অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

নবম বর্ষ

(ফাল্গুন ১৩১৮ হইতে মাঘ ১৩১৯)

সম্পাদক—

শ্রী কেশব চন্দ্র গুপ্ত

ও

[illegible]

কলিকাতা

অর্চ্চনা-কার্য্যালয়

৯ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, (অর্চ্চনা পোষ্ট) হইতে

শ্রীকৃষ্ণদাস ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র

অর্চ্চনা সম্বন্ধে মতামত।

ARCHANA—The publication is devoted to philosophical and incidentally Bengali interests. &c. &c—*Statesman and Friend of India.*

ARCHANA—This monthly magazine is always interesting reading and has a large circle of readers.—*The Indian Daily News.*

ARCHANA—We are glad to find that the Bengali monthly *Archana* has, within a very short time, been able to secure an assured place among the vernacular periodicals of the country and among the organs of Indian public opinion in Calcutta. It makes its appearance with characteristic punctuality. The articles are thoughtful, well-written interesting reading and bear ample evidence of judicious editing. (Summary of Opinions)—*The Bengalee.*

ARCHANA —The get up is very taking and it contains many valuable and interesting articles * * This magazine can be recommended highly to the reading public.—*The Telegraph.*

"অর্চ্চনা সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা। অর্চ্চনায় সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইতেছে। অর্চ্চনা বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত"। —হিতবাদী।

"অর্চ্চনা সর্ব্বাংশে ভাল হইয়াছে। অর্চ্চনা প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। সাহিত্যে অর্চ্চনার উচ্চ স্থান"।—বঙ্গবাসী।

"অর্চ্চনা পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে"।—বসুমতী।

* * এই উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা 'অর্চ্চনা' আজ কয় বৎসর ধরিয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাল মন্দ বিচার করিয়া আসিতেছে, যেরূপ অপক্ষপাতে ইহা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, যেরূপ অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়াও সময়ে প্রকাশিত হইতেছে এরূপ পত্রিকা বর্ত্তমানে একখানিও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অর্চ্চনা বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই। * * ইহা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীরই পাঠ করা উচিত।—সময়।

"অর্চ্চনা কয়েক বৎসরেই প্রভূত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। 'অর্চ্চনা' অনেক নূতন মাসিকের আদর্শ হইতে পারে। আলোচ্য সংখ্যায় প্রবন্ধগুলি যে কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিককে অলঙ্কৃত করিতে পারে। অর্চ্চনা ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। * * এক সংখ্যায় এতগুলি সুখপাঠ্য ও সুলিখিত প্রবন্ধের সমাবেশ ঢক্কা-নিনাদী মাসিক সমূহেও দেখিতে পাই না।"—সাহিত্য।

মাসিক সাহিত্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাগজের নাম করা যাইতে পারে। যতগুলি উৎকৃষ্ট পত্রিকা আছে, তাহার মধ্যে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত * * অর্চ্চনা * * প্রভৃতি পুরাতন পত্রিকাগুলি * * প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।—সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

মাসিক পত্রিকা ও
সমালোচনী।

নবম বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩১৮। [প্রথম সংখ্যা।

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র।

কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন বঙ্গ-সাহিত্যাকাশ হইতে আবার একটী মহাদীপ্তিশীল জ্যোতিষ্ক বিচ্যুত হইয়া পড়িল। ভারতীর অঙ্ক শূন্য করিয়া নির্ম্মম বিধাতা তাঁহার বরপুত্র গিরিশচন্দ্রকে কাড়িয়া লইলেন। যিনি ৪০ বৎসর ধরিয়া নানাচিত্র অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালীকে হাসাইয়াছেন, কাঁদাইয়াছেন—যাঁহার প্রতিভা এতদিন পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয়, প্রেমের মহত্ব, ভক্তির উৎসে নাট্যসাহিত্যকে উদ্ভাসিত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর চিত্ত আকর্ষণ ও শিক্ষার আয়োজন করিয়াছিল, বিগত ২৫শে মাঘ তারিখে কালের অশনি-সম্পাতে আমাদের সেই গিরিশচন্দ্র ধরাধাম হইতে অপসৃত হইয়াছেন।

১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন তারিখে গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যুর সময় তাঁহার ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। সারাজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিরিশচন্দ্র বঙ্গ-সাহিত্যকে মণিমুক্তাহীরক-সম্ভারে বিভূষিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, অসংখ্য নূতন নূতন চরিত্র-সৃজনের এত অধিক ক্ষমতা ও প্রতিভা লইয়া অন্য কোন নাট্যকার বা লেখক বঙ্গ-সাহিত্যে অবতীর্ণ হন নাই। গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র নাট্যকার ছিলেন না, তিনি নটকুলগুরু, প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি বঙ্গ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা, অভিনেতার শিক্ষক এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য ও প্রধান ভক্ত ছিলেন। সর্ব্ব বিষয়েই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা পূর্ণমাত্রায় প্রকট।

গিরিশচন্দ্র কখনও বাজে হুজুগে মাতিতেন না, বাজে গোলযোগের মধ্যে থাকিতেন না। প্রশংসা বা নিন্দাবাদে তাঁহার সাম্যভাব পরিলক্ষিত হইত। আধুনিকের ন্যায় যশঃ বা উপাসনা-লিপ্সা তাঁহার ছিল না, তিনি যশের কাঙ্গাল ছিলেন না। কলিকাতার এক প্রান্তে বসিয়া নিজের সাধনায়, নিজের কর্ম্মে, নিজের আত্মোন্নতিতে গিরিশচন্দ্র সর্ব্বদাই প্রমত্ত থাকিতেন।

আমরা গিরিশচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে বসি নাই, শোকপ্রকাশ করিতে বসিয়াছি, আক্ষেপ করিতে বসিয়াছি! তিনি বাণীর মানস পুত্র হইলেও, সর্ব্ব-দিকস্পর্শিনী প্রতিভার অধিকারী হইলেও, সর্ব্বপ্রধান নাট্যকার হইলেও আমাদের 'সাহিত্যিক-ধুরন্ধরে'র মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা, উপযুক্ত সম্মানদানে চিরদিনই কৃপণতা করিয়া আসিয়াছে; তাঁহাকে 'সাহিত্যিকের দলভুক্ত' করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র এই 'উপেক্ষা' ভাল করিয়াই বুঝিয়া গিয়াছেন, এইটুকু আমাদের দুঃখ, এইটুকু আমাদের আক্ষেপ। তাই কবির সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে হয়—

"এই অভিশপ্ত ভূমে, বুঝি গুরো পথ ভুলে
পড়েছিলে এসে,
কেন না জন্মিলে কবি, উপযুক্ত কালে আর,
উপযুক্ত দেশে?"

বাঙ্গালী যদি অকৃতজ্ঞ না হয় তাহা হইলে এখনও সকলে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-পূজা করিয়া তাঁহার আত্মার প্রীতি-সাধন করিবে, অন্যথা সাহিত্যের উপর যে অভিশাপ আসিবে, তাহা কখনও মোচন হইবে না। আমাদের সামান্য অর্ঘ্যেই যে গিরিশচন্দ্র কৃতার্থ হইবেন একথা ভাবিও না—সর্ব্বদা মনে রাখিও ইহা তোমাদের কর্ত্তব্য এবং মঙ্গলবিধায়ক, এবং ইহাও মনে রাখিও যে তাঁহার স্মৃতি তোমাদের স্তুতি-গীতির অপেক্ষা রাখে না। যতদিন বঙ্গ-সাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে —যতদিন তাঁহার বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, বলিদান, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব, সিরাজদ্দৌলা, মুকুলমুঞ্জরা প্রভৃতি গ্রন্থের অস্তিত্ব থাকিবে—যতদিন বিশাল নাট্যশালাসমূহের একখণ্ড ইষ্টকও অবশিষ্ট থাকিবে—ততদিন তাঁহার অমর-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন তাঁহার পুণ্যময় স্মৃতি বাঙ্গালীর অস্থি-চর্ম্মের সহিত জড়িত থাকিবে।*

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

* বঙ্গ-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় প্রতিভা-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় 'গিরিশচন্দ্র' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিতেছেন। উক্ত প্রবন্ধ আগামীবার হইতে 'অর্চ্চনা'য় প্রকাশিত হইবে।
—সম্পাদক।

সাহিত্যে মৌলিকতা।

বাঙ্গালার সাহিত্য-বাজারে 'মৌলিকতা' কথাটার এখন বড় বেশী রকম আমদানী দেখা যায়। এখনকার অধিকাংশ সমালোচকই সমালোচনা করিতে বসিলে ঐ কথাটার ব্যবহার না করিয়া প্রায়ই থাকিতে পারেন না। অবশ্য, ঐ বাক্য-ব্যবহারের আতিশয্য দেখিয়া উহার বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। আমাদের বক্তব্য,—কথাটার উচিত-মত ব্যবহার লইয়া। 'মৌলিকতা' কথার প্রকৃতিগত অর্থ চাপা পড়িয়া যাহাতে উহা দশ জনের অর্থহীন অভ্যস্ত-আবৃত্তিমাত্র হইয়া না দাঁড়ায়, সেদিকে সকলের একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি, অবস্থা প্রায় তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই ঐ শব্দটির সুপ্রয়োগ হয় না। প্রায় উহার অপ-ব্যবহারই হইয়া থাকে।

এইরূপ হইবার সাধারণতঃ দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম কারণ,—সমালোচক প্রভুদিগের সত্যের প্রতি অনুরাগের অভাব এবং তাঁহা-দিগের মানসিক সঙ্কীর্ণতা; দ্বিতীয় কারণ,—অজ্ঞতা।

যাঁহাদের সমালোচনা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বা বন্ধুতার অনুশাসনে শাসিত, তাঁহাদের রচনাতেই এই বাক্যের অপব্যবহার-রূপ ব্যভিচারদোষ ঘটিবারই কথা। ইঁহাদের দোষ অমার্জ্জনীয়। এই মিথ্যা ব্যবসায়ী লেখকগণ মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া সাহিত্য-চরিত্র নষ্ট করিয়া থাকেন। সদুপদেশ বা সুপরামর্শ এই লেখক-সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারকে সংযত করিতে পারে না। সাহিত্য-গুরু বঙ্কিম ইঁহাদের সংশোধনের জন্য চাবুকের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন, তাঁহারা 'মৌলিকতা' কথার ঠিক-মত অর্থ জানেন না। তাঁহাদের রচনাতেও সেই জন্য ঐ শব্দের অপ-প্রয়োগ দোষ ঘটিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের এ দোষ ইচ্ছাকৃত নহে। জ্ঞানকৃত পাপের সংস্পর্শ ইহাতে নাই। যে দোষ অজ্ঞতাজনিত, তাহা কতকটা মার্জ্জনীয়। তা' ছাড়া, কথাটার তাৎপর্য্য বুঝাইতে পারিলে, তাঁহাদের এ ত্রুটি সংশোধিত হইবার আশাও আছে। এই আশা-পরবশ হইয়াই আমরা দুই চারি-জন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সাহায্য লইয়া 'মৌলিকতা' বাক্যের মর্ম্ম সুস্পষ্ট করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছি।

"There is nothing new under the Sun."

এই প্রবাদ-বাক্যে সার সত্য নিহিত আছে। পৃথিবীতে 'আনকোরা' নূতনের অস্তিত্ব আদৌ অসম্ভব। আজ পর্য্যন্ত এমন কোন জিনিষ আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা একেবারে পুরাতনের সম্পর্ক শূন্য! পুরাতনই নূতনের বেশ ধারণ করিতেছে মাত্র। পুরাতন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতনের সৃষ্টি হইতে পারে না। অন্ততঃ, অদ্যাবধি সেরূপ হইতে ত দেখি নাই।

সাহিত্যও কিছু সৃষ্টি-ছাড়া বা জগত-ছাড়া জিনিষ নহে। সুতরাং সেখানেও যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে, এমন আশা করা দুরাশা মাত্র। সৃষ্ট জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, তাহারই সংযোগ-বিয়োগ করিয়া সমুদয় সাহিত্য-সংসার বিরচিত হইতেছে। অতএব সাহিত্য-সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছি, প্রকৃত পক্ষে সে সমস্তই পুরাতন। কোন চিন্তাই কোন 'আইডিয়া'ই নিজেকে সম্পূর্ণ নূতন বা মৌলিক বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না।

তাহা হইলে, সাহিত্য-সংসারে 'মৌলিকতা' জিনিষটার কি একান্তই অসদ্ভাব? না,—তাহা নহে। সে কথা ক্রমে বলিতেছি।

মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর হইতে স্বেচ্ছামত টানিয়া টানিয়া সূতা বাহির করিয়া জাল বুনিতে থাকে, 'মৌলিকতা' জিনিষটা সেরূপ ভাবে মনুষ্যমধ্য হইতে উৎপন্ন হয় না। ইহা নিতান্তই ব্যক্তিগত বা কাহারও নিজস্ব সামগ্রী নহে। ইহা দশ জনের যোগেই তৈয়ারী হইয়া থাকে। যদি আমার কোন মস্তিষ্ক-প্রসূত ভাব, অপরের চিন্তার বা বুদ্ধির অতীত হয়, তাহা হইলে সেই ভাবকে মৌলিক মনে না করিয়া পাগ্‌লামী বলাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং যাহা অর্থহীন,—তাহাও 'মৌলিক' নহে। সকলের হৃদয়েই ইহার আসন আছে। মৌলিক-চিন্তা এমন কথা কখনই বলিবে না, যাহাতে আমি বৃত্তকে চতুষ্কোণ বলিয়া বুঝিব। আসল কথা এই যে, সাধারণ-হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক না পাতাইয়া, আপোষ না করিয়া একপদও অগ্রসর হইবার ইহার সামর্থ্য নাই। তবে সাহিত্য-সংসারে মৌলিকতার কার্য্য কি?

মৌলিকতা পুরাতনকে নূতন আকার দেয় মাত্র। কোন এক বিখ্যাত বিলাতী লেখক তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,—

"I never had a spontaneously original idea for a story in all my life. I am a copy-book, pure and simple. You say you have never noticed the faintest suggestion of plagiarism about my stories. Ah, my friend, that is because I am such a crafty thief!"

বাস্তবিক, যে পাকা চোর, সে পরের সোনা লইয়া তৎক্ষণাৎ তদবস্থায় তাহা বাজারে বাহির করে না। সে তাহার ভিন্ন গঠন দিয়া জন-সমাজে নিজের বলিয়া তাহা চালাইতে চেষ্টা করে। ভাব-রাজ্যে ভাব-সম্পদ লইয়া এইরূপ কাড়াকাড়ি ব্যাপার প্রতিনিয়তই চলিতেছে। সেইজন্য দার্শনিকপ্রবর Emerson সাহেব বলিয়াছেন,—"The greatest genius is the most indebted man."

যে সেক্সপীয়রকে লোকে 'মৌলিকতা'র আকর বলিয়া স্বীকার করে, যাঁহার সম্বন্ধে পোপ্ (Pope) বলিয়াছেন যে, যদি কেহ 'অরিজিন্যাল' নামের যোগ্য থাকেন, তবে সে কেবল একমাত্র সেক্সপীয়র; সেই সেক্সপীয়রও এই অপহরণ-অভিযোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার রচিত 'Henry VI'. নামক তিন খণ্ড গ্রন্থের সর্ব্বশুদ্ধ ৬০৪৩ লাইনের মধ্যে ১৭৭১ লাইন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের লেখা হইতে অক্ষরে অক্ষরে গৃহীত। তা' ছাড়া, ২৩৭৩ লাইন অপর লেখকের লেখার ভাবাবলম্বনে লিখিত। এই সকল অভিযোগের বিরুদ্ধে Landor সাহেব কিন্তু বলিয়াছেন,—"Yet he was more original than his originals. He breathed upon dead bodies and brought them into life." সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে,'বৈচিত্র্যের চিত্রাঙ্কণ-নিপুণতা'র নামই মৌলিকতা। মৌলিকতা নিতান্ত আকাশ-কুসুমের মত কল্পনাগত জিনিষ নহে।

আমাদের দেশেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহাকবি কালিদাস রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থ না পড়িলে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা প্রভৃতি লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তিনি নিজেই বলিতেছেন ;—

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ।

মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥

'অথবা সূত্র যেমন হীরকাদিকৃত ছিদ্র পথে মণিমধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণকৃত বাক্যদ্বার দিয়া এই বংশে প্রবেশ করিব।'

একই চিন্তা, একই ভাব কতশত উপায়ে, কতশত আকারে যে সাহিত্য-সংসারে নিত্য প্রচারিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা রাখে? নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আদি আবিষ্কারক বলিয়া সভ্য সমাজে পরিচিত, কিন্তু এই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির কথা নিউটনের বহুপূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য ও আর্য্যভট্ট কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন,—"আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহী যৎ তয়া প্রক্ষিপ্যতে

চুৎ তয়া ধার্য্যতে।" অর্থাৎ 'পৃথিবী আকর্ষণ-শক্তি বিশিষ্ট। কারণ, যাহা প্রক্ষিপ্ত হয়, আকর্ষণ শক্তি দ্বারা পৃথিবী তাহাই ধারণ করে।'

ভারতবর্ষে বিলাতী আলোক আসিবার বহুপূর্ব্বে ভারতবাসী জানিত,—"কপিত্থফলবদ্বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমং।" অর্থাৎ 'পৃথিবী কয়েতবেলের মত গোলাকার এবং উত্তর দক্ষিণে ঈষৎ চাপা।'

এখন বলা হইতেছে, এই মৌলিকতার অধিকারী কে? উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, যিনি প্রতিভাশালী,—মৌলিকতা কেবলমাত্র তাঁহারই করায়ত্ত। কারণ; "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভেত্যুচ্যতে"। নবীকরণ-শক্তির নামই প্রতিভা। নবীকরণশক্তি হইতেই মৌলিকতার উৎপত্তি। সুতরাং প্রতিভা প্রসূত কার্য্য ব্যতীত অন্যত্র মৌলিকতার অস্তিত্ব নাই। নবীকরণ—মৌলিকতারই নামান্তর মাত্র। একই কার্য্য, শক্তির তারতম্য অনুসারে কোথাও অনুকরণ বা অপহরণ বলিয়া গণ্য হয় এবং কোথাও বা তাহা মৌলিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রতিভাশূন্যের কার্য্য অনুকরণে পরিণত হয়। আর প্রতিভাশালীর কার্য্য 'মৌলিক', 'নূতন' বা 'অপূর্ব্ব' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকে। এই অবসরে আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখি।

আমাদের দেশের দুই চারিজন ইংরাজী স্নায়ুগ্রস্ত বাবু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকে ইংরাজী সাহিত্যের নকল বা অনুকরণ বলিয়া অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না, যে অনুকরণে প্রতিভা সম্পৃক্ত, তাহা আর অবহেলার সামগ্রী হইতে পারে না। কথাটা প্রমাণ প্রয়োগে বুঝাইয়া দিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছেন, "সমুদায় রোমক সাহিত্য, যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমক সাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র।......তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এবং ইংলণ্ড এবিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে, এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয় এবং ফরাসীগণ অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন, যে শেষোক্ত জাতি সকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের

অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা 'নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল।' বিদেশী সাহিত্যের উদাহরণেই বা আবশ্যক কি? আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের কথা আলোচনা করিলেই সে কথা আরও স্পষ্টীকৃত হইবে। যে সাহিত্যকে তোমরা খাঁটী সাহিত্য বলিয়া থাক, সেই সাহিত্যের ভাবপ্রবাহও পশ্চিম হইতে বঙ্গে আসিয়াছিল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন, "সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস প্রভৃতির হিন্দীপদাবলী গীত ও মহাকাব্য সকল পাঠ করিয়া বাঙ্গালার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির লেখা পড়িলে মনে হয়, যেন বাঙ্গালায় হিন্দীর প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে তুলসীকৃত রামায়ণের অনেক ছত্র, অনেক শ্লোক আদত পাওয়া যায়। সুরদাসের গীত-লহরী হইতে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সর্ব্বস্ব পাওয়া যায়।" তাই বলিতেছিলাম, যে সাহিত্য মধুসূদন ও বঙ্কিমাদির প্রতিভা সংস্পর্শে সঞ্জীবিত, তাহাকে খাঁটি জিনিষ না বলা পাগলামী-পরিচায়ক। এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে আমরা রবিবাবুর ভাষায় বলিতে পারি, "যে জিনিষটা একটা কোনো স্থায়ী বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার আর কোনো পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটি-জিনিষ বলা হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধ্যে সে জিনিষটা কোথাও নাই।"

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

গুলে বকাওলি।

(ইহা এক প্রকার পুষ্পবৃক্ষ; কতকটা ভুট্টা গাছের মত আকার। গাছের দাঁড়া ঊর্দ্ধে উঠে ও তাহার চারি ধারে লম্বা লম্বা পাতা ছড়াইয়া পড়ে; থোলো থোলো শাদা সুগন্ধী ফুলগুলি কেবল ডগার উপরেই ফুটিয়া থাকে।)

১

রে বিচিত্র ফুলতরু! কাটাইয়া ধরণীর মায়া,
ধরণীর সুখভোগ, রোগ, শোক, সন্তাপ পাসরি,
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, ঊর্দ্ধ গতি, বল্ বল্, কার মুখ স্মরি'?
তোর কায়া-মাঝে আজি পড়িয়াছে কা'র পদ ছায়া?

২

জানিস্ না তোষামোদ—মানবের চরণ লেহন ;
কোনো নৃপতির পদে মাথা তোর নাহি হয় হেঁট!
কার পাদপদ্মতলে রাখিবারে এ রূপালি ভেট,
এ মধুর আকিঞ্চন, প্রাণপণ এই আয়োজন ?

৩

সদা তোর ঊর্দ্ধ দৃষ্টি! ধ্যানে সদা নন্দন-স্বপন!
ধাত্রী ধরিত্রীর লাগি তবু তোর কেঁদে উঠে প্রাণ!
হে পবিত্র শুভ্র আত্মা! কি সৌরভ করিস্ প্রদান
বিশ্বজনে!—বিশ্ব হাসে, ভুলি দুঃখ, মুছিয়া নয়ন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

পথের কথা।

ওয়েষ্টন্ ষ্ট্রীট (কলিকাতা)

আজকাল কলিকাতায় ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট্ বলিয়া যে গলিটী সাধারণে পরিচিত, তাহার নামের সহিত অতীত কালের ইতিহাসের একটু সম্পর্ক আছে। লোকে "ওয়েষ্টন ষ্ট্রীটে"র কথা জানেন, কিন্তু এই রাস্তার সহিত যে মহাত্মার নামটী সংযুক্ত, তাঁহার কথা খুব কমই জানেন। আমি এই ওয়েষ্টন সাহেবের সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই 'অর্চ্চনা'র পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। যদি এ সম্বন্ধে আর কেহ কিছু নূতন কথা বলিতে পারেন—তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হইব।

ওয়েষ্টন সাহেব, কলিকাতার প্রথম ফিরিঙ্গি। এই দেশে তাঁহার জন্ম—এ দেশের অন্নজলে তাঁহার দেহ পুষ্ট—এ দেশের সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্যময় নরজীবনের শেষ অস্তিত্ব লোপ—আজ প্রায় দুই শত বৎসর হইতে চলিল—কলিকাতার একটী ক্ষুদ্র গলি এই মহাপ্রাণ ফিরিঙ্গির কীর্ত্তি-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে।

চার্লস ওয়েষ্টন পলাশী আমলের লোক। এই কলিকাতাতেই তাঁহার জন্ম। বর্ত্তমান টেরিটি বাজারের বিপরীত দিকে একটী বাড়ী আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেখা যাইত, কিন্তু এখন আর সে বাড়ী নাই। তাহা ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে একটী নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। টেরিটি বাজারের এই বাড়ীতেই ১৭৩১ খৃঃ অব্দে চার্লস ওয়েষ্টনের জন্ম। আর ওয়েষ্টন লেন্‌টীও বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়া জিগ্‌জ্যাগ্‌-লেনে গিয়া মিশিয়াছে।

ওয়েষ্টনের পিতা কোম্পানীর প্রথম প্রতিষ্ঠিত Mayor's Court এর সেরেস্তাদার ছিলেন। সেকালের লোকে তাঁহাকে "সাহেব-সেরেস্তাদার" বলিত। তিনি এদেশের লোকের সঙ্গে বড়ই মেশামিশি করিতেন—বাঙ্গলায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। হিন্দুর পাল-পার্ব্বণে নিমন্ত্রিত হইলে—পাত পাড়িয়া বসিয়া ফলার পর্য্যন্ত করিতেন!

এই সাহেব সেরেস্তাদারের পুত্র, চার্লস ওয়েষ্টনের জীবনের কাহিনীগুলি ধারাবাহিকরূপে এক স্থানে কোথাও পাওয়া যায় না। পাঁচ জায়গায় পাঁচটী টুকরা সংগ্রহ করিয়া, জোড়া তালি দিয়া আমি এই সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাসানুরাগী পাঠক একটু ধৈর্য্যসহকারে সেগুলি পড়িলে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। চার্লস ওয়েষ্টনের নশ্বর দেহ এখন মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া, মাটী হইয়া গিয়াছে—কিন্তু পার্কষ্ট্রীটের পুরাতন গোরস্থানে এখনও তাঁহার সমাধিটী বর্ত্তমান। সেই সমাধিস্তম্ভে লিখিত আছে—

CHARLES WESTON.

BORN 1731 DIED 25th DECR. 1809

In the 78th year of his age.

ওয়েষ্টনের অমানুষিক গুণগরিমার পরিচয় তাঁহার সমাধিস্তম্ভের গাত্রে খোদিত, নিম্নলিখিত অংশটুকু পাঠ করিলে জানা যায়।

"A life protracted to unusual length, be marked by an unostentatious life of benevolence and charity seldom equalled or never before exceeded in British India. By the wise economical management of a fortune far from enormous (the production of his own industry) he was enabled to pour forth streams of bounty and mercy. He manifested a grateful mind, by cherishing in his old age his former employer and

benefact r the late Governor Holwell and after being the friend of the destitute, the support of the widow and fatherless,an ornament to British name and a blessing to mankind he descended to the tomb amid the tears of the indigent and lamentations of surviving frends. Reader ! this stone is no flatterer. Go and do thou likewise."

এই সমাধিস্তম্ভ গাত্রে যে কাহিনী লিখিত আছে, তাহা হইতেই সেকালের ইংরাজের মহৎ চরিত্রের আভায পাওয়া যায়। কষ্ট, বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা অর্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তির অধিকাংশই তিনি দাতব্য খাতে খরচ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানের পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না। দরিদ্র বালক, হতভাগিনী আশ্রয়হীনা বিধবা, অক্ষম আতুর সবাই তাঁহার দয়ার অধিকারী হইয়াছিল। তাঁহার দানের কোনরূপ জাতিগত বা সম্প্রদায়গত পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

অন্ধকূপ হত্যা ব্যাপারে সুবিখ্যাত হলওয়েল সাহেব আগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে—অস্ত্রচিকিৎসকের কার্য্য করিতেন। চার্লস ওয়েষ্টন প্রথম অবস্থায় তাঁহার সহকারী এ্যাপথিকারী ছিলেন। এমন কি, একবার তিনি তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া হলওয়েলের সহিত বিলাত পর্যান্ত যান। কিন্তু ডাক্তারী ব্যবসায়ে সেকালে বিশেষ লাভ ছিল না, কাজেই ওয়েষ্টন এ ব্যবসায়ে কোন কিছুই করিতে পারেন নাই। সহকারীর কথা দূরে থাক—তাঁহার প্রভু হলওয়েলই কোম্পানীর নিকট যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিত না। কারণ ওয়েষ্টন সাহেব নিজ মুখেই এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন—"হলওয়েল সাহেব কোম্পানীর প্রধান সার্জ্জন। তিনি বিলাত হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাঁ'রই যখন রোগী দেখিয়া ৩।৪ মাসে মোটে পঞ্চাশ-ষাট্ টাকা উপায় হয়, তখন এ ডাক্তারী ব্যবসা ত্যাগ করাই আমার শ্রেয়ঃ।" ওয়েষ্টন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা করিয়াছিলেন। আর তাহা না হইলে তিনি লক্ষপতি ধনেশ্বর হইতেও পারিতেন না।

হলওয়েল যখন ফোড়া অস্ত্র করার কাজ ছাড়িয়া, কোম্পানীর অধীনে Covenanted Civilian রূপে নিযুক্ত হইলেন, ওয়েষ্টন ও সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিলেন।

সেরাজউদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে-ড্রেকের পলায়নের পরই,হলওয়েলের হাতে ফোর্ট উইলিয়মের আধিপত্য আসিল। হলওয়েল কিরূপ অসমসাহসিকতার সহিত, নবাবের সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। স্বয়ং নবাব সেরাজউদ্দৌলাই নিজ মুখে

সেই বীরত্বের কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ওয়েষ্টন এই ভীষণ সময়েও তাঁহার পূর্ব্ব প্রভু হলওয়েলকে ত্যাগ করেন নাই। দুর্গমধ্যে তিনি Militriaman রূপে কাজ করিতেছিলেন। নবাব কর্ত্তৃক দুর্গজয়ের পূর্ব্ব রাত্রে হলওয়েল দুর্গের গুপ্ত দ্বার দিয়া ওয়েষ্টনকে গঙ্গায় নৌকাবক্ষে তুলিয়া দেন। হলওয়েলের অনেক মাল পত্র সেই নৌকায় রক্ষিত হইয়াছিল—ওয়েষ্টন সেই মাল রক্ষার ভার পাইলেন। ধরিতে গেলে হলওয়েল তাঁহার উপকারই করিয়াছিলেন। এরূপ না করিলে ওয়েষ্টনকে হয়ত অন্ধকূপের মধ্যে পচিতে হইত।

ওয়েষ্টন দুর্গজয়ের পর ফলতায় না গিয়া, চুঁচুড়ার দিনেমার ফ্যাকটারিতে আশ্রয় লইলেন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বিলাত যাইবার সময় হলওয়েল তাঁহার একান্ত অনুরক্ত সহকারীকে দুই হাজার টাকা দান করিয়া যান। খালি তাই নয়, স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে খাটাইবার জন্য, তাঁহাকে আরও পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ দেন।

হলওয়েল প্রদত্ত এই সাত হাজার টাকাই ওয়েষ্টনের উন্নতির প্রধান উপায়। ওয়েষ্টন এই টাকায় এজেন্সির কাজ আরম্ভ করিলেন। সেকালে এই কাজে বেশ দুপয়সা রোজগার হইত। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান টিরেটা (টেরিটি) বাজার নীলাম হয়। ওয়েষ্টনই সেই সময়ে উচ্চদরে এই বাজারটী কিনিয়া লন। ওয়েষ্টন এই বাজারের দোকান ভাড়া ও তোলা দান প্রভৃতি হইতে নিজের খরচ চালাইতেন, আর তাঁহার সঞ্চিত সম্পত্তির সুদ হইতে যে প্রচুর আয় হইত, তাহা দানকার্য্যে ব্যয় করিতেন।

মৃত্যু সময়ে তিনি কয়েক লক্ষ নগদ টাকা রাখিয়া যান। যেকালে আট টাকা মাহিনার চাকরীতে লোকে দোল-দুর্গোৎসব করিত, সেকালে লাখ্ টাকা সঞ্চয় করা একটা ভয়ানক ব্যাপার। আজীবন দাতব্য ও পরোপকারে অর্থদান করিয়া, এই টাকাটা নগদ রাখিয়া যাওয়াও বড় সহজ কথা নহে।

মহারাজ নন্দকুমার যখন জাল-অপরাধে সুপ্রীম কোর্টে অভিযুক্ত হন, তখন জুরীগণের মধ্যে আমরা এই ওয়েষ্টনকে দেখিতে পাই। ১৮০৯ খৃঃ অব্দের এক সংবাদপত্রের মন্তব্য হইতে জানিতে পারা যায় – Mr. Weston a. Eurasian of great wealth and boundless generosity who delighted to distribute with his own hand at his residence in Chinsurah *one hundred gold mohurs* a month to the poor.

চুঁচুড়ায় চার্লস ওয়েষ্টনের একটী বাগান বাটী ছিল। তিনি প্রতি মাসে এক শত মোহর (ষোল শত টাকা) স্বহস্তে গরীব দুঃখীকে দান খয়রাত

করিতেন। এ দানের পরিমাণ ত বড় সহজ নয়! পাঠক! বলুন দেখি, প্রতি মাসে এই দান আজকালকার দিনে সম্ভব কি না?

আজকাল যে বাড়ীটী লালদিঘীর প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা নিউম্যান কোম্পানী অধিকার করিয়া আছেন—ঐ বাড়ীটী চার্লস ওয়েষ্টনের ছিল। ১৭৮০ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসের একখানি পাট্টা হইতে দেখা যায়,—'অনারেবল কোম্পানীর নিজ জমাভুক্ত এক বিঘা যোল কাঠা খামার জমী চার্লস ওয়েষ্টনকে জমা দেওয়া হইল। এই ওয়েষ্টন সাহেব কলিকাতায় গরীব-দুঃখীর মা-বাপ ও কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী হলওয়েল সাহেবের বিশেষ বন্ধু। কোম্পানীর সহিত ওয়েষ্টনের এই স্বত্ব রহিল, যে তিনি ইহার উপর কোনরূপ পাকা এমারত ও দেয়াল নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না। রেলিং বা বেড়া দিয়া কেবল স্থানটী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাহাদের খাস দখলে আনিবেন।"

এই জমীর উপর ওয়েষ্টন কোনরূপ বাড়ী ঘর করেন নাই। কি উদ্দেশ্যে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে এই জমীটুকু পাট্টা লইয়াছিলেন, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে এক বিক্রয় কোবালা হইতে জানিতে পারা যায়,যে ওয়েষ্টন উক্ত অব্দে ছয় হাজার টাকা মূল্যে বারেটো সাহেবকে ঐ জমী পূর্ব্বস্বত্ব বলবৎ রাখিয়া বিক্রয় করেন। ইহার পর নয় বৎসর কাল এই জমী পতিত অবস্থাতেই থাকে। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সিঁড়ির পার্শ্বে কলিকাতার ঐ সময়ের যে একখানি পুরাতন চিত্র আছে,তাহাতেও মিসনরো'র পুরাতন গির্জ্জার পার্শ্বে এই স্থানটী শূন্য দেখা যায়।

১৮০৬ খৃঃ অব্দে কোম্পানী উল্লিখিত করারগুলি তুলিয়া দিয়া, এই জমী পুনরায় বিলি করেন। এই সময়ে এই স্থানে একটী বাটী প্রথম নির্ম্মিত হয়। ১৮৩০ খৃঃ এই বাটীতে Alport and Coর সদাগরী আফিস ছিল। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে ইহা "বেঙ্গল ক্লবের" দখলে আসে। ইহার পরে দেখা যায়, যে ক্রুটেন্‌ডেন ম্যাকিলপ, কোং জেমস্ উইলিয়াম নামক এক ব্যক্তিতে ৮২ হাজার টাকায় এই বাটী ও জমী বিক্রয় করিয়াছিলেন। তখনও এই বাড়ী "Club House" নামে পরিচিত। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে গুর ওয়ালটার ডিসুজা এই জমী ও তদুপরিস্থ বাটী ১৮০০০০ টাকায় ক্রয় করেন। আবার কয়েক বৎসর পরে এই জমী তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়। ওয়েষ্টন ১৭৮০ অব্দে যে জমী সামান্য মূল্যে জমা লইয়াছিলেন—১৮৮২ অব্দে তাহার মূল্য বাট্‌ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল।

টিরেটা-বাজার আজকাল বর্দ্ধমানের মহারাজের সম্পত্তি। কিন্তু শতাব্দী পূর্ব্বে এই বাজার হইতেই ওয়েষ্টনের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হন। এডওয়ার্ড টিরেটা নামক এক ভেনিসিয়ান এই বাজার স্থাপন করেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা গেজেটে একটী লটারি বা সুরতীর বিজ্ঞাপনে—এই বাজারটী একটী "প্রাইজ" রূপে ধরা হয়। বাজারের আয় সেই সময়ে মাসিক ৩৫০০ টাকা ছিল। নয় বিঘা আট কাটা জমী ব্যাপিয়া এই বাজারের ব্যাপ্তি। ইহার দাম সেই সময়ে ১৯৬০০০ হাজার টাকা ধার্য্য হয়। চার্লস ওয়েষ্টন এই লটারিতে টাকা দেন ও এই লটারির প্রথম পুরস্কার রূপে এই লক্ষ্মীমন্ত বাজারটী তাঁহার নামে উঠে। ইহা হইতেই তাঁহার লক্ষ্মীভাগ্য বাড়িয়া যায়।

ওয়েষ্টনের সন্তান-সন্ততি কি ছিল তাহার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে চুঁচুড়ার দিনেমারদিগের পুরাতন সমাধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায়, চার্লস ওয়েষ্টনের দুই কন্যার সমাধি সেইখানেই আছে। সম্ভবতঃ ১৭৮০ খৃঃ অব্দেই ওয়েষ্টন চুঁচুড়ায় থাকিয়া প্রতিমাসের প্রথম তারিখে দরিদ্র-দিগকে দেড় হাজার টাকা দান করিতেন।

ব্ল্যাক্‌হোলের ব্যাপারে Eleanor Weston নামক এক স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ দেখা যায়। এলিনারকে "ব্লাকহোলে" থাকিতে হয় নাই। নবাবের সেনাপতি তাঁহার অমানুষিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মুরশীদাবাদে চালান দেন। পথিমধ্যে এলিনার কোন উপায়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই এলিনার ওয়েষ্টনের সহিত চার্লস ওয়েষ্টনের কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারা যায় না।

ওয়েষ্টন দাতা ইংরাজের আদর্শ। তিনি এদেশে থাকিয়া যাহা কিছু উপায় করিয়াছিলেন, তাহা এ দেশের গরীব দুঃখীকেই দান করিয়া গিয়াছেন। এদেশে তাঁহার জন্ম। ধরিতে গেলে তিনি বর্ত্তমান "ইউরেসিয়ান" সম্প্রদায়ের প্রথম গণনীয় পুরুষ। আজও 'ওয়েষ্টন লেন' তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ধন্য ওয়েষ্টন! তোমার মত উদারপ্রাণ দাতা ইংরাজের এ যুগে বড়ই অভাব!

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সারঙ্গ

প্রয়াগের পথে সারঙ্গ বাজায়ে,
ফিরিত ফকির গাইয়া গান—
তরুণ বয়স— মলিন বসন,
মধুর কণ্ঠে ফুটিত তান।

সারঙ্গের তারে সঙ্গীত যবে
ঝরিয়া পড়িত ঝরণা মত,
এক এক করি, দলে দলে দলে,
দাঁড়ায়ে যাইত পথিক যত।

কি ধনী ভিখারী, কিবা মুসাফের,
বিহ্বল লোচনে করিত পান,
সারঙ্গের সুরে অমৃত মাখা
ফকিরের সেই বিরহ গান।

খ্যাতি গেল তার দিক্-দিগন্ত
দিল্লী প্রয়াগে ধ্বনিল তাহা,
তবুও ফকির ঘুরিয়া বেড়াত
তেমনি তরুণ, মলিন, আহা!

করুণ গর্ব্বে ঘুরিয়া বেড়াত,
না চাহে অর্থ, না চাহে মান;
শুধু সে গাইবে সারাটা জীবন,
সারঙ্গের সুরে বিরহ গান।

যন্ত্রটী করে, সঙ্গম তীরে,
কখন কখন বসিত আসি;
গঙ্গা-যমুনা বক্ষে যখন,
চন্দ্র কিরণ পুড়িত হাসি।

কখন কখন দূর আমিরের
উদ্যান পানে রহিত চাহি,
নিঃশ্বাস ফেলি, আকুল কণ্ঠে
কখন কখন উঠিত গাহি।

গভীর নিশীথে ভাসিয়া আসিত
লোকালয়ে যবে তাহার গান;
কত বিরহীর ঝরিত অশ্রু,
কত মানিনীর টুটিত মান।

কখন নিরালা আমিরের সেই
উদ্যান পাশে বসিত আসি;
মাথার উপরে এদিকে ওদিকে,
ঝরিত শুভ্র শেফালি রাশি।

স্কন্ধে সারঙ্গ তখন ফকির
কি মধুর তান তুলিত ধীরে,
পাখিরা আসিয়া শাখায় শাখায়,
ডাকিয়া উঠিত তাহার ঘিরে।

বিহার-কুঞ্জ কুটীরের দ্বারে,
জাগিত কাহার নয়ন দু'টি,
শিথিল কবরী, চরণ-প্রান্তে
অঞ্চল কা'র পড়িত লুটি।

আমির-ঘরণী আসিত লুকায়ে,
শুনিতে তাহার বিরহ গান,
নয়নে ঝরিত অশ্রু-মুকুতা
আকুলি বিকুলি উঠিত প্রাণ।

অতীতের কত প্রেমের কাহিনী
স্মরণে তাহার উঠিত ভাসি।
কত পরিচিত গায়ক কণ্ঠ,
কত পরিচিত সে সুররাশি!

একদা ফকির জাহ্নবী তীরে,
ধরিল চিত্তহরণ গান,
নেত্র যুগলে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ
কি প্রেমানন্দে পূর্ণ প্রাণ!

গাইল ক্রমশঃ— ক্রমশঃ করুণ
সঙ্গীত সেই উঠিল ধ্বনি,
চমকি উঠিল গগনে জ্যোৎস্না,
গঙ্গার জলে অদ্ভুত মণি।

ক্রমশঃ ছুটিল সঙ্গীত স্রোত,
—মধুর সমীর, মধুর নিশি,—
ক্রমশই ক্ষীণ ক্রমশঃ মধুর,
ছুটিয়া চলিল সারাটা দিশি।

গাইল ফকির তন্ময় প্রাণ
গভীর বিরহ হৃদয়ে বাজে;
গিয়াছে ভুলিয়া মৃন্ময়ী ধরা,
সুর-গীতিময় জগৎ মাঝে।

সহসা টুটিল, সে গভীর ধ্যান,
চমকি মেলিল নয়ন দুটি,
দেখিল মানস- প্রতিমা তাহার
চরণোপান্তে পড়িছে লুটি।

কত বরষের পরে হ'ল দেখা,
আমির-ঘরণী আজি সে নারী,
এ মিলন তরে সে যে মুসাফের,
জগতের সুখ সকলি ছাড়ি।

চাহি একবার শুধু একবার,
নায়িকার পানে নয়ন রাখি;
ফিরিল ফকির, স্কন্ধে সারঙ্গ
বন পথে মুখ, উদাস আঁখি।

শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ।

পিশাচ-পিতা।

(গোবিন্দরামের কীর্ত্তি-পর্য্যায়।)

১

একদিন প্রাতে গোবিন্দরাম আমার হাতে একখানা পত্র ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, আর একটা নূতন ব্যাপার হস্তগত।"

আমি বলিলাম, "কি ব্যাপার?"

তিনি বলিলেন, "পড়িয়াই দেখ।"

আমি পত্রখানি পাঠ করিলাম। দেখিলাম, পত্রখানি কোন শিক্ষিতা মহিলা লিখিয়াছেন। পত্রখানি এই;—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমার শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য একটি চাকুরী জুটিয়াছে; আমি এ সম্বন্ধে আপনার সহিত একবার পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি। কাল সকালে আটটার মধ্যে দেখা করিব। ইতি

অনুগতা

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

আমি পত্রখানি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, "ইনি কে ?"

"ইনি একজন ব্রাহ্মিকা, বিশেষ সুশিক্ষিতা, আমার একটী মৃত বন্ধুর ভগিনী।"

"চাকুরী লইবেন, তাহার আবার পরামর্শ কি ?"

"কিছুই জানি না।"

"আটটা তো বাজে, বোধ হয় এখনই আসিবেন।"

"হাঁ, ঐ আসিতেছেন. শোনা যাক্ ব্যাপারটা কি ?"

এই সময়ে একটি পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া স্ত্রীলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার বেশভূষা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মুখমণ্ডল সারল্যমণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত।

তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই গোবিন্দরামকে বলিলেন, "আপনি ত শুনিয়াছেন যে, আমার দাদা মারা গিয়াছেন, এখন আমার এমন আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই যে, তাঁহার সহিত পরামর্শ করি। আপনি চিরকালই আমাকে স্নেহ করেন, এইজন্য আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিলাম।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ইহাতে আর বিরক্ত কি ? বসুন—ঐ চেয়ারে। ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, ডাক্তার বসু।"

রাধারাণী চকিতে মুখ তুলিয়া একবার আমার দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই নতনেত্রে আমাকে নমস্কার করিলেন। আমিও তাঁহাকে নমস্কার করিলাম।

আমি দেখিলাম ইত্যবসরে গোবিন্দরাম তাহার আপাদমস্তক বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন।

রাধারাণী অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনি তো জানেন, মেয়ে পড়াইয়া আমার এক রকম চলে ; সম্প্রতি বসিয়া আছি ; কয়দিন হইল, একটি লোক আমার বাটীতে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। লোকটির বয়স হইয়াছে—পঞ্চাশের উপর। দেখিলে ভক্তি হয়, নিতান্ত ভাল লোক বলিয়াই বোধ হয়। তিনি আসিয়াই আমাকে বলিলেন, "আপনি চাকরি খুঁজিতেছেন ?"

আমি বলিলাম,—হাঁ এখন বসিয়া আছি।"

"আপনার নাম শুনিয়া আসিলাম। আমার একটী শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক।"

"আপনার কোথায় থাকা হয় ?"

"আমার বাড়ী চন্দননগরের কাছেই, ষ্টেশন হইতে ক্রোশখানেক দূরে। আমি আমার স্ত্রী, আর একটি সাত-আট বৎসরের মেয়ে আছে—এই মেয়েটিকেই আপনার পড়াইতে হইবে।"

"তা আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া—"

"এ অনুগ্রহ নয়, এক রকম আপনিই অনুগ্রহ করিতেছেন—কত মাহিনা চাহেন ?"

"আমি পূর্ব্বে যাঁহার বাড়ীতে ছিলাম, তিনি আমাকে প্রতিমাসে ত্রিশ টাকা করিয়া দিতেন।"

"সামান্ত ! আপনার মত শিক্ষয়িত্রীর ত্রিশ টাকা মাহিনা কিছুই নহে, আমি আপনাকে একশত টাকা দিব।"

"আপনি আমাকে যতদূর মনে করিতেছেন, আমি ততদূর নহি।"

"নিজের গুণ নিজে কেহ বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, আপনি নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন। ইহাও আমার নিয়ম যে, আমি লোক রাখিলে অর্দ্ধেক মাহিনা অগ্রিম দিই—এই লউন পঞ্চাশ টাকা।"

এই বলিয়া তিনি পাঁচখানা দশ টাকার নোট আমার সম্মুখে ধরিলেন। আমার বোধ হইল, এরূপ ভদ্রলোক সংসারে আর দ্বিতীয় নাই। পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম লইলে আমার আসবাবের সমস্ত দ্রব্যাদি কিনিয়া লইতে পারিব। আমি অতি কষ্টে মনের আনন্দোদ্বেগ গোপন করিয়া বলিলাম, "মেয়েটিকেই কেবল পড়াইতে হইবে ?"

"হাঁ, বড় ভাল মেয়ে, তবে আমার মেয়ের আরস্থলা মারা বড় বদ্-অভ্যাস—আমার এ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মেয়ে কি না। আমার আর একটি আগেকার পক্ষের স্ত্রীর বড় মেয়ে আছে, সে এখন শ্বশুর বাড়ীতে রহিয়াছে; তবে সে মেয়ে একটু আদুরে।"

"তাহা হউক, আমি বিশেষ আদর-যত্ন করিব।"

"পড়ানো ছাড়া আমার স্ত্রী যাহা বলে, তাহাও আপনাকে করিতে হইবে।"

"অবশ্য করিব বই কি !"

"হাঁ, তাহাতে আপনার বোধ হয় বিশেষ আপত্তি হইবে না। তবে একটা কথা হইতেছে, আমার স্ত্রীর গোটাকতক বিশ্রী রকমের খেয়াল আছে। এই মনে করুন—আমরা যে রকম কাপড় আপনাকে দিব, তাহাই পরিতে হইবে। ইহাতে বোধ হয় আপনার আপত্তি হইবে না ?"

আমি তাঁহার কথায় বিশেষ বিস্মিত হইলাম। বলিলাম, "না, ইহাতে আর আপত্তি হইবে কেন ?"

"তাহার পর এই মনে করুন—আমার স্ত্রী হয় ত বলিলেন, এইখানে বসো, ঐখানে দাঁড়াও, আপনাকে সেই রকম করিতে হইবে।"

"তাহাতে আপত্তি কি?"

"বেশ ভাল। আর এক কথা, আমার স্ত্রী লম্বা চুল আদৌ ভালবাসেন না। আপনাকে আমাদের বাড়ীতে যাইবার আগে চুল কিছু ছোট করিয়া কাটিতে হইবে।"

আমি এ কথা প্রকৃতই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। পাগল ব্যতীত কোন বিবেচক ব্যক্তি যে এরূপ প্রস্তাব করিতে পারে, তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না।

আমি বলিয়া উঠিলাম, "সে কি মহাশয়!"

তিনি আমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন, "এটা আমার স্ত্রীর সব চেয়ে বিশ্রী খেয়াল, লম্বা চুল সে সহ্য করিতে পারে না, দেখিলে তাহার বমি হইতে থাকে। এইজন্য এটা করা আবশ্যক—"

আমি এবার সবেগে বলিলাম "সে কি—তা হতে পারে না!"

তিনি যেন এ কথায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন; বলিলেন,"তাহা হইলে আপনি চুল কাটিবেন না?"

"না মহাশয়, আপনি বলেন কি!"

তিনি দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে উপায় নাই—আমাকে বিদায় লইতে হইল।" তিনি উঠিলেন। গমনোদ্যতভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কিছুতেই চুল কাটিবেন না?"

"না মহাশয়, আমাকে মাপ করুন।"

তিনি চলিয়া গেলে আমার মনে অনুতাপ আসিল। খরচ-খরচা বাদ প্রতি মাসে একশত টাকা সাধারণ নহে! এ রকম মাহিনা আর আমি কোথায় পাইব? চুল কাটিলেই বা ক্ষতি কি ছিল! চুলে আমার প্রয়োজনই বা কি! বিশেষতঃ ইহাদের বাড়ী ছাড়িয়া দিলেই, আবার শীঘ্রই চুল বড় হইত। একবারে নেড়া হইতে বলিতেছে না তো! আমি লোকটির নাম জিজ্ঞাসা করি নাই, সুতরাং তাহাকে যে পত্র লিখিব, তাহারও উপায় নাই। না বুঝিয়া এমন চাকুরীটা হারাইলাম! তখন মনে মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল, কি করিব স্থির করিতে পারিলাম না। পরদিন ডাকে তাহার এই পত্র পাইলাম। আপনাকে দেখাইব বলিয়া সঙ্গে আনিয়াছি।

এই বলিয়া তিনি গোবিন্দরামের হস্তে একখানি পত্র দিলেন,পত্রখানি এই ;—

"শ্রীমতী রাধারাণী দেবী,

আপনার মত শিক্ষয়িত্রী সহজে পাওয়া যায় না। তবে চুল সম্বন্ধে? এটা আমি দুঃখের সহিত অনুরোধ করিতেছি। চুল কাটায় আপনার যে অসুবিধা হইবে, তাহার জন্য আমি আপনার মাহিনা আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত আছি, বোধ হয় ইহাতে এবার আর আপনি অমত করিবেন না, ইতি।

অনুগত

শ্রীরাখালদাস নেউগী।"

রাধারাণী বলিলেন, "দেড় শত টাকা মাহিনা আমি আর কখনও পাইব না, লোভ বড় ভয়ানক জিনিষ, চুল রাখিয়াই বা ফল কি? তবে সন্দেহ হওয়ায় আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি, আপনি কি বলেন?"

গোবিন্দরাম ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সন্দেহজনক ব্যাপার সন্দেহ নাই।"

"তাহা হইলে আপনি আমাকে কি পরামর্শ দেন?"

"যখন এত বেশী মাহিনা দিতে চাহিতেছে, তখন অবশ্য ভিতরে একটা কিছু আছে।"

"তা হ'লে কি বলেন?"

"এখন কিছুই বলিতে পারি না, এই পর্য্যন্ত যে, ভিতরে একটা কিছু আছে।"

"তাহা হইলে আমি যাইব না?"

"যাইতে ক্ষতি নাই, কোন বিপদাপদের সম্ভাবনা দেখিলে আমাদিগকে পত্র লিখিলেই আমরা গিয়া উপস্থিত হইব।"

"আপনি ভরসা দিলেই যেতে পারি।"

"যাও—ব্যাপারটা কি জানাও উচিত।"

"কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি?"

"না থাকিতে পারে, এত অধিক মাহিনা দিয়া যখন লইতেছে, তখন কিছু ব্যাপার আছে।"

"তাহা হইলে যাইব?"

"যাও।"

"আপনি ভরসা দিলে, আমি জানি, আমার কেহই কিছু করিতে পারিবে না" এই বলিয়া রাধারাণী প্রস্থান করিলেন।

আমি বলিলাম, "এ স্ত্রীলোকের যে কেহ কিছু করিতে পারে, তাহা বোধ হয় না।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ, বিদুষী, বুদ্ধিমতীও খুব।"

২

এই ঘটনার পর প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। আমরা প্রায় রাধারাণীর কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। গোবিন্দরাম ভুলিয়াছিলেন কি না, জানি না, তবে তিনি এ কথার আর উত্থাপন করেন নাই।

এক মাস পরে একদিন আমার সম্মুখে গোবিন্দরাম একখানি পত্র ফেলিয়া দিলেন। আমি দেখিলাম, পত্রখানি রাধারাণী লিখিয়াছেন। পত্র এই;—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ ৩টার গাড়ীতে অবশ্য অবশ্য আসিবেন, আমি ষ্টেশনে থাকিব, ইতি।

রাধারাণী।"

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার যাইবে।"

আমি বলিলাম, "হাঁ এ রহস্যের ভিতর কি আছে, জানিবার জন্য আমিও একটু ব্যগ্র হইয়াছি।"

"তবে প্রস্তুত হও।"

আমরা তিনটার গাড়ীতে চন্দন-নগর যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে বহুক্ষণ গোবিন্দরাম নীরবে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "কি বুঝিতেছ, ডাক্তার?"

আমি বলিলাম, "কি বিষয়ে?"

"এই রাধারাণীর বিষয়।"

"আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

"একটা বিষয় স্থির যে, ইহাকে কেহ আটকাইয়া রাখে নাই।"

"কিসে জানিলে?"

"তাহা হইলে রাধারাণী ষ্টেশনে আসিতে পারিত না।"

"হাঁ, এখন বুঝিতেছি। কিছু স্থির করিতে পারিলে?"

"অনেক বিষয় মনে মনে স্থির করিতেছি, কিন্তু কোন বিষয়ে এখনও স্থির নিশ্চিত হইতে পারি নাই।"

তিনি আবার নীরব হইলেন। অন্যমনস্ক হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী চন্দন-নগরে দাঁড়াইল। আমি মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, রাধারাণী ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

আমরা নামিলে তিনি সহাস্য মুখে আমাদের নিকটে আসিলেন। বলিলেন

"আমি আজ সুবিধা পাইয়া আপনাদিগকে আসিতে লিখিয়াছি। আজ রাখাল বাবু তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কুটুম্বের বাড়ীতে গিয়াছেন।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "বেশ, এখন ব্যাপার কি শুনি। এই দিকে এস, ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে।"

গোবিন্দরাম ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিলে তিনি ওয়েটিং রুম খুলিয়া দিলেন। আমরা তিন জনে সেই ঘরে বসিলাম। বসিয়াই গোবিন্দরাম বলিলেন, "এখন শুনি—একে একে সব বলিয়া যাও।"

"তাহাই বলিতেছি।"

"হাঁ, আদ্যোপান্ত যাহাতে সব বুঝিতে পারি।"

"প্রথমে এখানে আমার কোন কষ্ট নাই, সকলে খুব যত্ন করেন।"

"তবে, অসুবিধা কি?"

"এই আমি ইঁহাদিগকে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কেন?"

"সব বলিতেছি, রাখাল বাবুর বাড়ী একটা বাগানের ভিতরে; বেশ ভাল বাগান—বাড়ীটাও ভাল। তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বদা বিষণ্ণ, দেখে মনে হয়, যেন তাহার কি একটা পীড়া আছে, আর আদর দিয়া দিয়া মেয়েটির মাথা একেবারে খাইয়াছে—মেয়েটির যে কিছু লেখাপড়া হইবে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না।"

"তা যা হউক, সেজন্য আমার বিশেষ দুঃখ নাই। তাহার পর কি, বল।"

"তাহাদিগের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে বিশেষ ভালবাসা আছে, এমন কিছু দেখি না।"

"ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই; নূতন খবর কি?"

"আমি যেদিন এখানে আসি, তাহার দুই দিন পরে একদিন রাখাল বাবুর স্ত্রী রাখালবাবুর কানে কানে কি বলিলেন। তখন রাখালবাবু আমাকে বলিলেন, "আপনার জন্য এই নীলরঙ্গের কাপড়খানি আনিয়াছি। আমার স্ত্রীর ইচ্ছা, আপনি এখনই এ কাপড়খানা পরুন।"

অগত্যা বাধ্য হইয়া আমি সেই কাপড়খানি পরিলাম। তখন রাখাল বাবু বলিলেন, "এই জানালার কাছে বসুন, এই দিকে মুখ ফিরাইয়া বসুন।"

আমি এ প্রস্তাবে বিস্মিত হইলাম। কিন্তু করি কি, পূর্ব্বেই ইহাতে সম্মত হইয়াছিলাম, কাজেই কোন আপত্তি না করিয়া সেইরূপ করিলাম। তখন রাখাল বাবু আমার সম্মুখে বসিয়া নানা হাসির খোসগল্প করিতে লাগিলেন,

আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ এই রকম গল্পসল্প করিয়া রাখাল বাবু বলিলেন, "এখন এ কাপড় ছেড়ে ফেলুন।"

কি করি—তাহাই করিলাম। এই রকম প্রায় রোজ হইতে লাগিল। আমি সন্দেহ করিলাম যে, ইহা কেবল খেয়াল নহে, ইহার ভিতরে কিছু রহস্য আছে। বোধ হয়, জানালা দিয়া আমাকে কেহ দেখে, কিন্তু আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। কারণ রাখাল বাবু আমাকে জানালার দিকে পিছন করিয়া বসিতে বলেন। আমার পিছনে কেহ থাকে কি না, দেখিবার জন্য আমি একদিন একখানা ছোট আর্সি ভাঙ্গা আঁচলের মধ্যে লুকাইয়া লইলাম, পরে আঁচলে মুখ মুছিবার ছলে সেই আর্সি গোপনে ধরিয়া দেখিলাম, কে একজন যুবক দূরে দাঁড়াইয়া আমাদের এই জানালার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। মুখ হইতে আঁচল অপসারিত করিয়া দেখি, রাখাল বাবুর স্ত্রী আমার মুখের দিকে সন্দিগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন। আমি তাঁহার দিকে চাহিবামাত্র তিনি সেই গবাক্ষ-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "দেখ, একটা ছোঁড়া আমাদের বাগানের বাহিরে বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

রাখাল বাবু বলিলেন, "হাঁ, বদ্ লোকটা এই দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে।"

রাখাল বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "কে এই অসভ্য লোক—আমাদের রাধারাণীর দিকে অমন করে চেয়ে আছে ?"

রাখাল বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কোন চেনা লোক নয় ?"

আমি বলিলাম, "এখানে আমার চেনা লোক কেহ নাই।"

"তাহা হইলে উহাকে ওখান হইতে চলিয়া যাইতে বল।"

আমি বলিলাম, "উহাকে না দেখাই ভাল।"

"না না—লোকটা তাহা হইলে রোজ এই রকম বিরক্ত করিতে আসিবে।"

কাজেই তাঁহাদের অনুরোধে আমি হাত নাড়িয়া সেই লোকটাকে সরিয়া যাইতে বলিলাম। তখন রাখাল বাবু জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেই দিন হইতে আর আমাকে সে কাপড় পরিতে হয় নাই, আমাকে সেই জানালায় আর বসিতেও হয় নাই। সে দিন হইতে আমি সেই লোকটিকেও আর দেখিতে পাই নাই।" ক্রমশঃ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

হংকঙের পথে।

সন্ধ্যার সময় সিঙ্গাপুর হইতে জাহাজে উঠিলাম, কিছুক্ষণ পরে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। পরদিবস আমরা চীন-সমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম। বঙ্গোপসাগরের ন্যায় ইহা তরঙ্গসঙ্কুল নহে বটে কিন্তু ফিরিবার সময় চীন উপসাগরে আমরা যে ভীষণ ঝটিকার মধ্যে পড়িয়াছিলাম তাহা মনে হইলেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়! এই সকল ঝড়কে "টাইফুন" কহে। বঙ্গোপসাগরের "সাইক্লোন" অতীব ভীষণ। "টাইফুন" তাহা অপেক্ষা ভীষণ! সেদিন প্রভাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ফোঁটা ফোঁটা করিয়া সমুদ্রের নীলজলে বৃষ্টি পড়িতেছিল। তরঙ্গরাজি স্বাভাবিক হইতে কিঞ্চিদধিক সচঞ্চল; পবন কিছু অধিক বেগে বহিতেছিল। ক্রমে পবনের ও সমুদ্রের গর্জ্জন বাড়িতে লাগিল। আমাদের জাহাজখানি তরঙ্গের সহিত উঠিতে পড়িতে লাগিল। তরঙ্গের শিরে জাহাজ স্থির থাকিতে পারে না। একদিকে না একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেই হইবে। এইরূপে জাহাজ এক পার্শ্ব হইতে আর এক পার্শ্বে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে তরঙ্গগুলি আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। উত্তাল তরঙ্গ জাহাজকে বহু উর্দ্ধে তুলিয়া ছাড়িয়া দেয়। জাহাজের পশ্চাদবর্ত্তী গতি চক্র (Propellor) তখন জল হইতে উত্থিত হইয়া শূন্যে ঘুরিতে থাকে। তখন একটা এমন শব্দ হয় যে মনে হয় যেন জাহাজখানি ভগ্ন হইয়া গেল। আবার যখন তরঙ্গটী অপসারিত হইল তখন জাহাজখানি ভীষণ বেগে বারিগর্ভে নিপতিত হয়। তখন দুই পার্শ্ব হইতে পর্ব্বত সদৃশ ঢেউ আসিয়া জাহাজের উপর দিয়া চলিয়া যায়। জাহাজের যাত্রীরা ফুটবলের মত জাহাজের ভিতর গড়াইতে থাকে। আমরা তখন উপুড় হইয়া শুইয়া এক একটা খোঁটা ধরিয়া কোন রকমে আপনাদের দেহ একস্থানে রক্ষা করিতে লাগিলাম। এই সময় বায়ু এত প্রবল হয় যে, জাহাজ তাহার অনুকূল গতিতে থাকিলে তাহাকে যে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিবে তাহা বলা অসম্ভব। সেই জন্য এ সময় জাহাজকে বায়ুর প্রতিকূলে চালাইতে হয়। দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির সহিত মনুষ্য-হস্ত-নির্ম্মিত জাহাজের এই রণ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

জাহাজের গতি প্রতিকূল বায়ুর দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে। ওদিকে চারি-

দিকে উঁকায় তরঙ্গরাশি, ক্ষুদ্র পোতখানিকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সেই বিপদে অন্য একটী তরঙ্গ আসিয়া জাহাজকে সেই বারিরাশির কবর হইতে তুলিয়া ফেলিল। ক্ষণিকের জন্য জাহাজ তরঙ্গ শিরে বিশ্রাম করিয়া আবার এক পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল। আবার চতুর্দ্দিক হইতে তরঙ্গরাশি আসিয়া জাহাজকে আবরণ করিয়া ফেলিল। জাহাজের ঘর, অলিন্দ, ডেক সব জলে ধৌত হইতে লাগিল। ডেক চারিদিক হইতে আঁটা। সেখানে জল প্রবেশ করিবার উপায় নাই। উপরে চারিদিক উন্মুক্ত। জল পতিত হইবামাত্র বাহির হইয়া যাইতেছে। পবন ও তরঙ্গের কি ভীষণ গর্জ্জন! যেদিকে চাও কেবল পর্ব্বতাকারে তরঙ্গ; কোন দিক্ দর্শন হইবে না। এই তরঙ্গরাজি ভেদ করিয়া গড়াইতে গড়াইতে উঠিয়া পড়িয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। যাত্রীদের মুখে কথা নাই, ভয়ে পাংশু বদন। জাহাজের কর্ম্মচারী সাহেবেরা জুতা খুলিয়া হাঁটু অবধি ইজের গুটাইয়া জাহাজ ধরিয়া চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাদের মুখে বেশ সপ্রতিভ ভাব। আবার গুণ গুণ করিয়া তান ধরিয়াছেন। আমি তখন নিরাশ অন্তরে উপুড় হইয়া "সেলুন" ডেকে শুইয়া আছি। সাহেবেরা সকলকে ক্যাবিনে যাইতে বলিলেন। সকলেই প্রায় ক্যাবিনে গেল, আমি যাইলাম না। আমি ভাবিলাম, ক্যাবিনে আবদ্ধ হইয়া মরণ অপেক্ষা জলে ভাসিয়া মরণ শ্রেয়ঃ। আত্মীয় স্বজনের জন্য মনটা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। বোধ হয় আমার মনের ভাব মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেন না সেই সময় একজন কর্ম্মচারী সাহেব আমার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া বলিল "Don't you like it?" আমি বলিলাম,—না, ইহা আমার মনের মত নহে। তখন সে আমায় আশ্বাস দিয়া গেল "Don't be afraid, it will pass off." সেই সময় দুর্দ্দান্ত পবনদেব জাহাজের পার্শ্বস্থিত একখানা "লাইফ বোট" উড়াইয়া লইয়া গেল। আমার মনে আরও ভয় হইল, কিন্তু ঈশ্বরের নাম স্মরণ ব্যতীত কোন উপায়ান্তর ছিল না। যাহা হউক, সমস্ত দিনের পর পবনের গতি একটু মৃদু হইয়া আসিল, ঢেউগুলির কলেবরও ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল। নিশার আগমনের সহিত সমুদ্র যেন কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিলেন। এইরূপে সে যাত্রা আমরা রক্ষা পাইলাম। শুনিলাম, কখন কখন এইরূপ ঝড় পাঁচ ছয় দিন থাকে। যাহা হউক, জাহাজ কোনরূপে ভগ্ন না হইলে কিম্বা কোথাও না আটকাইলে বিশেষ ভয়ের কারণ নাই।

ষষ্ঠ দিবস প্রত্যুষে আমরা হংকঙের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। চারি-দিকে কেবল ছোট ছোট পাহাড়, এক পাহাড়ের পর আর এক পাহাড়। সকল পাহাড়েই কিছু কিছু বসবাস আছে। তাহার মধ্য দিয়া জাহাজ যাইতে লাগিল। এখানে জল স্থির অচঞ্চল। এই সময় একটী পর্ব্বতের গাত্র দিয়া লোহিত বরণ তরুণ তপন উদিত হইতে লাগিলেন। বালার্কের উজ্জ্বল কিরণচ্ছটায় সাগর এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রকৃতির এই অভিনব সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম।

হংকঙ্।—অর্ণবপোতের গতি মৃদু হইয়া আসিলে, দূর হইতে এক উচ্চশির পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। চিত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকায় পর্ব্বত গাত্র আচ্ছন্ন। অট্টালিকার উপর অট্টালিকা, পথ কোথায় তাহা নির্ণয় করা যায় না। এ পর্ব্বতটী যে কি তাহা একজন সাহেব কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম, ইহারই নাম 'হংকঙ'। "হংকঙ" এই বিশ্রী নামে যে এমন অমরাবিনিন্দিত স্থান দেখিতে পাইব তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। সুনীল অম্বুরাশির মধ্যে ধবলকায় অদ্রি, সেই অদ্রির কলেবরে মানব-শিল্পের অপূর্ব্ব চাতুর্য্যে নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। এক অদ্রির শোভাই কিরূপ চিত্তা-কর্ষক, তাহার উপর আবার সমুদ্রের সুনীল শোভায় তাহা শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আমাদের জাহাজখানি ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুইদিকে তিন চারি খানি চীনাদের নৌকা দেখিলাম। নৌকাগুলি দাঁড়াইয়া ছিল, যেমন জাহাজ-খানি সম্মুখে আসিল অমনি তাহারা একটা খুব লম্বা বাঁশের আঁকসি জাহাজের কোন একটা স্থানে লাগাইয়া দিল। তখন নৌকাখানি জাহাজের গতিতে চালিত হইতে লাগিল।

সেই সময়ে তাহারা একটা দড়িতে বাঁধা হুক্ জাহাজের উপর নিক্ষেপ করিল। জাহাজের একটী খালাসী সেই হুকটী জাহাজের এক স্থলে আটকাইয়া দিল। নৌকা হইতে তিন চারিজন চীনা সেই দড়ি ধরিয়া জাহাজের গা বাহিয়া জাহাজে উঠিয়া পড়িল। ইহাদের উদ্দেশ্য জাহাজ বন্দরে উপনীত হইলে মাল নামাইবে। কুলীর জন্য আর অপেক্ষা করিতে হইবে না।

জাহাজ বন্দরে আসিয়া উপনীত হইল। নিয়মিত ডাক্তারের পরীক্ষার পর যাত্রীরা নামিবার জন্য ব্যস্ত হইল। জাহাজ হইতে তীরে যাইতে হইলে নৌকায় যাইতে হয়। এখানে নৌকাকে 'শ্যাম্পন' (Shampon) বলে।

এত অধিক নৌকার সমষ্টি এক চীনদেশ ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। 'প্সাম্পন' গুলি বেশ বৃহৎ। সমস্ত বন্দরটীর যে দিকে চাও, নৌকায় পরিপূর্ণ দেখিবে। ইহাকে একটী "তরণী উপনিবেশ" বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। প্রত্যেক নৌকাতেই একটী সম্পূর্ণ পরিবার বাস করিয়া থাকে। স্বামী, স্ত্রী ও অনেকগুলি পুত্র কন্যা। তাহাদের আর বিভিন্ন বাসস্থান নাই। বৎসরের সকল ঋতুতে এই সাগর মধ্যেই বাস। নৌকার মধ্যস্থলে একটী কামরা, তাহার তিন দিকে বেঞ্চি। বেশ পা ঝুলাইয়া বসা যায়। নৌকাস্বামীর ছেলেপুলেগুলি চারিদিকে ক্রীড়া করিতেছে। তোমার নিকট হইতে হয়ত কাতর স্বরে দু'একটী পয়সা ভিক্ষা করিতেছে। এই সকল চীনেদের প্রতি মা ষষ্ঠীর বেশ কৃপা দেখিলাম। সব নৌকাগুলিই ছোট বড় বহু সন্তানে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত প্রায় নৌকাস্বামীনিদের পৃষ্ঠে একটী করিয়া শিশু কাপড়ের থলিতে বাঁধা।

নৌকার সম্মুখভাগের কাঠ উঠাইলেই একটী উনান দেখা যায়—তাহাতেই এই পরিবারের পাকক্রিয়া হইয়া থাকে। পশ্চাদভাগে, যেখানে কর্ণধার দণ্ডায়মান হয়েন, তাহার পদনিম্নে ইহাদের ভাণ্ডার, তাহারই মধ্যে ইহাদের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি রক্ষিত হয়। রাত্রে বসবাস অবশ্য মধ্যস্থ বৃহৎ কামরাতেই হইয়া থাকে।

বৃহৎ মাল বোঝাইয়ের নৌকাগুলির ব্যবস্থা আরও সুন্দর। ইহার দুই প্রান্ত ভাগে বেশ স্বচ্ছন্দে দুইটী পরিবার থাকিতে পারে।

পরিবারস্থ সকলেই নৌকা পরিচালনা করিয়া থাকে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই পৃষ্ঠেই "কাল ভুজঙ্গিনী সম" বেণী লম্বিত। (আজ কালকার কথা বলিতেছি না) পুরুষদেরও বদন মণ্ডল গুম্ফ শ্মশ্রুবিরহিত। স্ত্রী পুরুষের একই প্রকার বেশভূষা। তাহাদের দেখিলে মনে হয় 'তুমি পুরুষ কি নারী চিনিতে না পারি'।

অনেক নৌকাতেই পুরুষে দাঁড় টানে; সে নৌকাস্বামী। যদি দাঁড় ধরিতে পারে এমন যুবতী থাকে, তবে পুরুষকে আর সে কার্য্য করিতে হয় না।

নৌকার কর্ণধার সকলেই রমণী। যেদিকে চাও, যে নৌকাতেই দেখ, সর্ব্বত্রই রমণী কর্ণধার। কাহারও পৃষ্ঠে, সদ্যজাত শিশুসন্তান বাঁধা। ক্ষুদ্র শিশু অকাতরে ঘুমাইতেছে, রমণী তবুও হাল ধরিয়া দণ্ডায়মান। অধিকাংশই যুবতী—কারণ যে নৌকায় অবিবাহিতা যুবতী কন্যা থাকে, সে নৌকার কর্ত্রী আর হাল ধরে না, দাঁড় টানে। সৌখীন যাত্রীরা যুবতী কর্ণধারের নৌকাই

অধিক পছন্দ করেন। তবে বৃদ্ধারাও একর্ম্মে উদাসীনা নহে। অনেকগুলি নৌকায় দেখিলাম সকলেই রমণী। পুরুষেরা স্থলে কেনা বেচা করে। তাহারা নৌকায় আসিয়া নিশিযাপন করিয়া থাকে।

ইহাদের সকলেই কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। বেশ মোটা কাপড়, অনেকটা আমাদের ছাতার কাপড়ের ন্যায়। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই পরিধানে একটা ঢিলে পায়জামা ও চায়না কোট। অবিবাহিতা যুবতীদের মাথায় একটা ঐ কৃষ্ণ বস্ত্রের ছোট আবরণ আছে। এই কাল পোষাকের মধ্যে তাহাদের শুভ্র বদনমণ্ডল, সরসীর নীলজলে প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় দেখাইতে থাকে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই অতি সুস্থ সবলকায়। চীনেদের মত এরূপ কর্ম্মী সতেজ দেহ অতি অল্প দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়।

জাহাজে উঠিয়া চীনা পুরুষেরা নৌকায় লইয়া যাইবার জন্য যাত্রীর জিনিষ পত্র লইয়া টানাটানি করিতে থাকে। ওদিকে নৌকা হইতে যুবতী কর্ণধারেরা আপন আপন নৌকায় আনিবার জন্য যাত্রীদের ডাকাডাকি করে।

এ সময় নৌকা ঠিক করা দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষের পক্ষে বড়ই সমস্যার কথা। সর্ব্বপ্রথম যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহার নৌকাতেই এ সময় উঠা উচিত। আমার অদৃষ্টে এক বৃদ্ধা কর্ণধারের বহু সন্তানসন্ততিপরিপূর্ণ নৌকা জুটিয়াছিল। তাহাতেই তীরে অবতরণ করিলাম। ইহাদের মধ্যে কোন রমণীকেই ক্ষুদ্র পাদবিশিষ্ট দেখি নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম।

হিমাচল

ঢাকিয়া আকাশ কে ঐ দাঁড়ায়ে,
স্বর্গ ধরিতে হস্ত বাড়ায়ে ?
বিশ্বে শরীরী ধূর্জ্জটি উনি—
মহাযোগী হিমালয়!

যেন মায়া-পটু কুহকী-কুহকে
দ্যুলোকে ভূলোকে বিথারি পুলকে—
স্তব্ধনিথর ক্ষিপ্ত পাগল
নীরধি-ঊর্ম্মিচয়!

নীহার-মৌলি উদ্যত কূট
লটপটি লোটে মেঘ জটাজুট,
হিম-গুঁড়িমা গ'লে গ'লে পড়ে
হাজার বর্ণ ফোটে—

ঝরে ঝরণার রূপালী নিঝর,
ঠিকরে শীকরে মুকুতা-নিকর—
টিট্‌কারি দিয়ে পিচ্‌কারি খেলে
উপলঘাতিনী ছোটে!

লুপ্ত রবির স্বর্ণ-পতাকা,
নীচে, দূরে—দূরে উড়িছে বলাকা—
মধুর মধুর মধুজা বধূর
মুদুর কুঞ্জচয়।

ললিতা সন্ধ্যা জড়িমা-কলিতা,
দীপ্ত তারায় রোপা-সলিতা ;
হের, ধীরে ধীরে নিরালা শিখরে
মৌন চন্দ্রোদয়।

মাঝে গিরিপথ,—দু'ধারে পাহাড়,
এদিকে আলোক,—ওদিকে আঁধার।
নিম্নে অতল অন্ধ গহেরা
পড়িলে ফুরাবে আয়ু।

গুঁড়ি মেরে গিরি—ধূসর, আদুড়,
ঝটপটি পাখা উড়িছে বাদুড়,
দুই গহ্বরে পাক্‌সাট্‌ দিয়ে
চীৎকার করে বায়ু।

উন্মোলে হো হো। কর্ণ বধির,
উল্লাসে একি লাসো অধীর,
নামে উদগ্র আকাশগঙ্গা
দীপ্র উল্কাসম।
কুহরে কুহরে আছাড়ি' গাত্র,
ফোটে টগ্‌বগ্‌ ফেনার পাত্র,
কুলকুচা করি লকলকি বেগে
ফুঁসিছে উরগোপম।

ঐ দাবাগ্নি উগ্রচণ্ড,
ক্ষতকীর্ণ শৈলখণ্ড,
বৃক্ষকাষ্ঠ রক্তশ্মশ্রু
তীব্রে ক্ষিপ্র কাটে—
উড্ডীন ব্যোমে ভস্ম পর্ণ,
অগ্নিস্তোম ধূম্রবর্ণ,
নগ্নস্নাগে ক্রুদ্ধ দৈত্য
মত্ত হিকাঠাটে।

*   *   *

কোথায় মানব—কোথায় ধরণী,
কোথায় চলেছি—এ কোন সরণী,
আগুনের তাপে তামাটে আকাশ,
কোথায় এসেছি আমি।

যত উঠে যাই—তত উঠে যাই,
যত নেমে যাই—আরো নীচু পাই,
ঊর্দ্ধে অসীম,—নিম্নে অসীম,
কোথা উঠি,—কোথা নামি ?

নিয়তির নেমি ঘুরে অহরহ,
ঘুরে রবি সোম তারকা-গ্রহ
বিশ্বনিখিল ;—লক্ষ তটিনী
জলধি নৃত্য করে।

সচল ভুবনে তুমি অচপল,
আত্ম-মগন, স্তব্ধ অটল,
উদাসীন ঠাটে দেখিছ, কাহারা
আসে, যায়, ওঠে, পড়ে!

দেখেছ অতীতে তরুণ তপনে,
পূত তপোবনে, প্রভাত-পবনে,
দীপ্তসমিধ—অগ্নিহোত্রে
অগ্নিধ-হুত-দান।

দেখেছ কোশল—নাই সে রাঘব,
রয়েছে মথুরা—নাই সে মাধব,
কোথা হস্তিনা, কপিলাবস্তু,
উজ্জয়িনীর মান ?

*   *   *

তুমি কি বিশাল জগৎ-প্রাকার!
বিরাট ধ্যানের মূর্ত্তি সাকার!
তুমি কি প্রেমিক! তুমি কি বিরহী!
তোমার উপমা নেই!

কত সভ্যতা, গেছে কত দেশ,
কত জাতি গেছে, কত যুগ শেষ,
কত প্রাণ গেছে মহাপ্রাণে মিশে,
তুমি একরূপ সেই।

মোদের জীবন—নিশার স্বপন!
আমার ভুবন,—আমার:ভবন,
আমার গগন, আমার পবন,
ক্ষণিকে আমার নয়।

কঠিন মরণ কহিবে সেদিন,
"ভেঙ্গে গেছে বীণ, ওঠ্ রে প্রবীণ!"
টুটিবে নবীন হেম সংসার
নবীন পুলকময়।

* * *

অহো আনন্দ! বিপুল ছন্দে,
তুষার নন্দে হৃদয় বন্দে,
তোমার অতনু উরসে উঠিয়া
ক্ষুদ্রতা যাই ভুলি'।

ধরণীতে থাকে ধরণীর প্রাণ!
মানবের দীন মান-অপমান,
বন্য পশুর হিংসা-গরল
দুঃখ নয়ন তুলি।

ছাড়িয়া তোমার ঝরণা ঝরণ,
উপত্যকার পাটল বরণ,
শ্যামল কানন, ধবল শিখর,
পবন, গগন, চাঁদে।

ফিরে যেতে হবে বিদায়—বিদায়!
আবার চলিনু ধরণী-হিয়ায়,
বর্ব্বরতার নিঠুর পীড়নে
আতুর-আর্ত্তনাদে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বিষ্ণু সংহিতায় দণ্ডবিধি।

(১)

কোনও সমাজ জ্ঞানালোকদীপ্ত হইয়া যতদিন সুসভ্য না হয়, ততদিন সে সমাজে প্রকৃত দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তিত হয় না, পাশ্চাত্য আইন-শাস্ত্রকার (Jurist) দিগের ইহা ধারণা। আধুনিক সমাজে আমরা যেমন স্বত্ব সম্বন্ধীয় (দেওয়ানী) এবং দণ্ডসম্বন্ধীয় (ফৌজদারী) পৃথক পৃথক আইনের প্রচলন দেখিতে পাই, প্রাচীন সমাজে আইন শাস্ত্রের সেরূপ পার্থক্য ছিল না, এই কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। রোম, গ্রীস, প্রাচীন জার্ম্মানী প্রভৃতিতে এক প্রজা কর্ত্তৃক অপর প্রজার স্বত্বাপহরণের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আইন ছিল; কিন্তু আধুনিক সমাজে যাহাকে crimes বা ফৌজদারী অপরাধ বলে, প্রাচীন সমাজে সেরূপ কোনও ধারণার অভাব ছিল, সার্ হেনরী মেন প্রমুখাৎ পণ্ডিতদিগের ইহা অভিমত।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিবাদের পার্থক্যটা ব্যবহারজীবী ব্যতীত সাধারণ

পাঠকের পক্ষে ততদূর সহজে বোধগম্য নহে। রাম কলহ করিয়া লগুড়াঘাতে শ্যামের নাসিকার অস্থি ভাঙ্গিয়া দিলে আধুনিক সুসভ্য রাষ্ট্র বিবাদটা কেবল রাম ও শ্যামের ইহা ভাবিয়া ক্ষান্ত হয় না। রাম সমস্ত সমাজের শান্তি ভঙ্গ করিয়াছে, শ্যামের সহিত কলহ করিয়া রাম সমস্ত সমাজের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, আধুনিক সমাজ রাম-শ্যামের কলহটা এইরূপ চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে। সুতরাং রাম কেবলমাত্র শ্যামের ক্ষতি করিলেও, রাজা স্বয়ং রামের বিপক্ষে বাদী হইয়া দাঁড়ান এবং আহত শ্যাম নিজে রামের সহিত বিবাদ মিটাইয়া লইতে চাহিলেও আধুনিক সুসভ্য রাষ্ট্রের বিচারালয় রামকে নিষ্কৃতি দিতে চাহে না। চুরি জুয়াচুরি, দস্যুতা বা গৃহদাহন কেবল ব্যক্তিগত বিবাদ বলিয়া পরিগণিত হয় না। এ সকল অপরাধে রাষ্ট্রের শান্তিভঙ্গ হয়, সুতরাং এ সকল রাষ্ট্রের বিপক্ষে অপরাধ।

যেদিন হইতে সমাজ প্রজামাত্রের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা করে, সেই দিন হইতেই সমাজে দণ্ডবিধির প্রচলন হয়। সেই দিন হইতেই শস্যাপহরণ করিলে অপরাধীকে দণ্ডগ্রহণ করিতে হয়, নরঘাতককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় এবং পরস্ত্রী হরণ পাতকের জন্য বিধিমত শাস্তি ভোগ করিতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সমাজ বেশ উন্নত না হইলে তথায় এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় না। রোম, গ্রীস প্রভৃতি প্রদেশ য়ুরোপীয় আইনের জন্মস্থান হইলেও তথায় বহু পরে দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সমাজ আদিম বর্ব্বরতার অবস্থা কাটাইয়া উঠিলে, সমাজরক্ষককে রাষ্ট্রাভ্যন্তরস্থিত প্রত্যেক প্রজার স্বত্বরক্ষা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যে রাষ্ট্রের অধিবাসীবৃন্দ আপনাপন পরিশ্রমের ফলভোগ হইতে বঞ্চিত হয়, যে দেশের লোক আপনার উপার্জ্জনলব্ধ ধন ভোগ করিতে না পারে সে দেশের পক্ষে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং মনুষ্য সমাজ গঠনের প্রথমাবস্থা হইতেই সমাজনায়ককে প্রজাদিগের স্বত্ব সম্বন্ধে নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। যে নেতা তাহা করিতে পারে না, সমাজে তাহার নেতৃত্ব বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব।

এই স্বত্ব সাধারণতঃ ত্রিবিষয়ক। প্রথম স্বত্ব প্রত্যেকের শরীর রক্ষা সম্বন্ধীয়। যে কেহ ইচ্ছা করিলে অপরের হস্ত পদ বা নাসিকা ছেদন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না বা তাহাপেক্ষা হীনবল ব্যক্তির বাহু ধরিয়া তাহাকে স্রোতস্বতীর জলে

নিক্ষেপ করিতে পারিবে না—সে বিষয়ে নিয়মাদি সকল সমাজকেই উদ্ভাবিত করিতে হয়। দ্বিতীয় স্বত্ব সম্পত্তি সম্বন্ধীয়। যাহাতে রাজ্যের একজন প্রজা অপর প্রজার পরিশ্রমলব্ধ ধনরত্নাদি ইচ্ছাক্রমে নিজস্ব করিয়া লইতে না পারে, প্রত্যেক রাজাকে সে বিষয়ে আইন প্রবর্ত্তন করিতে হয়. কেবল শরীর বা সম্পত্তি রক্ষা বিষয়ক নিয়ম করিলেই মানবের সকল অভাব দূর হয় না। সমাজ যেমন উন্নতির পথে অগ্রসর হয় মানুষের যশের মূল্য সেই পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহাতে কেহ কাহারও নিন্দা বা অপযশ ঘোষণা করিতে না পারে, যাহাতে একজন প্রজা আপনার ইচ্ছামত অপরকে গালি দিয়া সাধারণের নিকট তাহাকে হেয় করিতে না পারে. সভ্য সমাজকে সে বিষয়েও নিয়ম বাঁধিতে হয়।

প্রাচীন সমাজে দণ্ডবিধি ছিল না বলিয়া প্রাচীন সমাজে এই ত্রিবিষয়ক স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় ছিল না, পাশ্চাত্য মনীষিগণ তাহা বলেন না। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জীবননাশ করিলে আধুনিক বিচারপতি যেমন হত্যাকারীর প্রাণবধের আজ্ঞা দেন, প্রাচীন সমাজে সেরূপ দণ্ডাজ্ঞার প্রচলন ছিল না। "Eye for eye and limb for limb," চক্ষুর জন্য চক্ষু এবং ইন্দ্রিয়ের জন্য ইন্দ্রিয়—ইহা প্রাচীন অর্দ্ধসভ্য জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতির নিয়ম ছিল। একজন অপরকে হত্যা করিলে নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গ হত্যাকারীকে বধ করিত, তাহাতে রাজা কিছু বলিতেন না। কেহ কাহারও হস্তচ্ছেদ করিলে খণ্ডিতবাহুর গোষ্ঠীবর্গ ইচ্ছা করিলে অপরাধীর হস্তচ্ছেদ করিয়া আপনাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিত। তাহা না পারিলে তাহারা রাজদ্বারে বিচারের জন্য আসিত। তখন রাজা নিহত ব্যক্তির জীবনের বা কর্ত্তিত হস্তের একটা মূল্য নিরূপণ করিয়া অপরাধীর নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া নিগৃহীত ব্যক্তির পরিবারকে প্রদান করিতেন। এখনকার 'হরযতের দাবী' বা Damage suitএ যে পদ্ধতির বিচার হয় তখনকার বিচার সেই মত হইত। আধুনিক সভ্যজগতে একজন অপরের অপবাদ করিলে সে tortsআইন মত তাহার নিকট হইতে যশের মূল্য স্বরূপ কিছু অর্থ আদায় করিতে পারে কিম্বা ফৌজদারী বিচারে তাহার দণ্ড করাইতে পারে। প্রাচীন সমাজে শেষোক্ত উপায়ে অপরাধের শাস্তি দিবার পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল। হত্যা, চুরি বা মানহানির জন্য একজনকে অপরের ক্ষতি-পূরণ করিতে হইত মাত্র।

(২)

প্রাচীন ভারত সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। যেমন ধর্ম্মশাস্ত্র,

ন্যায়, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের কীর্ত্তিকাহিনী চিরদিন ভারতের সভ্যতার মহিমা ঘোষণা করিবে, স্মৃতি বা আইন শাস্ত্রেও তেমনি ভারতের সর্ব্বদিকস্পর্শিনী প্রতিভার অমল যশ সৌরভ যুগ যুগান্তর স্থায়ী। দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তন যদি উচ্চ সভ্যতার প্রমাণ হয় তাহা হইলে ভগবান মন্বাদি শাস্ত্রকারদিগের সময়ে ভারতবর্ষ যে সভ্যতার সোপানের অতি উচ্চে আরোহণ করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। মনুসংহিতা প্রভৃতির শরীর সম্পত্তি বা মান সম্বন্ধীয় স্বত্বের তত্ত্ব যেমন বিশদ উহাতে দণ্ডবিধির রহস্য বর্ণনাও তাদৃশ বিশাল। আমরা এ প্রবন্ধে বিষ্ণু সংহিতায় দণ্ডবিধি আইনের কিঞ্চিৎ আভাষ দিব। তাহা হইতেই সপ্রমাণ হইবে যে, প্রাচীন হিন্দুজাতি সভ্যতা ও নীতি সম্বন্ধে জগতে কিরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিত।

(৩)

সমাজ উন্নত হইলে দণ্ডবিধি উদ্ভাবিত হয়, সমাজ যেমন উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় দণ্ডবিধিও তেমনি উৎকর্ষ লাভ করে। শিক্ষিত সমাজ যেমন দণ্ডবিধির উন্নতি সাধন করে দণ্ডবিধিও তেমনি সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। সমাজে নীতিজ্ঞানের প্রসারের সহিত দণ্ডবিধির প্রসার হইয়া থাকে।

প্রত্যেক সমাজ বিভিন্ন আদর্শে গঠিত। কালের সহিত মানবের আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। জ্ঞানের উন্নতির সহিত মানুষের নীতির উন্নতি হয়। এক সমাজে যাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তদপেক্ষা অল্পসভ্য সমাজে তাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত হয় না। আজিও আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে মানুষ মানুষ মারিয়া ভক্ষণ করে। আমাদের সমাজে নরশোণিত যত মূল্যবান বর্ব্বর সমাজে নরশোণিত তত মূল্যবান নহে। ঐ সকল নরভোজী সমাজ যত উন্নতির দিকে ধাবমান হইবে উহাদের নীতিজ্ঞানও তত বিশুদ্ধতা লাভ করিবে। নীতির উন্নতি হইলেই তাহাদের আইনের উন্নতি হইবে এবং এক দিন সেই পশু সমাজ সদৃশ নর সমাজেও নরহত্যা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কোনও কর্ম্ম যখন সমাজাভ্যন্তরস্থ সকল লোকে নীতিবিরুদ্ধ ও গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করে তখন সেই কর্ম্মকে আইনপ্রবর্ত্তকগণ আইন বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ফলে কালের প্রভাবে আদিম সমাজের কুকর্ম্মগুলা ক্রমে নীতিবিগর্হিত, পরে আইন বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়।* দণ্ডের ভয়ে লোকে কুকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া আপনার সমাজকে উন্নত করে।

* বিলাতের একজন প্রধান আইন গ্রন্থ রচয়িতা Pike সাহেব বলেন—"The moralist may and frequently does influence the legislator and that which is but a moral lapse in one generation may become a criminal offence in another"

কোন্ সমাজে নীতিজ্ঞান কিরূপ উন্নত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় সেই দেশের দণ্ডবিধি বিচার করা। যে সমাজ যত উন্নত হইয়াছে সেই সমাজ তত অধিক কার্য্যকে পাপ বা অপরাধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে ইংরাজ যখন ক্রীতদাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া মহাপ্রাণতা দেখাইয়াছিল তখন ইউরোপের অপর জাতি সকল ইংলণ্ডকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। এখন তাহারাও ইংরাজ মহাজন প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়া দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এক্ষণে ইংরাজ শাসিত প্রদেশ সমূহে সহৃদয় ইংরাজমনীষিদিগের প্রভাবে পশুক্লেশ নিবারিণী সভাসমূহ গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সমিতির উদ্যোগে, তাহাদিগের সৎসাহসের প্রভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র অসহায় পশুদিগের নিগ্রহ বন্ধ করিবার জন্য আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় অপর জাতিদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে ইংরাজ জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহাদের সভ্যতা অপর দেশের সভ্যতা অপেক্ষা এ বিষয়ে অধিক।

উপরোক্ত কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়া বিষ্ণু সংহিতার দণ্ডবিধি অধ্যয়ন করিলে আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। অনেক স্থলে আমরা আধুনিক সভ্যতার চক্ষে বিচার করিলে লঘু পাপে গুরু দণ্ডের বিধান দেখিতে পাই বটে কিন্তু বিষ্ণু সংহিতায় যে সকল কার্য্য অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি প্রাচীন হিন্দুজাতি সভ্যতার কিরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। যে সকল কর্ম্ম সভ্যতাভিমানী জাতি সকল নীতিবিগর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করে অথচ যেগুলাকে এখনও দণ্ডের দ্বারা দমন করিতে পারে না, প্রাচীন হিন্দু সমাজে সেই সকল কর্ম্ম পাতক মহাপাতক বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাদিগের জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিষ্ণু সংহিতা হইতে আমরা সে সকল অপরাধের নামোল্লেখ করিব।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন কেবল ভারতবর্ষে প্রচলিত হইলেও ইহা হইতে সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্য জাতির দণ্ডবিধির ধারণা বুঝিতে পারা যায়। লর্ড মেকলে প্রভৃতি মনীষিগণ প্রভূত পরিশ্রমে সমগ্র পাশ্চাত্য দণ্ডবিধি আলোচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সামান্য পার্থক্য ছাড়িয়া দিলে এই গ্রন্থ বর্ণিত অপরাধই আধুনিক সভ্যজাতির নিকটেও অপকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের ফল স্বরূপ বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না।

আমরা এ প্রবন্ধে দেখাইব যে,ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে বর্ণিত সমস্ত অপরাধের উল্লেখ বিষ্ণু সংহিতায় পাওয়া যায়। উপরন্তু হিন্দু দণ্ডবিধির মধ্যে এমন অনেক পাতক বা অপরাধের বর্ণনা আছে, যে সকল কার্য্যকে নীতিবিগর্হিত মনে করিলেও পাশ্চাত্য সমাজ এখনও দণ্ডবিধির মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতে পারে না। অথচ সেই সকল বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুজাতি কতদূর করুণ হৃদয় ও পরদুঃখকাতর ছিল, এমন কি ইতর শ্রেণীর পশুদিগের জন্যও তাহারা কিরূপ সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিত।

(ক্রমশঃ)

আবদুল্লা।*

(১)

জীবনের এ কাহিনী যে কখনও মনুষ্য-কর্ণগোচর হ'বে, এমত আশা ছিল না। কিন্তু রুষরাজ-স্বাক্ষরিত ক্ষমাপত্রের অভয় পেয়েই এ ঘটনা অক্ষরাবদ্ধ করিতে সাহস পেয়েছিল৷ নহিলে মনের গোপন-গুহাতেই ইহাকে চিরদিন লুকিয়ে রাখ্‌তে হ'ত।

বয়স তখন আমার একত্রিশের বেশি হ'বে না। লণ্ডন নগরের দক্ষিণে চিকিৎসকের ব্যবসা করিতেছি। ব্যবসায়ের পরিশ্রমে স্বাস্থ্যটার এমনি অবস্থা হ'ল যে বায়ুপরিবর্ত্তনের একান্ত আবশ্যক হ'য়ে উঠল। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে জলপথে ভ্রমণের ব্যবস্থা করে মোরোক্কোর পথে যাত্রা করিলাম।

জাহাজ হ'তে নামিবার পর সেখানে কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম। আরে ছি! ছি! সেই আরবদেশীয় নোংরা কুলীদের অঙ্গভঙ্গী করে ডাকাডাকি, মোট নিয়ে টানাটানি—কি বিপদেই পড়েছিলাম! আমার কথাও তা'রা বোঝে না, আর তা'দের ভাষায় তো আমি একেবারে পণ্ডিত মশায়! যা'হোক বিধাতার ইচ্ছায় একটু কিনারা পাওয়া গেল। একটা মুর বালক একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে আমার সঙ্গে কথা কয়ে আমাকে কতকটা আশ্বস্ত কল্লে। তার সঙ্গে কথা কয়ে প্রাণটা বাঁচলো। তাকেই আমার পথ প্রদর্শকরূপে সে দেশ দেখাবার জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে একখানা গাড়ীতে উঠ্‌লাম ও হোটেলের দিকে নিয়ে যেতে বলে দিলাম।

---

* সঙ্কলিত।

চলেছি, কিন্তু পথ আর ফুরায় না! কত গলি ঘুঁজি দিয়ে যে সেই ছোট গাড়ী খানা জনতাভেদ করে ছুটতে লাগলো তার আর কি শেষ হয় না! একটু ভয় হলো! অপরিচিত স্থান—ভাবনা, এ ছোঁড়া হয়তো আমাকে বিপদে ফেলবে। কিন্তু গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবার জন্য উপর্য্যুপরি বলায়ও যখন সন্তোষজনক উত্তর পেলাম না, তখন আমার ধারণাটাই ঠিক বলে বোধ হ'ল। রাগে তার ঘাড়টা টিপে ধরে বল্লাম "এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি হোটেলে গিয়ে না পৌছুতে পারিস্ তবে তোর জীবন আমার হাতে জানবি!"

ও সর্ব্বনাশ! ছোঁড়াটা তো মূর বালক নয়! সেই মারের চোটেই তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি ঘুচে গেলো! সে দিব্যি আমারি মত আমার ভাষায় বল্লে, "ঈশ্বরের শপথ করে বলছি আপনাকে কোনও বিপজ্জনক স্থানে নিয়ে যাবো না। একটু নির্জ্জন স্থানে আপনাকে নিয়ে যাচ্চি—আমার দু'টো কথা আছে। আর আমার জীবন! সেতো সত্যই আপনারই হাতে।"

আমি অবাক্ হয়ে তার পানে চেয়ে রইলাম। তখনো আমার হাতটা তা'র ঘাড়ের উপরে ছিল; কিন্তু, তার কাতরতাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার প্রাণে কেমন একটা আঘাত লাগলো! সেই মুহূর্ত্তেই হাত নামিয়ে একটু সংযত ভাবে বল্লাম "আচ্ছা দেখি!"

ভালকথা, সে ছোকরার নাম—আবদুল্লা। অবশ্য সে নিজেই আমার কাছে এই নামে পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু, সেই মূর ছোকরা, আবদুল্লা হ'য়ে যে আমার ভাষায় কেমন ক'রে এমন কথা কইতে শিখ্লে, এইটা যখন ভাব্ছি, তখন দেখি সে আমাকে কতকটা নির্জ্জন পথেই এনে ফেলেছে। তারপর এক দোকানে এসে তার ভিতরের কয়েকটা নির্জ্জন কক্ষ অতিক্রম করে শেষ কক্ষের মধ্যে আমাকে এনে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে আমার সম্মুখে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। আমি বিস্ময়ে ও ত্রাসে কতকটা হতবুদ্ধি হয়ে তার পানে চেয়ে রইলাম।

সে আমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে, "আমি মূর নই। হাত মুখ সব রং করেছি।"

আমি বলিলাম, "আমিও তাই ভাব্ছিলাম ছোক্‌রা!"

"আমি পুরুষ নই, স্ত্রীলোক!"

"কি বল্লে? স্ত্রীলোক! অন্তঃপুর হ'তে পালিয়ে এসেছ?"

মূর বালক (অবশ্য উপস্থিত বালিকা) বলিল "না—তা নয়। তবে আপনি

যদি না রক্ষা করেন তবে অন্তঃপুরই আমার একমাত্র রক্ষাস্থল। আপনি কি আমাকে রক্ষা কর্ব্বেন না? আমি রুষদেশীয় রাজদ্রোহীদের তালিকাভুক্ত উপস্থিত পলাতক। আমার নাম প্রিন্সেস্ চিরস্কি। আপনি বোধ হয় এ নাম শুনে থাক্‌বেন!"

আমি বলিলাম, "কই—না।"

"রুষরাজের পরিবারের মধ্যে যে বিদ্রোহ ঘটেছিল সে সংবাদ তো জানেন।" আমি ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—"হুঁ"।

"আমি সেই রুষরাজ পরিবারভুক্ত। বিদ্রোহের পর আমাকে ধরে ও আমার মৃত্যুদণ্ড হুকুম দেয়। কোনও রকমে আমি ফ্রান্সে পালাই বটে কিন্তু আমাকে ফরাসীরাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য রুষরাজ আজ্ঞা প্রচার করেন। অনেক কৌশলে ফরাসীদের জাহাজে করে এখানে এসে এই রং মেখে মূর বালক সেজে বেড়াচ্চি। বড় ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হয়! রাত দিন সন্দেহ—কেবল মনে হয় এই বুঝি গোয়েন্দা পিছু নিয়েছে। একটু স্বস্তি নেই। কি অবস্থায় যে দিন কাটাচ্চি, তা' আর কি বলব! এখন আপনি যদি রক্ষা করেন! আমার বোধ হচ্চে গোয়েন্দার হাতে আমাকে শীঘ্রই পড়তে হবে—তা' হ'লে সেই দণ্ডেই আমার মৃত্যু! আপনি কি রক্ষা কর্ব্বেন না? কোনও উপায়ে কি আপনাদের জাহাজে আমাকে গোপনে নিয়ে যেতে পার্ব্বেন না?"

এই কথাগুলি বলে আবদুল্লা আমার হাতের উপর হাত রেখে আমার মুখের দিকে বড়ই করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল! রং মেখে কালো সাজলে কি হ'বে! তার মুখশ্রী যে অপরূপ! যেমন ভাসা ভাসা চোখ তেমনি সুন্দর নাক! গায়ে একটা ঢলঢলে পিরাণ, পায়ে একজোড়া চটী আর মাথায় কাল টুপী—তা'তেই কেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল!

আমি বলিলাম, "আমি যদি তোমাকে জাহাজে তুলে নিতে পারি তা' হ'লে তোমাকে আর সেখানে লুকিয়ে থাকতে হ'বে না। ব্রিটিশের পতাকা তলে—"

বালিকা অর্থাৎ আবদুল্লা একটা উপেক্ষার হাসি হেসে বল্লে, "আপনার ব্রিটিশ-পতাকাও আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমার বোধ হয় তা'দের প্রতিও এই বহিষ্করণ-আজ্ঞা প্রচার হয়ে থাকবে।"

আমি একটু দৃঢ়তার সহিত বলিলাম "সম্ভব বলে বোধ হয় না, আবদুল্লা!"

আবদুল্লা মনে মনে যেন কি একটা সমস্যার মীমাংসা করে নিয়ে বল্লে—"রাজনীতি বড়ই জটিল। আপনি জানেন না, তাই অমন কথা বলছেন।

রুষরাজ আমার বন্ধুদের প্রায় সকলকেই গুলি করে মেরে ফেলেছে। ব্রিটিশ-রাজের নিকট হ'তে তা'রা যদি আমাকে না পায়, তা' হ'লে তা'রা আমাকে গোয়েন্দা লাগিয়ে গুলি ক'রে হোক, বিষ খাইয়ে হো'ক্, জলে ডুবিয়েই হো'ক্ যেমন করে পারে মেরে ফেল্‌বে। রুষগভর্ণমেণ্ট আমার সন্ধান পেলে আমাকে কিছুতেই বাঁচ্‌তে দেবে না, আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না! একমাত্র উপায়—আপনার সঙ্গে গোপনে পলায়ন! আপনাদের জাহাজে আপনার কাছে যদি একটু স্থান দেন!"

আমি বলিলাম, "তাইত! বিশ্বাস করা—"

আবদুল্লা বাধা দিয়া বলিল, "আমি জানি। কিন্তু, আপনি যদি আমার কথায় অবিশ্বাস করেন, তা হ'লে মৃত্যুকেই আমার আলিঙ্গন করতে হ'বে।"

বিষম সমস্যায় পড়িলাম। একবার মনে হয় এর সকল কথাই কি সত্যি! সত্যই কি এ প্রিন্সেস্ চিরস্কি—রাজ সংসারের কন্যা! আবার কিন্তু তার সেই বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর, সেই সুন্দর ভ্রুযুগল, সেই মুখশ্রীতে সে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর আমি তাহাকে বলিলাম "আবদুল্লা, তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্চে বটে, কিন্তু, তোমার দেহের বর্ণ ও আকৃতি যে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। তুমি সত্য করে বল, তুমি কি সত্যই রাজকুমারী?"

"সত্য বলছি।"

"তবে কি তুমি কেবলমাত্র পলাইতে চাও? আমাদের জাহাজের বা অন্য কাহারও কোনও ক্ষতি করিবে না তো?"

আমার কথা শুনিয়া আবদুল্লা গম্ভীর হইয়া উঠিল ও ধীরে ধীরে বলিল, "কোন্ কথায় আপনাকে বিশ্বাস করাইব? ভগবানের শপথ করে বল্‌ছি আমার দ্বারা কাহারও কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।"

আমি বলিলাম, "উত্তম। তোমাকে তা' হলে আমার বালকভৃত্য হয়ে জাহাজে উঠ্‌তে হবে। কেমন?"

আবদুল্লা ঘাড় নাড়িয়া বলিল "তা' কি কখন হয়! জাহাজে উঠবার সময়েই তা' হলে তা'রা আমাকে সন্দেহ কর্ব্বে। এখানকার গোয়েন্দাদের প্রতারণা করা যত সহজ ভাবছেন তত সহজ নয়। আমার মতলব শুনুন। আমি এখানে যাঁর আশ্রয়ে আছি তিনি একজন মহাজন। বিলাতের জাহাজে তাঁর অনেক মাল প্রেরিত হয়ে থাকে। আপনাদের এ জাহাজ যখন যাবে আমি

তখন অন্যান্য কুলীদের সঙ্গে মাল ঘাড়ে করে শেষাশেষি গিয়ে জাহাজে উঠে পড়ব। তারপর জাহাজের খোলের ভিতর সেই সব মালের আড়ালেই এক-স্থানে লুকিয়ে থাকব। সেই সময় আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে। যে কয়দিন থাকুবো সেই কটাদিন আমাকে যৎসামান্য খাবার ও জল দিতে হবে। পারবেন না কি ? — যদিই না পারেন—মৃত্যু তো একদিকে আছেই !"

আমি বলিলাম, "আবদুল্লা, তুমি পাগল !"

সে একটু হেসে বল্লে, "হ'তে পারে।" পরক্ষণেই কম্পিতকণ্ঠে বল্লে, "কিন্তু, দেখছেন, যেদিকেই যাই না কেন মৃত্যু আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরছে !"

তার একথায় বিচলিত হয়ে উঠ্‌লাম। বল্লাম, "আবদুল্লা, মনে করো তাই যেন হ'লো। কিন্তু, তারপর ? ইংলণ্ডে গিয়ে জাহাজ হ'তে কি করে নাম্‌বে ?"

আবদুল্লা কাতর দৃষ্টিতে আমার প্রতি চেয়ে বল্লে, "জানি, বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার ! তবে মরণের দ্বারেই ত আছি, একবার শেষ চেষ্টা ! সে অবসরদানেও কি কৃপণতা কর্ব্বেন ?" সে কাতরতার সহিত আমার হাতটা জড়িয়ে ধরলে।

আমি বলিলাম, "তুমিই যেন পাগল, আমি তো আর পাগল হই নি' ! তোমার জন্য শেষ কি আমিও প্রাণটা দেব ?"

সে বেশ স্থিরভাবে বল্লে, "সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয় ! তা'রা যদি জান্‌তে পারে যে আপনি আমার পলায়নে সহায়তা কচ্চেন তবে আপনার ও তা'রা প্রাণদণ্ড কর্ত্তে পারে ! দেখুন, লণ্ডনে আমার অনেক বন্ধু আছেন ; তা'দের কাছে আমার অনেক সম্পত্তি আছে। আপনাকে আমি যথেষ্ট অর্থ দিতে ও দেওয়াতে পারি ; কিন্তু আপনি যে সামান্য অর্থলোভেই একার্য্যে অগ্রসর হবেন, আমি তা' মনেও করি না। এক জাহাজ লোকের মধ্য হ'তে আমি আপ-নাকেই বেছে বাহির করে নিয়েছি।"

"আমাকে ! কেন আবদুল্লা !"

"কেন ! তা বল্‌তে পারি না। তবে যত লোককে নাম্‌তে দেখেছিলাম, তার মধ্যে আপনাকে দেখেই আমার মন যেন আমাকে বল্লে যে, এই ঠিক মানুষের মত মানুষ !, এর দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হ'বার সম্ভাবনা। হাঁ, ঠিক তাই— আপনার মধ্যে যে যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে, তা' আমি বুঝতে পেরেছি। নইলে আমার দুঃখের কথা আপনি এত মনোযোগের সহিত শুনবেন কেন ? কে কা'র দুঃখের কথা শোনে !"

আমি বলিলাম, "আবদুল্লা, তুমি দেখছি যাদু জান! কোন্ মন্ত্রের বলে আমাকে এমন বশ করে ফেল্লে!"

আমার কথা শুনে সে একটু হা'স্লে। সে হাসি তার চোখের—নিমেষে ফুটে উঠ্‌ল, নিমেষেই মিলিয়ে গেল। সে হাসির অর্থ কি বুঝান যায়!

আমি বলিলাম, "কিন্তু দেখ, তুমি যদি জাহাজের খোলের ভিতর লুকাতে না পার, তা' হ'লে আমি জাহাজের কাপ্তেনকে বলে তোমার জন্তে একটু আশ্রয়ের ভিক্ষা চাইব। আমার জন্যে যে তুমি অনাহারে মারা যাবে, আমি তেমন কাজ পারব না।"

সে ব্যস্ততার সহিত বললে 'না না তা' হবে না। আমি যদি অনাহারে মরি সেও আমার পক্ষে ভাল, তবুতো মনে জানব যে, আমি একজন বীরের আশ্রয় নিয়েছি, একজন প্রকৃত পুরুষের আশ্রয় পেয়েছি!" এই কথা কয়টা বলেই সে যেন আমার ক্রীতদাসের মত সেই ধূলার উপর হাঁটু গেড়ে বসে আমার হাতে চুম্বন করতে লাগ্‌লো। কিন্তু,সত্য কথা বলতে কি, সেই সময় আমার মনে হ'ল যে, এই আবদুল্লাই বুঝি আমাকে তার ক্রীতদাস করে ফেললে!

(২)

আজ বিলাতে ফিরিব। জাহাজে বসে সেই মুর কুলীদের মাল বোঝাই দেখছি বটে; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আমার চোখের চঞ্চল দৃষ্টিটা সেই মুর আবদুল্লার অন্বেষণেই ঘুরছিল। কিছু পরে দেখলাম, আবদুল্লা একটা মোট লয়ে জাহাজের খোলর ভিতর নেমে গেল। দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত সেই দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম। কিন্তু তা'কে আর বাহির হ'তে দেখলাম না। আমাদের জাহাজও অপরাপর কুলীদের নামিয়ে দিয়ে মোরোক্কো বন্দর ত্যাগ করে বিলাত অভিমুখে চলিল। বড়ই ভয় হ'ল! ভাবলাম, সাধ করে এ বিপদ কেন ঘাড় পেতে নিলাম! কি আহাম্মকিই করেছি! ছি ছি! আপনাকে শত সহস্র ধিক্কার দিলাম! কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, আর আত্মগ্লানিতে ফল কি! এখন যেমন ক'রে হো'ক্ একটা উপায় দেখতে হবে।

সন্ধ্যার পর আমাদের আহারের ঘণ্টা পড়ল। আমি কিন্তু ঠিক সে সময়ে গেলাম না। যখন অন্যান্য সকলের আহার প্রায় শেষ হ'ল, আমি সেই সময়ে গিয়ে আহারে বসিলাম। আহার সমাপন করে সকলেই প্রায় চলে গেল। সেই অবসরে আমি দুই পকেট ভরে ফল ও বিস্কুট লয়ে আমার কেবিনে এসে একটু বিশ্রাম করতে লাগলাম।

কিন্তু আরাম উপভোগ করবার কি সেই সময়! আমার প্রাণটা যে তখন কি রকম ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছে তা' আর কাহাকে বুঝাব! কেবিন ত্যাগ করে জাহাজের খোলের উপরের রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। সেই খোলের ভিতরটা মালে পূর্ণ—ততোধিক পূর্ণ দেখলাম সূচিভেদ্য অন্ধকারে। সেই ঘোর অন্ধকারে আবদুল্লা একা আছে—রাজকুমারী চিরাস্কি অন্ধকারকে জড়িয়ে নিয়ে আছে! এখন অন্ধকারই তার একমাত্র ভরসা! এই কথা যখন ভাবছি, সেই সময় কাপ্তেন এসে আমার পার্শ্বে দাঁড়াল। তা'কে নিকটে পেয়ে ভাবলাম, এর সঙ্গে পরামর্শ করে যদি আবদুল্লার একটা কিছু উপায় করতে পারি তা'র চেষ্টা একবার দেখি। সেই জন্য তা'র সঙ্গে আলাপ করে কথা প্রসঙ্গে রুষ বিদ্রোহের কথা পাড়লাম।

কাপ্তেন রুষ বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বিবৃত করে উপসংহারে বল্লে, "মশায়, আমাদেরও বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়েছে। রুষরাজদ্রোহী রাজকুমারী চিরস্কি যাতে কোন প্রকারে লুকিয়ে আমাদের জাহাজে উঠতে না পারে, সে জন্য আমাদিগকে বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হয়েছে। বলব কি, তা'কে ধরিয়ে দিতে পারলে রুষ গভর্ণমেণ্ট পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। তা' ছাই আমার কি আর সে কপাল, যে চিরস্কি আমারই জাহাজে এসে উঠ্‌বে। তা' বলে, যেন আপনি মনে কর্ব্বেন না যে, আমি স্ত্রীজাতির উপরে এমনি খড়্গা-হস্ত। স্ত্রীলোক বলে নয়—রাজদ্রোহী বলে, তা' সে যেই হোক। যে রাজদ্রোহী, সে পুরুষও নয় রমণীও নয়; সে একটা হিংস্র ইতর জীববিশেষ। সে রকম লোককে ধরিয়ে দিতে আমি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করি না।"

কাপ্তেনের এই কথাগুলো যেন আমাকে বর্শার মত বিঁধ্‌তে লাগ্‌লো। কথাগুলা যে সে অন্যায় বলেছিল, তা' নয়। তবে এই সকল কথা যদি আবদুল্লা শুনতে পেয়ে থাকে—আমরা তো তা'র মাথার উপরেই দাঁড়িয়ে আছি —আহা, সে তবে কি ভাবছে!

আবদুল্লাকে একটু আশা দিবার জন্য আমি কাপ্তেনকে বলিলাম, "দেখুন একটা কথা ভেবে দেখ্‌তে হবে। যে দেশে স্ত্রীজাতি পর্য্যন্ত রাজদ্রোহী হয়ে উঠে, সে দেশের রাজা যে কতদূর অত্যাচারী সেইটা চিন্তা করা উচিত। আমার মনে হয় আমি যদি সেই রাজকুমারীকে পাই তবে তাকে তখনি ছেড়ে দিই।"

কাপ্তেন বেশ দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল "আমি তা' দিই না। পঞ্চাশ

হাজার টাকা পেলে আমার স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে খেয়ে বাঁচে; আর আমিও এ চাকরি ছেড়ে একটা বড় কাজ আরম্ভ করে দি'। কেন? যে স্ত্রীলোক বোমা ফেলে মানুষ হত্যা করে, তা'কে পালাতে দেব?"

"সত্যি! সত্যিই কি চিরস্মি বোমা ফেলেছিল?"

কাপ্তেন বেশ একটু রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়। কিম্বা সুবিধা পেলেই যে সে ফেলিত সেটা তো নিশ্চয়।" এই কথা বলিয়াই কাপ্তেন কণ্ঠস্বরটা একটু খাদে ফেলিয়া বলিল "যাক্ মশায়, ওসব কথায় আমাদের আর আবশ্যক নাই। রাত্ অধিক হয়েছে। আমি তবে চলিলাম। নমস্কার মশায়!"

কাপ্তেন জাহাজের অন্যদিকে চলিয়া গেল। তখন প্রায় সকলেই আপন আপন কেবিনে শয়নের আয়োজন করিতেছে। জাহাজের ডেক্‌টা প্রায় একরূপ জনশূন্য। সেই অবসরে আমি একগাছি দড়ি ধরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের খোলের ভিতর নামিলাম। ভিতরটা কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার! খুব সন্তর্পণে ও নিঃশব্দে খোলের ভিতর পৌঁছে খুব ভাল করে একবার চেয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা করিলাম। কারণ, সেই পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে আমার নয়নযুগল নেহাৎ বেকার ভাবে শ্রম করিতে পরাঙ্মুখ হ'য়ে আপনা আপনিই মুদে আস্‌ছিল। তার পর খুব চাপা আওয়াজে "আবদুল্লা" "আবদুল্লা" বলে বারদুই ডাক্‌লুম।

মালগুলোর ভিতর হ'তে একটা খস্ খস্ করে আওয়াজ হ'ল। তার পর সেই স্থান হ'তেই অতি ক্ষীণকণ্ঠে ধ্বনিত হল, "এসেছেন, দয়া করে এসেছেন! আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা তো আমি জানি না। আমি আর কি বলব! ভগবান আপনাকে জয়যুক্ত করুন, আপনার মঙ্গল করুন!...... আপনার কাছে সত্য করেই বল্‌ছি, আমি কিন্তু কখনও বোমা ফেলি নি'!" সেই কণ্ঠস্বরে আমার মনে হলো যেন সে দারুণ দুঃখে ও বিপদে নিতান্তই ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েছে। ক্ষণপরেই তার যেন বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস পড়িতে শুনিলাম— প্রাণটা বড়ই কাতর হয়ে উ'ঠল!

আমি বলিলাম, "হায় হতভাগিনী, কোথায় তুমি!"

সে ধীরে ধীরে কতকটা ঠাওর করে এসে আমার হাত ধরে বল্লে "এই যে আপনার দাসানুদাস আবদুল্লা।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম "কার্য্য গতিকে কিন্তু আমাকেই আবদুল্লার

দাসানুদাস হতে হয়েছে।" সে আমার হাতটা সজোরে টিপিয়া দিল। আমি তাঁকে পাশে লয়ে সিঁড়ির উপর বসিলাম ও বিস্কুট ও ফল প্রভৃতি খাইতে দিলাম। আমি তাহার জন্য এক বোতল জল ও একখানি কম্বলও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। অবশ্য কম্বলখানি পেয়ে তা'র যে কি আনন্দ হ'ল তা' আর কি বলিব!

আহারান্তে সে বলিল, "আপনি যখন উপরের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে গল্প কচ্ছিলেন, আমি তখন আপনাকে নীচে হ'তে এই সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম। আপনাদের কথাও আমি সব শুনেছি। কিন্তু কাপ্তেন আমার সম্বন্ধে যা' বল্লেন, আপনি দয়া করে আমার বিষয় সে ধারণাটা রাখ্বেন না।"

আমি বলিলাম, "এখন তোমার বিষয় একটা মন্দ ধারণা পোষণ করাও আমার পক্ষে দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে প্রিন্সেস্!"

সে ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে "আমাকে প্রিন্সেস্ বলে সম্বোধন কর্বেন না। আমি আপনার অধম দাস আবদুল্লা। আমাকে আপনি যেন একটা হীনপ্রকৃতির মানুষ বলে না বোঝেন, এই আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। রুস-বিদ্রোহের প্রকৃত কারণটা এখন শুন্বেন কি? না থাক—রাত্ অনেক হয়েছে—আপনার শোবার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে! আমি কি স্বার্থপর!"

আমি একটু হেসে বল্লাম "আমি তোমার কাছে আর খানিকক্ষণ থাক্‌লে কি তুমি সুখী হও?"

"হই, তবে আপনাকে কষ্ট—" আমি বাধা দিয়া বলিলাম "কিছু না।" সে বেশ সংক্ষেপে সমস্ত ইতিহাসটা আমাকে বুঝিয়ে দিলে। সকল কথা শুনে আমি বলিলাম, "আনন্দের বিষয় এই যে, তোমার দ্বারা কোনও গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হয় নি'।"

সে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "তবে আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস হয়েছে! এখন আপনাকে আমার বন্ধু বলে দাবী কর্ত্তে পারি!"

আমি বলিলাম "তোমার দাবী করিবার পূর্ব্বেই তো আমি তোমাকে বন্ধুরূপে বরণ করেছি আবদুল্লা!"

(৩)

এই ভাবেই এ কয় দিন আমাদের কাটিয়াছে। কাল প্রাতে আমাদের ইংলণ্ডে পৌঁছিবার কথা। দারুণ উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিনটা কেটে গেল। গভীর রাত্রে অতি সংগোপনে আবদুল্লাকে আমার কেবিনে লয়ে এলাম। খুব ভাল

সাবান দিয়ে সে তার মুখের ও হাতের রং গুলো ধুয়ে ফেল্লে। তার মাথার চুল আমাদেরই মত ছোট ছোট ছিল। প্রভাতের পূর্ব্বেই তা'কে আমার একটা ঢিলা পায়জামা পরিতে দিলাম। তার দীর্ঘাকৃতির দরুণ সেটা একেবারেই অমানান হয় নি'। বরং সে যখন কোট, পেণ্ট্‌লন ও হ্যাট্ পরে দাঁড়াল, তখন তাকে একজন নব্য ছোকরা না বলে সাধ্য কার!

সৌভাগ্যক্রমে আমার কেবিনটা জাহাজের এক পাশের দিকে ছিল; সে দিকে লোকজনের যাতায়াতও কিছু কম। জাহাজ থামিবার কিছু পরে সে ছড়ি হাতে করে আমার আগে আগে চলিল, যেন সে আমাকে জাহাজ হ'তে নিতে এসেছে। আমিও তাকে আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বলিতে বলিতে চলিলাম। বিধাতার আশীর্ব্বাদে তা'কে লয়ে নিরাপদে বাসায় পৌঁছিলাম।

কিন্তু আমার মত দীন দরিদ্রের বাসায় প্রিন্সেস্ চিরস্থির স্থান কি হ'তে পারে? একদিন না একদিন সে তার ঐশ্বর্য্য ও অধিকার পুনরায় প্রাপ্ত হবে। বিশেষতঃ, তার বড় লোক বন্ধুবান্ধব যখন এখানে রয়েছে, তখন আমার এ সামান্য উপকার স্মরণ করে সে যেতে না চাহিলেও আমি তা'কে আমার কাছে রেখে কেন কষ্ট দিই! কাজেই আমি তাকে বাধ্য হ'য়ে সকল কথা খুলে বল্লাম। সে অনেক বাদানুবাদের পর নিরুত্তর হ'ল বটে, কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল পড়ল!

আমি বলিলাম "আবদুল্লা, কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা কর, যদি কখনও এ দীনের সাহায্য আবশ্যক হয়, তবে আমাকে স্মরণ কর্ব্বে?" সে অঙ্গীকার করিয়া চলিয়া গেল।

(৪)

সন্ধ্যার সময় আমার কক্ষে সহসা এক সুন্দরী যুবতীর আবির্ভাবে আমি বিস্মিত হইলাম। দেখি এ যুবতী আমার সেই আবদুল্লা। আবদুল্লা এখন রমণীর পরিচ্ছদ পরিহিতা।

ইহার মধ্যে এখন আর সেই আবদুল্লার—সেই ছোকরার হাবভাব কিছুমাত্র নাই। তাহার মুখের প্রতি চাহিবামাত্র সে লজ্জায় মুখ নত করিল। এখন রমণীর রমণীয়তা যেন তা'র সর্ব্বাঙ্গেই জড়িত রহিয়াছে। তাহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আমি যেমন সসম্ভ্রমে চেয়ার হইতে উঠিতে যাইতেছিলাম, সে ত্রস্তভাবে আমার দুই কাঁধে তাহার হাতের ভর দিয়া আমাকে বসাইয়া দিয়া বলিল, "ইহারই মধ্যে আমাকে তোমার সাহায্যপ্রার্থিনী হয়ে আস্‌তে হয়েছে। অবশ্য তোমার এ সাহায্য আমার জীবনব্যাপী আবশ্যক। এখন হ'তে আর তোমাকে 'আপনি' বলিব না—সে সম্বন্ধ দূর হো'ক্! মনে পড়ে কি, সেই কাল, কুৎসিত ছোক্‌রা আবদুল্লাকে বলেছিলে যে "তুমি কি যাদু জান, কোন মন্ত্রের বলে আমাকে বশ করে ফেল্লে।" এখন বল—একবার সেই কথা বল—সত্যই কি তোমায় পাবার আশা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা?"

আর আমি! আমি আর সে কথার কি উত্তর দিব?

* * * *

আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে! বৎসরান্তে আমাদের একটি কন্যা সন্তান হইবার পরই রুসরাজ ক্ষমা ঘোষণা করেন! আমি এখন আমার স্ত্রীর সকল সম্পত্তির অধিকারী!

তবে একটা কথা বলিয়া রাখি। আমি যখনই বিদেশে যাই, আমার স্ত্রী —আমাকে আবদুল্লার একান্ত অনুগত জানিয়া—পত্র লিখিয়া সহি করিবার স্থানে 'তোমার দাসানুদাস আবদুল্লা' লিখিয়া থাকেন।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

সাময়িক সাহিত্য।

যাত্রাকালীন সংস্কার।

(লেখক—শ্রীঅমূল্যচরণ সেন)

সেকালে দূরদেশযাত্রা এরূপ বিপদসঙ্কুল ছিল যে, যাত্রাকালে লোকে একরূপ প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়াই বাহির হইত। আজিকালিকার মত যাতায়াতের সুবিধা তখন ছিল না; বর্ত্তমান যুগে বাষ্পীয় শকট ও জল-যানের সহায়তায় বহুদিনের পথ কয়েকঘণ্টার মধ্যেই অতিক্রম করা যায়। সুতরাং দূরদেশযাত্রা এখন একরূপ নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে; 'প্রাণ হাতে করিয়া' কাহাকেও আর এখন বিদেশ যাইতে হয় না।

সেকালে যখন দূরদেশ-গমন এরূপ ভয়াবহ ছিল, তখন লোকে গৃহ হইতে দূরপথে যাত্রা করিবার প্রাক্কালে শুভাশুভ না দেখিয়া বাটীর বাহির হইত না। বামে শব কি শিবা রহিয়াছে, দক্ষিণে সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী কি হ্রেষাধ্বনিরত অশ্ব বিচরণ করিতেছে, বারটা মঙ্গল কি বুধ, গৃহশীর্ষে বায়স তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, কি প্রাঙ্গণে বিড়াল ক্রন্দন-ধ্বনি তুলিতেছে,—যাত্রার পূর্ব্বে ইত্যাকার বহুবিধ শুভাশুভসূচক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত। কারণ দূরদেশে যাইতেই ত তখন প্রাণ একরূপ সন্দেহ-দোলায় দুলিত, দেশে কখনও ফিরিয়া আসিব কি সেইখানেই জীবন-পাত হইবে, এইরূপ সংশয় হৃদয়-মধ্যে উপস্থিত হইতই। এইজন্য যাত্রার পূর্ব্বে শুভদিন দেখিয়া, শুভচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া, শুভলগ্ন বুঝিয়া দৈবজ্ঞের উপদেশমত বাটী হইতে পা বাড়াইতে হইত।

তোমরা এ যুগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভোগী মানুষ, তোমরা এখন এসকলকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিবে। কিন্তু সেকালে যখন নিত্যসুখসম্ভোগ এই জাতির দগ্ধ অদৃষ্টে ঘটিত না; যখন বাঙ্গালীর জাতীয়তা এখনকার মত কোমল ছিল না; যখন তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে সামান্য একখানা উত্তরীয় ও

একগাছা যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া শত শত ক্রোশ ভূমি অতিক্রম করিয়া বিদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করিতে যাইতে হইত, যখন বিদেশ-গমন করিলে পুনরায় গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন অনিশ্চিত ছিল, তখন ভালই হউক বা মন্দই হউক, তাহাদিগকে যে মন্দ ভাবিয়াই বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইত, আত্মরক্ষার জন্য নানাপ্রকার দৈব-অনুষ্ঠানাদি করিতে হইত, গুরুজনের উপদেশানুযায়ী শুভ অশুভ জানিয়া চলিতে হইত, একথা নিশ্চয়। কিরূপ সংস্কারের বশে, তাঁহারা এসকল করিতেন, তাহা এখন বলা কঠিন। অবশ্য জ্যোতিষী ও দৈবজ্ঞগণের গণনাদি যে সকলেরই ভাগ্যে ঘটিত তাহা নহে; অনেক সময়ে পরিজনস্থ কুলাঙ্গনাগণও যাত্রাকালে শুভ কি অশুভ তাহার নির্দ্দেশ করিতেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশমতও অনেক সময়ে লোকে বাটী হইতে বিদেশ-যাত্রা করিত। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা, সুবচনীর পূজা, দেবতাদের নিকট 'মানসিক' করা প্রভৃতিও যাত্রার পূর্ব্বে যাত্রিকের শুভ সূচনা করিত।

আধুনিক যুগে—বাষ্প-তাড়িতের সমন্বয়ে এসকলকে কু-সংস্কার বলিতে হয় ত বল। কিন্তু তাই বলিয়া 'কু-সংস্কার' 'কু-সংস্কার' বলিয়া ঘৃণায় পূর্ব্ব-পুরুষদের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। তাঁহারা তখন যাহা করিয়াছিলেন, সরল বিশ্বাসেই করিয়াছিলেন; দেব-দ্বিজে ভক্তিবশতঃই করিয়াছিলেন। কুসংস্কারের দোষ দিবার সময়, ভ্রম দেখাইবার সময়—সে সকল দেখাইও; কিন্তু সাবধান! তাঁহাদের উপর শ্রদ্ধা হারাইও না; তাঁহাদের প্রতি ভক্তির কণামাত্র হ্রস্ব করিও না।

যাত্রা করিবে কখন্?

এতক্ষণ ত নানাকথায় মুখবন্ধ জটিল করিয়া তুলিলাম। এইবার কাজের কথা বলিব। সেকালে যাত্রা করিবার প্রশস্ত সময় ছিল—উষাকাল, শেষ রজনী হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত। পথিক দক্ষিণদিকে বা পুরোভাগে চন্দ্রকে রাখিয়া যাত্রা করিতে হইত; চন্দ্র কদাচ পশ্চাৎ বা বামদিকে থাকিবে না। পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিতে হইলে শনিবার এবং সোমবার; পশ্চিমদিকে শুক্র ও রবিবার; উত্তরদিকে মঙ্গল ও বুধবার এবং দক্ষিণদিকে বৃহস্পতিবারই প্রশস্ত। নিম্নলিখিত বারসমূহে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিয়া যাত্রা করিলে অশুভ আশঙ্কার সম্ভাবনা ছিল না:—

রবিবার—পান। সোমবার দর্পণে মুখ দেখা। মঙ্গলবার—ধনের চাউল। বুধবার—গুড়। বৃহস্পতিবার—দধি। শুক্রবার—মৎস্য। শনিবার গোধূমের রুটি।

আশ্চর্য্য এই, পৃথিবীতে আরও বহু উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্য থাকিতে এই সকল নিকৃষ্ট খাদ্য কেন শুভসূচক বলিয়া চলিয়াছিল।

শুভদিন ও শুভলগ্ন স্থির হইয়া গেলে বাটী হইতে অবিলম্বেই যাত্রা করা উচিত। যদি এরূপ যাত্রা-পথে হঠাৎ কোন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়, তাহা

হইলে অন্ততঃ তাহার জিনিসপত্র, বোঁচকা-বুঁচকী, তল্পী-তল্পা যাত্রাপথের নিকটবর্ত্তী কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া দিবে। এরূপ করিবার অর্থ, অন্ততঃ যাত্রা ত করা রহিল; তাহার পর তথা হইতে বাহির হইলেই চলিবে। কিন্তু এরূপভাবে যাত্রা করিয়া বাড়ীতে তিনদিনের বেশী থাকিতে নাই। যদি কোন অপরিহার্য্য কারণে তিনদিনের বেশী বাড়ীতে থাকিতে হয়, তাহা হইলে আবার দৈবজ্ঞদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া বাটী হইতে বাহির হওয়া উচিত নহে।

যাহাতে গ্রহগণ পথিকের উপর শুভদৃষ্টি সঞ্চারণ করিতে পারে, তাহার জন্য নিম্নলিখিত বারসমূহে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহকে ভিন্ন ভিন্ন পূজোপকরণ দান করিতে হয়:—

রবি—স্বর্ণ, তাম্র, লালফুল, গুড়, রক্তবস্ত্র, সবৎসা গাভী, গোধুম এবং রক্তচন্দন।

সোম—(চন্দ্র) রৌপ্য, মুক্তা, ঘৃত, শ্বেতবর্ণ ষণ্ড, তণ্ডুল, কর্পূর, শ্বেতবস্ত্র এবং বংশপেটিকা।

মঙ্গল—প্রবাল, মসুর ডাল, গোধুম, রক্তবর্ণ ষণ্ড, স্বর্ণ, রক্তবর্ণ বস্ত্র, গোলাপী পুষ্প।

বুধ—চুণী, শ্বেতচন্দন, নীলাভ বর্ণের বস্ত্র, সপ্তধাতুর পাত্র, বেগুনিবর্ণের ফুল।

বৃহস্পতি—স্বর্ণ, শর্করা, হরিদ্রা, তণ্ডুল, হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র, লবণ, মণি রত্ন।

শুক্র—হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, শ্বেত গাভী, শ্বেত অশ্ব, চাউল এবং শ্বেতচন্দন।

শনি—লৌহ, সর্ষপতৈল, রত্ন-নির্ম্মিত মহিষ, মুদ্রা, শস্য।

ধনী দরিদ্র সকলেরই যাহাতে সাধ্যায়ত্ত হয়, এই গ্রহশান্তির উপকরণগুলি সেইরূপ ভাবে অর্থাৎ মূল্যবান্ ধনরত্ন হইতে সামান্য তণ্ডুলকণা পর্য্যন্ত সেইরূপ ভাবেই করা হইয়াছে।

শুভসূচক চিহ্ন।

এ সকল সংস্কার ছাড়া যাত্রাকালে কতকগুলি চিহ্নের শুভাশুভও সবিশেষ লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকলের প্রভাব অর্দ্ধ ক্রোশের বেশী যায় না। যথা:—

১। যাত্রার প্রাক্কালে জলপূর্ণ কলস দেখা শুভ—ইহার অর্থ, যে উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হইতেছে, তাহা সাধিত হইবে। তাহাকে শূন্যহস্তে ফিরিতে হইবে না।

২। রজকের হস্তে সুধৌত পরিষ্কার বস্ত্র—ইহাও শুভসূচক। ইহার তাৎপর্য্য, রজকের মলিনতা-হীন বস্ত্রের ন্যায় বিদেশে যাত্রাকারীর চরিত্র সর্ব্বপ্রকার কলঙ্কশূন্য হইবে।

৩। পুরীষপূর্ণ পাত্রহস্তে—নীচ জাতি। এ দৃশ্যও শুভ সূচনা করে। কারণ যাত্রা-পথে পথিকের সর্ব্বপ্রকার বিপদ-আপদ দূরীভূত হওয়ার ইহা চিহ্ন।

৪। সবৎসা গাভী—ইহাও পথিকের যাত্রা-পথের শুভ-প্রণোদক। ইহা দর্শনে পথিকের মানসিক প্রফুল্লতা, স্বাস্থ্য ও সুখলাভ হইয়া থাকে।

৫। শঙ্খের রোধ্বনি—ইহাও শুভসূচক; ইহা যাত্রাকারীর সাফল্যলাভের সূচনা করে।

৬। দধি—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভ্রমণকারী সর্ব্বত্রই অপরিমেয় আতিথেয়তা লাভ করিবে।

৭। মৎস্য—যাত্রাকালে মৎস্য দেখা খুবই ভাল। যদি কোন চাকুরীলাভের জন্ত যাত্রা করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সাফল্য নিশ্চয়ই।

৮। শাক্‌সব্জী, তরীতরকারী—ইহাও ভ্রমণপথে সুখ, শান্তি, সাফল্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করিয়া থাকে।

৯। পুষ্প—অতীব শুভসূচক। ইহার অর্থ এই যে, ভ্রমণকারী বিদেশে সাধুস্বভাব, বাধ্য এবং বিনয়ী বন্ধু লাভ করিবে।

১০। দু'মুখো সাপ—ইহাও শুভ-প্রণোদক। কিন্তু এই সর্প সচরাচর দৃষ্টিপথে পতিত হইত না। যাত্রাকালে দু'মুখো সাপ দেখিলে পথিক বুঝিত—তাহার ভ্রমণপথ সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলজনক; কোন প্রকার অ-শুভ ঘটিবে না।

১১। বাদ্যধ্বনি—যাত্রাকালে বাদ্যধ্বনি শুনা শুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত এবং পথে ভ্রমণকারীর সুখ, শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যলাভ ঘটিত।

১২। পক্ষিকূজন—যাত্রাকালে যদি পথিক পাখীদের কলরবধ্বনি শুনিতে পাইত, তাহা হইলে সে বুঝিত, তাহার ভ্রমণ-পথ সুখের হইবে; পথে বা বিদেশে কোন ক্লেশ সে পাইবে না।

অশুভ চিহ্ন।

উপরে শুভসূচক চিহ্নাদির বিষয় কিছু বলা গেল, এইবার অশুভসূচক চিহ্নাদির বিষয় বলিতেছি;—

যাত্রার প্রাক্কালে পরস্পর যুদ্ধকারী পক্ষিদ্বয়, তিতির পক্ষী, চিল, শকুনি, খেঁকশিয়াল, শৃগাল, সত্যবিধবা, কলু, একচক্ষু ব্যক্তি, গর্দ্দভ এবং পেচক যদি পথিকের দৃষ্টিপথে পড়ে, তবে জানিবে যাত্রা শুভদায়ক নহে।

এই ত গেল, যাত্রা-সম্বন্ধে সংস্কারের কথা, তা' ইহাকে সু-ই বল, আর কু-ই বল। বংশ-পরম্পরায় এই সংস্কার কিন্তু আমাদের প্রাণে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। পঞ্জিকার 'জ্যোতিষ বচনে', 'খনার বচনে'ও আমরা এরূপ যাত্রার নিয়মাদি দেখিতে পাই, জানি না সেগুলিও সংস্কার কি না, অথবা তাহাদের কোন নিগূঢ় অর্থ আছে কি না। 'জ্যোতিষ বচনা'দির পর্য্যালোচনা করিয়াও দেখিতে পাই:—

জন্মর্ক্ষে জন্মমাসে বা যো গচ্ছদষ্টমে বিধৌ।
আয়ুঃক্ষয়মবাপ্নোতি ব্যাধিঞ্চ বধবন্ধনং॥

জন্মনক্ষত্র, জন্মমাস ও অষ্টম চন্দ্রে যাত্রা করিলে আয়ুক্ষয়, ব্যাধি ও বধ-বন্ধন হয়।

নক্ষত্রাদি-ভেদে যাত্রার আরও অনেক নিয়ম আছে। কোথাও ভয়, কোথাও অ-ভয়। সর্ব্বত্রই একটা খুঁটিনাটি আছেই আছে। তবে জ্যোতিষকার অভয় দিয়া বলেন,—যে দিকে যাত্রা করিবে, সেই দিক্‌পতিকে স্মরণ করিয়া "স্বস্তি" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূমিতে দক্ষিণ পদ ফেলিয়া গমন করিলে শুভ হইবে। যথা:—

দিগীশং হৃদয়ে ধ্যাত্বা গন্তব্যাশামুখস্থিতঃ।
অন্তঃসমীরণে দেহে প্রবেশে সমুপস্থিতে।
স্বস্তীতি দক্ষিণং পাদমাসনাদবতারয়েৎ॥

আরও গুরুজনের আশীর্ব্বাদ যাত্রার পূর্ব্বে গ্রহণ করিবে—

মাঙ্গল্য পুষ্পরত্নাদ্যৈঃ পূজ্যানভিবাদ্য চ।
ন নিষ্ক্রমেৎ গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচার পরোনরঃ॥

মাঙ্গল্য পুষ্প-দ্রব্যাদি দ্বারা পূজ্য ব্যক্তিদিগের পূজা বা অভিবাদন না করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ গৃহের বাহির হইবে না।

এ সকলকেও যাঁহারা মানিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, পিতা-মাতার পদধূলি লইয়া যাত্রা করাই প্রশস্ত। কারণ 'যাত্রায় শিবজ্ঞান' সকল সন্দেহের নিরাকরণ করে।

"জ্যোতিষের মতে শুদ্ধ দিন নাহি হয়।
শিবজ্ঞান অতএব তার বিনিময়॥"

তাই বলি, এ সকলকে যাঁহারা কুসংস্কার বলিবেন, পূর্ব্বপুরুষদের 'খামখেয়ালি' মনে করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে ভগবান ভিন্ন গতি নাই। তিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা; তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া বাহির হইলে আর ভয় কি? অতএব হে পান্থ! তোমার যাত্রা-পথ শুভময় হউক—'শিবাস্তে পন্থানঃ'।*

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শীশ্-মহল—(সচিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস) মূল্য ১৲—মুদ্রণ, কাগজ পরিপাটী। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসখানির রচয়িতা। যিনি বিগত কুড়িবৎসরকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিবিধ অলঙ্কারে বঙ্গ-সাহিত্য ভূষিত করিয়া আসিতেছেন এবং ইতিপূর্ব্বে কয়েকখানি নাটক ও উপন্যাস রচনা করিয়া যথেষ্ট যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন সেই সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থকারের নূতন পরিচয় অনাবশ্যক।

সমালোচ্য গ্রন্থে 'ইস্কান্দার খাঁ', 'কুলসম' ও 'গুলসানা' এই চরিত্রত্রয় লেখকের কল্পনা-প্রসূত তন্মধ্যে 'গুলসানা' নিখুঁতভাবে, আদর্শ রমণী-চরিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেনাপতি ইস্কান্দার খাঁ কৌশলে গুলসানার দুর্গ অধিকার করিলে গুলসানা ইস্কান্দারের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পতির সহিত দুর্গ হইতে পলায়ন করিল এবং পথিমধ্যে সে তাহার উপাস্যদেবতা স্বামীকে চিরদিনের জন্য হারাইল। গুলসানা ইচ্ছা করিলে, প্রতিহিংসাপরায়ণা হইলে, প্রথম সাক্ষাতেই ইস্কান্দারের হত্যাসাধন করিতে পারিত কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইস্কান্দারের কৃত অপরাধের প্রতিশোধস্বরূপ বারবার তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া সে নিজের উদার চরিত্রের, ত্যাগ ও ধর্ম্মের, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া গিয়াছে।

"ইস্কান্দার খাঁ"—সৌন্দর্য্যলোলুপ দুর্ব্বলচিত্ত মানবরূপে এবং "কুলসম" বুদ্ধিমতী রমণীরত্ন-রূপে বেশ ফুটিয়াছে। লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় একস্থানে বলিতেছেন—"আদর্শ চরিত্র ফুটাইবার উপযুক্ত শক্তি ও ক্ষমতা আমার খুব কম। তবে চেষ্টায় কোন দোষ নাই বলিয়া, সাহসী হইয়াছি"; বলা বাহুল্য, লেখকের এই উক্তি তাঁহার বিশ্বাস, ধারণা বা বিনয়প্রকাশ যাহাই হউক না কেন, ভ্রান্তিতে পরিণত হইয়াছে! যদি সাহিত্যে গুণের আদর থাকে তাহা হইলে এই উপন্যাসখানি সাধারণের নিকট আদৃত হইবে, পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে, একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

* প্রধানতঃ 'Muslim Review' নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত 'Indian Superstitions re. Journey' নামক প্রবন্ধ হইতে ইহা সংকলিত হইল।—লেখক'।

অর্চনা, ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

গিরিশচন্দ্র।

বাঙ্গালা সাহিত্য-সেতুর একটি বিরাট স্তম্ভ আজি খসিয়া পড়িল। বঙ্গীয় নাট্য-গগনের গৌরব-রবি গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার নাট্য-রাজ্য অন্ধকার করিয়া অস্তমিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশ আজি যে রত্ন হারাইল, তাহার তুলনা নাই;— তাহা অতুল্য ও অমূল্য!

গিরিশচন্দ্রের তিরোভাবে যে শুধু বাঙ্গালার নাট্য-সিংহাসন শূন্য হইয়াছে, তাহা নহে। বঙ্গ-রঙ্গালয়-সমূহের তিনি সর্ব্বস্ব ছিলেন। তাঁহার অভাবে আজি রঙ্গমঞ্চগুলিও রাজহীন হইয়াছে।

এই মহাসর্ব্বনাশ, এই সাংঘাতিক ক্ষতি, সমগ্র সভ্য বাঙ্গালীসমাজের আজিও সম্যক উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে একথা স্থির নিশ্চয়, দিন যত অগ্রসর হইবে, ততই বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে যে, একের বিয়োগে বাঙ্গালাদেশ এমন ক্ষতিগ্রস্ত আর কখনও হয় নাই। এমন একদিন আসিবে, যেদিন বাঙ্গালার সভ্য-সমাজ বুঝিতে পারিবে যে, এ ক্ষতি কখনও পূরণ হইবার নহে। ইহা অতিভক্তের অতিরঞ্জন নহে, স্তাবকের স্তুতি নহে, শোকোচ্ছ্বাসের অত্যুক্তি নহে। অবশ্য, একথা মিথ্যা নহে যে, মৃত-মনীষীদিগের গুণ-কীর্ত্তনের সময় আমরা প্রায়ই তাহার ওজন ঠিক রাখিতে পারি না,—প্রশংসার মাত্রা অতিক্রম করিয়া ফেলি। এমন কি, শোকের আবেগে তাঁহাকে 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বা 'অদ্বিতীয়' প্রভৃতি অযথা ও অযোগ্য বিশেষণে বিশেষিত করিতেও সঙ্কোচ বোধ করি না। মনে পড়ে, হেমচন্দ্রের শোক-সভায় মধুসূদনকে বিস্মৃত হইয়া হেমচন্দ্রকে সর্ব্বোচ্চ কবি-আসন দেওয়া হইয়াছিল। আবার নবীনচন্দ্রের শোকসভায় নবীনচন্দ্রকেও 'বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি' বলিয়া বিঘোষিত হইতে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আজি যাহা আমরা বলিতেছি, তাহা কেবলমাত্র ঐরূপ উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি নহে। সুবিচার দৃষ্টির সহিত পর্য্যালোচনা করিলে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, অভিনয় শক্তি ও নাট্য প্রতিভার অত্যাশ্চর্য্য সমাবেশ গিরিশচন্দ্রে একাধারে যে পরিমাণে যেমন ছিল, তেমনটি অদ্যাবধি আর কাহাতেও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সংক্ষেপে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে গেলে, ইহাই

বলা সঙ্গত যে, বঙ্গ-রঙ্গালয় ও নাট্যসাহিত্য এই দুই রাজ্যেরই তিনি নেপোলিয়ন ছিলেন।

এই সংক্ষিপ্তপরিচয়ের এইখানে একটু সম্প্রসারণ আবশ্যক। কারণ, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে উপরিউক্ত কথা দুইটি যতই অকৃত্রিম, যতই সত্য হউক, শুনিতে কিন্তু ফাঁকা লাগে। উহাতে গিরিশের সাহিত্য-মূর্ত্তির ছবি মানসপটে ঠিক অঙ্কপাত করে না। উহা দ্বারা তাঁহার মহীয়সী প্রতিভার পরিমাণ ঠিকরূপে বুঝা যায় না।

প্রতিভা জিনিসটাকে আমরা সচরাচর যত সুলভ মনে করিয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে তাহা তত সুলভ নহে। দার্শনিকপ্রবর স্পেন্সরসাহেব প্রতিভার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "অপরিসীম শ্রমশীলতার নামই প্রতিভা।" কথাটা বড় মিথ্যা নহে। অদ্য তারিখ পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে, বিনা আয়াসে কাহাকেও ত বড়লোক হইতে দেখি নাই। প্রতিভার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে ধারাবাহিক পরিশ্রম সংজড়িত। গিরিশচন্দ্রের জীবনও যে এই লক্ষণ সমন্বিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার জীবন—নিরবচ্ছিন্ন পুরুষকারের জীবন—অসাধারণ পরিশ্রমের জীবন! কত বৈচিত্র্যময় ও কঙ্করময় পথ পর্য্যটন করিয়া, কতশত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যে তিনি তাঁহার গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে ত্যাগ, যে সাহস, যে অধ্যবসায় ও যে সহিষ্ণুতা দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী জীবনে তাহা সুদুর্লভ। তাঁহার স্মৃতির উপাসনা উপলক্ষ্যে আজি সেই সব কথারই সাধ্যমত আভাষ দিবার প্রয়াস পাইব।

ভাষা পূর্ণ পরিণতি লাভ না করিলে, তাহা হইতে প্রকৃত নাটক প্রসূত হয় না। শুনিতে পাই, সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে একবার নাটক লিখিতে অনুরোধ করায়, তিনি নাকি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে. "বঙ্গভাষা নাটক প্রসব করিবার এখনও উপযোগী হয় নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র যে পথে পদার্পণ করিতে সাহস করেন নাই, সেই সন্দিগ্ধ পথ গিরিশচন্দ্র অকুতোভয়ে অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা, তাহার দুর্ব্বলতা তিনি কদাচ স্বীকার করিতে চাহিতেন না। বঙ্কিমের অভিমতের বিরুদ্ধে তাই তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"মহাকবি সেক্সপীয়র, অসীম ভাণ্ডার যাঁর,
মনন ক'রেছি হব অনুগামী তাঁর।

* * * * *

দেবভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার,
কোন্ ভাবে বাক্যভাবে হেন সংযোজন!
মধুর গুঞ্জরে অলি, বিকাশে কমল কলি,
কোন্ ভাবে কুঞ্জবনে কোকিল কুহরে—
কালের করাল হাসি, ঝলকে দামিনী রাশি,
নিবিড় জলদজাল ঢাকে বা অম্বরে!" *

গিরিশচন্দ্রের এই উক্তি, কেবলমাত্র কবিতায় পর্য্যবসিত হয় নাই। যেদিন 'প্রফুল্ল' ও 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের জন্ম হয়, সে দিন বাঙ্গালার সাহিত্য-মন্দিরে শুভ শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল,—বাঙ্গালার ইতিহাসে সেইদিন সোণার অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। মধুসূদন ও বঙ্কিমের প্রতিভাস্পর্শে যে বঙ্গভাষা নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিল, গিরিশের প্রতিভা প্রভাবে তাহার বন্ধ্যাত্ব মোচন হইল।

গিরিশের পূর্ব্বে যে বঙ্গভাষায় নাটক রচনার চেষ্টা হয় নাই, এমন নহে। নাটক-নামাঙ্কিত পুস্তক সে সময়ে যথেষ্টই পাওয়া যাইত। কিন্তু সে সকল পুস্তকের প্রায় পনেরোআনা সাড়েতিনপাই গ্রন্থ নাটকীয়-প্রাণ-সম্পর্ক-শূন্য। আর যে এক আধখানিতে নাটকীয় প্রাণের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হইত, প্রায় সে সকল গুলির গায়েই তখন শিশুকালের আঁতুড়ে গন্ধ ছাড়িত! মনে হইত, সেগুলিতে কিসের যেন একটা অভাব আছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের হস্ত প্রেরণা পাইবামাত্র নাটকের সে অভাব মোচন হইল,—বঙ্গসাহিত্যে নাটক চলিতে আরম্ভ করিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ কিন্তু গিরিশের এই অভিনব-সৃষ্টিকে সাদরে অভিনন্দন করে নাই। এজন্য, অবশ্য বিশেষ বিস্মিত হইবার হেতুও দেখি না। নূতনের অদৃষ্টে সর্ব্বদেশেই প্রথমটা প্রায় অনাদরই ঘটিয়া থাকে। আমাদের মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রকেও সর্ব্বপ্রথম বিস্তর উপহাস ও অবহেলা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তবে কথা হইতেছে এই যে, গিরিশের মত সারাজীবন তিরস্কার ও তাচ্ছীল্যের বোঝা বহিয়া জীবনপাত করিতে আধুনিক সভ্য সমাজে আর কোনও প্রতিভা-শালী ব্যক্তিকে দেখি নাই। শ্লীলবাদীরা তাঁহার নামে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন। সাহিত্য-সমাজ কতকটা তাঁহাকে একঘ'রে করিয়াই রাখিয়াছিল। আর বাঙ্গালার একদল সাহিত্যিক 'লিলিপুটিয়ান্' যখন তখন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার কৃতিত্ব অপ্রমাণ করিবার জন্য প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ করিত। গিরিশচন্দ্রকে কিন্তু কখনও এই সব উপহাস ও উপেক্ষায় বিচলিত হইতে দেখি

---

* অপ্রকাশিত রচনা। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ইহা লেখককে দিয়াছিলেন।

নাই। লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকর ব্রতকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, সামাজিক সম্মান দূরে রাখিয়া এই পুরুষসিংহ অদম্য উৎসাহে ও অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গমপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার কাছে তাঁহার নিন্দা, কুৎসার কথা উঠিলেই তিনি একটু উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিতেন, "যে দেশের লোকে থিয়াটারের পাশ পাইলেই 'বাঙ্গালায় আর এমন নাটক হয় নাই' বলিয়া সুখ্যাতি করে এবং পাশ না পাইলেই গালি দেয়, সে দেশের সমালোচনার আবার মূল্য কি?"

এত আত্ম-নির্ভর, আত্মশক্তিতে এমনি অটল-বিশ্বাস না থাকিলে সাহিত্যের গঠনকার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায় না। আর একথাও সত্য যে, সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে এইরূপ অসীম নির্ভীকতা ও নিভীকতার সহিত এই অসঙ্কোচ সরলতা এবং সেই সরলতার সহিত এই সহানুভূতিপ্রবণ উদারতা না থাকিলে, সে সাহিত্যে মানুষ গড়িতে পারে না।

গিরিশের গড়িবার শক্তি বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রতিভার একটা প্রবল স্বাধীন বল অনুভব করা যায়। বুঝা যায় যে, কি অসামান্য পরিমাণ-সামঞ্জস্য-বোধ লইয়া তিনি নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যের অবস্থা গিরিশের পূর্ব্বে কি ছিল এবং তাঁহার আবির্ভাবে কি হইল, তাহা আলোচনা করিলেই গিরিশের এই গড়িবার শক্তির আভাষ পাওয়া যাইবে।

সংসারের অনেক ঘটনাই প্রথমটা আকস্মিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, তাহার সূচনা বহুপূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সাহিত্য-সংসারেও এইরূপ এক একটি কার্য্য কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সহসা সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সে কার্য্যটি নিতান্ত একবার হঠাৎ অনুষ্ঠিত নহে;—তাহা দশজনের উদ্যোগের ফল। দশজনে নানারকমে উদ্যোগ করিয়া থাকে, তারপর শক্তিধর মনুষ্য তাহা একত্র করিয়া স্বেচ্ছামত ফল ফলাইয়া থাকেন।

বঙ্গসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাহাও কিছু একদিনে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে হয় নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সে শক্তি সংগ্রহের আয়োজনের সূত্রপাত তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল। এই শক্তি-সংগ্রহের মূলে যাঁহারা জলসেচন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের হস্তে যাহা বিকাশ লাভ

করিয়াছিল, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর হস্তে তাহারই উন্মেষ দেখা গিয়াছিল। এ কথায় গিরিশের যে গৌরব অপলাপ করা হয়, এমন যেন কেহ না মনে করেন। পশ্চাদগামী লেখকের পক্ষে পূর্ব্বগামী লেখকের নিকট ঋণ গ্রহণ অনিবার্য্য! গিরিপাদভূমির আনুকূল্য না পাইলে শৈল-শিখর কিছুতেই শিখর হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। কিড, মার্লো, ও গ্রীণ্ প্রভৃতি নাট্যকারগণের প্রতিভা মহাকবি সেক্সপীয়রের নাটকীয়-শক্তি উদ্দীপনে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া সেক্সপীয়র ছোট হইয়া যান নাই।

বাঙ্গালাদেশেও বুঝি মধুসূদন ও দীনবন্ধু না জন্মাইলে গিরিশচন্দ্রকে দেখিতে পাইতাম না। মধুসূদনকে নব্য ধরণের নাটকের প্রথম পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। মধুসূদন জানিতেন যে, দেশের সভ্যতার রূপ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের কাব্যেরও রূপ-পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সংস্কৃত-অলঙ্কার কর্ত্তাদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে রচিত নাটক যে এ রুচি পরিবর্ত্তনের যুগে বাঙ্গালীর রোচক হইতে পারে না, তাহা রামনারায়ণের নাটক দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আর ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালা নাটক রচনা করিয়া তাহার সকলরূপ গতি, সকলরূপ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন দ্বারা নাট্য-প্রতিমার গঠনকার্য্য একরূপ সমাধা হইল বটে; কিন্তু সে প্রতিমার গঠন-শুদ্ধি তেমন সন্তোষজনক হইল না। তা' ছাড়া তাহাতে প্রাণ-বস্তু জিনিষটার একান্ত অসদ্ভাব দেখা গেল। চরিত্রই নাটকের সর্ব্বস্ব,—প্রাণ বলিলেই হয়। সেই চরিত্র জিনিষটাকে মধুসূদন ভাষায় দুই একটা পোঁচের সাহায্যে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার নাটকের পাত্র-পাত্রীদিগের কথোপকথনে হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস নাই, অকৃত্রিম আবেগ নাই;—যেন সকল কথাতেই শুক্রবৎ বা মারকৎ লেখা রহিয়াছে।

যে দিন 'নীলদর্পণে'র জন্ম হয়, বাঙ্গালায় সেও এক মহাস্মরণীয় দিন,—সেইদিনে বঙ্গনাট্যপ্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। মধুসূদন তাঁহার প্রহসনে যে বাঙ্গালী চরিত্রের সামান্য একাংশ আঁকিয়া কৃতকার্য্যতার আভাষ দিয়াছিলেন, দীনবন্ধু সেই বাঙ্গালী চরিত্রের অন্যান্য অংশ তাঁহার নাটকের উপকরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'নীলদর্পণ' বঙ্গপল্লীর চিত্রপট দিয়াই সাজানো-গোছানো! যে ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ ও বহুল বৈচিত্র্যবিহীন, সেখানে কবিত্বশক্তি খেলাইবার কতকটা সুযোগও পাওয়া যায়। এই স্বল্প-বৈচিত্র্যবিশিষ্ট-বাঙ্গালী চরিত্র-

অঙ্কনের চেষ্টা দীনবন্ধুর কৃতকার্য্যতার পক্ষে বোধ করি, সেইজন্য কতকটা সহায়তা করিয়াছিল।

যাহা হউক, দীনবন্ধুর প্রতিভাস্পর্শে নাটকে জীবনী সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু তাহার বয়স তখন অতি অল্প—তখনও তাহার স্বাধীনভাবে উঠিয়া হাঁটিয়া দৌড়াইবার সামর্থ্য হয় নাই। মধুসূদনাদির নাটকাদি যে দোষে দূষিত, দীনবন্ধুর নাটকাদিও সে দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার কামিনী, বিজয়, লীলাবতী, ললিত ও সৈরন্ধ্রী প্রভৃতি কতকগুলি চরিত্র ভাষার মধ্য দিয়া সমগ্র মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পায় না। তাহাদের কাটাকাটা 'বুলি' ও সাজানো-গোছানো কথায় স্বাভাবিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয় না। উপরন্তু প্রকৃত শোকের স্থলে আড়ম্বরময় বিলাপ এবং তেজস্বিতার স্থলে আস্ফালনই অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কাব্যকৌশলের অভাবে দীনবন্ধুর নাটক কতকটা সৌন্দর্য্যহীন হইয়াছিল।

জগতের সমস্ত পদার্থই অপূর্ণতার ভিতর দিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে,—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বভাব সৃষ্ট সামগ্রী সকলের যেমন উন্নতি, বৃদ্ধি, পরিণতি ও স্ফূর্ত্তি আছে; মানবসৃষ্ট কাব্যকলারও সেইরূপ পরিণতি আছে,—স্ফূর্ত্তি আছে। বঙ্গীয় নাট্যকলার অদৃষ্টেও সেই সময়ে পরিণতি লাভের এক শুভ লক্ষণ দেখা দিল—শুভ অবসর আসিল।

সেই সময়ে গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর নাটককেই একরকম ভরসা করিয়া বঙ্গে জাতীয়নাট্যশালা সংস্থাপন করিলেন। রঙ্গালয়ে দীনবন্ধুর নাটক অভিনয় চলিতে লাগিল; কিন্তু একা দীনবন্ধু আর কতদিন দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়া রাখিতে পারেন? সকল বিষয়েই বৈচিত্র্যের পিপাসা মানবের স্বভাবসিদ্ধ। বাহিরের নাটক না পাইয়া তখন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং অভিনয়োপযোগী নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নাটক রচনা করিয়া তিনি বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, কাব্যাংশে যতই উচ্চদরের হউক না কেন, যে নাটক-নামাঙ্কিত পুস্তক অভিনয়ে কখনও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা নাটক নহে;—কাব্যসাহিত্য! তিনিই আমাদের বুঝাইয়া দিলেন,—নাটক ক্রিয়াচিত্র—নটচর্য্যার সেই ক্রিয়াচিত্রের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

জীবন-সমস্যা।

কে করিবে জীবনের সমস্যাপূরণ।
তুমি চাঁদ হাসি হাসি, কত সুধা পরকাশি—
এ নিখিল বিশ্বে কর সুধাবরিষণ—
প্রকৃতির শ্যামশোভা, চিরদিন মনলোভা—
আমারি নয়নে কেন বিরস এমন!

কে করিবে জীবনের সমস্যাপূরণ।
এ জীবনে মহারণ, কত চেষ্টা জাগরণ—
কত আশা, কত ভাবা, সাধনা যতন—
ঐশ্বর্য্যে বিলাস যত, দারিদ্র্যে সহন তত—
সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালে কর্ম্ম-সম্পাদন।

কে করিবে জীবনের সমস্যাপূরণ!
শত কার্য্য দিয়া মাথে, সংসার বসিয়া আছে
আলস্য তাচ্ছল্য সে যে পাশে নিরগন—
তারি মাঝে কেন হায়, এ মোহ আসিতে চায়
মরম ফুড়িয়া কেন করে জ্বালাতন।

কে করিবে জীবনের সমস্যাপূরণ!
হাহা করি কিবা চায়, কার ত'রে পড়ে হায়!
কর্ম্মভূমে কেন হেন জড়ের মতন—
(বুঝি) সকলি করিতে পারে, প্রাণচক্র পুনঃ ঘুরে
জীবনের মূলে শুধু পেলে একজন।

শ্রীউমাচরণ ধর।

পিশাচ পিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তাহার পর শুনি, তোমার গল্প ক্রমেই কৌতুকপূর্ণ হইয়া আসিতেছে। আমারও কৌতূহল বৃদ্ধি হইতেছে।"

রাধারাণী বলিতে লাগিলেন, "আমি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রাখাল বাবু একদিন আমাকে বাগানে লইয়া গিয়া একটা কাঠের ঘর দেখাইলেন। আমি সেই ঘরের কাছে গেলে লোহার শিকলের শব্দ পাইলাম। বুঝিলাম, এই ঘরের মধ্যে কোন জন্তু শিকল দিয়া বাঁধা রহিয়াছে।

রাখাল বাবু সেই ঘরের কাঠের ফাঁক দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ দেখি এটা কি ভাল নয়?"

আমি উঁকি মারিয়া দেখিলাম, অন্ধকারে কি একটা জন্তুর চক্ষু দুইটা ভয়ানক জ্বলিতেছে, আমি ভয়ে মুখ সরাইয়া লইলাম।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, এটা আমার পোষা কুকুর ভুলো। আমার পোষা কুকুর বলি বটে, কিন্তু আমার চাকর নন্দু ছাড়া আর কেউ এর কাছে এগোতে পারে না। আমাকেই তেড়ে কামড়াইতে আসে, রাত্রে নন্দু ইহাকে বাগানে ছাড়িয়া দেয়, আবার সকালেই বাঁধিয়া ফেলে। সেই ইহাকে খাওয়ায়, এ রাত্রে যদি কাঁহাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আর তাহার রক্ষা নাই। বাঘের মত ভুলো দুর্দ্দান্ত; দেখিও, যেন কোন মতে কোন দিন রাত্রিতে বাগানে বাহির হইও না।"

আর তিনি কিছু বলিলেন না, আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সেই দিন রাত্রে আমি জানালা খুলিয়া জ্যোৎস্নায় ভুলোকে দেখিলাম। এরূপ ভয়ানক কুকুর আমি আর কখনও দেখি নাই, তাহাকে হঠাৎ দেখিলে যথার্থই বাঘ বলিয়া মনে হয়। দেখিলাম ভুলো ছাড়া রহিয়াছে, বাগানে ঘুরিতেছে। ইহার সম্মুখে পড়িলে কাহারই যে রক্ষা নাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গোবিন্দরাম জিজ্ঞাসিলেন, "হাঁ, তাহার পর?"

রাধারাণী বলিলেন, "আর একটা বিষয়ও আপনাকে বলি। আমি যে ঘরে শুইতাম, সেই ঘরে একটা দেরাজ ছিল। দেরাজটায় আমার কাপড়-চোপড় রাখিয়া দিবার জন্ম রাখাল বাবু আমাকে চাবি দিয়াছিলেন। আমি দেরাজের সব কয়টি টানায় আমার জিনিষ-পত্র রাখিয়াছিলাম। কেবল দেখিলাম, একটা ছোট টানা বন্ধ, তাহার চাবী তিনি আমাকে দেন নাই। এটায় কি আছে আমার দেখিবার জন্ম কৌতূহল হইল। আমি অনেক কষ্টে তাহা খুলিলাম। খুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে এত বিস্মিত হইলাম যে বলিতে পারি না।"

"কি দেখিলে?"

"এক গোছা চুল। প্রথমে দেখিয়াই মনে হইল যে, আমি আমার মাথার যে চুল কাটিয়াছিলাম, ঠিক সেই চুল। কিন্তু আমি সে চুল ফেলিয়া দিই নাই, খুব যত্নে রাখিয়াছিলাম, এখনও তাহা আমার টিনের বাক্সের মধ্যে আছে, এরূপ স্থলে সে চুল এখানে আসিল কিরূপে? কে আমার বাক্স হইতে সে চুল লইয়া এখানে বন্ধ করিয়া রাখিল? আমি তখনই আমার বাক্স খুলিলাম, দেখি সে চুল ঠিক রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় এ কাহার চুল? দুই চুল পাশাপাশি রাখিয়া মিলাইয়া দেখিলাম ঠিক এক, কোন পার্থক্য নাই। আমি এ কথা রাখাল বাবুকে বলিলাম না। তাঁহাকে না বলিয়া গোপনে দেরাজের টানা খুলিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তিনি ইহাতে বিরক্ত হইতেন।"

"ভালই করিয়াছিলে।"

"আরও একটা বিষয় রাখাল বাবুর বাড়ীতে দেখিলাম।"

"কি বল—যাহা যাহা দেখিয়াছ, সমস্তই বলা প্রয়োজন।"

"রাখাল বাবুর বাড়ীর একটা দিকের দুই তিনটা ঘর চাবি বন্ধ; সে দিকে বড় কাহাকেও যাইতে দেখিতাম না। একদিন রাখাল বাবুকে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিলাম। তাঁহাকে সর্ব্বদাই হাসিমুখে দেখিতাম, সেদিন আমি তাঁহার মুখে যে ভাব দেখিলাম, তাহার বর্ণনা হয় না। নর-রাক্ষসের মুখ বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহার মুখ ঠিক সেইরূপ। তিনি সৌভাগ্যক্রমে আমাকে দেখিতে পাইলেন না, অথবা দেখিয়াও দেখিলেন না, বেগে অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

ইহাতে এই ঘরে কি আছে দেখিবার জন্য আমার খুব কৌতূহল হইল। আমি একদিন বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ঘরগুলির দিকে আসিলাম। দেখি জানালাগুলি সব কাঠ দিয়া বন্ধ। গৃহমধ্যে যে কেহ আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না।

সহসা নিকটে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি—রাখাল বাবু। তাঁহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম, তিনি আমার উপরে সন্দেহ করিয়াছেন; সেজন্য বলিলাম, "এ ঘরগুলি বন্ধ রাখিয়াছেন কেন? ঘরগুলি ত বেশ!"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন না যে, ফটোগ্রাফ তোলা আমার একটা প্রধান রোগ—ছবি তুলিতে হইলে অন্ধকার ঘরের দরকার। এই সকল অন্ধকার ঘরে আমার ছবি তুলিবার আরক প্রভৃতি আছে।"

আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না, অন্য কথা কহিতে কহিতে উভয়ে বাড়ীর ভিতরে আসিলাম। কিন্তু আমার সন্দেহ গেল না,—আমি রাখাল বাবুর কথা বিশ্বাস করিলাম না, কারণ এই ঘরে নন্দু চাকর ও নন্দুর স্ত্রীকেও সময়ে সময়ে যাইতে দেখিয়াছিলাম। এত বড় বাড়ীতে এই দুইজন চাকর ব্যতীত আর কেহ থাকিত না, ইহাও একটা সন্দেহের বিষয়। বিশেষতঃ নন্দু একটা মাতাল বদলোক, সৌভাগ্যের বিষয় আমার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। আমার কিছু প্রয়োজন হইলে আমি নন্দুর স্ত্রীকে বলিতাম। তাঁহাকে মন্দ লোক বলিয়া বোধ হইত না।

দুই দিন হইল এই ঘরে যাইবার আমার সুবিধা হইয়াছিল। দুই দিন হইতে নন্দু দিন রাত মদ খাইতেছে; প্রায় সে অজ্ঞান অবস্থায় তাহার নিজের ঘরে

পড়িয়া থাকে, তাহার স্ত্রী সমস্ত কাজ করিতেছে। আমি সেই ঘরের দিকে গিয়া দেখি, দরজা খোলা রহিয়াছে, এই সুবিধায় আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া সেই ঘরের দিকে চলিলাম। দরজার পরেই একটা লম্বা বারান্দা, ভারি অন্ধকার! ভারি ঠাণ্ডা, তাহার পর সারি সারি তিন-চারিটা ঘর, সব দরজা বন্ধ, চাবি দেওয়া। স্থানটা এতই নির্জ্জন যে আমার ভয় হইল, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, এই সময়ে কে যেন দূরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। সে নিশ্বাস মানুষের নিশ্বাস বলিয়া বোধ হইল না। আমি ভয়ে আর সেখানে থাকিতে পারিলাম না। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম; না দেখিয়া একেবারে রাখাল বাবুর উপরে আসিয়া পড়িলাম। তিনি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলাম, "আমি বড় ভয় পাইয়াছি।"

তিনি ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, "কি ভয়—ভয় কি? কিসের জন্য ভয় পাইলেন?"

তাহার স্বরে আমি তখনই সাবধান হইয়া আত্মসংযম করিয়া লইলাম, বলিলাম, "দরজাটা খোলা ছিল বলিয়া এদিকে কি আছে দেখিতে ইচ্ছা হইল, তাহাই গিয়াছিলাম, ভিতরে ভারি অন্ধকার, কিসে যেন আমার ভয় হইল। আমি ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছি।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দরজা খোলা রহিয়াছে দেখিয়াই বুঝিয়াছি যে তুমি। যাক্ ভয়ের কোন কারণ নাই। তবে যখন তুমি জান, আমি সর্ব্বদা এই দরজায় চাবী দিয়া রাখি তখন তোমার বুঝিয়া লওয়া উচিত ছিল যে, আমার উদ্দেশ্যই হইতেছে—অন্য কেহ এই দিকে না যায়।"

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "কিছু মনে করিবেন না, দোষ করিয়া থাকিতো ক্ষমা করিবেন।"

রাখাল বাবু বলিলেন, "না—না—তাহা নহে, ঐ ঘরে অনেক বিষাক্ত আরক রহিয়াছে, সেজন্য অপর কাহাকেও ওখানে যাইতে দিতে ইচ্ছা করি না।"

"আর আমি যাইব না," বলিয়া আমি আপনার ঘরে পলাইলাম। সেই পর্য্যন্ত আমার ভয় হইয়াছে—আমি এ বাড়ীর ভাব কিছুই বুঝিতে পারি নাই। লোকটার ভাবও বুঝি না,—এই জন্য এত ভয় হইয়াছে; যতই মাহিনা পাইনা কেন, ইহাদের বাড়ীতে আর এক মিনিটও আমার থাকিতে ইচ্ছা নাই। এখন আপনাকে সকল কথা বলিলাম, এখন আমি কি করিব, আমাকে

পরামর্শ দিন। এ বাড়ীর ব্যাপারটা যে কি, তাহা যদি আপনি বলিতে পারেন ত, বলুন।

আমরা নীরবে এই সকল কথা শুনিতেছিলাম। এইবার গোবিন্দরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চিন্তিতভাবে গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে রাখাল বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আজ কোন কুটুম্বের বাড়ীতে গিয়াছেন।"

"হাঁ, সন্ধ্যার পর ফিরিবেন।"

"নন্দু চাকর এখনও মাতাল হ'য়ে পড়ে আছে?"

"হাঁ, সে তাহার ঘরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে।"

"তাহা হইলে থাকিল কেবল নন্দুর স্ত্রী।"

"হাঁ।"

"তাহাকে কোন রকমে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না?"

"চেষ্টা করিব, বোধ হয় পারিব।"

"তুমি যেরূপ শক্ত, তাহাতে তোমার দ্বারা ইহা অসম্ভব হইবে না; তাহার পর থাকিল এক ভুলো কুকুর। আমাদের সঙ্গে পিস্তল থাকিবে, সুতরাং প্রয়োজন হইলে,আমরা দুইজনে একটা কুকুরকে—সে যতই গরম হউক না কেন, ঠাণ্ডা করিতে পারিব। আমরা দুইজনে ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাখাল বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইব, তাহার পর এ রহস্য সহজেই ভেদ হইবে।"

"কি বুঝিতেছেন?"

"এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছি, ইহারা তোমাকে এত বেশী মাহিনা দিয়া বাড়ীতে আনিয়াছে মেয়ে পড়াইবার জন্য নহে।"

"তবে কিসের জন্য?"

"অন্য কাহারও স্থলে তোমাকে পরিচিত করিবার জন্য।"

"সে কি?"

"রাখাল বাবু যে বলেন, তাঁহার বড় মেয়ে শ্বশুর বাড়ীতে আছে, তাহা ঠিক নহে। খুব সম্ভব এই মেয়ের মার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, আইন সঙ্গত এই কন্যাই তাহা পায়। এই গুণবান রাখাল বাবু সেই কন্যার সম্পত্তি হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। সম্ভবতঃ সেই কন্যার চুল ছোট ছিল, সেজন্য তোমার চুল ছোট করা, বোধ হয় তোমার চেহারাও কতকটা তাহার মত। যে লোকটাকে দূরে থাকিয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতে দেখিয়াছ

সে তাহার স্বামী। সম্পত্তি হাতে রাখিবার জন্য কোন অসহায় গরিব লোকের সহিত সেই মেয়ের বিবাহ দিয়াছিল। এখন তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া মেয়েকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। বেচারা গরিব লোক—স্ত্রীকে ক্ষমতাবান শ্বশুরের হাত হইতে লইতে পারিতেছে না। এই পর্য্যন্ত স্থির, এইজন্যই কুকুরটিকে রাত্রিতে ছাড়া হয়—এখন রাখাল বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেই সকল কথা প্রকাশ পাইবে। তুমি আগে যাও—নন্তুর স্ত্রীর বন্দোবস্ত কর, আমরা পরে যাইতেছি!"

(৪)

সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বেই আমরা রাখাল বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দ্বারেই রাধারাণী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, "কাজ হইয়াছে?"

ভিতরে একটা দরজায় ঘা মারিবার শব্দ হইতেছিল। রাধারাণী সেই দিক্‌টা দেখাইয়া বলিল, "তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছি; ঐ দরজা সে ঠেলিতেছে। নন্তু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার কোমরে সেই ঘরের চাবি ছিল—এই লউন।"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি একাই এক শো! চল এখন—কোন্ দিকে ঘর?"

আমরা তাঁহার সঙ্গে সেই ঘরের প্রথম চাবী খুলিয়া একটা বারান্দায় আসিলাম। কোন সাড়া-শব্দ নাই। চারিদিক্ একান্ত নীরব। আমরা এক-একটি করিয়া তিনটি ঘরের চাবি খুলিয়া প্রবেশ করিলাম—কোন ঘরে কেহ নাই।

শেষ ঘরের চাবি খুলিয়া দেখিলাম, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। গোবিন্দরাম প্রথমে ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন, কেহ উত্তর দিল না, তাহার পর জোরে আঘাত করিতে লাগিলেন, তথাপি কেহ কোন উত্তর দিল না। তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ডাক্তার আশা করি আমাদের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হয় নাই। দরজা ভাঙ্গিতে হইবে। পুরাতন দরজা দুই জনের জোর সহিবে না,—এস, লাগাও পিঠ।"

দরজাটা বহুকালের পুরাতন, সুতরাং আমরা দুইজনে দরজায় পিঠ লাগাইয়া সজোরে ঠেলিলে দরজা সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

গোবিন্দরাম রাধারাণীকে বলিলেন, "তুমি এইখানেই থাক।"

এই বলিয়া তিনি লাফাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিলাম। গৃহমধ্যে কোন আসবাব নাই, কেবল গৃহের একপার্শ্বে একটা বিছানা রহিয়াছে। ঘরের এক কোণে একটা জলের কলসী ও গেলাস আছে। ছাদের একদিক্ কে খুঁড়িয়া ফেলিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া একব্যক্তি অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারে। যে গৃহ মধ্যে ছিল, সে এই ছিদ্র পথে পলাইয়াছে! গৃহমধ্যে কেহ নাই।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "এই গৃহমধ্যে যে একটি স্ত্রীলোক বদ্ধ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খুব সম্ভব কেহ রাধারাণীর মতলব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে এই ছিদ্রপথে এখান হইতে সরাইয়া ফেলিয়াছে।"

আমি বলিলাম "কিরূপে?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "দেখিতেছ না,—ছাদের ছিদ্র? আর এই যে ছাদে একখানা মইয়ের কোণ্ দেখা যাইতেছে! মই ছিদ্র দিয়া ঘরের ভিতর দিয়াছিল, মেয়েটি সেই মই বাহিয়া ছাদে যায়, তাহার পর নিশ্চয়ই একখানা বড় মই লাগান ছিল, সেইখানির সাহায্যে সকলে পলাইয়াছে।"

এই সময়ে রাধারাণী তথায় আসিয়া বলিলেন, "আমি সন্ধ্যার আগেও বাড়ীর এদিক্টা দেখিয়াছিলাম, তখন এখানে মই ছিল না। আমার বোধ হয়, রাখালবাবু কখনও তাহাকে লইয়া যাইতে পারেন না।"

"নিশ্চয় তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি লোক সহজ নহেন, ভয়ানক লোক!"

এই বলিয়া তিনি কাণ পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হইতেছে, আমি তাহারই পায়ের শব্দ সিঁড়ীতে পাইতেছি—সে-ই এইদিকে আসিতেছে। ডাক্তার, তোমার পিস্তল ঠিক কর।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে একটি লোক সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া রাধারাণী ভয়ে গোবিন্দরামের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম, রাগে সেই লোকটার মুখের চেহারা এমনই ভয়ানক হইয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে ভয় হয়। তাহার মুখ দেখিলেই বোধ হয়, তাহার ন্যায় ভয়ানক লোক জগতে আর দ্বিতীয় নাই। সে কোন কথা কহিবার পূর্ব্বে গোবিন্দরাম লম্ফ দিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "পিশাচ। তোর মেয়ে কোথায়?"

লোকটি বিস্মিতভাবে ছাদের চারিদিকে চাহিল, তাহার পর ছাদের ছিদ্রের

দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। তখন সে গর্জ্জিয়া বলিল, "সে কথা আমি বলিব না, তোরা বল্‌বি, চোর বদমাইশ! কেমন তোদের ধরিয়াছি ঠিক, এখন—এখন তোরা আমার হাতে, দেখ তোদের কি শাস্তি করি।" বলিয়া সে উন্মত্তের ন্যায় ফিরিয়া বাহিরের দিকে ছুটিল।

রাধারাণী বলিয়া উঠিলেন, "কুকুর ছাড়িতে গিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আমার পিস্তল আছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তবুও শীঘ্র সদর দরজা বন্ধ করা যাক্।"

আমরা সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরের দরজার দিকে ছুটিলাম। আমরা দরজার কাছে গিয়াছি, এই সময়ে কুকুরের ডাক শুনিলাম, তৎপরে কে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, সেরূপ আর্ত্তনাদ আমি জীবনে আর কখনও শুনি নাই।

এই সময়ে একব্যক্তি টলিতে টলিতে একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বলিল, "কে সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ভুলোকে ছাড়িয়া দিয়াছে—দুইদিন সে কিছু খায় নাই, খেয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করিবে—এস—এস—শীঘ্র এস।"

এই বলিয়া সে বাহিরে ছুটিল। রাধারাণী বলিল, "এই সেই নন্থু বেহারা।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "তুমি এখন বাহিরে এসো না।"

এই বলিয়া তিনি রাধারাণীকে একটা ঘরের ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন আমরা দুইজনে ঊর্দ্ধশ্বাসে যেদিকে ভয়াবহ আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল, সেই দিকে ছুটিলাম।

আমরা গিয়া দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড কুকুর রাখালবাবুর গলায় তাহার ধারাল দাঁত বসাইয়া দিয়াছে, রাখালবাবু পড়িয়া অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছে! আমি তৎক্ষণাৎ গিয়া কুকুরটার মাথায় গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলাম।

তখন আমরা ধরাধরি করিয়া রাখাল বাবুকে ঘরে আনিয়া রাখিলাম। তখনও সে জীবিত ছিল। আমরা নন্থু বেহারাকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া সত্বর রাখালচন্দ্রের গলা বাঁধিয়া দিতে লাগিলাম।

এই সময়ে নন্থুর স্ত্রী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, "আপনি বৃথা আমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সব জানিলে এ কাজ করিতেন না।"

গোবিন্দরাম তাহার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি নন্থুর স্ত্রী না? দেখিতেছি, অনেক কথা তুমি জান। আমরা এখনও যাহা জানিতে পারি নাই, তাহাও তুমি জান।"

সে বলিল, "হাঁ, আমি তা' জানি।"

"তাহা হইলে বল, আমরা এখনও সকল কথা জানিতে পারি নাই।"

"আমি এখনই সব বলিতেছি। যদি আপনারা পুলিসের লোক হন, তাহা হইলে আপনারা আমাকে উপকারী বলিয়া জানিবেন। আমি রাখাল-বাবুর মেয়েকেও বড় ভালবাসি।"

"বল—সব শুনি।"

"রাখাল বাবুই নিজের মেয়েকে ঘরে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন, জামাই বাবুর সঙ্গে তাহার একেবারে দেখা সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। মেয়ে আর স্বামীকে চাহে না, ইহাই দেখাইবার জন্ম রাধারাণীকে লইয়া আসেন। দূর হইতে দেখিলে ইহাকে ঠিক সেই মেয়ের মত দেখিতে। তাহার পর ইহাকে দিয়া কি কি করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় ইনি আপনাদিগকে বলিয়াছেন। তখন জামাইবাবু আমার সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলাম। আমার সাহায্যেই তিনি ছাদে গর্ত্ত করেন, মই দিয়া নিজের স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছেন। রাখাল বাবুর এই বড় মেয়ের মার অনেক টাকা সে পাইবে। এখন মেয়ে বাপের নামে সেজন্য নালিস করিবে। এইবার বাপ মজা দেখিতে পাইবে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আর বোধ হয়, রাখাল বাবুর সে মজা দেখিবার অবসর হইবে না; কারণ তিনি ইহার চেয়েও বেশী মজা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া ফেলিয়াছেন; এখন তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা খুব কম। যাক্, এখন তোমাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"করুন।"

"কত দিন রাখাল বাবু বড় মেয়েকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন?"

"প্রায় এক বৎসর।"

"খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে?

"নিজেই দিতেন—কখনও কখনও আমরা দিতাম। যত দূর কষ্ট দিতে হয় দিয়াছেন, বাপ হয়ে এমন কষ্ট কেউ মেয়েকে কখনও দেয় না। সৎমা হইলে এইরূপই হয়।"

"যাহা হউক, এখন সেই মেয়ে তাহার স্বামীর কাছে গিয়াছে, ইহা ঠিক?"

"আজ বাড়ীতে কেহ থাকিবে না বলিয়া আমি জামাই বাবুকে খবর দিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরেই তিনি আসিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

"যাক্, তাহা হইলে আর আমাদের এখানে থাকিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা কিছুক্ষণের জন্য তোমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সে জন্য কিছু মনে করিও না। আমরা চলিলাম। আমাদের কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে।"

এই বলিয়া গোবিন্দরাম রাধারাণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমারও আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

আমরা তিন জনেই সেই রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

তাহার পর কি হইয়াছিল, তাহার সন্ধান লইয়া জানিলাম যে, রাখালচন্দ্র বাঁচে নাই। তাহার কন্যা ও জামাতা তাহার মৃত্যুর পর তাহাদের বাড়ী দখল করিয়াছিল, বিমাতা ও তাহার কন্যাকে অন্য বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিল। রাখালচন্দ্র তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে অনেক টাকা দিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের ভরণপোষণের কোন কষ্ট ছিল না।

সম্পূর্ণ।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

হংকঙ।

হংকঙ একটী পর্ব্বতময় দ্বীপ। সুবিশাল চীনরাজ্যের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। ইংরাজেরা চীনরাজের আদেশ লইয়া এখানে একটী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। চীনেরা পূর্ব্বে মনে করে নাই যে সামান্য একটা জল মধ্যস্থ পর্ব্বতে এরূপ সুন্দর নগরী নির্ম্মাণ হইতে পারে। অপর দিকে চীন রাজ্যের প্রান্ত অতি সন্নিকট। সেখানেও ইংরাজেরা খানিকটা স্থান লইয়া আর একটী ছোট উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থানটার নাম "কুলুন"। দুই খানি ছোট ষ্টীমার যাত্রী লইয়া সর্ব্বদা হংকঙ হইতে কুলুনে যাতায়াত করে।

ষ্ট্রাণ্ড।—প্রায় সমস্ত দ্বীপটীর (হংকঙ) সম্মুখ ভাগে একটী বেশ সুপ্রশস্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্র উপকূলে স্থানে স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান, কোথাও বা দু'একটা জেটী। এই সকল স্থানে নৌকা আসিয়া সংলগ্ন হইয়া থাকে। সোপান বা জেটী দিয়া একেবারে এই প্রশস্ত পথে উঠিতে হয়। ইহাই হংকঙের

"ষ্ট্রাণ্ড"। পথটী বৃহৎ ও অতিশয় মসৃণ। এই পথের উপর সারি সারি নানা প্রকারের দোকান। দোকানগুলির সম্মুখভাগ প্রায় এক প্রকার। মধ্যে মধ্যে এক একটী সরল পথ নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে অনেকগুলি সুবৃহৎ সুরম্য সৌধের উচ্চশির দেখা যায়। পূর্ব্বে যেমন সাগর হইতে মনে হইয়াছিল সমস্ত নগরীটী পর্ব্বত-গাত্রে অবস্থিত, এখন দেখিলাম তাহা ঠিক নহে। সম্মুখ ভাগের অনেকগুলি পথ সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। পশ্চাদের পথগুলি ক্রমে ক্রমে অদ্রি গাত্রে উঠিয়াছে। অনেকগুলি পথ সমতল ভূমি হইতে একবারে পর্ব্বত-উপরি চলিয়া গিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বেই বেশ সুরম্য সৌধ শ্রেণী। সকল সুবৃহৎ সৌধগুলিই ইংরাজ নির্ম্মিত; মেসের মতন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে অধিকাংশ ইংরাজ প্রায়ই এই সকল অট্টালিকায় বাস করেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সৌধ বড়ই মনোরম। সকলগুলিই ষ্ট্রাণ্ডের সম্মুখবর্ত্তী এবং সমুদ্র-পবন সঞ্চারে সুশীতল। সৌধগুলির নাম,

১। কিংস্ বিল্ডিংস্ (King's Buildings).

২। এডওয়ার্ডস্ বিল্ডিংস্ (Edward's Buildings).

৩। প্রিন্সেস্ বিল্ডিংস্ (Prince's Buildings).

৪। ভিক্‌টোরিয়া বিল্ডিংস্ (Victoria Buildings).

৫। হংকঙ হোটেল (Hongkong Hotel).

যে সকল সৌধের নাম করিলাম তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখিলে আঁখি ঝলসিত হয়। এক একটী সৌধ বোধ হয় ছয় সাত তল বিশিষ্ট। সকল গুলির নিম্নে বেশ সুবৃহৎ কাচ সমন্বিত (Plated glass) বিপণি। কাচের মধ্য দিয়া বিপণির নয়নরঞ্জন সাজসজ্জা বেশ স্পষ্ট দৃশ্যমান। অনেক গুলিতে কাপড়ের দোকান। সুবৃহৎ পুতুলগুলি ঠিক জীবন্ত মনুষ্যের ন্যায় নানা প্রকার পরিপাটী বেশ ভূষায় সুশোভিত। অবশ্য ইহা কিছু নূতন না হইলেও এরূপ বিশদ ভাবে অন্যত্র সদা সর্ব্বদা নয়নগোচর হয় না।

হংকঙে গিয়া যদি মনে কর কিছুই দেখিব না, তথাপি এ সৌধগুলিতে তোমার নয়ন আকৃষ্ট হইবেই।

হংকঙ হোটেল।—প্রাচ্যে (East) ইংরাজদের সুবৃহৎ হোটেল গুলির মধ্যে হংকঙ হোটেল অন্যতম। সাগরে বহুদূর হইতে এই হোটেলটী দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা ঠিক বন্দরের সম্মুখেই অবস্থিত। জাহাজ বন্দরে প্রবেশ

করিলেই যেন মনে হয় ইহা দেশ-ভ্রমণকারীদের বিশ্রাম করিবার জন্ত উচ্চ-শির তুলিয়া আহ্বান করিতেছে। অতীব বৃহৎ সৌধ, উপরে ইউনিয়ন জ্যাক্ পতাকা উড্ডীয়মান। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীদের ইহাই প্রধান আবাস স্থান। এখানে নেটিভের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ইহা হংকঙের একটা প্রধান দেখিবার স্থান।

এই সকল সৌধ ব্যতীত হংকঙের সকল সৌধই বেশ বিচিত্র ও মনোহর। অবশ্য এখানেও সকল স্থানে সৌধগুলির সম্মুখভাগ এক প্রকার, কিন্তু গিরিগাত্রে অবস্থিত বলিয়া তাহাদের শোভা নয়নে বড়ই একটা নুতন ভাব লইয়া আইসে। যেন মনে হয় এরূপটী কোথাও দেখি নাই, যেন এমনটী কখনও দেখিব না। যেন মনে হয় কোন সুচতুর শিল্পী লোক চক্ষুর অগোচরে বসিয়া একটী ছাঁচ (mould) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যেন সেই ছাঁচে এক একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া একটীর উপর একটী সাজাইয়া গিয়াছেন। এ শোভা যে দেখিয়াছে তাহার নয়ন সার্থক হইয়াছে। যে দেখে নাই তাহার পক্ষে ইহা স্বপ্ন-রাজ্য। চিত্রেও এ সৌন্দর্য্য বিরল।

হংকঙের পথগুলি বেশ মসৃণ কিন্তু গিরিগাত্রে অবস্থিত বলিয়া সর্ব্বত্র সমতল নহে। রাস্তা বেশ শুষ্ক, কোথাও কর্দ্দমযুক্ত নহে। এখানে অশ্ব বা গোযানের ব্যবহার দেখিলাম না। সর্ব্বত্রই "চা" বা "রিক্সা"। এখানকার রিক্সার একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রায় তাহাতে একজন বসিবার স্থান থাকে। দুইজন লোক পাশাপাশি বসিতে পারে এরূপ যান কচিৎ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা যুগলে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে দুইখানি রিক্সা ভাড়া লইতে হয়।

সম্মুখস্থ সমতল পথ গুলিতে "ইলেকট্রিক ট্রাম" আছে। বন্দরের এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত লাইন চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে ভ্রমণ করা উচিত। লাইনের এক প্রান্তে চীনাদের সহর। ইংরাজদের সুগঠিত সুপরিষ্কৃত সহরের পর চীনাদের দুর্গন্ধময় অপরিষ্কার সহর দেখিলে একটা শিক্ষার সহিত অশিক্ষার পার্থক্য বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই স্থানটার নাম "কজওয়ে বে" (Causeway Bay) ইহাই হংকঙ সহরের একটা প্রান্ত। এখানে ইংরাজ-দের পোলো খেলিবার একটী সুপরিষ্কৃত ময়দান আছে। ময়দানটীর একদিকে পাহাড় এবং অন্যদিকে সমুদ্র; বেশ ব্যায়ামের সঙ্গে বায়ু উপভোগ করা যায়।

চীনাদের সহর।—ইহার অপর নাম কেনেডি টাউন (Kennedy town)। এখানে রাস্তাগুলি বড়ই অপরিষ্কৃত ও অপ্রশস্ত। বাটীগুলি সর্ব্বত্র ত্রিতল কিন্তু বড়ই নীচু। সম্মুখভাগ অনেকটা এক রকমের। এখানে

প্রায় অধিকাংশই দরিদ্র চীনাদের বাস। এক পার্শ্বে একটা ছোট বাজার আছে, সেখানে শুঁটকী মাছ, তরীতরকারী প্রভৃতি পাওয়া যায়। বাজারটী দেখিবার যোগ্য নহে। রাস্তায় কেমন একটা দুর্গন্ধ অনুভূত হয় যে, তাহা বিদেশীর পক্ষে বড়ই কষ্টকর।

জলবায়ুর অবস্থা।—হংকঙে গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মাধিক্য ও শীতকালে শীতাধিক্য হইয়া থাকে। আমরা গ্রীষ্মকালে সেখানে গিয়াছিলাম। তখন সূর্য্যের তেজ বেশ প্রখর কিন্তু উত্তপ্ত বাতাস প্রবাহিত হইত না। শুনিলাম শীতকালে এখানে বরফ পড়িয়া থাকে।

এখানে পানীয় জল পরিষ্কৃত হইয়া পর্ব্বতগাত্রে একটী জলাধারে রক্ষিত হয় এবং সেখান হইতে নল সংযোগে চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়। পর্ব্বতে কোন ঝরণা দেখি নাই।

অর্থ বিক্রেতা বা পোদ্দারের দোকান।—হংকঙের পথে পথে অনেকগুলি অর্থ-পরিবর্ত্তকের দোকান (Money Changer's Stall) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কাছে নানাদেশীয় রৌপ্য মুদ্রা, নোট (Currency note) প্রভৃতি সর্ব্বদা মজুত থাকে। পিনাঙ, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বন্দরেও যে এরূপ দোকান নাই এমন নহে, কিন্তু তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। হংকঙে যে রাস্তায় যাও সর্ব্বত্র এই দোকান দেখিতে পাইবে। কলিকাতার টাকা, সিঙ্গাপুরের ডলার, জাপানের ইয়েন, বিলাতের সিলিং প্রভৃতির পরিবর্ত্তে যে দেশীয় মুদ্রা চাহিবেন তাহা উচিত মূল্যে তৎক্ষণাৎ পাইবেন। চীনাদের হিসাব করিবার কৌশল বেশ কৌতুকপ্রদ। একটা কাঠের ফ্রেমে তারের উপর সারি সারি কতকগুলি কাঠের গোলক লাগান আছে। কেহ চীন মুদ্রা লইবার জন্য গুটিকতক টাকা দিলে লোকটা কাঠের ফ্রেমটী লইয়া অঙ্গুলি চালনায় গোলকগুলি খট্‌খট শব্দে অতিক্রান্ত এদিক ওদিক করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাহাকে টাকার হিসাবে চীনমুদ্রা প্রদান করে। ইহারা অনেক স্থানের মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া রাখে। ব্যাঙ্ক অপেক্ষা এখানে মুদ্রার মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক পাওয়া যায়।

যাঁহারা দৃশ্য দেখিবার জন্য দেশ ভ্রমণে বাহির হয়েন, তাঁহাদের হংকঙের সকল রাস্তাগুলিতেই ভ্রমণ করা উচিত। এখানকার রথ্যাসমূহে আমাদের মহা-মান্যা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার খুব সম্মান দেখিলাম। তাঁহার নামে ছয়টী প্রধান রাস্তা আছে যথা (১) কুইন্সরোড সেণ্ট্রাল (২) কুইন্সরোড নর্থ (৩)

কুইন্সরোড সাউথ (৪) ভিক্টোরিয়া রোড সেণ্ট্রাল (৫) ভিক্টোরিয়া রোড ইষ্ট (৬) ভিক্টোরিয়া রোড ওয়েষ্ট। সকল রাস্তাগুলিই প্রশস্ত এবং দুইদিকে বেশ এক রকমের বাটী, বাটীগুলির বিশেষত্ব এই যে, কোনটাই ত্রিতলের কম নহে। সকল বাটীই গায়ে গায়ে সংলগ্ন। যেন মনে হয় একটা লম্বা ব্যারাক চলিয়া গিয়াছে। সকল বাটীরই সম্মুখে অলিন্দ; তাহাতে পদব্রজে যাতায়াতের বেশ সুবিধা।

হংকঙের পুলিস।—রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিস প্রহরী। এখানে পুলিসের লোক আমাদের দেশীয় সৈনিক বিভাগের শিখ্। বেশ সুসজ্জিত, হস্তে বন্দুক এবং গলায় একটা হুইসল্ (whistle)। যদি কোন চোর বা বদমাইস্ দৌড়িয়া পালায়, তখন প্রহরী এই হুইসল্ বাজাইলে রাস্তার অন্যান্য লোকেরা তাহাকে ধরিবার সহায়তা করে। চীনেরা বড়ই চতুর ও দ্রুতগামী, সেইজন্য পুলিসের এতদূর সাবধানতা। আমি একবার একটা চীনাকে একটা দোকান হইতে কিছু জিনিস লইয়া পলাইতে দেখিয়াছিলাম। শিখ প্রহরী তাহার সহিত ছুটিয়া পারিল না, কিন্তু যেমন সে হুইসল্ বাজাইল অমনি সম্মুখ হইতে লোকেরা বহির্গত হইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। শিখেরা বেশ ভদ্র, ইংরাজীও বোঝে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে রাস্তা দেখাইয়া দেয়। চীনেদের মধ্যে আমাদের দেশী লোকের আধিপত্য দেখিয়া মনে একটা আনন্দ অনুভূত হইয়াছিল।

"কাফে"—(Cafe) রাস্তায় রাস্তায় আর একটা নূতন ব্যবসা দেখিতে পাওয়া যায়। এ ব্যবসা পিনাঙ, সিঙ্গাপুরে দু'একটা দেখিয়াছিলাম। এখানে ঐরূপ অনেক দেখিলাম। এগুলি অবশ্য পাশ্চাত্যের অনুকরণ। আমি আমার এক সাহেব বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলাম। অত্যধিক ভ্রমণে আমরা বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম। আমার বন্ধুটী তখন আমাকে লইয়া এইরূপ একটা "রেষ্টরাণ্ট বা "কাফ"তে প্রবেশ করিলেন। চারিটী বেশ সুন্দরী য়ুরোপীয়া মহিলা হাঁটু অবধি স্কার্ট্ বা ঘাঘ্রা পরিধান করিয়া নর্ত্তকীর বেশে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অভিনব সাজসজ্জায় তাহাদিগকে প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় দেখাইতেছিল। একদিকে পান করিবার ষ্টল। সেখানে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ নানা প্রকারের মদ্য ও পানীয় বিক্রয় করিতেছেন। একপার্শ্বে একটি যুবতী নর্ত্তকী পিয়ানো সংযোগে সঙ্গীত সুধাধারা বর্ষণ করিতেছিল। চারিদিকের উজ্জ্বল আলোকে যুবতীদের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমরা

প্রবেশ করিবামাত্র অপর তিনজন যুবতী আমাদের লইয়া একটা টেবিলের চারিপাশে বসাইল এবং সহাস্তবদনে রসালাপ আরম্ভ করিল। ওদিকে অপর যুবতী মধুর সঙ্গীতে আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। সাহেব তাহাদের সঙ্গে বেশ কথার চাতুরী করিতেছিলেন। আমি চুপ করিয়া শুনিতেছিলাম। কিন্তু তাহারা ছাড়িবার পাত্রী নহে। একজন আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল ও অতি মিহিস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "Won't you have some drink ?" ("তুমি কিছু পান করিবে না" ?) একেত তৃষ্ণায় আমার মুখ শুষ্ক হইয়াছিল তাহাতে আবার তাহাদের আগমনে তালু অবধি বিশুষ্ক হইয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম "হাঁ"। আর একজন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি পান করিবেন, হুইস্কি না ব্রাণ্ডি ?" সাহেব হাসিয়া বলিল "বিয়ার" তখন একটা খুব হাসির ধূম পড়িয়া গেল। কাজেই সাহেব হুইস্কি ও সোডা আনিতে আদেশ করিলেন। এমন সময় আর একজন যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কি পান করিতে দিবেন ?" সাহেবের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আর একজন বলিল "আমি হুইস্কি পান করিব," আর একজন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল 'আমি ব্রাণ্ডি পান করিব'। আমার পার্শ্বস্থ যুবতী একটু ঢলিয়া পড়িয়া একটু আড় হাসি হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি পান করিবেন ?" আমি যেমন বলিয়াছি "বরফযুক্ত লিমনেড" অমনি সকলে হাঁ করিয়া একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া রহিল। সে ভাব অপনীত হইলে তাহারা আমাকে মদ্যপান করিবার জন্ত বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল ও আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না বলিয়া তাহারা আমাকে নানারূপ ঠাট্টা করিতে লাগিল। অবশেষে আমার পার্শ্বস্থ যুবতী আমাকে আর কিছু না বলিয়া আমার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া গিয়া সাহেবের পার্শ্বে গিয়া বসিল। আমার সহিত আর কেহ কথা কহিল না। সাহেবের সহিত সুরাপান চলিতে লাগিল। অবশ্য সমস্তই তাঁহার খরচ। সাহেবকে লইয়া সকলেই রসালাপে ব্যস্ত। তাহারা আনন্দ করিয়া নিজেদের ঘরের জিনিষ খাইতে লাগিল, সাহেবের নামে বিল হইতে লাগিল। আমিত লিমনেড খাইয়াই সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম। সাহেব বেচারার পকেটে সেদিন যাহা কিছু ছিল সব খরচ করিয়া ফিরিয়া আসিল। ইহাই "কাফে"র আনন্দ। এইরূপ আনন্দ উপভোগ করিয়া য়ুরোপে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে শুনিয়াছি। [ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম।

মানব-বন্দনা। *

সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর,
নেত্র মেলি' ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে ?
কাতর-আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি,'
লুটি' গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে ?
সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত-গর্জ্জনে,
কার অন্বেষণ ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্বজন !

২

আরক্ত প্রভাত-সূর্য্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দ্দমে পিচ্ছিল—
সলিলে শিশিরে।
শাখায় ঝাপটি' পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল ;
সম্মুখে শ্বাপদ-সঙ্ঘ বদন ব্যাদানি'
আছাড়ে লাঙ্গুল।
দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে ;—
কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব,না মানব—
প্রস্তরে লগুড়ে ?

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন্,
ক্ষুধায় অস্থির ;
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ক ফল,
পত্রপুটে নীর ?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু ? কে বুলা'ল কর
সর্ব্বাঙ্গে আদরে ?
কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে ?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
অতিথি-সৎকার ;
নিশীথে বিচিত্র স্বরে বিচিত্র ভাষার
স্বপন-সম্ভার !

৪

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি'
শিকার-সন্ধান ?
কে শিখাল ধনুর্ব্বেদ, বহিত্র-চালনা,
চর্ম্ম-পরিধান ?
অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি,'
করিনু ভক্ষণ ?
কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি,
কুর্দ্দন নর্ত্তন ?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে,
দেব-দেবী-নাম ?

* 'চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনী'তে 'সাহিত্য' ও 'বসুমতী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

৫

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'
দধি দুগ্ধ ক্ষীর?
সায়াহ্নে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ সাথে
নিবিদ উচ্চারি?
কার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী?
কে দিল ঔষধি রোগে, ক্ষতে প্রলেপন,
স্নেহে অনুরাগে?
কার ছন্দে—সোম-গন্ধে—ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
নিল যজ্ঞ-ভাগে?

৬

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
প্রাসাদ-নির্ম্মাণ?
কার ঋক্ সাম যজুঃ, চরক সুশ্রুত,
সংহিতা, পুরাণ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ?
কে আজ পৃথিবী-রাজ? জলে-স্থলে-ব্যোমে
কার রাজ্যপাট?
পঞ্চভূত বশীভূত, প্রকৃতি উন্নীত,
কার জ্ঞানে বলে?
ভূঞ্জিতে কাহার রাজ্য—জন্মিলেন হরি
মথুরা কোশলে?

৭

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
যুড়ি' দুই কর,
নমি, হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি? বিদ্যুত-মোহন,
বজ্রমুষ্টিধর!
চরণে ঝটিকাগতি—ছুটিছ উধাও
দলি' নীহারিকা!
উদ্দীপ্ত তেজসনেত্র—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য্য-শিখা!
গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে!
দোলে মহাকাল-কোলে অণু পরমাণু—
বুঝিছ স্পর্শনে!

৮

নমি, হে সার্থক-কাম! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব!
নর দেহে নহ নর, অমর-অধিক
ঐশ্বর্য্য বৈভব!
ল'য়ে লাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে,—
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উঙ্কালে পর্ব্বতে!
গঠিলে আপন মূর্ত্তি—দেবতা-লাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায়!
গড়িছ—ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে বিজ্ঞানে,
আপন স্রষ্টায়!

৯

নমি, হে বিশ্বগ-ভাব! আজন্ম চঞ্চল,
বিচিত্র, বিপুল!
হেলিছ—দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি,'
ভাঙ্গি' সীমা—কূল!
কি ঘর্ষণ—কি ধর্ষণ, ক্রন্দন—গর্জ্জন,
দ্বন্দ্ব—মহামার!
কে ডুবিল—কে উঠিল, নাহি দয়ামায়া,
নাহিক নিস্তার!

নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়
কোথায়—কোথায়!
চিরদিন এক লক্ষ্য,—জীবন-বিকাশ
পরিপূর্ণতায়!

১০

নমি তোমা, নরদেব! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি!
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শস্যভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ-কলস
ঝলসে কিরণে;
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্গীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগত,
চলিছে সময়;
ভ্রুভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে—ক্রম ব্যতিক্রম,
উদয় বিলয়!

১১

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ!
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্ম-কার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার!
কত রাজা, কত রাজ্য গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয়!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

মিশরে ভারত-মহিমা।

(সংক্ষিপ্ত বিবৃতি)

প্রাচীন মিশর আর নাই। আছে শুধু তার অশ্রুর কাহিনী! ইতিহাসে তাহার সভ্যতা এবং ঐশ্বর্য্যের প্রাণরঞ্জক গর্ব্ব-গাথা পাঠ করিয়া আমরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হই; দিগান্তবিসারী মরুভূ-প্রান্তে তাহার ধ্বস্তকীর্ণ শিল্পাবশেষ দর্শন করিয়া, আমরা তাহার গৌরবদীপ্ত অতীতের বিহসিতাস্য মূর্ত্তি চিন্তা করি; এবং অযুত অবদানে তাহার ফেরেও রাজগণের কথা, টলেমীবংশের কথা, তাহাদের ভগ্নীবিবাহের কথা ও মায়াময়ী যৌবনগর্ব্বিতা রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার বিশ্বজিৎ কামকৌশলের কামগ কুহকলীলার কথা শ্রবণ করিয়া আমরা চমৎকৃত হই। প্রাচীন মিশরের পুত্তল-পূজা এবং সামাজিক আচার-পদ্ধতি সমস্তই

অপূর্ব্ব। কিন্তু সেই অপূর্ব্বতার অবকাশে, এ যুগের আমরা,—যখন তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করি, তখন একটা বিশ্ববিস্মৃত হাহাকার, চক্ষুঃর সম্মুখে যেন শরীরী হইয়া উঠে এবং বুঝিতে পারি, যে, প্রাচীন মিশর আর নাই!

কিন্তু প্রাচীন ভারত, অদ্যাপি বিদ্যমান। এই ভারতের সম্মুখেই, বিশাল বিশ্বপাথারে সলিল-বিম্বুকীবৎ মিশর ভাসিয়া উঠিয়াছিল এবং কালক্রমে বিস্মৃতির তমঃকীর্ণ কুহরে লয়লাভ করিয়াছিল। এই অতীতসাক্ষী ভারত, মিশরের জন্ম ও মৃত্যু, শৈশব ও বার্দ্ধক্য এবং কার্য্য ও কীর্ত্তি সমস্তই নিরীক্ষণ করিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, মিশরের জীবন-পথে, ভারত, আপনার পদাঙ্ক পর্য্যন্ত ক্ষোদিত করিয়াছিল। ভারতের সহক্রীড় বটে মিশর! কিন্তু তাহার প্রাণাকাশবিসারী চন্দ্রিকাবৎ,—এই ভারত! এবং এতৎঅনুসারী হইয়াই তদীয় সভ্যতা-সম্পুট এমন পূর্ণ-গর্ভ হইয়াছিল।

যিনি একথা অস্বীকার করিবেন, আমরা তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। আমাদের 'অর্চ্চনা'র মাননীয় সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কেশববাবু, তাঁহার বিগত বর্ষের অর্চ্চনায় প্রকাশিত "প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশর" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "প্রায়ই একইকালে ভারত ও মিশর যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহা দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই দুই প্রদেশের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ চেষ্টায় তাঁহাদিগকে বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছে।"

পণ্ডিতেরা যে "বিফলমনোরথ" হইয়াছেন, কেশববাবু কোন্ প্রমাণে এমন মত প্রকাশ করিলেন? তিনি কি সকল পণ্ডিতের মতামত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন? যদি দেখিতেন, তাহা হইলে এরূপ কথা বলিতেন না। কারণ, পণ্ডিতেরা "সম্পর্ক আবিষ্কারে" আদৌ "বিফলমনোরথ" হন নাই; পরন্তু, সফলমনোরথই হইয়াছেন।

অধুনা, ইহা প্রায় সর্ব্বস্বীকৃত, যে, স্বমহিমালোকদীপ্ত ভারতের উৎসঙ্গেই, মিশর, আত্মভরণ করিয়াছে। এবং এ বিষয়ে এত অনুকূল মত আছে যে, সমস্ত প্রকাশ করিতে গেলে, বৃহদাকার পুস্তক হইয়া যায়। পরন্তু, এই মতের ভিতরে কুয়াশা-কল্পনা বা গোলমাল কিছুই নাই। আমরা এখানে সামান্য আলোচনা করিলাম। সম্ভবতঃ, কেশববাবুর মতের অলীকতা বুঝাইবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে, বিস্তৃত আলোচনার দরকার হইলে, তাহাও করিব।

প্রাচীন ভারতে, নাবিক-বিদ্যার আশাতীত উন্নতি হইয়াছিল। এমন কি, "ঋগ্‌বেদেও অর্ণবযান এবং বাণিজ্য দ্রব্যাদির মূল্য প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডের কোন স্থানে একখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়। পণ্ডিতবর্গ তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ আগে ভারতীয়গণ বাণিজ্যসূত্রে ইংলণ্ডে গমন করিতেন। ইংলণ্ডের যাদুঘরে উক্ত তাম্রলিপি এখনও বর্ত্তমান আছে (১)।

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ সেখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন, আমেরিকানেরাই একথা স্বীকার করিয়াছেন (২)। কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য আধুনিক রুসিয়া সাম্রাজ্যের ভিতরে গমন করিয়াছিলেন। আবার, রোম ও গ্রীসের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্বন্ধ ত সর্ব্বজনবিদিত।

এই সকল প্রমাণ দেখিয়া প্রথমেই মনে সন্দেহ হয় যে, ভারতীয়গণ যখন এত দূরদেশের সহিত সংযোগ-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তখন মিশরে গিয়া তাঁহারা যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া, আকাশ হইতে সদ্যঃপতিতের মত ব্যবহার করিবার কোন দরকার নাই। কারণ, তাহা স্বাভাবিক। পরন্তু, প্রাচীন যুগে ভারতের নৌ-শিল্প যে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ছিল, তাহারও একাধিক প্রমাণ আছে।

অজন্তা গুহার ভিত্তি-চিত্রমালায় খৃঃ পূর্ব্ব দুইশত বৎসরের আগেকার সাগর-গামী অর্ণবপোতের অনেক প্রতিকৃতি দেখা যায় (৩)। জাভাতে হিন্দুর উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী এখন সর্ব্ববাদীসম্মত (৪)। জাভার বড়বুদ্ধের দেবায়তনেও ভারতীয় পোতের অসংখ্য চিত্র আছে (৫)। উৎকলের মন্দিরমালাতেও প্রাচীন ভারতীয় অর্ণবপোতপ্রদর্শক চিত্রের অভাব নাই। কিন্তু এ সকল হইল গৌণ প্রমাণ। ইহা দ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপনিবেশ স্থাপন এবং বাণিজ্যপ্রিয়তার কথা জানিতে পারি মাত্র। অতঃপর মুখ্য

(১) Asiatic Researches.

(২) Harper's Magazine. July. 1901. "The Buddhist discovery of America."

(৩) The paintings in the Buddhist Cave-Temples of Ajanta. Griffiths.

(৪) Raffles History of Java.

(৫) Havell's Indian Sculptures and Paintings.

প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইব, মিশরের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক কতটা ছিল।

ভারতীয়গণের অর্ণবপোত, পূর্ব্বে যে এডেনবন্দরে গমন করিত, পেরিপ্লুস পাঠে আমরা তাহা জানিতে পারি। উক্ত গ্রন্থ প্রথম খৃষ্টাব্দে লিখিত। এতদ্দ্বারা উহার প্রাচীনতা বোঝা যাইবে (১)।

কর্ণেল আলকট বলেন, বহুসহস্রবৎসরপূর্ব্বে, ভারতবর্ষীয়গণ মিশরদেশে গমনপূর্ব্বক সভ্যতা এবং শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক বেক্‌ম্যানের মতে, অতি প্রাচীনকালে যুরোপের প্রয়োজনীয় নীল ভারত হইতে প্রেরিত হইত। অন্যান্য ভারতীয় পণ্যসম্ভার সহ উক্ত নীল, জাহাজে করিয়া পারস্য উপসাগরে আসিত। তাহার পর, স্থলপথে উহা মিশরে চালান দেওয়া হইত। মিশর হইতে অবশেষে তাহা যুরোপে গিয়া পঁহুছিত (২)।

ভিন্‌সেন্‌ট সাহেব বলিয়াছেন, ইজিপ্ট হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যে বাণিজ্য ব্যাপার রোমীয়গণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইত, তাহা খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তিনি আরও বলেন "Pliny has likewise a reference to Strabo, when he speaks of twenty days sail from the Prasii to Ceylon in the paperships of Egypt and seven in the Greek vessels." প্লিনিও বলেন, ভারতবর্ষের অর্ণবপোত, ভারতের বন্দর হইতে আফ্রিকার নানা বন্দরে আসা যাওয়া করিত (৩)।

আরও জানা যায় যে, গুজরাটের বণিকগণ, মিসর প্রভৃতি দেশে মসলিন প্রেরণ করিতেন। এবং গুজরাট হইতে মিসরে, গ্রীকগণও মশলার আমদানী করিতেন (৪)।

আর একজন পণ্ডিত বলিতেছেন, Phœnicianগণ, ভারতবাসীর সহিত সমুদ্রপথে বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং ভারতীয় দ্রব্যাদি মিশরীয়গণের নিকটে লইয়া যাইতেন (৫)।

---

(১) Mc crindel's Peri. P. 85.

(২) Johnston's Translation of Beckmann's History of Inventions and Discoveries.

(৩) Pliny VI—XXVI.

(৪) The Commerce and Navigation of the Ancients in the Indian Ocean. By W. Vincent. D. D. Vol. II. P. 515.

(৫) Schlegel's Preface to the Egyptian Mythology.

তৃতীয় খৃষ্টাব্দে, মিশরের রাজা টলেমী ফিলাডেলফাস, ভারত ও মিশরের মধ্যে বাণিজ্যসম্পর্ক দৃঢ়তর করিবার জন্ত মিওস্ হরমুজ্ নামক বন্দরকে ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থানস্বরূপ মনোনয়ন করিয়াছিলেন (১)। পণ্ডিত ল্যাসেন বলেন, "মিশরবাসীরা ভারতজাত নীলে বস্ত্ররঞ্জন এবং ভারতের মস্‌লিনে মমির প্রচ্ছাদনী প্রস্তুত করিতেন (২)।"

হিরেনের (Heeren) মতে, ব্যাবিলন এবং টায়ারে যে সকল রঞ্জিত বর্ণবিচিত্র বস্ত্র এবং মূল্যবান আভরণাদি দূরদেশ হইতে আনীত হইত, তাহার কিয়দংশ যে ভারতীয়, তাহা ধ্রুবনিশ্চিত (৩)।

অপর এক পণ্ডিতের মতে "A commerce frequent and direct between the semited of Mesopotamia and the Indian Aryans could be carried on only by way of the sea." (৪)। এইত গেল, বাণিজ্যসম্বন্ধের কথা। এখন, অন্যান্ত দু'একদিক দেখিয়া আমরা প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, মিশর শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত মিশ্রশব্দ হইতে। আমরা এই অনুমানের উপরে কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাই না। ভাষা-তত্ত্বে অভিজ্ঞের অধিকার। আমাদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু Brugsch Bay বলেন, ইতিহাসাতীত যুগে একদল ভারতবাসী মিশরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। নীলনদের তটে এই নব উপনিবেশ স্থাপিত হয়। তাঁহারাই মিশরবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষ।

সুবিখ্যাত পণ্ডিত Jacobi বলেন, "It appears therefore, quite clearly that in the fourteenth century B. C. and earlier the rulers of Northern Mesopotamia worshipped Vedic Gods." (৫)।

ভারতের লিঙ্গপূজা যে রূপান্তরিত হইয়া মিশরে প্রচলিত হইয়াছিল,

---

(১) Arr. Ind. XII.

(২) Ind. Alt., ii. p. 596,

(৩) Historical Researches III, p. 363.

(৪) J. R, A. S.

(৫) "On the Antiqnity of Vedic Culture. By Hermann. G. Jacobi. (J. R. A. S. Great Britain and Ireland.)

সে সম্বন্ধেও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশরের প্রাচীন কাহিনীতে জানিতে পারি যে, টাইফনের অস্ত্রে খণ্ডীকৃতদেহ অসিরিসের বিধবা সহধর্ম্মিণী আইসিস্ কর্তৃক এই লিঙ্গপূজা সর্ব্বপ্রথমে মিশরে প্রচলিত হয়। তাহার পর মিশর হইতে গ্রীসেও এই পূজার প্রচলন হইয়াছিল। গ্রীককবি অরিষ্ট কেনিসের টীকাকারের কথায় জানা যায় যে, এই পূজার একটী বিশেষ উৎসবও প্রতি পাঁচ বৎসর পরে এক একবার অনুষ্ঠিত হইত। মিশরে এই লিঙ্গপূজার নাম ছিল, "ফ্যালিক ফেষ্টিভ্যাল।"

মনস্বী স্যার উইলিয়াম জোন্সের মতে, সংস্কৃত ঈশ ও ঈশানী বা ঈশ্বর ও ঐশী শব্দ হইতে মিশরের অসিরিস ও আইসিস শব্দদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উক্ত দেশদ্বয়ে, এই পূজার সমারোহ এমনি অশ্লীলতাকলুষিত ছিল, যে, এখানে তাহার বিবরণ দেওয়া একরূপ অসম্ভব (১)।

এইরূপে, সকল দিক দিয়াই মিশরের সহিত ভারতের একটী নিয়মিত সম্বন্ধ-সূত্র আবিষ্কার করা যায়। বিচ্ছেদ-রেখা নয়,—সম্বন্ধসূত্র! পণ্ডিত লুইস জাকলিয়ট স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, "Manou (মনু) inspired Egyptian, Hebrew, Greek and Roman legislation, and his spirit still permeates the whole economy of our European laws."

তিনি বলিতেছেন, "মিশরের শাসনপদ্ধতি ভারতবর্ষের হুবহু নকল ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ এখানে উপনিবেশস্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে, তাঁহাদেরই ধর্ম্ম এবং আচারাদি মিশরে বিকৃত-ভাবে অনুকৃত হইয়াছিল। * * * ভারতসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, ভারতবর্ষই মিশরের অনুকরণ করিয়াছে। আমি বলি, প্রমাণ দেখাও। দেখাও কোন শিলালিপি, দেখাও কোন স্তম্ভলিপি, দেখাও কোন সাহিত্যগত প্রমাণ,—ভারতের কোথায় এমন অভিজ্ঞান আছে, যাহাতে আমরা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারি যে, ভারত, মিশরের অনুকারী? এমন প্রমাণ ভারতবর্ষের কোথাও নাই! কিন্তু ভারতবর্ষ যে, মৈসরীয় সভ্যতার জনক এবং পরে সমগ্র পৃথিবী যে সেই সভ্যতায় অগ্নিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সকল দিকেই অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। আমার প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে

(১) যাঁহারা "ফ্যালিক ফেষ্টিভ্যালে"র কথা জানিতে চান, তাঁহারা মিঃ মরিশের Indian Antiquities পাঠ করুন।

ভারতবর্ষ, তাঁহার প্রাণস্পন্দনমধুর সমগ্র আদিমতা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি তৎপ্রদত্ত পৃথিবীব্যাপিনী শিক্ষার সার্ব্বত্রিকতার মধ্যে তাঁহার উন্নতির গতি অনুসরণ করিয়াছি। মিশর, পারস্য, গ্রীস ও রোমের ভিতরে আমি তাঁহাকে বিলাইতে দেখিয়াছি—তাঁহার বিধান, তাঁহার রীতি, তাঁহার নীতি, তাঁহার ধর্ম্ম এবং তাঁহার কর্ম্ম! পরন্তু, তাঁহারই বক্ষে আমি খৃষ্টধর্ম্মের আদি উৎস উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেখিয়াছি (১)!" এই উদারহৃদয়, অপকট ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি কেবল শূন্যগর্ভ বক্তৃতা-বন্দুক ছুঁড়েন নাই। তিনি ভাববিগলিত চিত্তে ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, অকাট্য প্রমাণপ্রয়োগে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাহার আলোচনা অসম্ভব।

বৌদ্ধ যুগেও ভারতের সহিত মিশরের সম্বন্ধসূচক প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে আমি যে প্রমাণ দেখাইব, তাহার বিরুদ্ধে কেহ একটীও আপত্তি করিতে পারিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। এমন কি, এই একটী প্রমাণই আমার বক্তব্য বুঝাইতে যথেষ্ট।

তথাকথিত প্রমাণ আর কিছু নয়—সম্রাট অশোকের অনুশাসন। তাঁহার ভুবনবিখ্যাত ত্রয়োদশ অনুশাসনের অনুবাদ এখানে পুস্তকান্তর হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"মহারাজ * * এক্ষণে ধর্ম্মের দ্বারা দেশ জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। * * যে মিশর দেশে টলেমি ফিলাডেলফস্ রাজত্ব করিতেছেন, যে মাসিডোনিয়া নগরীতে আণ্টীগোনোস গোনেটস্ রাজত্ব করিতেছেন, যে এপিরস নগরের অধীশ্বর আলেকজান্দার এবং যে সাইরেণী নগরীতে মগস শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছেন, সেই সকল দেশেই মহারাজ অশোক ধর্ম্মদূত প্রেরণ করিয়াছেন (২)।"

সহসা কোনরূপ মত প্রকাশ করিবার আগে, কেশব বাবুর মত পণ্ডিত ব্যক্তিও যখন এমন প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ অনুশাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক মনে করেন নাই, তখন অধিক বাক্য ব্যয় নিষ্ফল।

(১) The Bible in India. Translated from "LA BIBLE DANS L'INDE" By Louis Jacolliot.

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, এম, আর, এ, এস কর্ত্তৃক অনূদিত।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক ডায়োডোরাস কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ, আসিরীয় রাজ্যের রাজ্ঞী সেমিরমিসের ভারতাক্রমণ কাহিনীও আর একটী প্রমাণস্বরূপ ধরা যায়। মিশর, পারস্য ও আরবদেশ লইয়া আসিরীয় সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। যদিও, উক্ত আক্রমণকাহিনী যথেষ্ট প্রামাণিক নয়,—তথাপি, তথাকথিত অবদানের মধ্যে ভারতের রণ-প্রণালী এরূপ অবিকলভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা প্রাচীন ভারত ও মিশরের মধ্যে অনায়াসে একটী যোগ-রেখা আবিষ্কার করা যায়। কারণ, ডায়োডোরাস বর্ণিত উক্ত কাহিনী বহু প্রাচীন যুগের। তৎকালে, ভারতের সহিত মিশরের সম্বন্ধ না থাকিলে, কখনও এরূপ কাহিনীর প্রচার হইতে পারে না।

অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক।

হে ভারতভূমি! হে শ্রেয়সী ভূমি! হে বিশ্বসভ্যতার আদি ভূমি! তুমি শুধু আমাদের গরিয়সী জন্মভূমি নও—তুমি মা, এই অনন্ত সাগরবসনা আকাশমৌলি জীবধাত্রী ধরিত্রীর অনন্ত সন্তানের শিক্ষাভূমি! অয়ি স্মৃতিমাল্যবিভূষিতা দীপ্ত-মঙ্গলশ্রী পুণ্যভূমি! তোমাকে লইয়া জগৎ ধন্য, তোমার ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা বরেণ্য! জননি! আমার চিরগৌরব-পুষ্পিতা জননি! তোমার চরণোদ্দেশে প্রতীচ্য জগৎ হইতে তাই অনাহত স্তব গাথায় নিত্য ধ্বনিত হইতেছে "Sail of Ancient India, cradle of humanity, hail! Hail, venerable and efficient nurse whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion! Hail, fatherland of faith, of love, of poetry and of science! May we hail a revival of thy past in our Western future!" (Louis Jacolliot)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

প্রয়াণ।

কারামুক্ত নিত্যধন যায় নিজ গৃহে ফিরে!
তবে ভঙ্গুর শৃঙ্খল কেন রবি নেত্রনীরে?
বৃথা বহি শোকভার,
বৃথা করি হাহাকার,
বৃথা হানি দুই কর কেন আপনার শিরে?
সাধের এ গৃহখানি বেঁধেছি যে নদীতীরে।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

শোক-সঙ্গীত ।*

গিরিশচন্দ্রে ।

প্রভাত-কিরণে জেগে,　ঘুমের স্বপন মত ।
দেখি ভরা তারু-চোখে,　ঝরে ধারা অবিরত ।
কিরণ মলিন তার,　রেণু-কণা অশ্রু-ধার,
তুলে বাণী হাহাকার, ম্লান ছবি ফুটে কত ।
কি বিরাট মহাকায় ,　চিতায় পুড়িয়া যায়,
দেখিতে আকুলে ধায়, নর-নারী শত শত—
একি দেখি কার ছবি,　এ যে মহা নট-কবি,
কবিত্ব গগন-রবি, চির তরে অস্তগত ।
বিশ্ব-ব্যাপী শিখা ছুটে,　অসংখ্য আলেখ্য ফুটে,
অগণ্য রাগিণী উঠে, গে'য়ে গেছে গান যত—
অই যে গো যায় দেখা,　হেথাকার স্মৃতি-রেখা,
উজলে জলন্ত লেখা, অনন্ত গগন-পথ ॥

মনোমোহন ।

ধন্য তুমি, জন্মভূমি, অয়ি পুণ্যময়ি শ্যামাঙ্গনে !
যাঁর কীর্ত্তি, নাট্য-গীতি, পেলে পুণ্যে সে
　　　　　মনোমোহনে ॥
মাতৃ-ভক্ত পুণ্য-প্রাণ,　রাখিতে মায়ের মান,
তুলেছে প্রথম তান, প্রথমে সে দেশ-সম্ভাষণে ।
দীঘল জীবন ধ'রে　কায়-মনে সেবা ক'রে,
এ'নে ফুল থালি ভরে',দিত ডালি বাণীর চরণে—
সে'ত হেথা নাহি আর　থেমে গে'ছে হেথাকার,
বীণার ঝঙ্কার তার, শুধু সুর জাগে মা স্মরণে ।
শুধু সুরে মনে হয়,　এখনো জাগিয়ে রয়,
গান তার বিশ্বময়, ঝ'রে রেশ গগনে-পবনে—
গে'ছে সে উপায় নাই,　এখন মা এই চাই,
যেন এঁকে রেখে যাই,কবি-স্মৃতি জীবনে মরণে ।

যুগল কবি ।

আগে দীপ জ্বেলেছিল সে মনোমোহন ।
উজলি ভাস্বর ভায়ে বাণীনিকেতন ॥
　খুলিয়ে মন্দির-দ্বার,
　দেখাইল রচনার,
মূর্ত্তচিত্র কত কার, মুগ্ধনেত্র বিশ্বজন ।
　তুলি বর্ণতুলি করে,
　গিরিশ আসিয়া পরে,
প্রতিভার সৌরকরে,করে শত চিত্রাঙ্কন—
　কেহ আগে কেহ পাছে,
　দুই গেছে দুই আছে,
রবে কীর্ত্তি জেগে কাছে, ক'রে স্মৃতি জাগরণ ॥

শ্রীবিহারীলাল সরকার ।

---

* নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মনোমোহন বসুর পরলোক গমনে এই গীতিত্রয় অস্থের শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক বিরচিত ।

বিষ্ণুসংহিতায় দণ্ডবিধি।

(৪)

ব্যবহারজীবী মাত্রেই অবগত আছেন যে, ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত। কিরূপ ভাবে অপকর্ম্ম করিলে তাহা আইনের চক্ষে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা ইহার মধ্যে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। লোকে সহজ বাঙ্গালায় যাহাকে চুরি করা বলে, অনেক সময় আইনের বর্ণনার মধ্যে সেরূপ কার্য্য মোটেই চৌর্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় না; আবার অনেক সময় যে কার্য্যকে সাধারণ ভাষায় চৌর্য্য বলে না, আইনের চক্ষে তাহাকে চৌর্য্য বলে। এইরূপ ভাবে প্রত্যেক অপরাধের বর্ণনা পদ্ধতি আধুনিক ব্যবহার শাস্ত্রের মধ্যে দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুসংহিতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থে আমরা এরূপ বর্ণনা সাধারণতঃ দেখিতে পাই না। নরহত্যা করিলে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অপরের প্রাণবধ করা কর্ত্তব্য, ইহা বিষ্ণু সংহিতার আদেশ। নরহত্যা কাহাকে বলে তাহা সাধারণ ভাষাজ্ঞান হইতে নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া হইত বলিয়া আমার বিশ্বাস। বিলাতী দণ্ডবিধিতে কিন্তু প্রকার ভেদে নরহত্যা নানারূপ অপরাধের মধ্যে পতিত হয়। সুতরাং পাশ্চাত্য আইন মতে নরহত্যা করিলেই অপরাধীর প্রাণদণ্ড হয় না। তাহার পর ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ আইনের কথা লইয়া বিচারকগণ টীকা প্রস্তুত করেন এবং অপরাধের বিচারকল্পে আইনের বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেন। বলা বাহুল্য, এই সকল আইন গ্রন্থের কথা এবং বিচারপতিদিগের ব্যাখ্যা লইয়া বিচারালয়ে বাক্‌যুদ্ধের দ্বারা ব্যবহারজীবিগণ অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং যাহাতে বিচার বিভ্রাট ঘটিতে পারে অনেক সময় বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

এই হিসাবে দেখিতে গেলে প্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্র আধুনিক ব্যবহার শাস্ত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিষ্ণুসংহিতায় নরহত্যা, চুরি, জুয়াচুরি প্রভৃতির দণ্ড লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে কিন্তু ঠিক কিরূপ অধর্ম্ম করিয়া পরদ্রব্য নিজস্ব করিলে তাহাকে চুরি, প্রবঞ্চনা বা বিশ্বাসঘাতকতা বলে, মহামুনি বিষ্ণু তাহার বর্ণনা দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রকে জটিল করিয়া তুলেন নাই। আমার বোধ হয়, সে কালের সমাজে এরূপ ভাবে বিভিন্ন অপরাধের গণ্ডী নির্ণয় করিবার আবশ্যকতা ছিল না।

ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ছোট ছোট রাজত্বে রাজা স্বয়ং ব্রাহ্মণ অমাত্যদিগের সাহায্যে বিচার করিতে বসিতেন।

একটু অবান্তর হইলেও এস্থলে আমরা মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য দেবের বিচারের বিধান বিবৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। নৃপ স্বয়ং ক্রোধ-লোভ বিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার বা মোকদ্দমার বিচার করিতেন।

শ্রুতাধ্যয়ন সম্পন্না ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ।
অপশ্যতা কার্য্যবলাদ্ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যৈঃ সহ নিযুক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ॥

বেদশাস্ত্রাভিজ্ঞ ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ সত্যবাদী, শত্রু মিত্রে সমদর্শী এরূপ ব্যক্তিকে নরপতি সভাসদ করিবেন। অলঙ্ঘনীয় কার্য্য হেতু রাজা স্বয়ং বিচারাসনে উপবেশন করিতে সমর্থ না হইলে তিনি একজন সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ব্রাহ্মণকে সে ভার অর্পণ করিবেন। তাহার পর স্নেহ, লোভ, ভয় প্রযুক্ত অবিচার করিলে কিরূপে বিচারপতিকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় এবং বিষ্ণুসংহিতায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত পদ্ধতি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, অপকর্ম্মের গণ্ডী নির্ণয়ের অভাবে অবিচার হইবার আশঙ্কা ভারতবর্ষে মোটেই ছিল না। আধুনিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যেমন সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া, ব্যবহার সম্বন্ধীয় সকল কথা শুনিয়া অপরাধীর অপরাধ হইয়াছে কি না একথা জুরিগণ বিচার করিয়া দেন, তখনও তেমনি বিচারকগণ অভিযোক্তার ও তাহার সাক্ষিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া অপরাধ হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করিতেন। এই বিচার পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বশিষ্ঠ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে।—"রাজমন্ত্রী সদঃ কার্য্যাণি কুর্য্যাৎ। দ্বয়োর্বিবদমানয়োরত্র পক্ষান্তরং গচ্ছেদ যথাসনমপরাধো হ্যন্তে নাপরাধঃ। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু যথাসনমপরাধোহ্যাগুবর্ণয়োর্বিধানতঃ সম্পন্নতামাচরেৎ;" অর্থাৎ রাজমন্ত্রী সভার কার্য্য করিবে। দুইজন বিবাদীর মধ্যে মন্ত্রী একজনের প্রতি পক্ষপাত করিলে, এই অন্তকৃত অপরাধও রাজার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবে। রাজা স্বয়ং কোনও অপরাধ করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিধান অনুসারে তাঁহাকে তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর প্রমাণ সম্বন্ধে মহামতি বশিষ্ঠ বলেন—

"লিখিতং সাক্ষিণো ভুক্তিঃ প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতং।"

অর্থাৎ দলিল, সাক্ষী ও ভোগ বা দখল তিন প্রকার প্রমাণ। চুরি, দস্যুতা, গৃহদাহন, কূটলেখন প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দের সরলার্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা অপরাধীর দণ্ডের বিধান করিতেন। সুতরাং "পরের দ্রব্য অপরের দখল হইতে তাহার বিনা অনুমতিতে অসাধু ভাবে স্থানান্তরিত করিলে তাহাকে চুরি করা বলে—" এরূপ ভাবে চুরির বর্ণনা বিচারকদিগের হস্তগত না হইলেও তাঁহারা আপনাপন বিদ্যাবুদ্ধি ও বিবেকের সাহায্যে কাহাকে চুরি করা বলে একথার মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতেন।

(৫)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিষ্ণু সংহিতায় উল্লিখিত অপরাধের তালিকা হইতে প্রাচীন হিন্দু সমাজের সভ্যতা ও নীতিজ্ঞানের আভাস পাইবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা। ভারতীয় পিনাল কোডের মত এ গ্রন্থে অপরাধের সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই বলিয়া আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। আইন মানুষে নির্ম্মাণ করে এবং আইনের ভাষাও রাষ্ট্র মধ্যে প্রচলিত সাধারণ ভাষা। স্থল বিশেষে সামান্য মাত্রায় পরিভাষার আবশ্যক হইলেও কোন্ আইনের বাক্যের কি অর্থ বুদ্ধিমান প্রজা মাত্রেই তাহা আপনাদের সাধারণ জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে পারে। আমার ভৃত্যের হস্তে একখানি শাল দিয়া তাহা আমার আত্মীয়ের নিকটে লইয়া যাইতে আদেশ করিলে, সে পথিমধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া শালের মূল্য আত্মসাৎ করিলে তাহার কার্য্যকে ব্যবহারজীবী ও সাধারণ প্রজা উভয়েই বিশ্বাসঘাতকতা বলিবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কোনও বিবাদ সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা কথা বলিলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধ হয়, একথা বুঝিতে গভীর আইন জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। সুতরাং কেহ যদি আমাদিগকে বলে আধুনিক ইংরাজ জাতি, প্রাচীন হিন্দু ও রোমকজাতি এবং আমেরিকার ব্রেজিলিয়ান জাতি মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে দণ্ডিত করে, তাহা হইলে ঠিক কোন্ কার্য্যকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধ ভাবিয়া আধুনিক ইংরাজ ও ব্রাজিলিয়ান এবং প্রাচীন হিন্দু ও রোমান জাতি দণ্ডনীয় মনে করিত, তাহা সাধারণ ভাবে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই চারিটি বিভিন্ন জাতির ব্যবহার শাস্ত্র আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হয় না। সাধারণভাবে পাশ্চাত্য ও প্রাচীন হিন্দুদিগের সভ্যতা ও নীতিজ্ঞান এইরূপে আমরা তুলনা করিতে পারি।

(৬)

পাশ্চাত্যজাতিদিগের মধ্যে যে সকল অপরাধ বর্ণিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটিই বিষ্ণুসংহিতা, মনুসংহিতা প্রভৃতিতে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পরে ভারতীয় দণ্ড-বিধির অপরাধের তালিকার সহিত বিষ্ণু সংহিতার অপরাধের তালিকা মিলাইয়া একথা সপ্রমাণ করিব। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু সমাজ আধুনিক সুসভ্য সমাজ হইতে অনেক অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল।

প্রথম বিষয়টি সুরাপান। সুরাপান করা যে নীতিবিগর্হিত ইহা পাশ্চাত্যের আপামর সাধারণের ধারণা না হইলেও য়ুরোপীয় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সুরাপান নিন্দনীয় একথা ঘোষণা করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। সুরাপান করা যে পাপ, সুরাপান করিলে সমাজের অনিষ্ট করা হয় সুতরাং সমাজের চক্ষে ইহা অপরাধ, এ ধারণা সভ্যতা গর্ব্বিত ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুরাপান করিয়া সহরের পথে অসভ্যতাচরণ করিলে বা গণ্ডগোল বাধাইলে অপরাধীর সামান্য পরিমাণে অর্থদণ্ড হয় মাত্র। ইহা ব্যতীত সুরাপানের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য দণ্ডবিধিতে কোনও বিধান নাই। অথচ সুরাপান অভ্যাসের অপব্যবহার বশতঃ পাশ্চাত্যে নিত্য কত পাপাচরণ হইতেছে, কত ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিষ্ণু সংহিতার মতে সুরাপান করিলে মহাপাতক করা হয়। ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে তাহার ললাটে সুরাধ্বজ অঙ্কিত করিয়া তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিবার বিধান বিষ্ণু সংহিতায় দৃষ্ট হয়। অস্মদ্দেশে বর্ত্তমান যুগে এ প্রথা প্রচলিত থাকিলে অনেক পল্লী ব্রাহ্মণ শূন্য হইত।

হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের দ্বিতীয় বিশেষত্ব পশু পক্ষী প্রভৃতি সম্বন্ধে অপরাধের বর্ণনা। জীবে দয়া হিন্দু ধর্ম্মের ভিত্তি। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম' নীতি ভারতবর্ষে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। যেমন রাষ্ট্রমধ্যস্থ মনুষ্যবৃন্দকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত, সেইরূপ জগদীশ্বরের সৃষ্ট সকল জীব সংরক্ষণ করা হিন্দুজাতি রাজধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিত। মনুষ্য সমাজ যত অধিক উন্নতিলাভ করে, মানব হৃদয়ে করুণ বৃত্তির তত অধিক প্রসার হয়। হীনবল নরনারীর উপর অত্যাচার বর্ব্বরোচিত, বিনা কারণে জীবহত্যাও উচ্চনীতির পরিচায়ক নহে। বর্ব্বর জাতি মাত্রেই পশু বধ করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। ক্রমে সমাজের

উন্নতির সহিত লোকে কৃষি প্রভৃতি শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করে এবং ক্রমে জীবন ধারণ জন্য কেবলমাত্র পশু পক্ষীর মাংসের উপর নির্ভর করে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে লোকে সহজে নিরামিষাশী হইতে পারে। আমিষাহার শীতপ্রধান দেশের লোকেরা আজিও একেবারে বর্জ্জন করিতে পারে নাই।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর হৃদয়ে সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান জন্মাইবার জন্য শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। খুব প্রাচীন যুগে হিন্দুগণ মাংসাহার করিত। কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা স্বচ্ছন্দবনজাত কন্দমূল ফলশস্যাদিতে অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছিল। সেই "সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান" "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" প্রভৃতি নীতির বশবর্ত্তী হইয়া স্মৃতিকারগণ জীবহত্যা অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং অপরাধীর দণ্ডের বিধান করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণু সংহিতা প্রণয়নের সময়ে যে হিন্দুজাতি মাংসাহার একেবারে বর্জ্জন করিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কারণ বিষ্ণুসংহিতায় নিষিদ্ধ মাংস বিক্রয়ীর এককরপাদচ্ছেদনের ব্যবস্থা দেখিতে পাই।

কেবল যে ইতরশ্রেণীর জীবের উপর করুণা দেখাইবার জন্য পশুপক্ষী সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বহু বিষয়ে গজঅশ্বগবাদি পশু মানুষের সহায় বলিয়াও হয়ত আর্য্য স্মৃতিকার তাহাদিগের হত্যা অপরাধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপরাপর কারণ থাকিলেও দয়া যে ঐরূপ আইন রচনার প্রধান কারণ তাহা অস্বীকার করা যায় না। মহামতি বিষ্ণুর মতে গজাশ্বোষ্ট্র গোঘাতীর করপাদ কার্য্য অর্থাৎ অপরাধীর কর বা পদচ্ছেদনের ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য দণ্ডটা বড় গুরু। কিন্তু আমার বোধ হয় প্রজাবৃন্দকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া ঐরূপ অপরাধ বন্ধ করিবার উদ্দেশেই মহামুনি ঐরূপ কঠিন শাস্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর তিনি গ্রাম্যপশুঘাতী, অরণ্যপশুঘাতী, পক্ষিঘাতী মৎস্যঘাতী কীটোপঘাতী এমন কি পুষ্পোগমনক্রমচ্ছেদী প্রভৃতির অর্থদণ্ডের বিধান করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এবিধানের অনুরূপ বিধান পাশ্চাত্য আইনে দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য সমাজের নীতি পশুপক্ষী বধকে এখনও অপরাধ বলিয়া মানিয়া লইতে শিক্ষা করে নাই। ইংরাজ শাসিত কতকগুলি প্রদেশে ইতর জীবের ক্লেশ এবং তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা দমনার্থ দণ্ডের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু পশুবধের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার আইন এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। আমার প্রতিবাসী আমার একটি পালিত কুকুর মারিলে অবশ্য তাহাকে দণ্ড পাইতে হয়। কিন্তু সে দণ্ড কুকুরের রক্তের প্রতিশোধের জন্য নহে। সে দণ্ড আমার সম্পত্তি

বিষয়ক স্বত্বের হানির জন্য। একব্যক্তি অপরের স্ফটিক দ্রব্য লোষ্ট্রাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিলে যে আইনের দ্বারা দণ্ডনীয় হয় সে তাহার প্রতিবাসীর ছাগশিশুর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া দিলেও তাহাকে সেই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। আধুনিক জগতের এ আইন প্রাচীন হিন্দু জগতের পশুবধের আইন হইতে উদ্দেশ্যে একেবারে বিভিন্ন।

বয়োঃজ্যেষ্ঠের বা শ্রেষ্ঠ বর্ণের বা আত্মীয়ের সম্মান রক্ষা বিষয়ক দণ্ডবিধিও আধুনিক দণ্ডবিধি হইতে স্বতন্ত্র। মানব সমাজে সাম্যভাব আধুনিক সভ্য জগতের প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমাজের চক্ষে যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান বলিয়া বিবেচিত হয় এইরূপ ভাবের প্রচার করিতে পাশ্চাত্য সমাজ সচেষ্ট। অবশ্য কার্য্যতঃ পাশ্চাত্য সমাজ ঐরূপ সাম্যভাবের প্রচলন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে একথা আমি বলিতে চাহি না। তবে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দেখিয়া প্রণাম না করিলে, একাসনে ব্রিটিস সচীবের সহিত বৃটিস শ্রমজীবী বসিলে বা ইংরাজ আচার্য্যকে দেখিয়া অপর ইংরাজ টুপী না তুলিলে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয় না। স্ত্রী স্বামীর সহিত কলহ করিলে বা স্বামীর অবাধ্য হইলে তাহাকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা পাশ্চাত্যে নাই।

প্রাচীন ভারতের নীতি কিন্তু একেবারে বিভিন্ন প্রকারের ছিল। ব্রাহ্মণ জাতিকে ভক্তি প্রদর্শন করিতে না পারিলে লোকে কেবল সমাজের চক্ষে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইত না তাহাকে রাজপুরুষদিগের হস্তে শাস্তি ভোগ করিতে হইত। ভগবান বিষ্ণুর নিম্নলিখিত বিধান হইতে এ বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে—"স্ত্রিয়মশক্ত ভর্ত্তৃকাং অতিক্রমণীঞ্চ। হীনবর্ণোঽধিকবর্ণস্য যেনাঙ্গেনাপরাধং কুর্য্যাৎ তদেবাস্য শাতয়েৎ। একাসনোপবেশী কটাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ। নিষ্ঠীব্যোষ্ঠদ্বয়বিহীনঃ কার্য্যঃ। আক্রোশয়িতা চ বিজিত গুরুনাক্ষিপন্ কার্ষাপণশতম"—অর্থাৎ স্ত্রী ভ্রষ্টা বা অবাধ্য হইলে তাহার বধদণ্ড। হীনবর্ণ ব্যক্তি তাহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর্ণের ব্যক্তির প্রতি যে অঙ্গের দ্বারা অপরাধ করে সেই অঙ্গ ছেদন করিবে। একাসনে বসিলে তাহার কটীতে দাগ দিয়া নির্ব্বাসন করিবে। থুথু দিলে ওষ্ঠাধর ছেদন করিয়া দিবে। গালি দিলে বিজিহ্ব করিয়া দিবেন। এবং গুরুজনদিগকে রূঢ় কথা বলিলে বা নিন্দা করিলে তাহার শত কার্ষাপণ * দণ্ড।

* এক কার্ষাপণের আধুনিক মুদ্রায় মূল্য কত তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কার্ষাপণ সুবর্ণ ও রজত উভয় ধাতুর নির্ম্মিত হইত। কার্ষাপণে সুবর্ণের ওজন ১৬ মাষা। রজতের মূল্য ১৬ পণ কড়ি। আবার তাম্র দ্বারাও এ মুদ্রা নির্ম্মিত হইত। সুতরাং ইহার ঠিক মূল্য নিরূপণ করা দুরূহ।

আধুনিক সাম্যমন্ত্র দীক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শ হইতে এ আদর্শ একেবারে বিভিন্ন সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কাহাদের আদর্শ এ বিষয়ে উচ্চ তাহার বিচার এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। উভয় জাতির নীতি বিভিন্ন ছিল, কেবল আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি।*

আজি ভাই গৌরবের উচ্চ শিখরের 'পরে,
দাঁড়ায়ে চাহিয়ে দেখ নিয়ে তিলেকের তরে!
ওই দূর তলদেশে আনন্দ আলোকে কিবা
ফুটিয়া উঠেছে তব, জীবন তরুণ-দিবা।

২

স্নিগ্ধ শ্যাম বটচ্ছায়ে সুন্দর সৈকত তীরে
পবিত্র আশ্রম দেখ ধৌত জলাঙ্গীর নীরে,
হাস্যময় ও আশ্রম হাস্য-সবিতার করে,
হাস্যময় তপোধন সে তপনে তৃপ্তিভরে।

৩

ও আশ্রমে আনন্দের মহর্ষি আসীন সুখে
হরষ লহর সুধা উঠিছে ছুটিছে মুখে;
আধি-ব্যাধি ভাসাইয়া প্রবাহিছে অবিরত
ফুটিছে কানন ভরি মালতী মল্লিকা কত।

৪

আজি দেখিতেছি তাঁরে, অপসৃত করি সুখে
কালের এ অন্তরাল, বিজড়িত সুখে দুঃখে,
আর তাঁর পাশে সেই সুন্দর শিশুটি তুমি,
শৈশবের সে শোভায় উজলিয়ে পুণ্য ভূমি।

৫

সুন্দর শিশুটি তুমি গাইছ তুলিয়া তান
"এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে" সেই গান;
আহা যেন বাল্মীকির হৃদয় আনন্দে ছেয়ে
মধুময় রামায়ণ শিশু কণ্ঠ উঠে গেয়ে।

৬

আশ্রম বালক মোরা শুনিতাম প্রীতি-ভরে
পিতার মধুর গাথা তোমার মধুর স্বরে;
সে অধ্যায় সুধাময় জীবনের সূচনায়,
শৈশবের সে সৌহার্দ্দ জীবনে কি ভোলা যায়?

৭

সেই চিত্র সুললিত আজি চিত্ত আঁকিয়াছে,
সাধের আলেখ্যখানি এনেছি রাখিও কাছে;
শৈশবের স্নিগ্ধ স্মৃতি চির প্রীতিকর তাই,
প্রীতি-ভরে পূর্ব্ব-কথা তুলিলাম আজি তাই।

৮

সেই দীক্ষা শৈশবের ভুল নাই এ জীবনে;
কবি-দিষ্ট কুঞ্জবনে ভ্রমিয়াছ হৃষ্টমনে;
আজি নানাবিধ ফুলে, সাজি তব ভরিয়াছে,
পর্য্যাপ্ত প্রসূন-পথ সম্মুখে বিস্তৃত আছে।

৯

'শিশু মানবের পিতা,' নহে শুধু কাব্যকথা,
তোমার জীবনে তার আছে পূর্ণ সার্থকতা;
যেই শিশু কলকণ্ঠে রোমাঞ্চিত হ'ত কেশ
আজি তাহে মুখরিত পবিত্র 'তোমার দেশ'।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

* কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ৫।৬ বৎসর বয়সকালে স্বীয় পিতৃদেব দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের বন্ধু রায় দীনবন্ধু মিত্রকে তদীয় "এমন সুন্দর" কবিতা আবৃত্তি করিয়া মোহিত করিতেন। তখন দীনবন্ধু বাবু খড়িয়ার (জলাঙ্গীর) তীরে বটতলার বাটিতে থাকিতেন। বলা যাইতে পারে তৎকালে দীনবন্ধুর মধুর হাসি ও দেওয়ানজীর পবিত্র গান কৃষ্ণনগরের সরস্বতী সরপুরিয়ার ন্যায় আর একটি বিশেষত্ব ছিল।

উত্তর

অনেক দিনের কথা – ঠিক নাহি আসে মনে
মধুর শৈশবগাথা সে প্রথম জাগরণে ;
তবু যেন মনে পড়ে স্নিগ্ধ গ্রামে বটচ্ছায়,
এখনও গভীর সেই সাম গান শোনা যায়—

২

বিজড়িত সঙ্গে তার সে নিশার অবসান,
পবন হিল্লোল আর প্রভাতের পিকতান,
প্রাতঃসূর্য্য বিহসিত সে আমার জন্মভূমি,
সঙ্গে তার বিজড়িত প্রিয়বর আছ তুমি !

৩

মনে পড়ে আজি এই জীবনের এ সন্ধ্যায়
যেন সেই সুগভীর মহাগীত শোনা যায় ;
তাহার মধুর স্মৃতি এখনও বাজিছে প্রাণে,
বাজিবে তাহার সুর এ জীবন অবসানে।

৪

ঠিক মনে নাই বটে—সেই হাসি সেই গান,
দীনবন্ধু কার্ত্তিকেয় দুই বন্ধু এক প্রাণ,
সেই হাসি সেই গান আমার জীবনে আসি
বিজড়িয়া রচিয়াছে এই গান এই হাসি,

৫

কিম্বা সব কল্পনা এ – ভালবাস বলে তাই,
সকল সুন্দর দেখ আমার প্রাণের ভাই !
রচিয়াছি যেই হাসি, যেই গান রচিয়াছি
সে হাসির সে গানের নহে নহে কাছাকাছি ;

৬

অন্য কোন নাই সুখ, অন্য কোন নাহি আশা,
শুধু চাহি এ জীবনে তোমাদের ভালবাসা !
যদি এই গানে হাস্যে লভিয়াছি তব প্রীতি,
সার্থক আমার হাস্য সার্থক আমার গীতি,

৭

প্রভাতে এ জীবনের হাসায়েছি বঙ্গভূমি,
করিয়াছি তীব্রব্যঙ্গ বন্ধুবর জানো তুমি ;
জীবনের এ সন্ধ্যায় মিলায়ে গিয়াছে হাসি
সব হাস্য শুয়ে আছে রোদনের পাশাপাশি !

৮

মানুষের সুখ দুঃখ, মানুষের পুণ্যপাপ,
দেবতার বর আর পিশাচের অভিশাপ,
নাটকের যে আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ,
ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার কাজ।

৯

ঈশ্বরের কাছে আর অন্য কিছু নাহি চাই,
আমার এ খ্যাতি শুধু পুণ্যে গড়া হোক তাই
তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমার মস্তকে ধরি,
যেন বন্ধু তোমাদের ভালবাসা নিয়ে মরি !

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ব্রজ-দর্শন।—শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর নাথ ব্রজবাসী প্রণীত এবং শ্রীধাম বৃন্দাবন মদনগোপাল প্রেস হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মথুরা ও বৃন্দাবনের যেখানে যে কিছু জ্ঞাতব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয় আছে, তাহা সবিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর যখন স্বয়ং একজন শিক্ষিত ব্রজবাসী ইহার লেখক, তখন সে সম্বন্ধে কোন ত্রুটি না থাকাই সম্ভব। সেজন্য মনে হয়, ইহার এক একখানি উক্ত তীর্থযাত্রীদিগের সঙ্গে থাকিলে বিশেষ উপকারে আসিবে, এবং তাঁহারা অনেক অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। অধিকন্তু পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দাবন ও মথুরার দেবালয় ও দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের ১৬ খানি অতিবিকল সুন্দর হাফ্‌টোন ফটোচিত্র প্রদত্ত হওয়ায় পুস্তকখানি আরও সুশোভন হইয়াছে ; অথচ মূল্য আট আনা মাত্র, খুব সুলভ বলিতে হইবে।

পথের কথা।

(২)

চৌরঙ্গীর রসেল ষ্ট্রীট্ কোথায়, কলিকাতাবাসী পাঠককে তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বেঙ্গল-ক্লাবের পশ্চাৎ দিক হইতে এই রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে। ১৮০৬ হইতে ১৮১৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্যর হেনরি রসেল, সুপ্রীম কোর্টের চিফ্-জষ্টিস্ ছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই রাস্তাটীর নাম Russel Street হইয়াছে। স্যর হেনরির আবাস-বাটীই এই পথের প্রথম বাটী। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে চৌরঙ্গীর চারিদিকে বড় বড় বাগান ছিল। অনেক বাগানে কেবল নিম্নশ্রেণীর দুই চারি ঘর লোক বাস করিত। তাহা কেবল ঝোপ জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ও পথের ধারে কোন নয়নরঞ্জন বাগানবাটীও ছিল না। তখনও গ্যাস হয় নাই। এরণ্ড-তৈল-বর্ত্তিকা স্তম্ভগুলি, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের মস্তকের উপরস্থ লণ্ঠনের স্তিমিত জ্যোতিতে সেই অন্ধকারময় পথগুলি আরও অন্ধকারময় করিত।

এখন রসেল-ষ্ট্রীটের যে বাড়িটী "Golightly Hall" বলিয়া পরিচিত,তাহাই জজ রসেলের আবাসবাটী ছিল। এই বাটীতেই, প্রাচীন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ মহিলা রোজ্ আলমার তাঁহার শোচনীয় জীবনের কিয়দংশ কাল অতিবাহিত করেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বাটী হইতেই তাঁহার মৃতদেহ পার্ক-ষ্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। *

এই রসেল ষ্ট্রীটের ১২ এবং ১৩ নম্বরের বাড়ী দুইটী বিশেষ গণনীয়। এই বাড়ী দুইটীতে অনেক নামজাদা চিফ্জষ্টিস বাস করিয়া গিয়াছেন। সার বার্ণেস্ পীকক, হাইকোর্টের একজন খুব নামজাদা চিফ্জষ্টিস্। তিনি ১৮৫৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৭০ অব্দ পর্যান্ত জজীয়তী করেন। ইহার পর মিষ্টার জন প্যাক্সটন নর্ম্মাণ এই বাটীতে বাস করেন। নর্ম্মাণ সাহেবের হত্যাকাণ্ড ব্যাপার এখনও আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক। ওয়াহাবী মোকদ্দমায় পরাজিত পক্ষের, গুপ্ত ঘাতকের হস্তে জজ নর্ম্মাণ সাহেবের মৃত্যু হয়। হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়া জজ্

* Rose Aylmér সম্বন্ধে ভবিষ্যতে অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল—লেখক।

সাহেব যখন নীচে নামিতেছিলেন সেই সময়ে আবদুল্লা নামক এক ওয়াহাবী-পাঠান তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করে। তখনই একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। নর্ম্মাণ সাহেবের আহত ও মূর্চ্ছিত দেহ বর্ত্তমান থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর বিপণীতে আনিয়া সেবা শুশ্রূষা করা হয়। কিন্তু হায়! কিছুই হইল না। এক নীচান্তঃ-করণ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে হাইকোর্টের একটা উজ্জ্বলতম নক্ষত্র চিরদিনের জন্য আঁধারে ডুবিল।*

রসেল-ষ্ট্রীটের ৫ নং এর বাটীটা ১৮২৫ হইতে ১৮৪৯ পর্য্যন্ত লর্ড বিশপদিগের আবাস-বাটী রূপে ব্যবহৃত হয়। স্বনাম-প্রসিদ্ধ বিশপ হিবার ১৮২৫ হইতে ১৮২৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বৎসরাবধি কাল এখানে বাস করেন। তখন লাট-গির্জ্জার সম্মুখে, লাটপাদরিদের প্রাসাদতুল্য বাসভবন নির্ম্মিত হয় নাই। বিশপ টর্ণার, বিশপ উইলসন নামক দুইজন লাট-পাদরীও এই ৫ নং বাটীতে বাস করিয়া ছিলেন।

চৌরঙ্গী রোড হইতে আরম্ভ হইয়া পার্ক ষ্ট্রীট্‌ বরাবর সারকিউলার রোডে গিয়া মিশিয়াছে। মধ্যপথে ইহা রসেল ষ্ট্রীটকে কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। চৌরঙ্গী রোড হইতে পার্ক ষ্ট্রীটে প্রবেশ কালে, বামদিকে সুপ্রসিদ্ধ সরস্বতী-নিকেতন এসিয়াটিক সোসাইটী গৃহ। গবর্ণমেণ্ট এই গৃহ নির্ম্মাণের জন্য জমী দান করেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। স্বনামপ্রসিদ্ধ ওয়ারেণ হেষ্টিংস ইহার প্রথম "পেট্রণ" ছিলেন। সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান জজ বহু-ভাষাবিৎ স্যর উইলিয়াম জোন্স ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। স্যর উইলিয়াম জোন্সের মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত খুব কম এদেশে আসিয়াছিলেন বা জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বাইশটী ভাষা জানিতেন। এরূপ জন-প্রবাদ আছে তিনি এক সময়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"আমি এত দিনে পৃথিবীর সকল দেশের ভাষা শিখিতে পারিলাম না—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। যদি

* এই হত্যাকারীর ভ্রাতা বা কোন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়ই হউক, ঠিক আমার মনে নাই, তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়োকে আন্দামান দ্বীপে হত্যা করে। লর্ড মেয়ো একটী পাহাড়ের উপর উঠিয়া—সমুদ্রের ও সান্ধ্যগগনের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে এই শিক্ষিত পাঠান তাঁহার পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করে। সেই আঘাতেই লর্ড সাহেবের জীবন বায়ু বহির্গত হয়। লর্ড মেয়োর মৃত দেহ জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আনা হয় ও তৎপরে তাহা পুনরায় বিলাতে পাঠান হয়। এক ওয়াহাবী পাঠান হইতেই ভারতের দুইটী প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীর জীবলীলায় অবসান হইয়াছিল।

পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা না শিখিয়া মরি, তাহা হইলে কেহ যেন আমার জন্য অশ্রুপাত না করে।” বস্তুতঃ এত বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভারতে খুব কম আসিয়াছিলেন। স্যর উইলিয়াম জোন্স, ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রুতিধর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের শিষ্য। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সুপ্রীম-কোর্টের প্রথম জজ্‌-পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু-আইন-ঘটিত কূট তর্কের মীমাংসার জন্য, সে কালের গবর্ণমেণ্ট একজন প্রাজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতকে সুপ্রীম-কোর্টের হিন্দু-আইনের ব্যবস্থাপকরূপে নিযুক্ত করিতেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননই প্রথম হিন্দু “জজ্‌-পণ্ডিত”। তর্কপঞ্চানন ঠাকুর, তাঁহার আবাস স্থান ত্রিবেণীতে মহা সমারোহে দেবী বাক্‌-বাদিনীর পূজা করিতেন। স্যর উইলিয়াম জোন্স এই সরস্বতী পূজার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়া, চিনির মুড়কী, মুকুন্দ-মোয়া ও ত্রিবেণীর বিখ্যাত সন্দেশ খাইয়া আসিতেন। *

পার্ক-ষ্ট্রীটের পুরাতন নাম বাদামতলা রোড। সুপ্রীম-কোর্টের প্রথম চিফ্‌ জষ্টিস, নন্দকুমারের বিচারক, হেষ্টিংসের প্রধান বন্ধু, স্যর ইলাইজা ইম্পির “পার্ক” বা বাগানবাটী হইতে পার্ক-ষ্ট্রীট নামকরণ হইয়াছে। ইম্পির সময়ে এই পথটীতে বড় চোর ডাকাতের ভয় ছিল। ইম্পির সম্পত্তি ও দেহ রক্ষার জন্য

---

* জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের এই সরস্বতী পূজায় সময়, স্যর উইলিয়াম একবার নিমন্ত্রণ রাখিতে যান। তিনি খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া, চণ্ডীমণ্ডপের উপরে না উঠিয়া সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞ-ছাত্রের (আর এই ছাত্র যে সে লোক নহেন, স্বয়ং সুপ্রীম-কোর্টের বড় জজ) সংস্কৃত জ্ঞানের গভীরতা সমবেত পণ্ডিতগণকে দেখাইবার জন্য, সংস্কৃতে বলিলেন—“হে মহাত্মন! আপনি মণ্ডপের উপরে আসুন।” স্যর উইলিয়মও সংস্কৃতে উত্তর দিলেন,—“আমি ম্লেচ্ছ। দেবী মণ্ডপের উপরে উঠিবার অধিকার আমার নাই।”

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অতিশয় মেধাবী ছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিধর পণ্ডিত। যাহা শুনিতেন তাহাই তাঁহার মনে থাকিত। এক সময়ে তিনি ত্রিবেণীর ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে দুইজন ফিরিঙ্গি জাহাজী-মাল্লা তীরে নামিয়াই ঝগড়া আরম্ভ করিল। তাহারা ইংরাজীতে পরস্পরকে গালি দিতে লাগিল। শেষ হাতাহাতি। ব্যাপারটী আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়। অনেক সন্ধান করিয়া তাহারা তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে খুঁজিয়া বাহির করে। কারণ তিনি তাহাদের মামলার প্রধান সাক্ষী। সে সময়ে ঘাটে আর কেহই ছিল না। তর্কপঞ্চানন ইংরাজী জানিতেন না—কিন্তু উভয়ের মধ্যে ইংরাজীতে যাহা ঘটিয়াছিল—তিনি তাহার সব কথাগুলিই অবিকল ইংরাজীতে বলিয়া যান।

পথের মধ্যে সিপাহী পাহারা থাকিত। সুপ্রীম-কোর্টে বিচার কার্য্যের জন্য যে দিন সন্ধ্যা হইয়া যাইত, সে দিন তাঁহার পালকীর আশে পাশে সিপাহীরা ঘেরিয়া থাকিত—ও এইরূপ সুরক্ষিত অবস্থায় তিনি গোবিন্দপুরের মাঠ পার হইয়া বাটী পৌছিতেন। আজকাল সে বাড়ীটী Loretto Convent বলিয়া পরিচিত, তাহাই স্যর ইলাইজা ইম্পির আবাস স্থান ছিল।

পার্ক ষ্ট্রীটের ছয় নম্বরের বাটীটীও অতি পুরাতন ও ইহার একটু ঐতিহাসিক সংশ্রব আছে। পূর্ব্বে এই বাড়ীটী বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, স্যর জন পিটার গ্রাণ্টের আবাস বাটী ছিল। ১৮৫৯ হইতে ১৮৬২ পর্য্যন্ত গ্রাণ্ট সাহেব বাঙ্গলায় ছোটলাটগিরি করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট সাহেব এই ৬নং এর বাড়ীটীকে বড়ই ভাল বাসিতেন। যাহাতে গবর্ণমেণ্ট এই বাড়ীটী কিনিয়া বাঙ্গলার ছোটলাট সাহেবদের আবাস ভবনরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, তিনি তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে হয়ত বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ছোটলাটগণ পার্ক ষ্ট্রীটের অধিবাসী হইয়া থাকিতেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট সাহেবের এ অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। আজকাল যাহা "বেলভেডিয়ার" বলিয়া পরিচিত, গবর্ণমেণ্ট সেই বাড়িটী কিনিয়া গ্রাণ্ট সাহেবের পার্ক ষ্ট্রীটে বাসের কল্পনা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

এই ৬নং এর বাড়ীটী ভবিষ্যতে বাঙ্গলার স্বনাম-প্রসিদ্ধ, বঙ্গদেশের উজ্জ্বল রত্ন, সুবিখ্যাত বারিষ্টার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) মহোদয় খরিদ করেন। খিদিরপুরের পিতৃভূমির উপর তাঁহার যে প্রাসাদ তুল্য ত্রিতল অট্টালিকা ছিল, তাহা খিদিরপুর ডক্ কোম্পানীর কবলে পড়ায়, বনার্জ্জি মহোদয় পার্ক ষ্ট্রীটের এই বাটী খরিদ করেন। ইহাতে তিনি বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিলাতে দেহান্ত হইবার পর, তাঁহার স্বর্গগতা পত্নী ও উপযুক্ত পুত্র মিঃ সেলি বনার্জ্জি এই বাটীতে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

অনুবাদে প্রমাদ।

আমার বন্ধু শচীন্দ্রনাথ 'কুছ্ কামকা লায়েক' না হইলেও সে চিরকাল মতলববাজ।

আমি বিলাত যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন সে একখানি সংবাদ পত্র হস্তে হাসিতে হাসিতে, আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল "ওহে, যা' খুঁজছিলাম পেয়েছি।"

শচীন্দ্র সারা জীবনটা গোলাপ ফুলের মত সুন্দরী স্ত্রী হইতে মোজার তারের গার্টার অবধি এত রকম দুর্লভ পদার্থ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত বলিয়া তাহার অন্বেষণের পদার্থ টা আমি সে ক্ষেত্রে ঠিক ধরিতে পারি নাই।

সুতরাং আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাকে বলিতে হইল যে সে ব্যবসার জন্য একটি সুবিধাজনক স্থান খুঁজিয়া পাইয়াছে। আমি বলিলাম—'এ তো ভাল কথা। এবার ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করে দাও। এ স্থানটা কোথা?'

শচীন্দ্র সগর্ব্বে বলিল—বড় লোকের জায়গা। কল্‌কাতায় একেবারে শীর্ষস্থান বল্‌লে হয়। এখানে চুরুটের দোকান খুলে দিলে বাস্, একেবারে রাতারাতি বড়লোক।

আমি বলিলাম—তাতে আর সন্দেহ আছে? এমন জায়গা মাথা খুঁড়লে লোকে পায় না। বেশ স্থান।

শচীন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল—তবে তুমি জান না কি?

আমি আন্দাজ করিয়া লইয়াছিলাম তাহার রাতারাতি ধনী হইবার স্থানটা চৌরঙ্গীর দিকে কোথাও হইবে। সুতরাং সপ্রতিভ ভাবে তাহাকে বলিলাম —হ্যাঁ, সে জানারই মধ্যে।

শচীন্দ্র হাসিয়া বলিল—কি! ধাপ্পা দিচ্চ? এই দেখ।

একখানা ইংরাজি সংবাদ পত্রে লাল কালিতে দাগ দেওয়া নিম্নলিখিত লাইনটায় আমার চক্ষু পড়িল—'The office of the Lieutenant Governor of Bengal will shortly be vacant.' আমি বন্ধুর মুখের দিকে চাহিলাম। সে বিজয়-গর্ব্বিত সৈনিকের মত অথবা উত্তর পোল হইতে প্রত্যাবৃত্ত নূতন

সুখণ্ড আবিষ্কর্ত্তা পেয়ারীর মত মুখের ভাবটা করিয়া বলিল—ভাবচ কি? Writers' Building কেমন জায়গা? একেবারে লালদিঘির সামনে। তিন রাস্তার মোড়ে।

আমি প্রথমটা ভাবিয়াছিলাম যে শচীন্দ্র পরিহাস করিতেছে। শেষে দেখিলাম তাহার ভয়ঙ্করী অল্প বিদ্যার মোহে সে ঠিক বুঝিয়াছে যে, ঐতিহাসিক Writers' Building নামক বিশাল সৌধে তাহার রাতারাতি ধনী হইবার উপায় স্বরূপ চুরুটের দোকান প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কি রকম?

সে বলিল—আস্‌কে খাও তার ফোঁড় গোণ না? লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের অফিস কোথা?

"কেন, রাইটার্‌স্ বিল্‌ডিঙ্গে।"

"সেটা শীঘ্র খালি হ'বে। তাহ'লে কি গবর্ণমেণ্ট সেটাকে ভাড়া দেবে না! ভূতের বাড়ি করবার জন্তে ফেলে রেখে দেবে?"

আমি প্রাণ ভরিয়া হাসিলাম। শেষে তাহাকে বুঝাইলাম যে ইংরাজি কথা অফিস অর্থে শুধু অফিস বাড়ী না, এস্থলে অফিস অর্থে পদ। লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের পদ খালি হ'বে। অর্থাৎ আর একজন লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বাঙ্গালার মসনদে বসিবেন। ইংরাজি কথা অফিসের অপর অর্থ কাজ। একবার একটি স্কুলের ছাত্রকে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"What is the office of the liver অর্থাৎ লিভারের কার্য্য কি?" সে শচীন্দ্রের মত অফিস অর্থে কর্ম্মস্থল বিবেচনা করিয়া বাহাদুরি লইবার জন্ত সর্ব্বাগ্রে বলিয়া উঠিয়াছিল—উদর, উদর।

শচীন্দ্র আমার কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

ইংরাজি কথার অর্থ সুস্পষ্ট জানা না থাকিলে আমাদিগকে প্রায় ঠকিতে হয়। অস্মদ্দেশীয় অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ইংরাজির বুকনিতে প্রায় প্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম বিলাতে গিয়া একটি পঞ্জাবী সহপাঠীর সহিত লণ্ডনের এক ডাকঘরে ডাক টিকিট কিনিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এ সকল কার্য্য প্রায় স্ত্রীলোকের একচেটিয়া। আমরা ডাকঘরের জানালায় দাঁড়াই-বামাত্র একটি সুন্দরী, আমরা অনুগ্রহ করিয়া কি চাই তাহা জিজ্ঞাসা করিল। আমার বন্ধু বলিলেন—পাঁচ খানি পেনি টিকিট।

'পেনি টিকিট?' মেম সাহেব একটু মধুর ভাবে হাসিয়া বলিলেন—"আপনারা ভুল করচেন—এটা ডাকঘর।"

স্বাধীনতা-গর্ব্বিত ইংলণ্ডের ভূমির উপরও শ্বেতাঙ্গী সুন্দরীরা কালা আদমীকে ঘৃণা করে, তাহাদিগকে লইয়া পরিহাস করে, এ চিন্তাটা আমার বন্ধুর নিকট বড় ভীষণ উৎপীড়ক বলিয়া বোধ হইতেছিল। সে একটু অবিনয়ী ভাবে বলিল—হাঁ জানি, এটা পোষ্ট অফিস এবং তুমি পোষ্ট অফিসের কেরাণী।

যুবতীটি একটু অবমানিতা হইয়া আমাদের দিকে চাহিল, তাহার গণ্ডদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মনের ভাব সংযত করিয়া বলিল—আপনারা নিশ্চয় ভুল করচেন—এখানে টিকিট বিক্রয় হয় না। টিউব রেলের টিকিট টিউব ষ্টেসনে পাওয়া যায়, আর ট্রামের টিকিট কণ্ডাকটারদের কাছে পাওয়া যায়। থিয়েটারের টিকিট—

বাধা দিয়া পঞ্জাবী বন্ধু বলিলেন—তা' বিলক্ষণ জানা আছে, আর জাহাজের টিকিট টমাস কুকের নিকট পাওয়া যায়। আমি চাই ডাক টিকিট।

যুবতী বিস্মিত ভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিল—মাপ করিবেন—এখানে টিকিট পাওয়া যায় না।

পুতুলের মত ঘুরিয়া সে তাহার টেবিলের নিকট চলিয়া গেল। আমরা ভুল জানালায় আসিয়াছি ভাবিয়া উপরে চাহিয়া দেখিলাম লেখা আছে যে সে স্থলে ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হয়। আমি বন্ধুকে বলিলাম—দেখ আমাদের বোধ হয় ভুল হয়েছে। টিকিট কথাটা ভারতবর্ষে আমাদের মধ্যে চলে। তুমি ষ্ট্যাম্প চাও দেখি।

বন্ধু আবার জানালায় মুখ বাড়াইয়া কাঠের উপর টোকা দিল। মেয়েটি হাসিতে হাসিতে আবার উঠিয়া আসিল। বন্ধু বলিল—পাঁচ খানি পেনি ষ্ট্যাম্প।

যুবতী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া "ও"! বলিয়া রমণী-সুলভ লজ্জা বা সরকারী চাকুরী-সুলভ সৌজন্যতা ভুলিয়া গিয়া হাসিতে লাগিল। আমরাও লজ্জায় অধোমুখে সে স্থল হইতে ফিরিয়া আসিলাম।

একবার মোজা কিনিতে লণ্ডনের একটা বড় দোকানে ঢুকিয়া আমাদের ঐ রকম দুর্দ্দশা হইয়াছিল। দোকানে ঢুকিবামাত্র অভিবাদন করিয়া একটি লোক জিজ্ঞাসা করিল—'অনুগ্রহ করিয়া কি চান?'

আমি বলিলাম—"Stocking."

সাহেবটি একটু বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চাহিল বটে কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। সে মিস্ টুক নামক একটি সুন্দরীর হস্তে আমাদিগকে সঁপিয়া দিয়া বলিল—"ভদ্রলোকেরা ষ্টকিং চান।" সুন্দরী আমাদিগকে মস্ত এক হলের

ভিতর দিয়া অপর একটি হলে লইয়া গেল। তাহার প্রবেশ দ্বারে লেখা ছিল "মহিলা-বিভাগ।" আমার কেমন একটু সন্দেহ হইতে লাগিল। সে হলটি মহিলায় পূর্ণ। আমাকে সে স্থলে যেন হংস মধ্যে বকের মত দেখাইতেছিল। সকলেই বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইতেছিল। আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম কি একটা ভুল করিয়াছি। বুক ঠুকিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম—মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম, যে রণে ভঙ্গ দিব না।

একটী টেবিলের সম্মুখে আমায় দাঁড় করাইয়া মিস্ টুক অপর একটী সুন্দরীকে বলিল—'ভদ্রলোক ষ্টকিংস চান।' সে যুবতীটি আমার মুখের দিকে সেই প্রকার বিস্ময়ের কটাক্ষ করিয়া বলিল—কি সাইজ, কি রং। আর কি চাই। আপনার নিজের জন্য সক্স্ চাই?

বিদ্যুতের মত আমার মস্তিষ্কে উদয় হইল যে ষ্টকিংস মানে স্ত্রীলোকের মোজা আর সক্স্ মানে পুরুষের মোজা। কে জানে বাবা যে বিলাতের ইংরাজি কল্‌কাতার ইংরাজি হইতে বিভিন্ন। চিরকাল 'ওয়ার্ড বুকে' Stockings মানে মোজা পড়িয়া আসিতেছিলাম।

যাহা হউক, সে যাত্রার ভুল শিক্ষার দণ্ডস্বরূপ চারি শিলিঙ দিয়া এক জোড়া সিল্কের 'মহিলা-মোজা' বা ষ্টাকিন কিনিয়া সুন্দরীদের হাসির হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম।

প্রথম প্রথম মুন্সীজির নিকট উর্দ্দু পড়িতে পড়িতে ঐ রকম একটা ভুল করিয়াছিলাম। উর্দ্দু প্রথম ভাগে লিখিত ছিল—"মাকড়ী জালা তন কর রহী হয়।" মুন্সীজি ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিয়াছিলাম,—"বান্দর লোক দিক্ করতা হায়।" মাকড়সা মানে বান্দর এবং জ্বালাতন মানে দিক্ করা ইহা কোন্ বাঙ্গালীর ছেলে না জানে? মুন্সীজি বিস্মিত ভাবে নিজের দাড়ী ধরিয়া 'তোবা' বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে কথাটার অর্থ—মাকড়সা জাল বুনিতেছে।

(২)

রসিক বাঙ্গালী কবি বিলাত সম্বন্ধে গান বাঁধিয়াছিলেন যে তথায় 'শালিক পাখি বিয়োয় নাকঃ টিয়া পাখির ছানা'। শুধু তাহাই নয়, তথায় ট্রেণ ছাড়িবার সময় রেলের ষ্টেসনেও ঠুং ঠুং করিয়া ঘণ্টা বাজায়। চৈনিক রেলের কথা বলিতে পারি না। ইয়ুরোপীয় সভ্যতাদীপ্ত সকল স্থলে রেলের ঐ ব্যবস্থা।

আমরা রাত্রি যোগে প্যারিস ছাড়িয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছিলাম। গার্ডীর

প্রকোষ্ঠে কেবল আমি ও আমার একটী পাঞ্জাবী বন্ধু ছিলেন। আমরা ছুটিতে ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম। যেমনি ষ্টেসনে টুং টুং করিয়া ঘণ্টাধ্বনি হইল অমনি ব্যস্তভাবে একটা ফরাসী আমাদের গাড়ীতে উঠিল। লোকটার খর্ব্বাকৃতি ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া আমাদের মনে তাহার সম্রান্ততা সম্বন্ধে একটু সন্দেহ হইল। তাহার সহিত কিছু মালপত্র ছিল না।

ষ্টেসন হইতে গাড়ী ছাড়িলে লোকটা আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল এবং ফরাসী ভাষায় কি বলিল। আমি তাহাকে ইংরাজিতে উত্তর দিলাম। সে তাহা বুঝিল না, আবার তাহার সেই ভাষায় অনর্গল স্রোতে বকিতে আরম্ভ করিল। একবার তাহার কথার মধ্যে 'হিন্দু' কথাটা ধরিতে পারিলাম।

বন্ধু মাণিকরামকে বলিলাম—কি হে, কি বলে। লোকটা সমস্ত রাত বক্‌বে না কি ?

মাণিকরাম হাসিয়া বলিল—ফরাসীরা বাঙ্গালীকেও হার মানিয়ে দেয়। ও বকুক না, তুমি একখানা বই খুলে বস। চুপ করবে এখন।

মাণিকরামের পরামর্শ মতে কার্য্য করিলাম। লোকটা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়। সে একটা চুরুটের বাক্স হস্তে লইয়া আবার বক্তৃতা জুড়িল। মনে মনে ভাবিলাম 'এ তো ভাল বিপদে পড়িলাম!' আমি জানিতাম, ফরাসী কথা কোসোঁ (Cochon) অর্থে 'নিদ্রা যাও'। এবার হাত নাড়িয়া ফরাসী ভাষায় তাহাকে বলিলাম—কোসোঁ, কোসোঁ, কোসোঁ।

এক বাক্স বারুদে অগ্নিসংযোগ করিলে যাহা হয়, আমার ফরাসী ভাষায় কথা কহিবার সেই পরিণাম হইল। ফরাসীটার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তাহার ছোট ছোট গোল চক্ষু দুইটা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। ফরাসী বিপ্লবের সময় ম্যারাট ড্যান্‌টন প্রভৃতি তাহার স্বদেশবাসিগণ যে প্রকার তেজস্বী প্রগল্‌ভ বক্তৃতা করিত, লোকটা সেইরূপ ভাবে ফরাসী ভাষা উদ্গীরণ করিতে লাগিল। বৃথা অস্থানে মুক্তা ছড়াইতে দেখিয়া তাহাকে হস্তের দ্বারা সঙ্কেত করিয়া আবার বলিলাম—'কোসোঁ'। এবার লোকটা চকিতের মধ্যে উপরের কোট্‌টা খুলিয়া আমার সম্মুখে ঘুসি বাগাইয়া দাঁড়াইল। আমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে লোকটা পাগল।

মাণিকরামকে বলিলাম—কিহে লোকটা পাগল নাকি ?

মাণিকরাম বলিল—সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে ?

আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য কি তাহা ভাবিয়া লইয়া আর একবার লোকটাকে

ফরাসী ভাষায় শয়ন করিতে অনুরোধ করিলাম। বুঝিলাম তাহার বায়ুরোগের প্রধান লক্ষণ তাহার শয়নে অনিচ্ছা। এরূপ monomaniaর বিষয় অনেক পড়িয়াছিলাম।

রাত্রে নিরাপদে নিদ্রা যাইবার জন্য শেষে দুইজনে ধরিয়া লোকটাকে উত্তম রূপে বাঁধিয়া রাখিয়া সুখে বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলাম।

(৩)

সুষুপ্তি ও জাগরণের মধ্যে একটা অবস্থা আছে তাহা সময়ে সময়ে আমরা অনুভব করিতে পারি। তখন আমাদের কর্ণে বাহ্যজগতের শব্দ প্রবেশ করে কিন্তু আমরা ঠিক করিতে পারি না, শব্দগুলা বাস্তবজগতের না স্বপ্ন জগতের। আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি তখনও জড়তামাখান অর্দ্ধ সুষুপ্ত অবস্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে।

বুঝিতেছিলাম ট্রেণটা কোনও ষ্টেশনে আসিয়াছে। একাধিক কণ্ঠে আমাদের অবোধ্য ফরাসী ভাষা উচ্চারিত হইতেছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমাদিগের পূর্ব্ব রাত্রের উন্মাদ সহযাত্রীটার কণ্ঠস্বরই তাহার মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে শুনিতে পাইতেছিলাম। একটা লোক আমার গাত্র স্পর্শ করিল। আমার ঘুমঘোরটা কাটিয়া গেল। চক্ষু মেলিলাম।

চক্ষু মেলিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বড় অধিক শান্তি পাইলাম না। দেখিলাম বন্ধনমুক্ত হইয়া আমাদের পূর্ব্বরাত্রের ক্ষিপ্ত বন্দীটা আমাদের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার বাগ্মীতার পরিচয় দিতেছে আর দুইটা ৭ ফুট লম্বা ফরাসী পুলিস দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে। কেবল মাণিকরাম তখনও নিদ্রিত।

নিদাঘ প্রভাতের অরুণভাতি গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। আমাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া একটা পুলিস কর্ম্মচারী ফরাসী ভাষায় কথা কহিল। অপরটা মাণিকরামকে উঠাইল।

মাণিকরামও আমারই মত বিস্মিত হইল। আমাকে বলিল—ব্যাপার কি ?

আমি বলিলাম—ব্যাপারটা কি তা' একটু একটু বোধগম্য হচ্চে। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা গর্ব্বিত ফরাসীকে বন্ধন করিবার অপরাধে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের কিছুদিন অতিথি হ'তে হ'বে তারই সব সরঞ্জম হচ্চে।

মাণিকরাম ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল—নন্‌সেন্স। আমরা ব্রিটিশ প্রজা। ওসব ফরাসী অত্যাচারের ধার ধারি না।

আমি বলিলাম—বৃটিস প্রজার নানারূপ সত্ব আছে জানি। তবে অপরের দেশে এসে সে দেশের প্রজাকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখার অধিকার বৃটিস প্রজার আছে কি না জানি না।

মাণিকরাম বলিল—আত্মরক্ষার জন্ত করেছি তো কি হ'বে।

কি হইবে তাহা আর প্রত্যুত্তর দ্বারা বুঝাইতে হইল না। ফরাসী পুলিস অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে গাড়ী হইতে নামাইয়া হাজতে লইয়া চলিল।

(৪)

বড়ই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছিলাম। সারাদিন দ্বৈভাষিকের অভাবে আমাদের সম্বন্ধে পুলিস কিছু তদন্ত করিতে পারিল না। পরদেশে আসিয়া সামান্ত দস্যুতস্করের মত পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া ভাবিতেছিলাম—ইহার পূর্ব্বে মৃত্যু হয় নাই কেন?

সন্ধ্যার পর এক ইংরাজি-অভিজ্ঞ লোক আসিল। তাহাকে সমস্ত কথাটা বলিয়া ফেলিলাম। সে সমস্ত শুনিয়া বলিল—আপনারা লোকটাকে শয়ন করিতে বলিয়াছিলেন? কি ভাষায় বলিয়াছিলেন?

"কেন, ফরাসী ভাষায়।"

"কি বলিয়াছিলেন?"

"কোসোঁ।"

দ্বৈভাষিক চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমাদের দিকে চাহিল। আমাদের যেন ক্ষতস্থলে লবণ সিঞ্চিত হইল। বড় কষ্ট হইল। কে আগে জানিত ফরাসী জাতিটা এত বে-আদব।

আমাদের খর্ব্বাকৃতি বন্দী 'কোসোঁ' শব্দ শুনিয়া ভাবিল আমরা দোষ স্বীকার করিতেছি। সে আমাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আবার ফরাসী শব্দের উৎস ছুটাইল। তাহার প্রগলভতার মধ্যে 'কোসোঁ' কথাটা বুঝিতে পারিলাম।

দ্বৈভাষিকটি ফরাসী ভাষায় আমাদের কাহিনীটা আদ্যোপান্ত তাহাকে ও পুলিসের কর্ম্মচারী দুইজনকে বুঝাইতে লাগিল। তাহার গল্প শেষ হইতে না হইতে ফরাসী চতুষ্টয় চতুর্দ্দশ পংক্তি দশন বাহির করিয়া বিকট ভাবে হাসিতে লাগিল! একে বন্দী হওয়ার অপমান, তাহার উপর ক্ষুধার যন্ত্রণা, তাহার উপর এই অশিষ্ট ফরাসী পিশাচদিগের শ্লেষ আমায় একেবারে উন্মাদ করিয়া তুলিল।

আমি বৈভাষিককে বলিলাম —মুসোঁ আপনাদের সভ্যদেশে কি বন্দীদিগকে লইয়া এইরূপে আনন্দ করেন ?

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বৈভাষিক বলিল—আপনি একটা কথার অর্থ না জানিয়া ব্যবহার করিয়া এ বিপদে পড়িয়াছেন। 'কোসোঁ' অর্থে 'শয়ন করা' নহে, 'শূকর'!

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ছিঃ ছিঃ, তবে ভদ্রলোককে মিছামিছি অপমানিত করিয়াছিলাম বলিয়া সে আমাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেছিল। আমি তখনই তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

বৈভাষিক বলিল—উনি আপনাদের উপর মামলা চালাইবেন না। কোসোঁ (Couchons) মানে শয়ন কর। কোসোঁ মানে শূকর।

হাঃ ভগবান! পূর্ব্বে কে জানিত ফরাসী ভাষায় 'শয়ন করা'র সহিত 'শূকরে'র এত ঘনিষ্ট সম্পর্ক!

সেই ফরাসী কারাগৃহ হইতে নাকে কাণে খত দিয়া বাহির হইলাম। শপথ করিলাম ভালরূপে অর্থ না জানিয়া ভবিষ্যতে আর কোনও কথা ব্যবহার করিব না।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

গিরিশচন্দ্র।

(২)

মধুসূদন ও দীনবন্ধু প্রভৃতি পূর্ব্ব নাট্যকারগণের নাটকীয় প্রতিভার ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু তাহা ব্যবহারে তাঁহাদের মিতব্যয়িতা ছিল না। গিরিশচন্দ্র ঐ প্রতিভা-ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া তাহা উচিত-মত ব্যয় করিয়াছিলেন। অপব্যয় বা অপসঞ্চয়-দোষ গিরিশের অসামান্য প্রতিভাকে বড় একটা দূষিত করিতে পারে নাই। সংযোজনা-শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনও এক নাট্য-পদ্ধতির তিনি একান্ত অন্ধ অনুসরণ বা কোনও এক নাট্য-পদ্ধতিকে একেবারে, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করেন নাই। তাঁহার নাটক—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যকলা-পদ্ধতিরই অত্যদ্ভুত সমন্বয়। তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজী নাট্যকলার রীতি-পদ্ধতির সুসম্মিলন করিয়া অর্থাৎ 'বিষয় হিসাবে

একের অল্পতা এবং অপরের প্রবলতা দ্বারা' বাঙ্গালা-সাহিত্যে নাটকের আদর্শ গঠনের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। সুসম্মিলনই সৌন্দর্য্যের আকর,—রসের নির্ঝর। সুসম্মিলন সামঞ্জস্যের নামান্তর মাত্র। কেহ কাহারও সুন্দর চক্ষু বা সুন্দর নাসিকা দেখিয়া তাহাকে সুন্দর বলে না। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সুসম্মিলন দেখিয়াই লোকে সুন্দর বলে। এই সুসম্মিলন-গুণ আছে বলিয়াই গিরিশের নাটকাবলী বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকের চিত্তরঞ্জন করিতে এতটা সমর্থ হইয়াছে।

ভাষা গিরিশের কাছে পরিচারিকার মত আজ্ঞাবাহিনী ছিল। ভাবের অনুরাগে তাঁহার ভাষা যেন তাকাইয়া আছে বলিয়া মনে হয়। যেমন প্রত্যেক মানবে আকৃতি ও প্রকৃতিগত একটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়,সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যের কথা কহিবার প্রণালীতেও একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। গিরিশের নাটকে ভাষা-ব্যবহারের ঐ সার্থকতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাঁহার মদন দাদা, কাঙ্গালীচরণ ও সাধক হইতে আরম্ভ করিয়া রঙ্গলাল ও বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি সকলের ভাষাতেই চরিত্রগত একটা বিশেষত্ব, একটা স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীর বাক্যেই যেন তাহাদের নিজ নিজ কণ্ঠস্বর শুনা যায়। এসম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিয়া তৎ-কৃত ম্যাক্‌বেথ-অনুবাদের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে, মনে করি। অন্য কিছু না পড়িয়া এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই ভাষার উপর তাঁহার কিরূপ অসাধারণ আধিপত্য ছিল, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

ইহা ছাড়া, তিনি তাঁহার নাটকে এক নূতন ধরণের ছন্দের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। সেক্সপীয়র-ছন্দের অনুকরণে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ যে এক টুক্‌রা ছন্দ বাঙ্গালীকে নমুনাস্বরূপ দিয়া গিয়াছিলেন, সেই টুক্‌রা-টুকুকে ঈষৎ মার্জ্জিত করিয়া গিরিশচন্দ্র নাটকের জন্য লুফিয়া লইয়াছিলেন।* আবেগ বা উচ্ছ্বাসের সময়ে নাটকান্তর্গত উচ্চ শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীর মুখে ঐ ছন্দোময়ী ভাষা বসাইয়া দিয়া উহার উপযোগিতা তিনি সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

---

* হে সজ্জন, স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্যরসের রঙ্গে,—
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতী-বরে।
কৃপাচক্ষে হের একবার ; শেষে বিবেচনামতে,
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার'
দিও তাহা মোরে—বহমানে লব শির পাতি।
—হুতোমপ্যাঁচার নক্সা।

আর একটি জিনিষ নাটকান্তর্গত করিয়া গিরিশ বিশেষ নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহা—সঙ্গীত। মধুসূদন নাটকে সঙ্গীত দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু দীনবন্ধু কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হয় নাই। অন্য কোন ভাষায় নাটকে যখন সঙ্গীতের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন বাঙ্গালা নাটকে এ বিড়ম্বনা কেন, এইরূপ ওজর-আপত্তি তখন চলিতেছিল। এই ওজর-আপত্তিকে পদদলিত করিয়া গিরিশ কিন্তু জোর করিয়া নাটকে গীত সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। নাটকে গান দিয়া বাঙ্গালীকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, নাটকোপযোগী হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমাদের মাতৃভাষায় সঙ্গীতে যত আছে, সেরূপ অন্য কোনও ভাষায় নাই। তিনিই শিখাইয়া দিলেন, সঙ্গীত বঙ্গীয় নাটকের একটা অঙ্গ-বিশেষ। উহাকে নাটক হইতে নির্ব্বাসিত করিলে নাটককে কিছু খোঁড়া হইয়া থাকিতে হয়।

এইরূপ নবীকরণ করাই প্রতিভার ধর্ম্ম,—প্রতিভার কর্ম্ম। প্রতিভা প্রতিপদে পরের বাঁধাবাধি নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া চলে না। উপরন্তু প্রতিভার কার্য্য-সমর্থনের জন্য নিয়মই প্রতিভাশালীর কার্য্যানুযায়ী গঠিত বা রচিত হইয়া থাকে। কালিদাস বা সেক্সপীয়রের পূর্ব্বে অলঙ্কারশাস্ত্র রচিত হয় নাই। তাঁহাদের অবলম্বন করিয়াই অলঙ্কারশাস্ত্রের সৃষ্টি।

গিরিশচন্দ্র যে শুধু নাটকের আকৃতি-সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে; নাটকের প্রকৃতিতেও তিনি একটা বিশেষত্ব ফুটাইয়া গিয়াছেন। শুধু ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, নাটকের ভিতরকার ভাবে ও রসে তিনি একটা অপূর্ব্বত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সেই অপূর্ব্বত্ব, সেই বিশেষত্ব— হিন্দুর মর্ম্মগত সম্পত্তি। হিন্দুর সেই মর্ম্মগত কথা, সেই মজ্জাগত ভাব তিনি তাঁহার কাব্য-কল্পনার সহিত সমসূত্রে গাঁথিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার রচিত নাটক বঙ্গসাহিত্যে একটা শাখা বিস্তার করিতে পারিয়াছে—একটা মহা-গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে। কথাটা এইবার আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি।

গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ সেক্সপীয়রের অনুগামী হইলেও তিনি জানিতেন যে, গুরু আপাদমস্তক অধ্যয়নীয় বটে; কিন্তু পদে পদে অনুকরণীয় নহেন। দেশভেদে, দেশবাসীর প্রকৃতিভেদে কাব্যকলার প্রকৃতিগত আকার বিভিন্ন প্রকার হওয়াই যে উচিত, একথা তাঁহার বিলক্ষণ জানা ছিল। সেইজন্য, আধুনিক অধিকাংশ কবিই যেমন 'ভাহা' ইংরাজী ভাবকে বাঙ্গালীর পোষাকে বাহির করিয়া থাকেন,

তিনি তাহা আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি বাঙ্গালীর মজ্জাগত ভাবকে ইংরাজী ভাবের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া বাঙ্গালীর পোষাকে মানানসহি করিয়া তাহা বাহির করিতেন। এইখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, বাঙ্গালী চরিত্র ত—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চরিত্রেরই 'মিকশ্চার'—তাহার আবার মজ্জাগত ভাব কি? হাঁ, 'মিকশ্চার'ই বটে ; কিন্তু এই 'মিকশ্চারে'র মূলে বাঙ্গালী-চরিত্রে এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা ভারতবাসী ব্যতীত অন্য জাতির জীবনে অপ্রাপ্য। বাঙ্গালী চরিত্রের এই মূলগত বিশেষত্বটুকুর নাম—ধর্ম্ম। ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, মূলভিত্তি। এই ভিত্তির উপরেই গিরিশচন্দ্রের নাট্যহর্ম্ম্য গঠিত। তাঁহার প্রায় সকল প্রধান প্রধান নাটকের ভিতরেই ধর্ম্মের একটা অন্তঃসলিল স্রোত প্রবহমান দেখিতে পাওয়া যায়। "এইখানে একথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্ম শব্দের লক্ষ্য কেবল 'রিলিজন্' নহে। আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্মশব্দের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক ; মানুষের অনুষ্ঠেয় প্রত্যেক কর্ম্ম,—'দাঁতন কাঠি'র ব্যবহার হইতে ঈশ্বরোপাসনা পর্য্যন্ত সমস্তই ধর্ম্মের অন্তর্ভূক্ত।"

রসতত্ত্বেও যে অধিকারিভেদ আছে, তাহা গিরিশচন্দ্র অতি সুস্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মানব-হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্ন দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। ...অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্যে বা প্রাচ্যে দেশভেদে বিভিন্নতা।...তাহার কারণ, বোধ হয়, ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছবি। ...একদেশের নাটক অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচনা হইতে পারে না। দার্শনিক জর্ম্মাণ সিলার, নাটকে ভার্জ্জিন মেরির অবতারণা করিয়া উচ্চ "জোয়ান অফ্ আর্ক" নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে ভাবে সেক্সপীয়রের নাটক রচিত নয়। পশু-যুদ্ধ-আনন্দ-প্রিয় স্পেনের নাটক নির্দ্দয়তা-পূর্ণ। ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নাটকসকল, প্রায়ই বিপ্লবের ভীষণতায় পরিপূর্ণ। সেক্সপীয়রের Tempest নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের বার বার তুলনা হইয়া থাকে। Tempest বায়ু-বিহারী দেহী ও কুহক-আশ্রয়ে রচিত। 'শকুন্তলা' ঋষির অভিশাপ ও অপ্সরার প্রণয়ভিত্তি স্থাপিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে প্রমাণ করা যায় যে, ভিন্নদেশে ভিন্ন মস্তিষ্ক-প্রসূত নাটক, ভিন্নভাবাপন্নই হইয়া থাকে, এবং এক দেশেই সময়-বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয় ; যথা—Elizabethএর সময়কার নাটকসকল Charles IIএর সমসাময়িক নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকল বস্তুই দেশ,

কাল ও পাত্র-উপযোগী। এইহেতু ভিন্ন দেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না। যদি কোনও রঙ্গালয়ে 'শকুন্তলা' সুন্দররূপে অনুবাদিত হইয়া অভিনয় হয়, তাহা দর্শকের মন কতদূর আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার স্থিরতা নাই। অনেকেই বলেন, 'Othelo' অনুবাদিত হইয়া অভিনয় হউক। অবশ্য মানব-হৃদয়-সম্ভূত প্রদীপ্ত ঈর্ষার ছবি দর্শকের মন স্পর্শ করিবে। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ যোদ্ধা মূরের প্রেমে অনিন্দ্যসুন্দরী ডেস্‌ডিমোনার পিতৃগৃহত্যাগ নিভৃতে পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে। উভয়ের প্রণয়ানুরাগে ভালবাসার কথা নাই, কেবল যুদ্ধ-বিক্রম ও কঠোর সঙ্কট হইতে কেশ-ব্যবধানে উদ্ধারলাভ বর্ণিত। স্থিরচিত্তে নিভৃতপাঠে তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেক্সপীয়র-বর্ণিত ওথেলোর মুখে অনুরাগ-চিত্র সহজে সাধারণের উপলব্ধি হয় না। বীরত্বে আকর্ষিত সুন্দরীর হৃদয়-বর্ণনা সেক্সপীয়রের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ হইয়াছে। দর্শকও তাহা পাঠ করিয়া ডেস্‌ডিমোনার অনুরাগ বুঝিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ নায়িকার প্রেমোদ্দীপিত ভাবে যাঁহারা অভ্যস্ত নন, তাঁহাদের নিকট উপবনে সুন্দর শোভাহার-বিভূষিত স্থানে নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়।

"এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত,—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্ম্ম প্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু,—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব। যেরূপ বীরচিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী লোক ও ধর্ম্ম-সম্মানকারী নায়ক হিন্দু-হৃদয়ে স্থান পাইবে। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া স্থির-গম্ভীর যুধিষ্ঠিরের ভাব হিন্দুর প্রিয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের মস্তকচ্ছেদন পাশ্চাত্য-প্রিয় হইত। এ দেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্ম্মপ্রসূত হইবে।...দেশভেদে এইরূপ প্রত্যেক রসেই বিভিন্নতা দেখা যায়। এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

গিরিশচন্দ্রের এই যুক্তিপূর্ণ উক্তিতে সার সত্য নিহিত আছে। ইহার প্রতিবাদ নাই,—প্রত্যুত্তর নাই। গিরিশের নাট্য-সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে ঐ রসতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই করিতে হইবে। তাহা হইলেই হৃদয়ঙ্গম

হইবে যে, তিনি কেন তাঁহার নাটকে মারামারি, কাটাকাটি ও হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি ছবির প্রাধান্য না দিয়া তাহাতে ভক্তি, প্রীতি, ত্যাগ, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও আতিথেয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর ছবিই উজ্জ্বলতর করিয়া আঁকিয়া গিয়াছেন।

'বিল্বমঙ্গল' নাটকের বণিককে অতিথি-সৎকারের জন্য স্বীয় পত্নীদানে উদ্যত দেখিয়া হয়ত দুই চারিজন বিলাতী-বিদ্যা বিভ্রান্ত বাবু ঘৃণায় নাক সিঁট্‌কাইতে পারেন, আমরা কিন্তু এই মহিমাময় চিত্র দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে মনে করি যে, বাহ্যপ্রকৃতির উপর অন্তঃপ্রকৃতির এত বেশী আধিপত্য যে দেশের কবি দেখাইতে পারেন, সে কবি ধন্য! সে দেশবাসী ধন্য! 'হারানিধি' নাটকের নীলমাধবকে তাহার সর্ব্বনাশসাধনে সমুৎসুক বিশ্বাসঘাতক মোহিনীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহার উপকার করিতে দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত নীলমাধবের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দিহান্ হইতে পারেন, আমরা কিন্তু ক্ষমার এই অপূর্ব্ব ছবি দেখিয়া মনে করি যে যিনি এইরূপ মহতী কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি।

সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা দ্বারা লোক-শিক্ষাই তাঁহার নাটকের প্রধান লক্ষ্য ছিল। যাঁহারা নিষ্কাম সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা চিত্তরঞ্জনই নাটক-নভেলের প্রধান উদ্দেশ্য স্বরূপ গ্রহণ করেন, তাঁহারা গিরিশচন্দ্রের উপর সেইজন্য ততটা প্রসন্ন নহেন। তাঁহারা বলেন যে, নাটক-নভেলে 'with a purpose' কেন?—কেবল আনন্দ উপভোগের জন্যই কলাবিদ্যার সৃষ্টি। গিরিশ কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেন না। এই সকল কথার উত্তরে তিনি বলিতেন, "কেবল আনন্দদানে কলাবিদ্যাবিশারদের তৃপ্তি নহে। তাহার আজীবন উদ্যম, কিরূপে আনন্দ-স্রোত মানব-হৃদয় স্পর্শ করিয়া মানবের উন্নতি সাধন করিতে পারে। গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য পূর্ণ দৃশ্যসকল অঙ্কিত করিয়া, দর্শকের চক্ষের সম্মুখে ধরে।"

বঙ্গীয় নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতিতে তিনি ঐরূপে যে বিশেষত্ব রস ঢালিয়া গিয়াছেন, তাহারই নাম মৌলিকতা। মৌলিকতা আসমান্ হইতে দম্‌কা বাতাসের মত পেটে ঢুকিয়াই অমনি উদ্গারমাত্র হইয়া নিজ অস্তিত্বের পরিচয় দেয় না। বৈচিত্র্য প্রদানের নামই মৌলিকতা।

শুনিতে পাই, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, গিরিশচন্দ্রের নাটকে সর্ব্বরকম কলাকৌশলই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে কবিত্ব জিনিষটার একান্ত অভাব। একথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। আধুনিক 'ন্যাকামি' বা

হেঁয়ালী তাঁহার নাটকে স্থান পায় নাই বটে ; কিন্তু 'রসাত্মক' বাক্যের নামই যদি কবিত্ব হয়, তাহা হইলে, তাহা তাঁহার নাটকে প্রচুর পরিমাণে আছে।

"উপহাস করে আশা তবু তার দাসী
আশায় যাতনা তবু আশা ভালবাসি"।

এ কথায় কবিত্ব নাই, এ কথা বলিতে কে সাহস করিবে? 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল', এ মর্ম্মভেদী বাক্যে কি কোন রস পাওয়া যায় না?

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

হংকঙ।

হংকঙের বাজার।—হংকঙে দুইটী প্রধান বাজার আছে। তন্মধ্যে সহরের মধ্যস্থলে যেটী অবস্থিত সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা জমকাল। বাজারটী ত্রিতল। এরূপ বাজার আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ইহার সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইদিকেই দুইটী প্রধান রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। যদি সম্মুখ-ভাগ দিয়া প্রবেশ করা যায় তাহা হইলে প্রথমে নীচের তলে যাইয়া অবশেষে সোপান দ্বারা উপরে উঠিতে হয়। পশ্চাতের রাস্তা দিয়া প্রবেশ করিলে একেবারে দ্বিতীয় তলে যাইতে হয়, কেন না, পশ্চাতের রাস্তা ক্রমে উচ্চ হইয়া গিয়াছে। নীচের তলে আসিতে হইলে সোপান দ্বারা রাস্তা হইতে নামিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হংকঙের রাস্তাগুলি ক্রমশঃ পর্ব্বতগাত্রে উঠিয়াছে, এ কারণ রাস্তাগুলি কোথাও উচ্চে উঠিয়াছে, কোথাও নিম্নে নামিয়াছে। বাজার গৃহটী রক্তবর্ণ ইষ্টকে নির্ম্মিত, মাথায় ঢালু ছাদ; দূর হইতে শোভা বড়ই মনোরম। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কারণ ইহা চীনাদের বাজার নহে। জাহাজের লোকেরা এখানেই কেনাবেচা করিয়া থাকে। দ্বিতীয় তলে কেবল মাংসের দোকান। গোমাংসই অধিক। জাহাজে এই সকল মাংস প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়া পরে বরফে রক্ষিত হইয়া থাকে। বাজারের দ্বিতীয়তলে নানাপ্রকার ফল, তরিতরকারী ও মৎস্য। আমাদের দেশের আর সকল প্রকার তরকারী এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মৎস্যও

নানাপ্রকার প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীতে বেশ যত্নে রক্ষিত। বাজারটীর বন্দোবস্ত ভাল। সকল দ্রব্যের বেশ পৃথক পৃথক স্থান। কোন দ্রব্য আবশ্যক হইলে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইতে হয় না। অপর বাজারটী দ্বিতল নহে এবং সেখানে এত অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি বিক্রীত হয় না। তবে দুইটী বাজারের বাহিক আকার অনেকটা একই প্রকার।

সরবতের দোকান।—অন্যান্য উষ্ণপ্রধান দেশের ন্যায় এখানেও পথের ধারে ধারে সর্ব্বত্র সরবৎ বিক্রয় হয়। এখানকার সরবৎ প্রস্তুত প্রণালী একটু বেশ নূতন রকমের ও বেশ আনন্দজনক। একটা কাষ্ঠের ফ্রেমে একটা গোল পিত্তলের সুবৃহৎ থালা রক্ষিত এবং তাহার কেন্দ্রস্থলে একটা ছিদ্র দিয়ে একটা ছোট নল সংলগ্ন করা হইয়াছে। এই ছিদ্রোপরি একখণ্ড বৃহৎ বরফ রক্ষিত হইয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে অনেকগুলি কাচের গেলাস সজ্জিত করা হইয়াছে। ক্রেতা সরবৎ চাহিলে পার্শ্বের একটা কলস হইতে একটা গেলাসে জলপূর্ণ করিয়া এক হস্তে তাহা বরফের উপর ঢালা হয়, অপর হস্তে আর একটী গেলাস ছিদ্র নিয়ে ধরিয়া সরবৎ পূর্ণ করিতে হয়। এই প্রকারে ছয় সাত বার ঢালাঢালির পর বেশ সুশীতল সরবৎ প্রস্তুত হইয়া থাকে। মনে হয়, যেন ভক্ত উপাসক শুভ্র শীতল ধূর্জ্জটী শিরে বারিধারা ঢালিয়া সেই পূতবারি পান করিবেন।

পিক্‌ট্রামওয়ে।—হংকঙে সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব দ্রষ্টব্য "পিক্‌ট্রামওয়ে" (Peak Tramway)। এরূপ শকট প্রাচ্যে (East) আর কোথাও নাই। গিরি-শির হইতে একখানা ট্রামগাড়ী পাদমূলে নামিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা গাড়ী পাদমূল হইতে পর্ব্বতশিরে উঠিতেছে। পথ সরল, অতিদূর হইতে মনে হয় যেন দুইটী বৃহৎ বিষধর সর্প পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইহা বেশ সুকৌশলে নির্ম্মিত, পর্ব্বতের শিরোদেশে এঞ্জিন দ্বারা একটা অতি সুবৃহৎ স্তম্ভ লম্বিতভাবে বেষ্টিত হইতেছে। সূক্ষ্ম তারের সমষ্টিতে একটা মোটা তার নির্ম্মিত হইয়া তাহার মধ্যভাগ এই স্তম্ভে বিজড়িত। তারের দুই প্রান্তে দুইখানি শকট সংলগ্ন। স্তম্ভটী ঘূর্ণিত হইলে, তারের এক প্রান্ত জড়িত ও অপর প্রান্ত স্খলিত হইতে থাকে। এঞ্জিন ঘর হইতে পর্ব্বতের তলদেশ পর্য্যন্ত পাশাপাশি সরলভাবে দুইটা ট্রাম লাইন চলিয়া গিয়াছে। তারের প্রান্ত সংলগ্ন শকট দুইখানি এই লাইনের উপর স্থাপিত। যখন এঞ্জিন

যারা স্তম্ভ ঘূর্ণিত হয় তখন জড়িতপ্রান্তের গাড়ীখানি শিরদেশে আরোহণ করে ও স্খলিত প্রান্তের গাড়ীখানি পাদমূলে অবতরণ করে। এই লাইনের মধ্যে মধ্যে শকটে অধিরোহণ ও অবতরণের জন্ত প্লাটফরম্ আছে। এই সকল প্লাটফরম্ হইতে পর্ব্বতগাত্রের চারিদিকের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। একারণ অদ্রি কলেবরস্থিত অট্টালিকাগুলিতে যাতায়াতের কোন অসুবিধা নাই।

আমরা এই ট্রামে পর্ব্বতে উঠিয়াছিলাম। পর্ব্বতগাত্রে একটু অধিরোহণ করিয়াই ট্রাম আরম্ভ হইয়াছে, সেখানকার প্লাটফরমটীর বেশ বন্দোবস্ত আছে। স্ত্রী পুরুষের পৃথক বিশ্রামের স্থান, পানীয় ও ধূমপানের বন্দোবস্ত, খবরের কাগজ প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। কারণ যতক্ষণ না গাড়ী নামিয়া আইসে ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিতে হয়। গাড়ীতে পর্ব্বতশিরের দিকে মুখ করিয়া বসিতে হয়, পিঠের ঠেসগুলি বেশ উচ্চ। গাড়ী যখন পর্ব্বতগাত্রে উঠিতে থাকে তখন ইহার সম্মুখভাগ পশ্চাদ্ভাগ হইতে এত অধিক উচ্চ হয় যে, কেবল পশ্চাতের ঠেস ব্যতীত বসিয়া থাকা যায় না। ইহা চড়িতে বেশ আমোদজনক। মধ্যে আবার একটা পুলের উপর দিয়া গাড়ী চলিতে থাকে; ইহার ভাড়া অতি সামান্ত। পথের দুই দিকের পার্ব্বতীয় শোভা বড়ই নয়নমুগ্ধকর।

পর্ব্বত শিখর।—আমরা এই ট্রাম করিয়া পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়াছিলাম। ট্রাম লাইনের শেষ হইতে (Terminus) শিখর অনেক উচ্চে। ঠিক টার্মিনস্ হইতে কিয়দ্দূরে গোরাদের একটা ছোট বারিক (Barrack) আছে। এখানে গোরারা বেশ আরামে থাকে। গোরা-বারিকের সম্মুখ দিয়া একটী রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া পর্ব্বতের শিরদেশে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার মধ্যে মধ্যে বাড়ী এবং সেগুলির চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত উদ্যান। এই রাস্তা হইতে নিম্নে সমুদ্রের ও চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদ্রির শোভা বেশ মনোরম। আমরা এই রাস্তা ধরিয়া একবারে গিরিশিখরে উপস্থিত হইলাম। এখানে একটী বেশ উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে। ঠিক উদ্যানটীর মধ্যস্থলে একটী আচ্ছাদিত চবুতারা। ইহার উপর একটা নিশানের দণ্ড। সেখানে বসিবার একটা বেঞ্চ আছে। এইখানে বসিয়া চারিদিকের দৃশ্য দেখিলে মনে এরূপ একটা বিস্ময় উপস্থিত হয় যে পর্ব্বত অধিরোহণের ক্লান্তি আর থাকে না। সেখানে বসিয়া যে মহান্ দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা চিরদিন স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে। চারিদিকে বিস্তৃত পর্ব্বতরাশি, তাহার গাত্রে পারা-

বস্তের খোপের ন্যায় ছোট ছোট অট্টালিকা এবং চতুর্দ্দিকে সমুদ্রের মহান্ দৃশ্য। এ দৃশ্য বর্ণনাতীত।

প্রমোদ উদ্যান।—এই পিক্‌ট্রামওয়ের অনতিদূরে পর্ব্বতগাত্রে সান্ধ্য-বিহারের জন্য একটী বেশ সুন্দর উদ্যান আছে। উদ্যানটী পর্ব্বতগাত্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রমণ করিতে বেশ একটু ক্লান্তি অনুভূত হয়। তবে স্থানে স্থানে বসিবার বেশ সুরম্য স্থানের বন্দোবস্ত আছে। পর্ব্বতগাত্র নানাপ্রকার সযত্ন রক্ষিত তরুলতাদিতে সুশোভিত। বিটপীর কেশরীগুলি নানা ছন্দে নির্ম্মিত এজন্য বেশ নয়নতৃপ্তিকর। সান্ধ্যবায়ুসেবীদিগের পক্ষে যে ইহা বড়ই আরামপ্রদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ওয়ানচাই।—এই উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া আমরা পর্ব্বতের এক প্রান্তে উপনীত হইলাম। পর্ব্বতের এই প্রান্তের নাম "ওয়ানচাই" এ স্থানটী বেশ মনোরম। এখানে একটী সরল পথ গিরিগাত্রে উঠিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে অনেকগুলি সুন্দর চিত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একতল গৃহ বিরাজিত। সকল গৃহগুলিরই সম্মুখভাগ বেশ সুসজ্জিত; তথায় চীন ও জাপানী যুবতীরা চেয়ারে বসিয়া রসালাপ করেন। তাহারা সকলেই অভিনব বেশভূষায় সুসজ্জিত; মাঝে মাঝে এসিটিলিন গ্যাসের আলোক তাহাদের সুন্দর মুখোপরি পতিত হইয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃজন করে। স্থান, কাল, পাত্রের একত্র সমাবেশে তাহা এত মনোহর, যেন কবির কল্পনা বলিয়া মনে হয়। যেন মনে হয়, কে পর্ব্বতগাত্রে চিরবসন্তের মধ্যে নন্দনের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অমরার পারিজাত সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। হংকঙে কেনারী পাখী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যুবতীরা সুরম্য পিঞ্জরে বিহগদের ঝুলাইয়া রাখে। তাহাদের কল কল গীতিতে স্থানটী মুখরিত। যুবতীরা বিদেশী দেখিলে মুচকি হাসে, ডাকিয়া কথা কয়, ও পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়ে। বিদেশীদের পক্ষে এ স্থান দেখিবার যোগ্য হইলেও সকল সময়ে নিরাপদ নহে।

ব্যবসাবাণিজ্য।—ইংরাজের উপনিবেশ হইলেও, এখানে চীনেরাই প্রধান ব্যবসায়ী। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় পার্সী সম্প্রদায়েরও অনেক দোকান আছে। আমি কুইন্‌স্‌রোড সেণ্ট্রালে "ওয়াসিমল" নামক একজন পারসীকের দোকানে গিয়াছিলাম। তাঁহার দোকানে নানা প্রকারের সিল্ক ও জরীর কারুকার্য্য বিক্রীত হইয়া থাকে। জরীর কার্য্যটা সমস্তই ভারতে প্রস্তুত। আমি

ইয়োকোহামায়ও পার্শীদের দোকান দেখিয়াছি, ইহারা যথার্থ ব্যবসায়ী বটে। এখানে বেতের নানা প্রকার তৈজসাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বেতের কেদারা, বেতের সোফা, বেতের টেবিল, বেতের সকল প্রকার দ্রব্যই দেখিলাম। চন্দন কাষ্ঠের নানা প্রকার বাক্স ও সিন্দুক বেশ স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কাঠের খেলনায় এবং মাটীর অতি ছোট ছোট পুত্তলিকায় চীন শিল্পের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

রাত্রে হংকঙের শোভা।—সমুদ্রবক্ষ হইতে রাত্রে হংকঙের শোভা বড়ই মনোহর। পর্ব্বতগাত্রে সকল বাটীতেই নানাবর্ণে আলোক প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। অন্ধকারে পর্ব্বত দৃষ্ট হয় না। মনে হয় যেন নানাবর্ণের তারকারাজি আকাশ হইতে নামিয়া ধরার এক প্রান্তে উদিত হইয়াছে। এ শোভা বড়ই চিত্তাকর্ষক।

সমুদ্রবক্ষে নৌকা-বিহার।—হংকঙে একটা অপূর্ব্ব প্রথা দেখিলাম। সভ্য জগতের মধ্য কোথাও এ প্রথা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। পূর্ব্বে যে সকল নৌকার কথা বলিয়াছি, তাহাদের অধিকারীরা রাত্রে রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বড় একটা যাত্রী লইয়া যাইতে চাহে না। কিন্তু অনেক চীন যুবতী নৈশ-ভ্রমণের জন্য নৌকাস্বামী বা স্বামিনীদের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। প্রায় রাত্রে আহারাদির পর এই সকল যুবতীরা অভিনব সাজসজ্জায় আপনাদের দেহ সুশোভিত করিয়া সাগরবক্ষে নৈশবিহার করিয়া থাকেন। যুবতী-দাঁড়ি দাঁড় টানিতেছে, যুবতী-মাঝি হাল ধরিয়াছে, যুবতী-যাত্রীরা গান গাহিতেছে। বোধ হয় সে গানের মর্ম্ম :—

"তরী ধীরে বাহ, যেন না যায় টলে—"

এক নৌকায় ৭।৮টী যুবতীর কম হইবে না। যুবতীদের মধ্যে কাহার শিরে বিচিত্র পুষ্পে সুশোভিত সুচিক্কণ কবরী, কাহারও পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী, ললাটে কেশদাম কুঞ্চিত কবরীতে পরিণত। যুবতীদের পদযুগল সুগঠিত স্বাভাবিক। পরণে ঢিলা পায়জামা, অঙ্গে বেশ কাল ডুরির কাজ করা আসমানি রঙ্গের চায়না কোট। কোন কোন নৌকায় একজন বৃদ্ধা যুবতীদের তত্ত্বাবধারণ করে। অপর নৌকায় তাঁহারা স্ব স্ব প্রধানা। যুবতীরা এই প্রকারে অনেক রাত্রি অবধি বিহার-সুখ উপভোগ করিতে থাকেন। আবার বন্দরস্থিত জাহাজগুলিতে যাইয়া জাহাজের কর্ম্মচারী বা যাত্রীদের সহিত রহস্যালাপেও সময় অতিবাহিত করেন। অনেকে একটু আধটু ইংরাজী বলিতে পারায় আমোদ-প্রমোদের

বিশেষ অসুবিধা হয় না। এরূপ আনন্দে কখন কখন অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত করিতেও যুবতীরা কুণ্ঠিত হয় না।

কুলুন।—হংকঙ হইতে ষ্টীমারে করিয়া অপর পারে "কুলুনে" যাইতে হয়। ভাড়া তিন পয়সা মাত্র। "কুলুন" হইতে "ক্যান্টন্" পর্য্যন্ত এখন একটী ক্ষুদ্র রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। কুলুন সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সমতল ভূমির উপর নির্ম্মিত। রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত। এখানে সৈন্যদের জন্য একটা বৃহৎ ব্যারিক আছে। তন্মধ্যে শিখ্ সৈন্যই অধিক। একটী বেশ বৃহৎ মিলিটারি হস্পিটাল দেখিলাম। সেখানকার ডাক্তার আমাদের দেশীয় একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। তিনি আমাদের সহিত এক জাহাজে ভারতবর্ষ হইতে পরিবার লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া খুব সমাদরের সহিত আমাদের সহরটী দেখাইয়াছিলেন।

কুলুনের ঠিক মধ্যস্থলে ভগ্ন মাস্তলের আকৃতি একটী স্তম্ভ প্রোথিত আছে। তাহার চারিদিকে অনেক সাহেবের নাম লেখা। ১৮৯৯ সালে একবার ভীষণ "টাইফুনে" একখানা বৃহৎ অর্ণবপোত কুলুনের কূলে আসিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। সেই সময়ে অনেকগুলি জাহাজের লোক মারা পড়ে। ঐ স্তম্ভ তাহাদের ও সেই জাহাজখানির স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

কুলুনের বাটীগুলি বেশ পৃথক পৃথক অবস্থিত। অনেকগুলি বাটির চারিদিকে প্রশস্ত উদ্যানও দেখিতে পাওয়া যায়। সকল অট্টালিকাই ইষ্টক নির্ম্মিত। হংকঙে স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে অনেক ইংরাজ এই খানেই বসবাস করিতেছেন। এখানে চীন অধিবাসীর সংখ্যা অল্প।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম।

বৌদ্ধ-সাহিত্যে রামায়ণী-কথা।*

["জাতক" নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থে আমাদের পবিত্র রামায়ণ-কথা কিরূপ অসাধারণ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, নিম্নলিখিত প্রবন্ধ তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিবে—লেখক।]

পূর্ব্বকালে বারাণসী নগরে দশরথ নামে একজন পরম ধার্ম্মিক নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর মধ্যে প্রধানা মহিষী দুই পুত্র ও

* The Jatak, Edited by V. Fausboll, Vol. IV. P. 123.

এক কন্যা প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম পণ্ডিত, কনিষ্ঠ লক্ষ্মণকুমার, কন্যার নাম সীতা। মাতৃস্নেহোপভোগের শুভ মুহূর্ত্ত সুখময় বাল্য জীবন অতীত হইতে না হইতেই তিনটী ভাই বোন সহসা মাতৃহীন হইল। জ্যেষ্ঠা পত্নীর বিয়োগ ব্যথায় রাজা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরে অমাত্যবর্গের বিবিধ হিতোপদেশে শোকবেগ কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে রাজা যথাবিধি মহিষীর পারত্রিক কৃত্য সম্পন্নপূর্ব্বক দ্বিতীয় পত্নীকে প্রধানা মহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই দ্বিতীয় পত্নী প্রাধান্য লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজা দশরথের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া লইল। ফলে সে রাজার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা হইয়া পড়িল। কিছুদিন পরে এ রাণীরও এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার নাম রাখা হইল— ভরতকুমার। রাজা নবজাত তনয়ের স্নেহাতিশয়ে মুগ্ধ হইয়া পত্নীকে বলিলেন, —"ভদ্রে, তোমাকে বর দিতেছি, গ্রহণ কর।" রাজ্ঞী তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া স্বীয় পুত্রের ষষ্ঠবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজাকে একদিন বলিলেন,—"আর্য্য, তুমি আমাকে বর দিতে চাহিয়াছিলে, আজ আমি সেই বর প্রার্থনা করিতেছি।"

রাজা।—"বল, তোমার কি অভিপ্রায়।"

রাজ্ঞী।—"দেব, আমার পুত্রকে রাজ্য প্রদান কর।"

রাজা।—"পাপীয়সি, তুমি মর। ইন্দ্র চন্দ্রের মতন আমার দুই উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া তোমার পুত্রের জন্য রাজ্য চাহিতেছ ?"

রাজার রোষ-লোহিত লোচনের তেজঃপূর্ণ দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া রাজ্ঞী ভয়-চকিত হৃদয়ে শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সে দিন আর কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাহার পর প্রায় প্রতিদিনই পুত্রের রাজ্যের জন্য রাজাকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। বার বার রাজ্ঞীর এইরূপ অনুচিত আবদার শুনিয়া রাজা ভাবিলেন,—"অল্পবুদ্ধি স্ত্রীজাতি হিতাহিতবিবেকশূন্য ; নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য হইলে সেই অন্তরায়ের উচ্ছেদের নিমিত্ত ইহারা না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। আমি ইহার পুত্রকে রাজ্য দিব না নিশ্চিতই, কিন্তু যদি সেই আক্রোশে এই অকৃতজ্ঞা কূটবুদ্ধিপ্রভাবে উৎকোচাদি প্রদান করিয়া কোনও উপায়ে আমার পুত্রদ্বয়কে মারিয়া ফেলে! সুতরাং কিছুদিনের জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে স্থানান্তরিত করাই সমীচীন।" ইহা ভাবিয়া রাজা একদিন উভয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন,—"বাবা, তোমাদের এখানে থাকি- বার পক্ষে নানারূপ অন্তরায় উপস্থিত। সুতরাং তোমরা কিছুকাল অন্যত্র

কোনও সামন্তরাজ্যে বা অরণ্যে গিয়া বাস কর। আমার মৃত্যুর পর আসিয়া কুলাগত রাজ্যভার গ্রহণ করিও।" রাজা জ্যোতির্বিদগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহার আয়ুঃকাল আর দ্বাদশ বৎসর। সেইজন্য আবার বলিলেন, "আজ হইতে বার বৎসর পরে আসিয়া রাজচ্ছত্রের অধিকারী হইও।"

রাম ও লক্ষ্মণ পিতার আদেশ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক জনক জননীর চরণ বন্দনা করিয়া সাশ্রুনয়নে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল। ভ্রাতৃদ্বয়কে যাইতে দেখিয়া সীতা বলিলেন,—"দাদাদের ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না, আমিও যাইব।" ইহা কহিয়া পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে উভয় ভ্রাতার সহিত রাজ-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তাহারা তিন জনে এইরূপে পিতৃভবন হইতে বহির্গত হইয়া চলিতে চলিতে হিমালয়ের একদেশে আসিয়া পড়িল। সে স্থানে তাহারা সুজলা সুফলা ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ফলমূল ভোজনের দ্বারা জীবনযাপন করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ ও সীতা রামের নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয়, আপনি কোনও স্থানে না গিয়া এই আশ্রমেই থাকিবেন। আমরা ফলাদি আহরণ করিয়া আপনার সেবা শুশ্রূষা করিব।" সেই দিন অবধি রাম আশ্রমেই থাকিতেন, লক্ষ্মণ ও সীতা ফলমূল সংগ্রহ করিয়া অগ্রজের সেবা করিত।

এ দিকে রাম লক্ষ্মণকে বনে পাঠাইয়া রাজা দশরথ দুঃসহ পুত্র বিরহের দারুণ আঘাতে নবম বৎসরে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। রাজার পারত্রিক কর্ম্মাদি সমাপ্ত হইলে রাজ্ঞী নিজ পুত্র ভরতকে রাজসিংহাসনে আরোহণ করাইতে চাহিলেন। কিন্তু অমাত্যেরা ভরতকে রাজা করিল না;—তাহারা বলিল, "যাহারা রাজসিংহাসনের অধিকারী, তাহারা অরণ্যে বাস করিতেছে।" 'ভ্রাতা রাম পণ্ডিতেরই রাজত্বভার গ্রহণ করা উচিত' ইহা মনে মনে স্থির করিয়া ভরত চতুরঙ্গ সেনার সহিত অরণ্যোদ্দেশে অভিযান করিল। রামের নিবাসস্থলের সন্নিহিত হইলে অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া কয়েক জন অমাত্যের সহিত ভরত শান্তিময় আশ্রমে প্রবেশ করিল। ভরত গিয়া দেখিল, রাম পণ্ডিত আশ্রমদ্বারে সুখোপবিষ্ট। তাঁহার সস্মিত মুখমণ্ডল শান্তির পবিত্র প্রস্রবণে পরিস্নাত। ভরত রামের চরণ প্রান্তে প্রণত হইয়া পিতার মৃত্যু সংবাদ কহিতে কহিতে তাঁহার পাদযুগল অনর্গল অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিয়া ফেলিল। কিন্তু রাম নিস্পন্দ—নিশ্চল। তাঁহার প্রশান্ত মুখশ্রী অবিকৃত রহিল, নয়ন হইতে

বিন্দুমাত্রও অশ্রু ঝরিল না। ভরত যখন আশ্রমে প্রবেশ করেন, তখন লক্ষ্মণ ও সীতা সে স্থানে ছিলেন না—তাঁহারা আহার্য্য সংগ্রহের জন্য অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অবিশ্রান্ত অশ্রুধারায় রুদ্ধ হৃদয়ের কতকটা ভার লাঘব করিয়া ভরত যখন গম্ভীর ও বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট, সেই সায়াহ্ন সময়ে লক্ষ্মণ ও সীতা আশ্রমে প্রত্যাগমন করিল। লক্ষ্মণ ও সীতাকে আসিতে দেখিয়া রাম ভাবিতে লাগিলেন,—"ইহারা দুইজনেই অল্প বয়স্ক, আমার ন্যায় আত্মসংযমশক্তি বা ধৈর্য্য ইহাদের নাই। তাহার উপর এইমাত্র পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছে। এ সময়ে সহসা 'পিতা আমাদের আর ইহলোকে নাই' এই অশনিসম্পাতসম হৃদয়ভেদী কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই লক্ষ্মণ ও সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। হস্তপদাদি প্রক্ষালনানন্তর শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ না হইলে ইহাদিগকে পিতৃবিয়োগের দুর্ব্বিষহ শোক সংবাদ শ্রবণ করান উচিত নহে। সুতরাং কোনও উপায়ে জল মধ্যে নামাইয়া এই দুঃসংবাদ শুনাই।" রাম তখন সম্মুখবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র জলাশয় দেখাইয়া দিয়া লক্ষ্মণ ও সীতাকে কহিলেন, "দেখ, তোমরা বড় দেরী করিয়া আসিয়াছ; সুতরাং তোমরা এই জলে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহার শাস্তিভোগ কর।"

লক্ষ্মণ ও সীতা তৎক্ষণাৎ অগ্রজের আদেশ প্রতিপালন করিল। রাম তখন তাহাদিগকে পিতার আকস্মিক বিয়োগবার্ত্তা বলিলেন,—

"এবময়ং ভরত আহ রাজা দশরথো মৃতঃ।"

সীতা ও লক্ষ্মণ এই অচিন্তনীয়—স্বপ্নাতীত ঘটনার কথা শুনিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। নিকটবর্ত্তী অমাত্যগণ তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া ভূতলে বসাইল। সীতা ও লক্ষ্মণ এবং অন্যান্য সকলে কত কাঁদিল—কত বিলাপ করিল; কাঁদিতে কাঁদিতে, বিলাপ করিতে করিতে সকলে শ্রান্ত হইয়া পড়িল কিন্তু তাহাতেও রামের মুখচ্ছবি বিন্দুমাত্রও মলিন হইল না—তিনি সমানভাবে স্থির হইয়া সব দেখিতে লাগিলেন!

তখন ভরতকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"আচ্ছা, আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভগিনী সীতা পিতার মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আর অগ্রজ রাম বিন্দুমাত্রও শোকপ্রকাশ করিলেন না বা বিচলিত হইলেন না। তিনি স্থির ধীরভাবে সমস্ত শুনিয়া গেলেন। ইঁহার শোক না হইবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করি।" এইরূপ ভাবিয়া ভরত রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"দাদা, তুমি কোন্ অমানুষিক শক্তিবলে ভীষণ শোকের সময়েও শোক

প্রকাশ করিলে না, পিতার নিদারুণ মৃত্যু সংবাদেও তিলমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিলে না ?" ইহার উত্তরে রাম ভরতকে কহিলেন,—

"আয়ুঃকাল অতীত হইলে যাঁহারা এই কর্ম্মভূমি হইতে অপসৃত হন, সহস্র চীৎকারে বুক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেও তাহাদিগকে আর পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহারা বিবেকবান্ তাহারা কি জন্য বৃথা শোক করিয়া আত্মাকে সন্তাপিত করিবে ? শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সকলেই একদিন না একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। সুপক্ক ফলসম্ভারের পতনাশঙ্কার ন্যায় জন্তু মাত্রেরই মরণের ভয় নিত্য বর্ত্তমান। প্রাতঃকালে যাহাদিগকে অক্ষতশরীরে অবস্থান করিতে দেখিলাম, সায়ংকালে তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে,—সহস্র অন্বেষণ করিয়াও আর তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। আবার সায়ংকালে যাহাদিগকে সুস্থদেহে বর্ত্তমান দেখিলাম, প্রাতঃকালে তাহাদিগের মধ্যে কেহ বা মহাপ্রস্থান করিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আসিলেও আর তাহার দর্শনলাভ করিতে পারি না।" *

রাম এইরূপে সংসারের অনিত্যতা বর্ণন করিলেন। ভরত প্রভৃতি সকলে তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া কথঞ্চিৎ শোকশূন্য হইলেন। জলধির বেলাবিপ্লাবী তরঙ্গাঘাতের ন্যায় হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশান্ত হইলে ভরত কহিলেন,—"চল দাদা, রাজ্য গ্রহণ করিবে।"

রাম।—"তাত, লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া তোমরা রাজ্যশাসন কর।"

ভরত।—"আর আপনি ?"

রাম।—"পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে পর আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিও। সুতরাং আমি এ সময়ে গিয়া তাঁহার আজ্ঞার

* "যন্ন শক্যং পালয়িতুং পুরুষেণ লপতা বহু।
স কস্মৈ বিজ্ঞো মেধাবী আত্মানমুপতাপয়েৎ॥
আঢ্যাশ্চৈব দরিদ্রাশ্চ সর্ব্বে মৃত্যুপরায়ণাঃ।
ফলানামিব পক্কানাং নিত্যং প্রপতনাদ্ ভয়ম্॥
এবং জনানাং মর্ত্ত্যানাং নিত্যং মরণতো ভয়ম্।
সায়মেকে ন দৃশ্যন্তে প্রাতর্দৃষ্টা বহুজনাঃ॥
প্রাতরেকে ন দৃশ্যন্তে সায়ং দৃষ্টা বহুজনাঃ।"

—মূল পালির সংস্কৃত ভাষান্তর।

অন্যথা করিব না। আরও তিন বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত করিয়া আমি রাজধানীতে গমন করিব।"

ভরত।—"দাদা, তাহা হইলে এত দিন রাজ্য করিবে কে?"

রাম।—"তোমরা করিও।"

ভরত।—"না দাদা, আমরা রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারিব না।"

"তবে এক কাজ কর, আমার এই পাদুকা লইয়া যাও; যতদিন আমি না যাইব, ততদিন এই পাদুকাকে সম্মান করিয়া রাজ্য পরিচালিত করিও।" রাম ইহা কহিয়া নিজ তৃণ নির্ম্মিত পাদুকাযুগল উন্মোচন করিয়া ভরতের হস্তে প্রদান করিলেন। তখন অগত্যা তাঁহারা তিন জন রামের চরণ বন্দনা করিয়া সমভিব্যাহারী লোকজনের সহিত রাজধানী বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাদুকার প্রাধান্যে তিন বৎসর রাজ্য পরিচালিত হইল। অমাত্যবর্গ রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত সেই তৃণপাদুকার নিকটে আসিয়া রাজকীয় বিচারিত বিষয়ের নিবেদন করিতেন। তাহাতে কোনও ভ্রমপ্রমাদ থাকিলে পাদুকাদ্বয় পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত করিয়া শব্দ করিত। তখন অমাত্যগণ পুনর্ব্বার বিচার করিতেন। বিচারে কোনও ভ্রান্তি না থাকিলে পাদুকাদ্বয় নিঃশব্দ হইত।

তিন বৎসর অতীত হইলে পর রাম পণ্ডিত অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া একেবারেই প্রাসাদে প্রবেশ না করিয়া প্রথমতঃ এক উদ্যানে গমন করেন। লক্ষ্মণ ও ভরত তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাইয়া অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে সেই উদ্যানে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে সীতাদেবীকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিয়া সকলে রাম ও সীতার অভিষেকোৎসব সম্পন্ন করিলেন। তখন রাম ও সীতাদেবী সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাধুমধামের সহিত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং সেই অবধি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গারূঢ় হইলেন।*

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধ মূল পালির সংস্কৃত ভাবান্তরের ভাবানুবাদ।—লেখক।

বিষ্ণুসংহিতায় দণ্ডবিধি।

(৭)

কোন্ অপরাধে অপরাধীকে কি দণ্ড পাইতে হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন কতকগুলি কুকার্য্যকে একেবারে অপরাধের গণ্ডীর বাহির করিয়া দিয়াছে। সপ্তম বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকবালিকা কোনও অপরাধ করিলে তাহাদিগকে অপরাধী হইতে হয় না ; অপরিণতবুদ্ধি বা স্বল্পমেধাবিশিষ্ট দ্বাদশ বর্ষের ন্যূন বয়সের বালকবালিকাও অপরাধী হইলে ঐ নিয়মে অব্যাহতি লাভ করে ; পাগলে কুকর্ম্ম করিলে তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হয় না। কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কাহাকেও মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া তাহাকে আইন-নিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলে সে ব্যক্তি আইনের চক্ষে শাস্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। চিকিৎসক রোগীর হিতের জন্য তাহাকে বিষ প্রয়োগ করিলে যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে চিকিৎসককে নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হইতে হয় না। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি কুফলপ্রসূ কার্য্যকে অপরাধের গণ্ডীর বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।•

ইংরাজী আইন সকল প্রজাকে 'আত্মরক্ষার স্বত্ব' (Right of Self-defence) নামক একটা স্বত্ব প্রদান করিয়াছে। অনেক সময় শান্তিরক্ষক রাজপুরুষগণ আসিয়া সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই লোকের শরীর ও সম্পত্তি নষ্ট করিয়া অপরাধী পলাইতে পারে। সুতরাং সকল কার্য্যেই শান্তি রক্ষার জন্য রাজপুরুষদিগের সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতে গেলে অনেক সময় শোকাবহ দুর্ঘটনায় সমাজ কলুষিত হইতে পারে। এই আত্মরক্ষার স্বত্ব দ্বিপ্রকারের—প্রথমতঃ দেহ সম্বন্ধীয় কোনও অপরাধের হস্ত হইতে আপনার ও অপরের শরীর রক্ষা করিবার স্বত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ চৌর্য্য, দস্যুতা, অনধিকার প্রবেশ অথবা এই সকল অপরাধের চেষ্টা হইতে নিজের ও পরের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করিবার স্বত্ব।

এইরূপ বিধির অনুরূপ বিধি বিষ্ণুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। মহামুনি বিষ্ণু বলেন—

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি।

গুরু, বালক, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বা নানাশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিও আততায়ী হইয়া আসিলে তাহাকে বিচার না করিয়াই হত্যা করিবে। গোপনেই হউক বা প্রকাশ্যেই হউক, আততায়ী বধে হন্তার কোনও দোষ নাই বরং আততায়ীকে বধ না করিলে দোষ। কোন্ ব্যক্তিকে আততায়ী বলা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে মহামুনি বলেন—

> উদ্যতাসিবিষাগ্নিশ্চ শাপোদ্যতকরং তথা
> আথর্ব্বণেন হন্তারং পিশুনঞ্চৈব রাজসু
> ভার্য্যাতিক্রমিনঞ্চৈব বিদ্যাৎ সপ্তাততায়িনঃ
> যশোবিত্তহরানন্যানাহুর্ধর্ম্মার্থহারকান্।

অসির আঘাত করিতে উদ্যত, বিষদানোদ্যত, অগ্নিপ্রদানোদ্যত, শাপদানার্থ উদ্যত হস্ত, অভিচারাদি কার্য্য দ্বারা মারিতে উদ্যত, রাজসকাশে কুৎসাকারী এবং ভার্য্যাপহারী এই সাতজন আততায়ী। ইহা ব্যতীত কীর্ত্তিহারক, ধনাপহারী, ধর্ম্ম কর্ম্ম বিনাশীকেও পণ্ডিতগণ আততায়ী বলিয়া থাকেন।

ইংরাজী আইনের সহিত এই আততায়ী বধের সত্ব মিলাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আধুনিক পাশ্চাত্য দণ্ডবিধি অপেক্ষা সাধারণ প্রজাকে স্বহস্তে উপস্থিত অপরাধ-দমনের অধিক ক্ষমতা প্রদান করিত। প্রাচীন হিন্দুর সমস্ত জীবনটাই ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার আদর্শ প্রাচীন ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল বলিয়াই মহামুনি বিষ্ণু বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মকর্ম্ম বিনাশীকে উত্তেজিত হইয়া মারিয়া ফেলিলেও অপরাধ হয় না। আমেরিকার দার্শনিক পণ্ডিত এমারসন্ কোনও প্রাচীন জাতির ইতিহাস পাঠ করিবার পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"Every law which the state enacts indicates a fact in human nature ; that is all. We must see the necessary reason of every fact—see how it could and must be. So stand before every public and private work....We assume that we under like influence should be like affected, and should achieve the like." "রাষ্ট্র মধ্যে প্রত্যেক প্রবর্ত্তিত আইনটি মানব প্রকৃতির একটি অবস্থা মাত্র সূচনা করে। কথাটাই এই। প্রত্যেক ঘটনার আমরা আবশ্যক কারণ অন্বেষণ করিব, দেখিব সে ঘটনা কিরূপে ঘটিতে পারিত এবং নিশ্চয় ঘটিত। এইরূপ ভাবে প্রত্যেক সাধারণ ও ব্যক্তিগত কার্য্যের সম্মুখীন হও।...আমরা মানিয়া লই যে সমরূপ প্রভাবে

আমরা সমরূপ ভাবে প্রভাবান্বিত হই এবং সমান ফললাভ করি।" তাঁহার কথার সহিত মিলাইয়া দেখিলে হিন্দুজাতির আততায়ী বিনাশের নীতির আধুনিক নীতি হইতে পার্থক্যের কারণ অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠান যেরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল তাহাতে অস্মদ্দেশে এরূপ প্রথা যে প্রচলিত থাকিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। সতীত্ব রক্ষা সম্বন্ধীয় আততায়ী হত্যার নীতি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় দণ্ডবিধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুজাতির সতীত্বের আদর্শের সমতুল্য আদর্শ প্রাচীন ও আধুনিক কোনও জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। যে লোক রমণীর সতীত্ব রত্ন অপহরণ করিতে উদ্যত তাহাকে বধ করিলে যে হিন্দুজাতির চক্ষে অপরাধ করা হইবে না সে কথা স্মৃতিশাস্ত্রকার বিষ্ণু মুনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া না দিলেও, ইতিহাসপাঠকের পক্ষে সে বিধান অনুমান করিয়া লইতে কষ্ট হইত না।

আত্মরক্ষার্থ প্রত্যেক কার্য্যের জন্য পাশ্চাত্য বা প্রাচীন হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্র নরহত্যার ব্যবস্থা করে নাই। আততায়ীকে তাড়াইবার জন্য বা তাহার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যতটুকু কাঠিন্যের আবশ্যক তাহা অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা উভয় ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয়। বৃহস্পতি বলেন—

আক্রোষ্টস্তু যদা ক্রোশং তাড়িতঃ প্রতিতাড়য়ন্
হত্বাততায়িনঞ্চৈব নাপরাধী ভবেন্নরঃ।

আক্রোশকর্ত্তার উপর আক্রোশ করিলে এবং যে ব্যক্তি দণ্ডাদি দ্বারা তাড়না করে তাহাকে প্রতিতাড়না করিলে বা আততায়ীকে হত্যা করিলে মানুষ অপরাধী হয় না।

অপরাধের শাস্তি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন প্রথমেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছে এবং তাহার পরের অধ্যায়ে সৈন্যাদির বিদ্রোহদমনের ব্যবস্থা করিয়াছে। বলা বাহুল্য, অদ্যাবধি পৃথিবীতে এমন কোনও রাজশক্তি আধিপত্য বিস্তার করে নাই যাহা সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়াছে। রাষ্ট্রের হিতের জন্যই রাজশক্তির আবশ্যক সুতরাং যাহাতে দুষ্টলোকের দ্বারা সেই রাজশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করা না হয় তাহার বিধান স্বভাবতঃই সকল দেশে দৃষ্ট হয়। বর্ব্বর পশু-ভাবাপন্ন অসভ্য নেতাও বিদ্রোহদমনের আইন প্রথমেই প্রবর্ত্তিত করে। মনুসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতিতে এ বিষয়ের আইন প্রভূত পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ভগবান মনুর মতে—

অরাজকেহি লোকেস্মিন সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।

যেহেতু পৃথিবীতে রাজা না থাকিলে সকল ব্যক্তির ভয় নিবারণ হয় না সেই নিমিত্ত ভগবান্ সর্ব্বজীবের রক্ষার্থ রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং "যে চাকুলীনা রাজ্যমভিকাময়েয়ুঃ" বিষ্ণু তাঁহার অপরাধকে মহাপাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহার বধব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইংরাজী দণ্ডবিধিতে অবৈধ জনতা বা বহু ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া এক ব্যক্তিকে বা অপর দলকে প্রহারের প্রতিবিধানের জন্য আইন দৃষ্ট হয়। আধুনিক ভারতীয় দণ্ডবিধিতে এ সকল অপরাধ সাধারণের শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে বিধান করিতে বিষ্ণুসংহিতাও বিস্মৃত হয় নাই।

"একং ঘ্নতাং বহুনাং প্রত্যেকমুক্তাদ্দণ্ডাদ্বিগুণং।"

বহু ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া এক ব্যক্তিকে প্রহার করিলে প্রত্যেকের দ্বিগুণ দণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বিধান আছে—

"একং ঘ্নতাং বহূনাঞ্চ যথোক্তাদ্দ্বিগুণং দমঃ
কলহাপহৃতং দেয়ং দণ্ডশ্চ দ্বিগুণ স্মৃতঃ।"

"বহু লোক মিলিয়া এক ব্যক্তিকে প্রহার করিলে দ্বিগুণ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। কলহে কোনও দ্রব্য অপহৃত হইলে অপরাধীকে সে দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিতে হইবে এবং দ্বিগুণ দণ্ডভোগ করিতে হইবে।"

শুধু তাহাই নহে, প্রহারার্ত্ত ব্যক্তির কাতর ক্রন্দনে যে সকল ব্যক্তি তাহাকে উদ্ধার করিতে গমন না করিত এবং যে সকল লোক সে স্থল হইতে পলায়ন করিত তাহাদিগেরও দ্বিগুণ দণ্ড হইত।

প্রাচীন ভারতের অবৈধ জনতা সম্বন্ধীয় নিয়মাদি অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে কাপুরুষতার উপর প্রাচীন হিন্দুজাতির ঘৃণা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিপন্নের উদ্ধার করাও প্রত্যেক প্রজার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত। আধুনিক জগতে এক ব্যক্তি বহু কর্ত্তৃক অপরের নিগ্রহের নীরব দ্রষ্টা হইলে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। প্রাচীন ভারতের নীতি কিন্তু অন্য প্রকার ছিল। বলা বাহুল্য, সে আদর্শই শ্রেষ্ঠ।

আমাদিগের আধুনিক দণ্ডবিধিতে নবম অধ্যায়ে রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক উৎকোচ গ্রহণ, তাহাদিগকে উৎকোচ প্রদান ইত্যাদি অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য, প্রাচীন হিন্দুজাতি উৎকোচ গ্রহণ বা উৎকোচ প্রদানকে

বড় গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করিত। এ বিষয়ে মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক ব্যবস্থা আছে। উৎকোচ গ্রহণ করিলে রাজকর্ম্মচারীর নৃপতি কর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইবার বিধি বিষ্ণুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে, ইংরাজী আইন সেই মিথ্যা অভিযোক্তাকে দণ্ড প্রদান করে। মনুসংহিতায় আমরা এ আইনের অনুরূপ ব্যবস্থা পাই।

তিনি বলিয়াছেন—

অবেদয়ানো নষ্টস্য দেশং কালঞ্চ তত্ত্বতঃ
বর্ণং রূপং প্রমাণঞ্চ তৎসমং দণ্ডমর্হতি।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নষ্টদ্রব্যের দেশ, কাল, বর্ণ, রূপ এবং প্রমাণ দিতে পারে না অথচ দ্রব্যের দাবী করে, রাজা তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন।

মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান করার অপরাধ সম্বন্ধে আইন লিপিবদ্ধ করিবার সময় ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রণেতা মেকলে সাহেব ভাবিয়াছিলেন, বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান করা যে একটা গুরুতর অপরাধ এ নীতি ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করিয়া তিনি আমাদিগকে এক উচ্চ আদর্শের নীতি শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে বাঙ্গালী জাতি মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া নীতিবিগর্হিত বলিয়া মনে করে না। বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে তাঁহার সেই গ্লানিসূচক ছত্র কয়টি ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালী-মাত্রেরই হৃদয়ে গভীর মর্ম্মপীড়া উপস্থিত করিয়াছে। হিন্দুজাতির শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সকল গ্রন্থে সত্যকে কিরূপ উচ্চস্থান প্রদান করা হইয়াছে, তাহা এ স্থলে আবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছি মাত্র। সকল জাতিরই ধর্ম্মগ্রন্থে সত্যের আদর ও মিথ্যার নিবৃত্তির জন্য ভূরি ভূরি বচন ও উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া বিবাদস্থলে লোকে সর্ব্বদা সত্য ব্যতীত মিথ্যার আশ্রয় লইবে না এরূপ আশা করিতে পারা যায় না। সুতরাং প্রত্যেক জাতির সত্যের উপর অনুরাগ বুঝিতে গেলে আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হয় শাসনকর্ত্তাদিগের পার্থিব বিচারে বিচারালয়ে মিথ্যাভাষী কোন্ দেশে কিরূপ ভাবে দণ্ডিত হইয়া থাকে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে কেবল যে সাক্ষীকেই পাপী হইতে হয় তাহা নহে। ভগবান মনু বলিতেছেন যে সাক্ষ্যের মিথ্যা বাক্যের অসারবত্তা ধরিতে না পারিয়া বিচার করিলে রাজা এবং সভাসদদিগকে পাদ পাদ পাপের ভাগ গ্রহণ করিতে হয়।

পাদোঽধর্ম্মস্য কর্ত্তারং পাদঃ সাক্ষিণ ঋচ্ছতি
পাদঃ সভাসদঃ সর্ব্বান্ পাদো রাজানমৃচ্ছতি।

বিচারকর্ত্তা সাক্ষীর বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিবার উদ্দেশ্যে অর্থী বা প্রত্যর্থীকে ব্যবহার জিতাইয়া দিলে চলিত না। হিন্দু বিচারককে বুঝিতে হইত যে সাক্ষীর মিথ্যা বাক্যের পাপের ভাগ তাহার স্কন্ধে ও তাহার সুরেন্দ্রদিগের অংশে নির্দ্দিষ্ট নৃপতির স্কন্ধে পতিত হইবে, সুতরাং তাহাকে সত্য আবিষ্কারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। কেবল নথি সাফ রাখিতে পারিলে বা বাস্পীয় যানের গতিতে মোকদ্দমা বিচার করিয়া দিতে পারিলেই বিচারক যশস্বী হইতেন না বা বিবেকের কশাঘাতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না।

নারদমুনি বলিয়াছিলেন—

অশ্বমেধ সহস্রন্তু সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥

অর্থাৎ "সহস্র অশ্বমেধের ফল এবং সত্যের ফল তুলাদণ্ডে ধারণ করিলে দেখা যায় যে অশ্বমেধ সহস্রের ফলাপেক্ষা সত্যের ফল অধিক।" আধুনিক বিচারালয়ে যেমন সাক্ষ্যকে শপথ করিতে বলা হয়, প্রাচীন ভারতে তেমনি সাক্ষীকে শপথ করাইয়া নিম্নোক্ত মনুবাক্য ও পূর্ব্বোক্ত নারদবাক্য শ্রবণ করান হইত।

ব্রহ্মঘ্না যে স্মৃতা লোকে যে চ স্ত্রীবালঘাতিনাঃ
মিত্রদ্রুহ কৃতঘ্নাশ্চ তে তে স্যু র্ব্রুবতোমৃষা।

"ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীবালকমিত্রাদি হত্যা করিলে যে পাপ হয় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে সেই পাপ হয়।" আধুনিক ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষে সাক্ষীকে কি বলিয়া শপথ বা অঙ্গীকার করিতে হয় তাহা বোধ হয় পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বঙ্কিমবাবুর 'কমলাকান্ত' শপথ গ্রহণ করিতে হাকিমকে কিরূপ বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল সে সকল কথাও বঙ্গসাহিত্য-পাঠকের নিকট অবিদিত নহে। প্রাচীন ভারতে কিরূপ শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিতে হইত, সে সম্বন্ধে আমরা ভগবান মনুর বচন উদ্ধৃত করিব।

সত্যেন শাপয়েদ্বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ
গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈশ্চ পাতকৈঃ।

অর্থাৎ "আমি সত্য বলিব একথা বলিয়া ব্রাহ্মণ শপথ করিবেন; সত্য না বলিলে আমার বাহন, আয়ুধাদি নিষ্ফল হইবে এই শপথ ক্ষত্রিয় করিবেন; বৈশ্য বলিবে আমি যদি মিথ্যা বলি তাহা হইলে আমার গোবীজ কাঞ্চনাদি সমস্ত বিনষ্ট হইবে; আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে আমার সকল পাতক হইবেক, এই কথা বলিয়া শূদ্র শপথ করিবে।"

শপথের প্রকার ভেদ হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, যাহাতে সাক্ষীগণ বিচারালয়ে মিথ্যা কথা না বলিতে সাহস করে তজ্জন্ত শাস্ত্রকারগণ যথেষ্ট বিধান করিয়াছিলেন। যাহারা পরজন্মের ভয় করে না তাহারা মিথ্যা কথা বলিলে এ পৃথিবীর সমস্ত বাঞ্ছনীয় ও সুখকর পদার্থ হইতে বঞ্চিত হইবে, অন্ততঃ এই ভয়েও যাহাতে লোকে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিতে বিরত হয়, তাহারই প্রতিবিধান করিবার জন্য ঐরূপ শপথের সৃষ্টি।

পর জন্মের শাস্তির ভয় দেখাইয়াও যাহাতে লোকে মিথ্যা সাক্ষ্যদান না করে তজ্জন্যও শাস্ত্রকারগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদিগের নাই। তবে বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় দুই একটা বচনের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভগবান মনু বলেন—

জন্ম প্রভৃতি যৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যং ভদ্র ত্বয়ার্জ্জিতং
তত্তে সর্ব্বং শুনো গচ্ছেৎ যদি ব্রূয়াস্তমন্যথা।

অর্থাৎ 'হে ভদ্র তুমি যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দাও তবে জন্মাবধি তুমি যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ তাহা কুকুরের নিকট গমন করিবে।' অপিচ—

নগ্নোমুণ্ডঃ কপালেন ভিক্ষার্থী ক্ষুৎপিপাসিতঃ
অন্ধঃ শত্রুকুলং গচ্ছেদ্যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ।

'যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে সে অন্ধ হইবে এবং বস্ত্র পর্য্যন্ত হীন হইয়া এত দরিদ্র হইবে সে ক্ষুধাপিপাসায় কাতর হইয়া অপকৃষ্ট ভিক্ষা পাত্র হস্তে করিয়া শত্রুকুলে ভিক্ষা করিবে।'

অবাক্শিরাস্তমস্যন্ধে কিল্বিষী নরকং ব্রজেৎ।
যঃ প্রশ্নং বিতথং ব্রূয়াৎ পৃষ্টঃ সন্ ধর্ম্মনিশ্চয়ে।

যে ধর্ম্ম নির্ণয় কালে জিজ্ঞাসিত হইলে, প্রশ্নের মিথ্যা উত্তর দান করে, সে পাপাত্মা অধোমুখ হইয়া ভয়ানক অন্ধকারপূর্ণ নরকে গমন করিবে।

কোন্ বিষয়ে মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে কিরূপ পাপ হয় মনু তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। হিরণ্যার্থে মিথ্যা সাক্ষ্য কথনে জাত অজাত পুত্রাদি হননের পাপভাগী হইবে, ইত্যাদি। যিনি ব্যবহার বিষয় কোনও কথা পরিজ্ঞাত হইয়া সাক্ষ্যদানে স্বীকৃত না হন, তাঁহার কূট সাক্ষ্য দানের সমান পাপ হয়। সত্য সাক্ষ্যদানের ফল সম্বন্ধে ভগবান মনু বলেন—

সত্যং সাক্ষ্যং ব্রুবন্ সাক্ষী লোকানাপ্নোতি পুষ্কলান্
ইহচানুত্তমাং কীর্ত্তিং বাগেষা ব্রহ্মপূজিতা।

অর্থাৎ সাক্ষ্যদান কালে যে সাক্ষী সত্য বলেন, তিনি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এই ইহ লোকে উত্তম কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন, যেহেতু স্বয়ং ব্রহ্মা সত্যবাক্যকে পূজা করেন।

মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানের শাস্তি সম্বন্ধে মহামুনি বিষ্ণু বলিয়াছেন—

"কূটসাক্ষিণাং সর্ব্বস্বাপহারঃ কার্য্যঃ।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষী দিবে রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইবেন।

আমাদিগের পিনালকোডের একাদশ অধ্যায়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদান প্রভৃতি ব্যতিরেকে দস্যু তস্কর প্রভৃতিকে আশ্রয়দান করা অপরাধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অপরাধীকে আশ্রয়দান করা যে অত্যন্ত অবৈধ তাহা হিন্দুশাস্ত্রকারগণ উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

"প্রসহ্যতস্করাণাঞ্চাবকাশভক্তপ্রদাশ্চ"

এই বাক্যদ্বারা মহামুনি বিষ্ণু এইরূপ অপরাধের জন্য বধব্যবস্থা করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

ভক্তাবকাশাগ্ন্যুদকমন্ত্রোপকরণব্যয়ান্
দত্বা চৌরস্য হন্তুর্ব্বা জানতো দম উত্তমঃ।

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ চোর কিম্বা হত্যাকারীকে আহার, থাকিবার স্থান, শীতাপনোদন জন্য অগ্নি, তৃষ্ণার জল, অকার্য্যে মন্ত্রণা, তাহার উপকরণ ও সেই কার্য্যের ব্যয় প্রদান করে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। কেবল তাহাই নহে। যাহারা উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক কোনও মহাপরাধীকে ছাড়িয়া দেয় মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য তাহাদেরও শাস্তির বিধান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন পরদার-গামীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া কেহ তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে।

ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পিনালকোড সরকারী মুদ্রা ও ষ্ট্যাম্প জাল করা প্রতিরোধের জন্য শাস্তির বিধান করিয়াছে। অস্মদ্দেশে প্রাচীন কালে আধুনিক ষ্ট্যাম্পের অনুরূপ কোনও পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তো অদ্যাবধি কোনও গ্রন্থে পাঠ করি নাই। সুতরাং ষ্ট্যাম্প জাল সম্বন্ধে কোনও বিধান মনুসংহিতা বা ঊনবিংশতি সংহিতার মধ্যে কোথাও দৃষ্ট হয় না। যে দ্রব্য দেশে ছিল না তাহার সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে বিধান নাই বলিয়া যে হিন্দুশাস্ত্রকে অসম্পূর্ণ বলিবে সে বাতুল। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতে ঠিক আধুনিক অর্থে সঙ্কেত মুদ্রার (token money) বিশেষ প্রচলন

ছিল না। মুদ্রার মূল্য ও ধাতুর মূল্যে পার্থক্য থাকিত না বলিয়া আমার বিশ্বাস। "সৌবর্ণীং রাজতীং তাম্রীসায়সীং বা সুশোভিতাম্"—নানাপ্রকার মুদ্রা অস্মদ্দেশে প্রচলিত ছিল। বিশিষ্টভাবে মুদ্রাজালের সম্বন্ধে কোনও বিধান বিষ্ণুসংহিতায় দেখি না। বোধ হয় সাধারণ জাল করার অপরাধীর মত মুদ্রাজালকারীও দণ্ডনীয় হইত।

তবে বিষ্ণুসংহিতায় পঞ্চমাধ্যায়ে বিধান আছে—

"কূটশাসনকর্ত্তৄংশ্চ রাজা হন্যাৎ"

এস্থলে কূটশাসন অর্থে তাম্রশাসনাদি জাল করার অপরাধই বোধ হয় কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুসংহিতার মতে মুদ্রাজাল এই বিধির মধ্যে পড়িবে কি "কূটলেখ্য" অপরাধের অন্তঃবর্ত্তী হইবে তাহা ঠিক বলিতে পারি না।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় কিন্তু স্পষ্ট করিয়া মুদ্রাজালের দণ্ড উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন—

"তুলাশাসনমানানাং কূটকৃন্নাণকস্য চ
এভিশ্চ ব্যবহর্ত্তা যঃ সদাপ্যো দণ্ডমুত্তমম।"

অর্থাৎ তুলাদণ্ড, শাসন পত্র, (গজকাটি, দ্রোণপ্রস্থ প্রভৃতি) পরিমাণের যন্ত্র, এবং নাণক অর্থাৎ মুদ্রা—এই সকল বস্তু সে কূট করে এবং যে সকল লোক ঐ সকল কূটমুদ্রাদি ব্যবহার করে তাহাদিগের উত্তম দণ্ড হইবে। ইহা ব্যতীত—

"অকূটং কূটকং ব্রূতে কূটং যশ্চাপ্যকূটকম্
স নাণক পরীক্ষীতু দাপ্য উত্তমসাহসম্।"

অর্থাৎ "যে মুদ্রা পরীক্ষক অকূট মুদ্রাকে জাল মুদ্রা বলে, এবং জাল মুদ্রাকে বিশুদ্ধ মুদ্রা বলে, তাহারও উত্তম সাহস দণ্ড।"

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ত্রয়োদশ কাণ্ডে মিথ্যা ওজনযন্ত্র ও মাপিবার যন্ত্র ব্যবহার জন্য শাস্তির বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাণ্ড বর্ণিত অপরাধের অনুরূপ অপরাধও আমাদিগের গৌরবান্বিত পূর্ব্বপুরুষগণের ধারণার অতীত হয় নাই। বিষ্ণুসংহিতায় এ সম্বন্ধে বিধান আছে—

"তুলামানকূটকর্ত্তৄংশ্চ"

অর্থাৎ যাহারা তুলাদণ্ড বা দ্রোণপ্রস্থাদি পরিমাণ বস্তু কূট করে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণে।

ধরা বক্ষে উঠে ধীরে অস্ফুট ক্রন্দন ;
বায়ু কাঁদে তরুশাখে,
নিশাচর-পাখি ডাকে,
দুখভরে মর্ম্মরিছে দূর অলিবন ;
ম্লাননভে ম্লানতারা
উল্কাছুটে দিশেহারা,
দিগঙ্গনা চেলাঞ্চলে মুছিছে নয়ন।

২

সহসা বিরাটশূন্যে জ্যোতির্ম্ময় রথে
পূর্ণ জ্যোতিঃ নাহি ছায়া,
নাহি ক্লান্তি নাহি কায়া,
আবির্ভূত কে পুরুষ স্নিগ্ধ ছায়াপথে—
উজলি উঠিছে স্বর্গ
লভিয়াছে চতুর্ব্বর্গ,
পদতলে কাঁদে নর পড়িয়া জগতে !

৩

যশের মুকুট শিরে চলিয়াছে কবি—
যার প্রেম-সূত্রে সদা
রামকৃষ্ণ ছিল বাঁধা,
রামকৃষ্ণ ছিল যার নিত্য কর্ম্মে সবি'—
যার প্রেম ভক্তি লয়ে
'পাগলিনী' ফিরে গিয়ে
'চিন্তামণি' চিন্তামণি—ভক্তনারী ছবি।

৪

আর কে গাহিবে বল সে গীত সুন্দর !
যে সঙ্গীতে পার্থপ্রিয়া
বাঁধিয়া আপন হিয়া
উন্মাদিনী বেশে পশে অরণ্য ভিতর ;
প্রেম পদতলে প্রাণ
দিবে কেবা বলিদান,
পড়িবে বিষাদ মূর্ত্তি বিষাদ অন্তর।

কে আর আনিবে বল বঙ্গ রঙ্গালয়ে,
সোণার গৌরাঙ্গ চাঁদে
পাপীরে দেখিয়ে কাঁদে
ছুটে গিয়ে তুলে লয় আপন হৃদয়ে,
বলে—বল হরিবোল
আয় তোরা দেরে কোল
আনন্দে ভাসুক ধরা হরিনাম লয়ে।

৬

আর রঙ্গমঞ্চে নাহি হেরিবে নয়ন
রঙ্গলাল রঙ্গরাজ,
কিম্বা পরি নটসাজ
ইতুভাঁড় করে লয়ে মৃদুল গমন ;
বিষাদে হৃদয় ভরি'
যোগেশের বেশ ধরি'
প্রগাঢ় দুখের মাঝে করিবে মগন।

৭

এতদিনে সেই সুখ গেল ফুরাইয়া
চূর্ণিত কাঞ্চন চূড়া
গিরিশ পড়িয়া ধরা
জীবাত্মা আপন পথে যাইছে চলিয়া ;
ভক্তভরে ঊর্দ্ধহাতে
প্রভু বৈজয়ন্ত পথে
ডাকিছে আয়রে বৎস আয়রে চলিয়া।

৮

যাও নটরাজ কবি সংসার বিরাগী
অপ্রমেয় প্রীতিভরে
ঠাকুর নির্ম্মাণ ক'রে
রাখিয়াছে স্বর্ণপুরী ভক্তজন লাগি,
যাও চলি স্মিত মুখে
অনন্ত আনন্দে সুখে,
কাঁদুক অতলে পড়ি ধরণী অভাগী।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বর্ম্মণ।

স্বর্ণ সাগরে।*

ডুবুডুবু রবি-ছবি,—প্রদীপ্ত গগন,
ঝলিছে কনক-প্রভা স্বর্ণ সাগরে।
ধীবর-কুটীর হোথা ; প্রকৃতি নির্জ্জন,
ম্লানমুখে বসি মোরা, পাণ্ডু বালু-চরে।

হের, ঊর্দ্ধে ব্যোম-স্তোমে জলদ-পতাকা—
নিম্নে, একি অম্বুনিধি দুলে থাকি থাকি!
সাগর-শকুন উড়ে ঝট্‌পটি পাখা—
প্রিয়ে, তোর অশ্রু-ভরা প্রেমে-ভরা আঁখি!

শুক্তিশুভ্র সিন্ধুতটে অশ্রু তোর দেখে,
লুব্ধ আমি, মুক্তজানু হইয়া আপনি,
মন্ত্রপ্রায় পান করি, পদ্ম-কর থেকে—
শুভ্র ভাবি, বিন্দুগুলি, তুহার সজনী!

সে অশ্রু গরল গো! তার বশে চলে,
যতনে যাতনা-সর্পী পুষেছে হৃদয়।
হাহা প্রতি দিনে-দিনে—হাহা পলে পলে;
মরি আমি, শুষ্ক আমি, হই আমি ক্ষয়!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সাহিত্য-সমাচার

প্রবাসী।—চৈত্র। সর্ব্বপ্রথমে 'গৃহহারা জননী' নাম দিয়া যে ছবিখানি বাহির হইয়াছে, তাহার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ইহার মূল চিত্রটি হয়ত ভাল হইতে পারে,—আমরা তাহা দেখি নাই। কিন্তু এই ছবিটি এতই অস্পষ্ট হইয়াছে যে তাহা মনশ্চক্ষু দ্বারা দেখাত দূরের কথা, চর্ম্ম চক্ষুতেই ভাল দেখা যায় না। চিত্র জিনিষটা 'চোখের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' থাকে। কিন্তু যে চিত্রে চোখের পর্য্যন্ত 'প্রবেশাধিকার' নাই, সেখানে মন বেচারী আর কি করিবে। এইরূপ 'ধ্যাব্‌ড়া' ছবি বাহির করিয়া 'পিণ্ডিরক্ষে' না করিলেই কি নয়? কবিবর রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি" উৎকৃষ্ট উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক হইতেছে। এরূপ সুন্দর বর্ণনাভঙ্গী, এমন সরস লিপিচাতুর্য্য আমাদের সাহিত্যে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভবে। তিনি কেন যে লিখিয়াছিলেন, "আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই।"—একথা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না। ইহা বোধ করি, কবিবরের অতিমাত্র বিনয় প্রকাশেরই অভিব্যক্তি। "সর্দ্দার সার চিনুভাই মাধবলাল" অতি সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী,—পড়িয়া আদৌ তৃপ্তি হয় না। শ্রীযুক্ত রামলাল সরকারের "চীন এবং সামন্তের অসভ্যজাতি" সুখপাঠ্য রচনা। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "প্রাচীন ভারতের সভ্যতা" পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ। আধুনিক 'গবেষণাকারি'দের এ রচনা পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে আয়াস স্বীকার করিয়া সাধারণের বোধ-গম্য করিয়া ইহা লিখিতেছেন, তাহা আমাদের দেশীয় সাহিত্যিক-সাধারণের অনুকরণীয়। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট আমাদের একটি প্রশ্ন আছে। তিনি এই প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"রামায়ণে রমণীর স্বাধীনতা কম, সুতরাং মহত্ত্ব-কম। কিন্তু নারী প্রেমের মহত্ত্ব ও

---

* হাইনের কবিতা হইতে।

বিশুদ্ধতা তখনও ছিল।"—এ বাক্যের তাৎপর্য্য কি ? সীতা-চরিত্রে মহত্ত্বের কি অভাব ছিল এবং প্রমীলা চরিত্রই কি মহত্ত্বে কম ? তাহাত আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। "পিতৃস্মৃতি"তে পাঠযোগ্য কিছুই নাই। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের "বসন্তের আহ্বান" একটি বিশেষত্ব বর্জ্জিত কবিতা। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের "হর্ষচরিতে ঐতিহাসিক উপাদান" উল্লেখযোগ্য রচনা। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত "নবীন-সন্ন্যাসী" উপন্যাস এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। "ফয়মোজা দ্বীপের কাপালিক" বেশ চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" সচরাচর যেরূপ মুরব্বিয়ানা থাকে, বাজে কথায় সন্নিবেশ হয়, এবারেও তাহা আছে। তা ছাড়া, ইহাতে এবার যথেচ্ছাচারেরও বিলক্ষণ পরিচয় আছে। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুপলক্ষে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মধ্যে এই মন্তব্যটুকু স্থান পাইয়াছে,—'গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন সুপরিজ্ঞাত নাটককার ও অভিনেতা ছিলেন। আমরা তাঁহার কোন নাটক পড়ি নাই, বাঙ্গালা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোন থিয়েটারেও কখন যাই নাই। এইজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।" বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারের নাটক না পড়িয়া সাহিত্য-সেবা করা, মাসিকের সম্পাদক সাজিয়া বাহার দেওয়া, এই সব ধৃষ্টতা বাঙ্গালা দেশেই সম্ভবে। অন্য দেশ হইলে লেখককে হাস্যাস্পদ হইতে হইত। এ কাগজ কেহ ছুঁইত না। শুনিতে পাই, গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া এই শ্রেণীর আলোকপ্রাপ্ত সম্পাদক ধুরন্ধরেরা তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে ইচ্ছুক নহেন। পাছে অশ্লীলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় বোধ হয়, এই আশঙ্কায় 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদকও গিরিশচন্দ্রের নামোল্লেখ করা পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যবোধ করেন নাই। যাঁহারা 'সাম্যমৈত্রের' ডঙ্কা বাজাইয়া ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল একাকার করিতে চাহেন, তাঁহারা এতটুকু ক্ষুদ্রতা এতটুকু হীনতা বর্জ্জন করিতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। এই ভণ্ডামির জন্যই আমাদের দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। ইহাকে সংযত করিতে না পারিলে দেশের আর আশা নাই! এই সময়ে সাহিত্য-রাজ বঙ্কিমের সুতীব্র কশাকে মনে পড়ে। 'বিবিধ প্রসঙ্গের' আর একস্থলে লিখিত হইয়াছে, "আমরা...তাঁহার (মনোমোহন বসু মহাশয়ের) সতী নাটক, প্রণয় পরীক্ষা নাটক এবং নলদময়ন্তী নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম।" 'নলদময়ন্তী' নাটক যে মনোমোহন বসু মহাশয়ের রচিত, এ অভিনব তত্ত্ব প্রবাসী-সম্পাদক কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন? সুলভ মূল্যের কাগজ কলম পাইয়া কি দায়িত্ব জ্ঞানকে একেবারেই নির্ব্বাসিত করিতে হয় ? প্রবাসী-সম্পাদক যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে এইখানে তাঁহাকে শুনাইয়া রাখি যে, যে 'নলদময়ন্তী' নাটকখানি তাঁহার 'বেশ ভাল লাগিয়াছিল', সে গ্রন্থখানি মনোমোহন বসুর নহে, —তাহা গিরিশচন্দ্রের। গিরিশচন্দ্রের নাটক ভ্রমক্রমে দেখিয়া ফেলিয়াছেন, বুঝি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! শুধু ইহাই নহে। আর এক বিড়ম্বনার কথা বলি! মৃত লেখকের নামোল্লেখ স্থলে সুলেখক বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের নাম 'শ্রী'যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রবাসী'র 'জল-জীবন্ত' চারুচন্দ্র 'শ্রী'হীন আর স্বর্গগত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় 'শ্রী'যুক্ত। এরূপ মৌলিকতা একমাত্র 'প্রবাসী'তেই সম্ভবে এবং 'প্রবাসী'র নিজস্বও বটে; অন্যত্র কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

শাল ও সন কি এক?

আমরা বাল্যকালে বোধোদয়ে পড়িয়াছি যে হিজিরা সন ও শাল একই বস্তু; এখনও সেই পরিজ্ঞান সমগ্র বঙ্গদেশে অক্ষতদেহে বিরাজমান। কিন্তু বস্তুতই কি শাল ও সন এক?

না, শাল ও সন কখনই এক বস্তু নহে, মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়নের স্মরণার্থ যে অব্দের প্রচলন হইয়াছে, তাহারই নাম হিজিরা সন এবং মহম্মদের মৃত্যুদিনহইতে যে অব্দের গণনা হইতে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্বত্র এলাহি সন বলিয়া পরিচিত, হিজিরা সনের পরিমাণ চান্দ্রগণনামতে ১৩২৯-৩০, ও এলাহি সনের পরিমাণ সংখ্যা ১৩১৯-২০, পক্ষান্তরে শালের পরিমাণ সংখ্যা সৌরগণনামতে ১৩১৮, অপিচ ইহার মধ্যে প্রথম দুইটী বৈদেশিক, তৃতীয়টী বঙ্গদেশের একমাত্র সম্পৎ এবং উহার প্রবর্ত্তক বঙ্গদেশের একজন বাঙ্গালী বৈদ্য রাজা। ইহা একটী বৈদ্যাব্দ, পরন্তু মুসলমানাব্দ নহে।

অবশ্য বিতর্ক হইবে যে তাহা হইলে এই সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কেন কেহ এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্যই করিলেন না? কেই বা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপ্রকার গবেষণায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন ও করিতে পারিয়া থাকেন? অযোধ্যার রাজগণ "সূর্য্যবংশীয়", গগনতলবিহারী জড়সূর্য্য "আদিত্য ও কাশ্যপেয়", "ঋগ্‌বেদ আদি-বেদ" এই জলন্ত ভ্রান্তিগুলি কি অদ্যাপি এই মহান্ আলোকের যুগেও কোবিদ বৃন্দকে ব্যামোহিত করিয়া রাখে নাই? এখনও কি প্রাচ্য প্রতীচ্য মনীষিগণ ভারতীয় রাজবংশদ্বয়কে "Solar ও Lunar Race" বলিয়া বিশেষিত করিয়া আসিতেছেন না? বস্তুতঃ ইহার প্রত্যেকটীই প্রমাদভূয়িষ্ঠ ও স্খলনবিশেষ।

মুনসী মফিজুদ্দিন আহম্মদ তাঁহার মহম্মদীয় পঞ্জিকার একত্র "বাঙ্গালা বা এলাহি সন" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে—"যখন ভারতবর্ষে মুসলমান বাদসাহ ছিলেন, তখন সর্ব্বত্রই হিজরী সন প্রচলিত ছিল এবং ঐ হিজরী সন ধরিয়াই যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু যখন সুলতান জালালুদ্দিন যিনি আকবর বাদসাহ বলিয়া পরিচিত, তাঁহার নিকট হিন্দুগণ আপত্তি করিল যে, হে ধর্ম্মাবতার! আমরা হিন্দু, সুতরাং চান্দ্রমাস হিসাবে গণনা করা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। অতএব আমাদের জন্য একটী সন প্রচলিত করিয়া দিন। এ-

দিকে আকবরসাহও অতি বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন, তিনি কখনও কাহারও হৃদয়ে আঘাত দিতেন না। সুতরাং হিন্দু প্রজাগণের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। তিনি মনে মনে যুক্তি করিয়া নূতন একটী সন জারি করিয়া দিলেন। ফলে সে সনটীও মুসলমানেরই থাকিল। কেন না জোনাব পয়গম্বর সাহেবের ওকাতের তারিখ ধরিয়া সনটী জারি করিলেন। জোনাব পয়গম্বর সাহেব হিজরী দশ বৎসর পরে ওফাত হন, এইজন্য হিজরী সনে ও বাঙ্গালা সনে দশ বৎসর ব্যবধান আছে। কিন্তু বাদসাহের মনের ভাব কেহই জানিতে পারে নাই বলিয়া ইহা বাঙ্গলা সন বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। সম্রাট্ ঐ সনের নাম রাখিয়াছিলেন,

"এলাহি সন"। ১৩ পৃষ্ঠা।

আমরা কিন্তু মুন্সী সাহেবের এই হেতুবাদে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিলাম না। এখন ইংরাজ রাজ তাঁহার রাজত্বে খৃষ্টীয় অব্দের প্রচলন করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে হিন্দু মুসলমান কোনও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরই কোনও ক্ষতি বা অসু-বিধা হয় নাই,মুসলমান বাদসাহের আমলেও সর্ব্বত্র হিজরী সনের প্রচলনে কোনও হিন্দুর কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে ছিল না। কেন না তখনও হিন্দুরা সংবৎ শকাব্দ বা শালের ব্যবহার করিতেন ও এখনও তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও বিবাহাদিতে এই সকল দেশীয় অব্দেরই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুরা কোনও দিনই মহাত্মা আকবরের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা করেন নাই, হিন্দুর প্রার্থনা মতেও এলাহি সনের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল না, উহা তিনি আপন স্বাধীন ইচ্ছাবশতই প্রচলিত করেন এবং তাহা অদ্যাপি দিল্লী সহরতলে প্রচলিত রহি-য়াছে, আমাদের, সুদূর বাঙ্গালার সহিত উহার কোনও সংশ্রবই নাই, অপিচ দিল্লীশ্বরের দিল্লীতে প্রবর্ত্তিত সনের যে কেন "বাঙ্গালা সন" নাম হইবে তাহারও আমরা কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইতেছি না।

অবশ্য মানব দেবতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার বোধোদয়ে হিজরী সন ও বাঙ্গলা শালের সাম্য সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহা প্রকৃত সংবাদ বলিয়া মনে করিতে সমর্থ নহি, বাঙ্গলা ১৩১৮ শালের প্রবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তয়িতা বাঙ্গালী এবং তিনি রাজা শালিবাহন নামে প্রখ্যাত ছিলেন। জন সাধারণ তাঁহাকে "শালবান" রাজা বলিয়া জানিতেন।

মহারাজ শালিবাহন না জাতিতে ক্ষত্রিয় ও মহারাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন? তাঁহার প্রবর্ত্তিত অব্দই কি শকাব্দ বা শাল নামে পরিচিত নহে? হাঁ, একজন শালিবাহন মহারাষ্ট্রের অধিপতি ও জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত

অব্দই শকাব্দ নামের বিষয়ীভূত। কিন্তু ইহা ছাড়াও বঙ্গদেশে শালিবাহননামে বৈদ্যজাতীয় আর এক জন স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন, তৎপ্রবর্ত্তিত অব্দের নামই শাল এবং উহার পরিমাণ ১৩১৮ বৎসর। হিজরী সন ও এলাহি সনকে সৌর বৎসরে পরিণত করিলে দেখা যাইবে মহাত্মা মহম্মদের উদয় এবং অস্ত এই বৈদ্য শালি-বাহন রাজার শকাব্দ প্রচলনের বহু পরেই হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশে যে শালিবাহন নামে একজন স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন তাহার প্রমাণ কি ? আমরা সে প্রমাণদ্বারা আমাদিগের উক্তির সমর্থন করিবার পূর্ব্বে ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের কয়েকটী কথা এখানে প্রসঙ্গতঃ উদ্ধৃত করিব। তিনি বলিতেছেন যে—

"সুবিখ্যাত শালিবাহন নৃপতি মগধে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর দ্বারা খৃষ্ট জন্মের আটাত্তর বৎসর পরে শকের সৃষ্টি হয়।"

"শালিবাহন বা সাতবাহন মহারাষ্ট্র প্রদেশের প্রতিষ্ঠান পুরীর অধীশ্বর। তাঁহার রাজধানী গোদাবরীতটে স্থাপিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম পাটন। শালিবাহন শক এক্ষণে মহারাষ্ট্র প্রদেশের নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে এবং বিক্রমাব্দ ঐ নদীর উত্তরাংশে প্রচলিত আছে"।

ঐতিহাসিক রহস্য, দ্বিতীয় ভাগ—২০৪ পৃষ্ঠা।

আমরা রামদাস বাবুর সকল কথার অনুমোদন করিতে পারি না—কিন্তু ভারতবর্ষে যে দুই জন শালিবাহন রাজা ছিলেন তাঁহার উক্তি তাহা সপ্রমাণ করে এবং তিনি যে একজনকে বাঙ্গলার কাছে মগধে আনিয়া দিয়াছেন, আমরা এজন্যও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে অগ্রসর। বস্তুতঃ মগধের সিংহাসনে শালিবাহন নামে কোনও একজন রাজা ছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না, শকাব্দ যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত, রামদাস বাবুর এ কথাও—প্রকৃত সংবাদ নহে। শাক মহারাষ্ট্রের। তাঁহার নিজের উক্তিদ্বারা নিজের উক্তিই ব্যাহত হইতেছে, যাহা হউক মগধে নহে পরন্তু বাঙ্গালা দেশেই শালিবাহন নামে একজন স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত অব্দের নামই শাল। যদাহ বিপ্রকুলকল্পলতা—

আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গরাজাধিরাজঃ স স্বধর্ম্মপরিপালকঃ॥
তদ্বংশ্যো জনিত শৈচকঃ প্রতাপচন্দ্র ভূপতিঃ।
তৎকুলে জনিতশ্চান্যঃ শ্রেষ্ঠঃ শেখর সংজ্ঞকঃ॥
বিধুবাণা চল মিতে শকাব্দে বিগতে পুরা।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ॥

বেদ বট্ট ক্ষি মানাব্দে শাকে সদ্‌গুণসাগরঃ।
গৌড়রাজ্যাধিরাজঃ সন্ অভিষিক্তো মহামতিঃ॥

অতি পূর্ব্বে শালবান্ নামে একজন বৈদ্য রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশে প্রতাপ-চন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের বংশে তেজঃশেখর নামে আর এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশে ৮৫১ শাকে মহারাজ আদিশূর প্রসূত, তিনি ৮৬৪ শকাব্দে বঙ্গদেশের (গৌড়রাজ্য) আধিপত্য গ্রহণ করেন।

সুতরাং এতদ্দ্বারা জানা গেল, বঙ্গদেশে শালবান্ নামে একজন বৈদ্য রাজা ছিলেন—মহারাজ আদিশূর যাঁহার একজন অনন্তরবংশ্য। মহামহোপাধ্যায় চতুর্ভুজসেনও বলিতেছেন যে—

বঙ্গে শ্রীশালবান্ নাম ভূপো বিখ্যাতবিক্রমঃ।
শালাব্দো নির্ণয়ো যস্য সর্ব্বলোকাবলোচরঃ
বৈদ্যবংশ সমুদ্ভূতঃ স চ ভূপঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্যাজ্ঞয়া শর্ববর্ম্মা চকার শব্দশাসনং॥
ব্যাকরণং কলাপাখ্যং মূলসূত্রং বিচক্ষণঃ।

বঙ্গদেশে বৈদ্যবংশে শালবান্ নামে এক রাজা ছিলেন। সর্ব্বজনবিদিত শাল অব্দ তাঁহারই প্রবর্ত্তিত,এবং তাঁহার আদেশেই তাঁহার গুরু মহামতি শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কলাপ ব্যাকরণের মূলসূত্র প্রণয়ন করেন।

সুতরাং মগধসিংহাসনে নহে পরন্তু বাঙ্গলার সিংহাসনে একজন যে শালি-বাহন নামে বৈদ্য রাজা ছিলেন এবং শাল অব্দ যে তাঁহারই প্রবর্ত্তিত, তাহা জানা যাইতেছে। এবং তিনিই স্ত্রীকৃত অবমাননার জন্য কলাপ ব্যাকরণ রচাইয়া অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

চতুর্ভুজঃ সেনকুলাবতংসঃ বৈদ্যঃ প্রিয়া সর্ব্বগুণানুরাগী।
শাকে হ্রকবট্টবাহনশশিপ্রমাণে চকার পঞ্জীং ভিষজাং কুলস্য।

অর্থাৎ ১২৬৯ শকাব্দে চতুর্ভুজসেন তাঁহার পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। সুতরাং উহা অতীব প্রামাণ্য। তিনি রামকান্ত কণ্ঠহার ও ভরত মল্লিকেরও যথাক্রমে ৩০৬ ও ৩২৮ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। যাহা হউক আমরা যাহা যাহা বলিলাম তৎপাঠে অবশ্যই প্রতীত হইবে যে শাল ও সন এক নহে এবং শাল বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি ও উহা একটী বৈদ্যাব্দ।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

অমলা।

১

পূজাবকাশে সুরেন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিয়া পল্লীগ্রামের নিয়মানুসারে বয়োঃবৃদ্ধদিগের সাক্ষাৎ করিল। এতদিন কলিকাতা প্রবাসের পর তাঁহার বিনয় নম্র ব্যবহারে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল।

আজ বিজয়াদশমীর পরদিন। পূজার উৎসব নিভিয়া গিয়াছিল। প্রবাস গমনোন্মুখ পতির বিরহাশঙ্কায় সতী কাতরা হইতেছিল। পুনরায় কলিকাতায় গমন করিতে হইবে ভাবিয়া সুরেন্দ্রও চিন্তিত হইতেছিল।

শরতের শুভ্র মেঘরাজি মস্তকোপরি ভাসিয়া যাইতেছিল। নিম্নে শ্যাম দূর্ব্বাদলশালিনী সমতল ভূমি। সম্মুখে নির্ম্মল স্বচ্ছজলশোভিনী পুষ্করিণী। সুরেন্দ্র নিঃশব্দে পদচারণা করিতেছিল।

পশ্চাৎ হইতে একজন তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিল। সুরেন্দ্র সেই ক্ষুদ্র হস্তদ্বয়ের কোমল স্পর্শ অনুভব করিয়া বলিল—"কমলা, আমায় পরীক্ষা? যাহার ছায়া দেখিলে বলিতে পারি, তাহাকে অনুভবে বলিতে পারিব না?"

সেই জন চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ সুরেন্দ্রনাথ দেখিল যাহাকে কমলা মনে করিয়াছিল সে কমলা নহে—সে কমলার কনিষ্ঠা অমলা।

বিদ্রূপরঞ্জিত স্বরে অমলা বলিল "তবে না সুরেন দাদা তুমি দিদিকে খুব ভালবাস, তুমি ত বুঝ্‌তে পারলে না দিদি না আমি?"

"আমি ঠাট্টা করছিলুম অমলা! আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলুম তুই চোক টিপে ধরেছিস"।

বালিকা বুঝিতে পারিল; বলিল "হ্যাঁ, ঠাট্টা করছিলে বই কি? তুমি কিনা দিদিকে ঠাট্টা কর? আমি যেন বুঝ্‌তে পারিনি!"

সুরেন্দ্র দেখিলেন বালিকা হইলেও অমলা অতিশয় চতুরা। কাজেই সে অন্য কথা পাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহার দিদি কোথায়, এবং সে পথে আসিবে কি না।

বালিকাও সে কথার কোন উত্তর দিল না। সে শুধু অন্য মনে বলিল

"সুরেন দাদা, তুমি এসে সকলের সঙ্গে দেখা করলে, আর আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না" ?

সুরেন্দ্র যেন একটু দুঃখিত হইয়া বলিল "এই ত তোর সঙ্গেই দেখা কর‍্তে আস্‌ছিলুম। তোর দিদি কোথা" ?

"দিদির যে শীঘ্রই বিয়ে হ'বে, সে তাই আর বড় বাড়ী থেকে বেরোয় না"।

সুরেন্দ্রের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তথাপি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল "তুই একবার আমার সাম্‌নে তাকে ডেকে নিয়ে আয় না লক্ষ্মীটী"।

গম্ভীর ভাবে বালিকা বলিল 'তার যে বিয়ে হ'বে, সে তোমার সামনে আস্‌বে কেন ?"

কাতরকণ্ঠে সুরেন্দ্র বলিল "তুই একবার তাকে বলনা—"

"আচ্ছা, তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি তাকে ডেকে আন্‌ছি।" এই কথা বলিয়া বালিকা তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

তারপর সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার শ্যামল বনানীকে আলিঙ্গন করিল। বিহঙ্গমগণ আপন আপন কুলায় আসিয়া শান্ত সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল, কিন্তু বালিকা অমলা আর ফিরিল না। তখন ভগ্নমনোরথ সুরেন্দ্র অগত্যা বাটী ফিরিল।

২

দুই ভগ্নী অমলা ও কমলা, এক বৃন্তে দুইটী ফুলের ন্যায় অল্পবয়সে মাতৃহারা হইয়া গৃহ আলোকিত করিয়াছিল। কমলা বয়োঃজ্যেষ্ঠা হইলেও কনিষ্ঠা অমলার ন্যায় প্রখরা বুদ্ধিশালিনী ছিল না। কমলা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী; রূপসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া যৌবন-তরঙ্গে দেহ তরীখানি ভাসাইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। অমলা প্রায় দেড় বৎসরের কনিষ্ঠা; কমল কোরক যেন ফুটি ফুটি করিয়া সম্পূর্ণ ফুটিতে পারিতেছিল না; সেই অর্দ্ধবিকশিত সৌন্দর্য্য দর্শকের প্রাণহরণ করিত।

অমলা এক পা এক পা করিয়া সুরেন্দ্রকে ছাড়িয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল। কিন্তু মত্তি পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া তাহার পা আর চলিল না। বালিকা দেখিল অস্তাচলোন্মুখ লোহিত রবি পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে আপন কায়া বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। সেখানে প্রতি ঢেউগুলি কত সোহাগ ভরে রবিকরগুলিকে চুম্বন করিতেছে। সরসী জলে বিকশিতা নলিনী রবির বিরহাশঙ্কায় ম্লানমুখী হইতেছিল।

অমলা মতির নীলজলে আপনার গা ভাসাইয়া দিল। তাহার সুন্দর অঙ্গ-সৌষ্ঠবটুকু জলধর পাশে বিজলীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া অমলা জলক্রীড়া করিতে লাগিল। তারপর যখন সন্ধ্যার কালছায়া সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু অপহরণ করিল, তখন, সে যে কমলাকে ডাকিতে আসিয়াছে একথা তাহার মনে পড়িল।

গৃহে আসিয়া অমলা ডাকিল "দিদি"। সোৎসুক কণ্ঠে কমলা কহিল "এত রাত ক'রে কোথা থেকে এলি বোন, ছেলে মানুষ—তোর কি ভয় ডর নেই?"

অমলা একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল "দিদি, তোকে সুরেন দাদা ডাক্‌ছিল—আমার মতি পুকুরে গা ধু'তে দেরী হ'য়ে গেল তাই আমি তোকে এতক্ষণ খবর দিতে পারিনি।"

"তা বেশ করিছিস্, এখন চল্ কাপড় ছাড়বি—আবার ভিজে কাপড়ে অসুখ হ'লে কি হ'বে বল দেখি?" এই বলিয়া জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল।

৩

সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতের কোমল মলয় স্পর্শে দীর্ঘ অবসাদের পর যে নিদ্রা তাহার অবসান হইয়াছে। কিন্তু তখনও অনেকে সুষুপ্ত। উষার কিরণ গবাক্ষের মধ্য দিয়া উঁকিঝুঁকি মারিয়া যেন সকলকে বলিতেছে "আর কেন, জাগ—আমি যে তোমাদের মুখ দেখিব বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি"।

ঠিক এমনি সময় দুই ভগ্নী অমলা ও কমলা গলা ধরাধরি করিয়া সুরেন্দ্রদের বাটীর অভিমুখে গমন করিতেছিল। অমলার ক্রোড়ে একরাশ ফুল ও ফুলের মালা। পরিধানে একখানি গুলবাহার ঢাকাই। অমলা বলিল "দিদি তোর গলায় এক ছড়া মল্লিকে ফুলের মালা পরিয়ে দেব?"

কমলা হাসিয়া বলিল "তোর বর এলে তার গলায় পরিয়ে দিস্"। চতুরা অমলা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল "দেখ দিদি, ওই দোফলা আমগাছটায় কত আম পেকেছে, গোটা কত পেড়ে নিবি"?

"ছি বোন, পরের জিনিষে কি লোভ কর্‌তে আছে—ওই দেখ তোর সুরেনদাদা এদিকে আস্‌ছে"।

তখন সুরেন্দ্রকে দেখিয়া অমলা যেন একটু অপ্রতিভ হইল। কিন্তু যখন সুরেন্দ্র নিকটবর্ত্তী হইল তখন তাহার আর সে ভাব রহিল না। বালিকা প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত বলিয়া উঠিল "সুরেনদাদা তুমি দিদির সহিত দেখা

করিতে চাহিয়াছিলে, দিদি কাল আসতে পারেনি, আজ আমি ধরে এনেছি—তুমি কাল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলে, না সুরেনদাদা" ?

অন্য মনে সুরেন্দ্র বলিল "না, বেশীক্ষণ আর কি"। অমলা বলিল "সুরেন দাদা তুমি ফুল নেবে" এই বলিয়া বালিকা সেই ফুলের রাশি ও নিজ হস্তে গ্রথিত মালাগুলি সুরেন্দ্রের পদোপরি নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, কমলার নিষেধ গ্রাহ্য করিল না।

আর কমলা—ভূমিতলাবদ্ধ দৃষ্টি সুরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিতে পারিতেছিল না—শুধু ভাবিতেছিল কেন অমলা এত প্রতিশোধপরায়ণা!

৪

সুরেন্দ্র কত কথা বলিল—কমলা সকল কথা বুঝিতে পারিল না। সুরেন্দ্র কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিল।

"আবার দুইদিন পরে আমায় ভুলিয়া যাইবে কমলা—জীবনে বোধ হয় এই শেষ দেখা—প্রার্থনা করি, তুমি সারা জীবন সুখে থাক—তুমি সুখে আছ শুনিয়া আমিও সুখী হইব"। তখন অস্পষ্ট জড়িতকণ্ঠে কমলা উত্তর করিল—

"সুরেন দাদা, তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান; অশিক্ষিতা আমি তোমায় কি বলিয়া বুঝাইব? তুমি যে এই হতভাগিনীর জন্য এত কষ্ট পাইতেছ তাহাতে আমি অতিশয় লজ্জিতা হইতেছি। তোমার জীবনে মহান্ কর্ত্তব্য পড়িয়াছে, সকলে তোমার কত আশা করিতেছেন, এ সামান্যা রমণীর জন্য সে কর্ত্তব্যে অবহেলা করিও না"।

সুরেন্দ্র—"কমলা! আমি তোমাকে আশৈশব যে শিক্ষা দিয়াছি, তুমি সেই উচ্চ আদর্শ আজ আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছ। কিন্তু কেবল শিক্ষা দ্বারা হৃদয়কে বশীভূত করা যায় না। যে আপনার হৃদয়কে জয় করিয়াছে সে দেবতা। আমার সে সাধনা হয় নাই। শিক্ষার ফলে তুমি যদি—এরূপ গুণবতী না হইতে তাহা হইলে তোমার জন্য আমার প্রাণ এরূপ আকুল হইত না।"

কমলার নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে কাতরকণ্ঠে বলিল "ছি, সুরেন দাদা, আমায় এ সকল কথা বলিও না—আমার কি সাধ্য আমি তোমাকে বুঝাইব। তুমি আমার গুরু—আমি চিরদিন তোমায় গুরুর ন্যায় ভক্তি করি। আমার সে বিশ্বাস ও ভক্তি দলিত করিও না।"

সুরেন্দ্রনাথ আর কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু কমলার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

৫

যখন পল্লীরমণীগণ একে একে কলসীকক্ষে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, বালার্করশ্মি ক্রমে প্রখরতর হইতে লাগিল, দ্রুতপাদবিক্ষেপে কমলা তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

অমলা যে সকল ফুল ও মালা রাখিয়া গিয়াছিল, অন্যমনস্ক সুরেন্দ্র তাহা পথেই ফেলিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল।

পার্শ্বে বনান্তর হইতে বালিকা অমলা সেই পথে আসিয়া দেখিল যে তাহার সযত্ন রক্ষিত ফুল ধূলায় অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে—তাহাতে দেবতার পূজা হয় নাই।

৬

যে দিন সুরেন্দ্রনাথের সহিত কমলার শেষ সাক্ষাৎ হয় তাহার পর দীর্ঘ তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কমলা শ্বশুরালয়ে থাকিত।

অমলার রূপ-নদী এখন কূলে কূলে উথলিয়া উঠিতেছে! শীতের মধ্যাহ্ন রবির ন্যায় তাহার রূপরশ্মি সকলরেই মন আকর্ষণ করিত। অমলার বয়স চতুর্দ্দশ হইয়াছিল। কিন্তু এ বয়সেও তাহার বিবাহ হয় নাই। রূপবতী অমলার জন্য সৎপাত্রের অভাব ছিল না। কিন্তু তাহার পিতা আপনার "একগুঁয়ে" বালিকাটিকে কিছুতেই বশে আনিতে পারেন নাই। বিবাহের নামে অমলা অন্নগ্রহণ করিত না—মতি পুকুরের জলে গা ভাসাইয়া পড়িয়া থাকিত, যতক্ষণ না পিতা প্রতিশ্রুত হইতেন, যে তাহার বিবাহ দিবেন না—ততক্ষণ সে জল ছাড়িয়া উঠিত না। কাজেই অমলা আপনার রূপের আপনিই একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হইয়া সেই ক্ষুদ্র পল্লী আলোকিত করিয়াছিল।

ঠিক এমনই ভাবে আর একটী যুবক পিতার অতুল ধনের অধিকারী হইয়া সেই পল্লীর এক ক্ষুদ্র নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। যুবক কলি-কাতায় পাঠাভ্যাস করিত; সম্প্রতি পিতার মৃত্যুর পর স্বগ্রামে থাকিয়া বিষয় রক্ষণাদি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। লোকে বলিত যে সে যেরূপ ভাবে বিষয় কার্য্য দেখিতেছে তাহাতে সেই অতুল বিষয়ের অস্তিত্ব অধিকদিন সম্ভবপর নহে। কারণ সে অকাতরে দান করিত। লোকে মিথ্যা ক্লেশ জানাইয়াও তাহার নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিত। তাহার কিন্তু সে সকল দিকে লক্ষ্য ছিল না। দুঃখের কথা শুনিলেই তাহার হৃদয় গলিয়া যাইত। সে বড় একটা কাহারও সহিত বেশী মিশিত না, তাহার জীবনের ব্রত ছিল—আতুরের উদ্ধার। সে স্বহস্তে রোগীর পরিচর্য্যা করিত।

যুবকের বিষয়ের প্রতি বিরাগ দেখিলে তাহাকে ত্যাগী বলিয়া মনে হইত। কিন্তু ত্যাগীর স্তায় তাহার মন প্রফুল্ল ছিল না—তাহার মুখমণ্ডল হাস্তবিরহিত, বিরস ও গম্ভীর; মনে হইত যেন কোন অব্যক্ত যাতনা তাহার সুন্দর আননে বিষাদ কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে।

একদিন কোন রোগীর শয্যাপার্শ্বে সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর যুবক প্রভাত সময়ে আপন শ্রান্তি বিনোদনার্থ মতি পুকুরের ধারে ভ্রমণ করিতেছিল। তখন উষার অরুণরবি দিগন্তের প্রান্ত হইতে উঁকি মারিতেছিল। দীর্ঘ বিরহের পর কান্তের মিলনাশায় কমলিনী আঁখি উন্মীলিত করিতেছিল; যুবক মতি পুকুরের সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিল। শেষে যখন স্বচ্ছ সলিলা খুব নিকটবর্ত্তী হইল, তখন সে পাদুকা ঘাটের উপর রাখিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিতে জলে অবতরণ করিল।

সে সময়ে বর্ষাকাল। শৈবালমণ্ডিত সোপানশ্রেণী অতিশয় পিচ্ছিল। যুবক অতর্কিত ভাবে পা ফেলিতেছিল এবং হঠাৎ পদস্খলন হইয়া একবারে গভীর জলে নিমজ্জিত হইল। ঠিক সেই সময় একজন পশ্চাৎ হইতে জলে ঝম্প প্রদান করিয়া সন্তরণ কৌশলে যুবকের বস্ত্র ধারণ করিয়া তাহাকে তীরে উত্তোলন করিল।

যুবকের শারীরিক কোন প্রকার অনিষ্ট হয় নাই। যিনি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া যুবক যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইল এবং সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিল—

"অমলা, তুমি এ সময় কোথা হইতে!"

"কেন সুরেনদাদা, আমি ত ঠিক সময়েই এসেছি; তুমি যে অসাবধান!"

"তা বটে—কিন্তু আমি যে এখানে আসিব, তাহা কি তুমি জানতে?"

"জানাটা কি বড় আশ্চর্য্য কথা, তুমি যখন যা কর আমি সব জান্‌তে পারি, তুমি যেখানে যাও—যাহার পরিচর্য্যা কর—আমি সবই জানিতে পারি। তুমি যাহা চাহ—যাহার জন্ত তোমার এত বৈরাগ্য তাহাও আমি জানি। তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্তল আমার সদাই লক্ষ্যস্থল। আমার নিকট তোমার কিছুই গোপন নাই।"

"তুমি আমার সকলি জান দেখছি—আচ্ছা তুমি কি অগোচর বস্তু দেখিতে পাও?"

"কিছু কিছু পাই বটে!"

"আমার বিষয়ে কি দেখিতেছ বল দেখি ?"

"তোমায় একজন ভালবাসে—প্রাণের অধিক ভালবাসে—সে ছায়ার ন্যায় তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ফেরে। তুমি আর একজনের প্রেমে অন্ধ, সেজন্য তাহাকে দেখিয়াও দেখিতে পাও না। যদি আজিকার মত আর কখনও তোমার চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইত তবে দেখিতে সে সেখানে বুক পাতিয়া দিত; তোমার জন্য সে উন্মাদিনী।"

"সে কে, কমলা ?"

কখনই নহে, তুমি তাহা হইলে দিদিকে ভাল করিয়া জান না বা ভালবাস না। সাধ্বী স্ত্রীর স্বামী ব্যতীত অন্য চিন্তা নাই।

"অমলা তুমি কেন বিবাহের নামে অত ভয় কর ? তোমার মত বালিকা বাঙ্গালীর ঘরে অবিবাহিতা থাকে না।"

"আমি বিবাহ করি না কেন শুনিবে—আমার মন আমার নহে—আমার সকলই আমি পরকে দিয়াছি—পরের জিনিষের উপর আমার কি অধিকার! তুমি কেন বিবাহ কর নাই ?"

"তাহা কি তুমি জান না ?"

"ওঃ বুঝিয়াছি তুমিও পরকে মনঃপ্রাণ দিয়াছ, কিন্তু সে যখন অপরের হইয়াছে তখন তাহার চিন্তা তোমার পাপ ;—তুমি বিবাহ কর।"

"যদি কখনও তাহাকে ভুলিতে পারি তবে করিব, নচেৎ এ জীবনে নহে—"

সুরেন্দ্রনাথের চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অমলার নিকট আপন দুর্ব্বলতার জন্য সে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল,—বলিল "তুমি আমায় কেন বাঁচাইলে অমলা—আসন্ন শান্তির কূপ হইতে আমায় ফিরাইলে ?"

অমলারও চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে কম্পিত কণ্ঠে আবেগভরে বলিল—"সুরেন—প্রাণের সুরেন—তোমায় বাঁচাইয়াছি একি বড় কথা—আজ যদি তোমায় জল হইতে তুলিতে না পারিতাম তাহা হইলে আমিও অন্যত্র শীতল গভীর জলে আশ্রয় লইতাম। সুরেন তুমি জাননা তোমায় কত ভালবাসি—শয়নে স্বপনে জাগরণে আমি তোমার সাথে সাথে ফিরি, অন্ধকারে তোমার ছায়া তোমায় পরিত্যাগ করে, কিন্তু নিবিড় আঁধার আমাকে তোমার নিকট হইতে পৃথক করিতে পারে না। নিষ্ঠুর তুমি কি জানিবে, আশৈশব তোমায় পূজা করিয়া আসিয়াছি—আজ যৌবনে তোমার জন্য গৃহত্যাগিনী হইয়া পথে পথে ফিরিতেছি—"

অমলা আর বলিতে পারিল না—তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে আর সে স্থানে দাঁড়াইল না, হঠাৎ বৃক্ষ পার্শ্ব দিয়া কোথায় চলিয়া গেল সুরেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইল না।

৭

সে দিন জল-নিমজ্জন ও রাত্রিজাগরণ হেতু তাহার পরদিন সুরেন্দ্রনাথ জ্বরাক্রান্ত হইল। শিরঃপীড়া ও শরীরের যন্ত্রণায় তাহার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা ছিল না। জ্বর ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার প্রকোপে দ্বিতীয় দিনে সে সংজ্ঞাশূন্য হইল।

সুরেন্দ্রনাথের সংসারে তাদৃশ নিকট আত্মীয় কেহ না থাকায় গ্রামস্থ সকলেই তাহার পরিচর্য্যার ভার লইল। পল্লীগ্রামের এই মধুর আত্মীয়তা বড়ই সুন্দর। তোমার আমার সহিত কলহ থাকিতে পারে কিন্তু বিপদের সময় সকলেই আপনার। সে সময়ে কোন প্রকার রাগদ্বেষাদি স্থান পায় না। গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলের সহিত একটা না একটা সম্পর্ক পাতান থাকে। কেহ "ঠাকুরদা" কেহ "খুড়ো" কেহ "পিসী" কেহ "মাসী" এইরূপ পুরুষেরা সন্তানের অধিক যত্নে একে একে তাহার সেবা করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা মাতার অধিক যত্নে দুগ্ধ বা অন্য পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল। এ সময়ে কিশোরী অমলা সতত দূরে থাকিয়া তাহার পরিচর্য্যা লক্ষ্য করিতেন। কোন প্রকার ত্রুটী হইলে তাহা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। দূর হইতে অনিমেষ নয়নে সুরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চক্ষুদুটী অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিত।

দুইদিন এইরূপে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত দেখা দিল। তখন একে, একে, সকলে তাহার কাছ হইতে দূরে থাকিতে লাগিল। চতুর্থ দিনে সুরেন্দ্রের যন্ত্রণা বড়ই অধিক হইল, তাহার অঙ্গের কোন স্থানে আর বসন্তের বাকী রহিল না। সে সময়ে তাহার কাছে কেহই থাকিতে তাদৃশ ইচ্ছুক নহে। তাহারা নানাপ্রকার ওজর আপত্তি করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। যে দু'একজন সুরেন্দ্রনাথের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে বিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছিল, তাহারাই কাছে থাকিয়া সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু দিবারাত্র রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। এ সময়ে অমলা আসিয়া তাহাদের হইয়া অনেক কাজ করিয়া দিত। তাহারা নিদ্রায় কাতর হইলে সে একাকিনীই সুরেন্দ্রনাথের শিয়রে বসিয়া থাকিত।

এইরূপে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হতভাগিনী অমলা তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহাকে কেহ নিষেধ করিতে সাহস করিল না। গ্রামের একগুঁয়ে বালিকা স্বর্গীয়া দেবীর ন্যায় তাহাদের দুর্ব্বল তর্কযুক্তি উপেক্ষা করিয়া মাতার ন্যায় মঙ্গল হস্তে সুরেন্দ্রনাথের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

অষ্টম দিবসে সুরেন্দ্রনাথের অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল। তাহার সুন্দর বপুখানি বসন্তের আক্রমণে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সকলে তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ মুখে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বালিকা অমলা স্থিরনেত্রে রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহিল। সকলে তাহাকে সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল কিন্তু অমলা নড়িল না। সে গৃহে আর কেহ ছিল না। অমলা তখন দুই হস্তে সুরেন্দ্রের অচৈতন্য দেহখানি আলিঙ্গন করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে বলিতে লাগিল "হে অন্তর্য্যামী, হে প্রভু, আমি প্রেমের প্রতিদান চাহি না; তুমি সুরেন্দ্রের ব্যাধি, সুরেন্দ্রের যাতনা, আমায় দাও, আমায় দাও, আমায় দাও।" অমলার আরক্তিম গণ্ডদ্বয় বহিয়া অবিরল অশ্রুধারা তাহার দেহ সিক্ত করিতে লাগিল। সে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহার প্রাণের আবেগ যেন শতগুণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

অনন্ত করুণাময় বিভুর নিকট বালিকার কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না। দশম দিবস হইতে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। গায়ের গুটি-গুলি এক এক করিয়া শুখাইতে আরম্ভ করিল। অমলার অবিরাম শুশ্রূষায় ষোড়শ দিবসে সুরেন্দ্র পথ্য পাইল। অষ্টাদশ দিবসে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে সক্ষম হইল।

সুরেন্দ্রের আরোগ্যলাভের পর অমলা তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করে নাই। প্রায় এক সপ্তাহ পরে সে সংবাদ পাইল যে অমলা প্রবল জ্বরে শয্যাগত হইয়াছে। সুরেন্দ্রের দেহ তখনও বেশ সবল হয় নাই। তথাপি তাহার জীবনদাত্রীর অসুস্থতা শ্রবণে সে বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল। যষ্টীতে ভর করিয়া সে অমলার বাটীতে গমন করিল। সেখানে গিয়া সে যাহা অবগত হইল তাহা বড়ই ভীষণ। চারদিন হইতে অমলা জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর দেহখানিকে কে যেন রক্তসিক্ত করিয়া দিয়াছে। রোগ যন্ত্রণায় আরক্তিম মুখমণ্ডলে ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই। পদ্মপলাশ

আঁখি দুটীও লাল হইয়া উঠিয়াছে। সুরেন্দ্রকে দেখিয়া সে আঁখি দুটি যেন হাস্য বিকশিত হইয়া উঠিল।

সুরেন্দ্র বলিল "আমায় এত দিন কোন সংবাদ দাও নাই কেন অমলা?" অমলা বলিল "সুরেন্দ্র! তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে, তোমায় সুস্থ দেখিয়া মরিতে পারিব, এ আমার বড় সুখ - বড় সুখ!"

সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল—সে গদগদস্বরে বলিতে লাগিল "অমলে! কেন তুমি আমায় দুইবার আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলে? জীবন তুচ্ছ করিয়া যে ব্যাধি দূর করিয়াছ, দেখ সেই ব্যাধি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরীরে আশ্রয় লইয়াছে। আজ যদি আমি মরিতাম তাহা হইলে আমার এত কষ্ট হইত না। আজ তুমি যে আমার জন্য এই প্রাণ-ঘাতী যন্ত্রণা সহ্য করিতেছ ইহা আমার পক্ষে মৃত্যু হইতেও কষ্টকর"।

তখন অমলা সুরেন্দ্রনাথের মুখের উপর আপনার চক্ষু দুটী স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল "হে হৃদয় দেবতা, বিশ্বপতি যে অধিনীর কাতর প্রার্থনা শুনিয়া তোমাকে নিরাময় করিয়াছেন তাহাতে আমি মৃত্যুতেও অনন্ত শান্তিলাভ করিব। হে প্রিয়, আমার জন্য কাতর হইও না, আমি বেশ জানি আমার বাঁচিবার কোন আশা নাই। আমি আমার জীবন পণ করিয়া মৃত্যু ভিক্ষা করিয়া লইয়াছি—আমার শান্তি নিকট, আমি চলিলাম"——

এত কথা একেবারে কহিয়া অমলা প্রায় সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া পড়িল। সেই সময়ে একবার একটা বমনের চেষ্টা হইল। সেই বমনের সহিত তাহার মুখ হইতে অনর্গল শোণিতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এ হৃদয়বিদারক দৃশ্যে সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল "অমলা তুমি কি করিলে—আমায় জীবন দান করিয়া তাহা এরূপ ঋণে আবদ্ধ করিয়া গেলে! সে ঋণ পরিশোধ করিবার একটীবারও অবকাশ দিলে না! আমার এ দুঃখ ইহজীবনের মত রহিয়া গেল!"

সুরেন্দ্রনাথের উন্মাদ চিৎকারে আত্মীয় স্বজন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন অমলার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, নিশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া পড়িতেছে। সকলে বুঝিতে পারিলেন, অকস্মাৎ মৃত্যুর ছায়া সে গৃহে পতিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল—যখন একটু সুস্থ হইল তখন দেখিল যে অমলা তাহার হাতে হাতখানি রাখিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছে!

৯

অমলার মৃত্যুর পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ এক্ষণে গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী। অমলার নামে সে একটী আতুরাশ্রম স্থাপন করিয়া তাহাতেই আপনার সমস্ত বিষয়বৈভব ও জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।

অতি দূরদেশ হইতে রোগী ও সামর্থ্যহীন ব্যক্তি তাহার আশ্রমে আসিত। অক্লান্ত পরিশ্রমে, স্বহস্তে সুরেন্দ্রও সকলের পরিচর্য্যা ও তত্ত্বাবধান করিত।

এতদ্ব্যতীত কখন কাহারও বিপদ বা রোগের কথা শুনিলে সে নিজে তাহাদের আবাসে গমন করিয়া সকল প্রকার সাহায্য করিত। এ সকল কার্য্য সে ঈশ্বরের কার্য্য মনে করিয়া জীবনে অপার শান্তি উপভোগ করিতে লাগিল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম।

পথের কথা

(৩)

এইবার চৌরঙ্গী সম্বন্ধে কিছু বলিব। চৌরঙ্গীর রাস্তাটী অতি পুরাতন। পলাশী যুদ্ধের বহুপূর্ব্ব হইতে এই পথ বর্ত্তমান ছিল। তবে অবশ্য বর্ত্তমান আকারে নয়। পাঠকগণ চৌরঙ্গীর বর্ত্তমান গ্যাস আলোক ও প্রাসাদমালা শোভিত—প্রস্তরমণ্ডিত প্রশস্ত-বর্ত্মময়ী মূর্ত্তি মন হইতে মুছিয়া ফেলুন। পলাশী আমলের পূর্ব্বে, এই চৌরঙ্গী গভীর বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। পার্শ্বে গোবিন্দপুর আর কলিকাতা গ্রাম। সেখানে কয়েক ঘর লোকের বাস, ইংরাজের ফ্যাক্‌টারী—কয়েকটী ক্ষুদ্র হাট। আর বাকী অংশ বন জঙ্গল। বড় বড় গাছ, কণ্টকাকীর্ণ ঝোপ প্রভৃতি তখন ইহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিত। এই গভীর জঙ্গলের অনেক স্থানে দিবাভাগে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিত না। চোর-ডাকাতের ভয়ে, সন্ধ্যার পর ভদ্রলোকে বাটীর বাহির হইতে পারিত না। যাহাদের কাজ কর্ম্ম থাকিত—তাহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাজ সারিয়া বাটী ফিরিত। যদি কখনও রাত্রিকালে কাহারও পথ চলিবার কোন প্রয়োজন হইত—তাহা হইলে লোকে মশাল, বল্লম, লাঠি লইয়া দলবদ্ধ হইয়া এই জঙ্গলের পথে প্রবেশ করিত।

এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটী অনতিপ্রশস্ত বনপথ বরাবর—দক্ষিণ মুখাভি-গামী হইয়া কালীঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিল। আজকাল যাহাকে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট বলে, যেখানে চীনামুচির দোকানে আমরা প্রয়োজন হইলে জুতা খরিদ করিতে যাই, সেই বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীটও পুরাকালে একটা ক্ষুদ্র বনপথ ছিল। এই পথের মধ্যখানে একটী Creek বা খাল ছিল। সে খালের এখন চিহ্নমাত্র নাই—কিন্তু তাহার নাম হইতে Creek Row নামক রাস্তাটী হইয়াছে। ধাপা হইতে আরম্ভ হইয়া এই খালটী বেণ্টিঙ্ক-ষ্ট্রীট ভেদ করিয়া গঙ্গার সহিত সম্মিলিত ছিল।

তখন অনেক যাত্রী এই ক্ষুদ্র বনপথের মধ্য দিয়া কালীঘাটে কালীদর্শনে যাইত। চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী দেবী সেকালে অতি বিখ্যাত ছিলেন। যাত্রীরা চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে পূজা দিয়া—বরাবর এই পথ দিয়া কালীঘাটে আসিত। এই জন্যই এই স্থানের নাম—"চিৎপুরের রাস্তা" হইয়াছে।

হলওয়েল সাহেবের পূর্ব্বে—পলাশী যুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে গোবিন্দরাম মিত্র বলিয়া এক বাঙ্গালী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জমিদার নিযুক্ত হন। এই গোবিন্দরামের প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত। তিনি, ধরিতে গেলে একাধারে কোম্পানীর পুলিশ ও ফৌজদারী বিভাগের বড়কর্ত্তা। তাঁহার শাসনে—ডাকাতেরা থরহরি কাঁপিত। গোবিন্দরাম মিত্র যখন পাল্‌কী করিয়া গোবিন্দপুরের গ্রাম্য পথে (অর্থাৎ বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়াম্‌ তৎসম্মুখবর্ত্তী ভূভাগে) যাতায়াত করিতেন, তখন চোর ডাকাতেরা ফেরুপালের ন্যায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে পলাইত। শুনিতে পাওয়া যায়, এক বর্ষার রাত্রে ডাকাতেরা অন্যলোক ভাবিয়া গোবিন্দরামের পাল্‌কী আক্রমণ করে। কিন্তু পাল্‌কীর মধ্য হইতে গোবিন্দরাম মিত্রের দীর্ঘাকৃতি চক্ষে পড়িবামাত্রই তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হয়। এই ঘটনার পর হইতেই গোবিন্দরাম চোর ডাকাত দমনের বিশেষ চেষ্টা করেন। ইহাতে তাঁহার নাম যশ খুব বাড়িয়া উঠে। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট বড়ই সম্মানিত ছিলেন। সাহে-বেরা তাঁহাকে "Black Zemindar" (ব্লাক্‌ জমিদার) বলিত। গোবিন্দ-রাম যখন কাছারী করিতেন অর্থাৎ ফৌজদারী বিচারকের কাজ করিতেন তখন, চাকরেরা বড় বড় হাতপাখা লইয়া বাতাস করিত, আশা-সোটা লইয়া চোপদারেরা তাঁহার চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইত। ধরিতে গেলে—গোবিন্দরাম মিত্র সেকালের কলিকাতার একটী ছোটখাট সিরাজদ্দৌলা। তাঁহার হুকুম রদ করে এমন সাধ্য কাহারও ছিল না। তিনি এতদূর তেজস্বী ছিলেন যে ব্লাক-

হোলের স্বনামপ্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেব, কলিকাতায় জমিদার হইবার সময় তাঁহার নিকট নিকাশী হিসাব পত্র চাহিয়া পাঠান। গোবিন্দরাম হলওয়েলের মত সেকালের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে তাচ্ছল্য করিয়া বলিয়া পাঠান—"নিকাশ দিতে হয় আপনার উচ্চতম অধ্যক্ষকে দিব।" গোবিন্দরামের এই দুর্দ্দান্ত শাসনের জন্য "গোবিন্দরামের লাঠি" বলিয়া একটী প্রবাদ আজও প্রচলিত। এই গোবিন্দরাম মিত্রই কুমারটুলির বর্ত্তমান মিত্রবংশের আদি পুরুষ। ইহাঁদের এক শাখা বেনারসে বাস করিতেছেন। চিৎপুর রোডের উপর গোবিন্দরামের নবরত্ন এখনও বর্ত্তমান।

চৌরঙ্গীর সীমাও আগে এত দীর্ঘ ছিল না। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মার্কউড্ যে ম্যাপ তৈয়ারী করেন, তখন এই চৌরঙ্গী রোড ধর্ম্মতলা হইতে বর্ত্তমান পার্ক ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তাকে তখন "ধর্ম্মতলা হইতে চৌরঙ্গীর রাস্তা" বলিত। পার্ক ষ্ট্রীটের পরের স্থানটাই বোধ হয় এই চৌরঙ্গী। কিন্তু আপজন সাহেব ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার যে ম্যাপ তৈয়ারী করেন তাহাতে পার্ক ষ্ট্রীটের দক্ষিণাংশবর্ত্তী ভূভাগ "ডিহি বিরজী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই "বিরজী" নাম এখনও লোপ হয় নাই। আজকাল চৌরঙ্গীর যে বাটীতে নদীপুরের মহারাজা বাস করিতেছেন, তাহার সম্মুখেই বিরজীতলা ফাঁড়ি ও তালাও। একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ এখনও এই স্থানের প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে। এই বিরজীতালাওএর সান্নিধ্যেই, লাট-গির্জ্জা বা সেন্ট-পলস্ ক্যাথিড্রাল।

পলাশী-যুদ্ধের পর হইতেই, অর্থাৎ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে চৌরঙ্গীর মধ্যবর্ত্তী জঙ্গল পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়। গোবিন্দপুরের স্থানাধিকার করিয়া বর্ত্তমান "ফোর্ট-উইলিয়াম" নির্ম্মিত হইয়াছে। গোবিন্দপুরের অধিবাসীরা এই সময়ে এই স্থান ত্যাগ করিয়া কোম্পানীর জমি ও অর্থ খেসারত লইয়া সহরের উত্তরাংশে চলিয়া যান। ইহাদের মধ্যে কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর গোষ্ঠী ও শেঠ বসাকেরা প্রধান।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলের কাহিনী হইতে আমরা দেখিতে পাই, তখনও চৌরঙ্গীর জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয় নাই। ডাকাতের দল একেবারে বাস্তুচ্যুত হয় নাই। আজকাল যেখানে লাট-গির্জ্জা ও বিরজী-তল্লাও বর্ত্তমান, জনশ্রুতি এই, ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব হাতিতে চড়িয়া এইস্থানে বাঘ ও বরাহ শীকার করিতেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

উন্মেষণ।

তুমি, আছ কি না আছ প্রভু,
জানিতে চাহি না কভু,
বলোনা আমায়—
ব্যাপ্ত আছ বিশ্বময়
সত্য, মিথ্যা, কিম্বা ভয়,
চাহি না তোমায়—
প্রার্থনা সাধনা আর
নামান্তর কামনার—
(নাহি) স্বরগ-বাসনা ;
স্বপ্ন এ নশ্বর ভব,
চাহি না করুণা তব,—
চাহি না মার্জ্জনা।

যদি, যায় বিশ্ব রসাতলে
কিম্বা দগ্ধ মহানলে—
—প্লাবন, দহন—
ভরে' যদি এ সংসার,
হাহাকার অশ্রুধার
ভেদিয়া নয়ন,
দানবীর অট্টহাসে,
থর থর কাঁপে ত্রাসে
তাণ্ডব নর্তনে,
ভীষণ প্রলয় ঝড়ে
জগত ভাঙ্গিয়া পড়ে
মহা-আবর্তনে—
অথবা নন্দন-বন,
হয় যদি ত্রিভুবন,
সুখ শান্তি ভরা,
দৈন্য-ক্লেশ-শোকহীন,
পুণ্য-সুখময় দিন
ঘুচে মৃত্যু জরা—
দেখিব না দেখিব না,
মুছে যাক্ সে কল্পনা,
—পলকের খেলা—
হো'ক্ রুদ্ধ সব দৃষ্টি,
যাক্ ঘুরে তার সৃষ্টি,
মায়া-জাল ফেলা—
রঙ্গালয়ে নট যথা,
কহে সুখ দুঃখ কথা,
ভাবেতে আকুল,
পটের পতন সনে,
হৃদয়ে নিভৃত কোণে,
রহে স্বপ্ন ভুল—
ছায়া নিয়ে উন্মাদনা,
আত্মপর প্রবঞ্চনা,
নিহত চেতনা—
ক্ষুদ্র স্বার্থে করি ভর
সুখী দুঃখী নিরন্তর
সবই বিড়ম্বনা।
প্রশান্ত গম্ভীর স্থির
হৃদয়-অর্ণব-নীর
স্তব্ধ কোলাহল ;—
এবে হেমরবি * ভায়
—বৃথা স্বপ্ন আলো ছায়—
আমাতে সকল।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

* হেমরবি—বেদে যাহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে অর্থাৎ আত্ম-জ্যোতিঃ। সকলেই প্রত্যহ স্বপ্ন দেখেন কিন্তু অনেকে হয়ত লক্ষ্য করেন না যে স্বপ্নাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত থাকে এবং কোনওরূপ বহির্জ্যোতিঃ থাকে না তথাপি স্বপ্নগত সকল বস্তুই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হয়। ঐ প্রকাশই আত্ম-জ্যোতিঃ এবং এই জ্যোতিঃতে চিরদিনের অবস্থানের নিমিত্ত যোগীরা যোগাভ্যাসাদি করিয়া থাকেন কারণ উহাই জ্ঞানালোক।

গিরিশচন্দ্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

গিরিশচন্দ্র যেন নাট্যকল্পতরু ছিলেন। পাঠক বা দর্শক যখন যেমন নাট্যফল ইচ্ছা করিত, তখনই তিনি তাহাদিগকে মনের মত সুমিষ্ট নাট্যফল প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। আখ্যান বস্তুর বৈচিত্র্যে তাঁহার নাটক বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। কেবল বঙ্গসাহিত্য কেন, অন্য কোন সাহিত্যেই তাঁহার মত শুধু একজন মাত্র নাট্যকারে এত বিভিন্ন বিষয়ের নাটক লিখিয়া যাইতে কখনও পারিয়াছেন, কি না সন্দেহ! আমাদের এই উক্তি অনেকের কাছেই উপস্থিত অত্যুক্তি বলিয়া উপহাস্য ও উপেক্ষিত হইবে, জানি। কিন্তু উপেক্ষা করা কাজটা নিতান্তই সহজ;—উপেক্ষা প্রদর্শনের কারণ নির্দ্দেশ বা প্রমাণ করাই সুকঠিন। এই উপেক্ষাপ্রিয় মহোদয়গণকে এই অবসরে বলিয়া রাখি, তাঁহারা যেন এইটুকু মনে রাখেন যে, রামায়ণ ও মহাভারত যে দেশের জাতীয় মহাকাব্য, যে দেশ বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক ও চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জন্মভূমি ও লীলাভূমি, সেই দেশ ব্যতীত অন্য কোথাও "বিল্বমঙ্গল, নসীরাম, তপোবল ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মত নাটক সৃষ্ট হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে। ঐ শ্রেণীর নাটক লিখিতে হইলে স্থান-মাহাত্ম্য ও প্রতিভা ছাড়া আর একটি জিনিষের বিশেষ আবশ্যক। সেই জিনিষ—ভক্তি! অলোকসামান্য প্রতিভা এবং অসাধারণ ভক্তি যাঁহাতে একত্রে সম্মিলিত, রামকৃষ্ণদেবের মত গুরুর কৃপায় যাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত, কেবলমাত্র তাঁহারই দ্বারা ঐ শ্রেণীর নাট্যকাব্যের সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর;—অপরের উহা শক্তি-সাধ্য নহে।

গিরিশচন্দ্রের নাটক-রাশি ভাগ করিয়া দেখিলে প্রধানতঃ চারিটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম স্তরের নাটকগুলিতে নানা পৌরাণিক কথা এবং এতদ্দেশীয় নানা মহাপুরুষের চরিত-গাথা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই শ্রেণীর নাটকে তিনি ঘটনার ও হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের ছবির ভিতর দিয়া বহু জ্ঞানের কথা, বহু ভক্তির কথা ও বহু আধ্যাত্মিকতত্ত্ব রসাত্মক করিয়া পাঠক সাধারণকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতে গার্হস্থ্য প্রধান জীবনের যে সকল আদর্শ চিত্র আছে, যে সকল সুনীতির প্রসঙ্গ আছে, সে সমুদায়ের অনেকাংশই তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকে সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন।

এই শ্রেণীর নাটক লিখিয়া তিনি বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, ব্যাস-রচিত মহাভারতে এমন কোন উচ্চ আদর্শ বা উচ্চ ভাবের অভাব নাই, যাহার জন্য পরের দুয়ারে ঋণ গ্রহণের আবশ্যকতা করে। ইহা ছাড়া, আত্মা-সম্বন্ধীয় নানা জটিল সমস্যার সুন্দর মীমাংসাও তিনি তাঁহার 'নসীরাম' ও 'কালাপাহাড়' প্রভৃতি নাটকে গাঁথিয়া গিয়াছেন। 'সোহং' তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা যিনি শুনিতে চাহেন, তাঁহাকে নির্ভয়ে বলিতে পারা যায়, এজন্য তিনি অন্যত্র অনুসন্ধান না করিয়া 'শঙ্করাচার্য্য' নাটক অধ্যয়ন করুন,—সহজেই 'সোহং তত্ত্বের মর্ম্ম তাঁহার উপলব্ধি হইবে। যিনি ত্যাগের মহিমাময় ও পবিত্রতাময় চিত্র দেখিতে চাহেন, তাঁহাকে একবার গিরিশের 'বুদ্ধদেব' পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মানবের দুঃখ মোচনের উপায়-চিন্তার জন্য রাজপুত্রের রাজ্যসুখ ছাড়িয়া যাওয়াতেও কি মহত্ত্ব আছে, কি মনোহারিতা আছে। আশ্রিত-রক্ষণ-কার্য্যের মাহাত্ম্য যিনি বুঝিতে ইচ্ছুক, তিনি যদি একবার 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটক পাঠ করেন, তাহা হইলে ঐ কার্য্যের মাহাত্ম্য-ছবি তাঁহার হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইয়া যাইবে। যখন ইহাতে দেখিবেন, আশ্রিত-রক্ষণরূপ সদনুষ্ঠান—ভীমের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, রক্ত মাংসের শরীর লইয়া—শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন সত্য সত্যই হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ উঠিবে, তখন অন্ততঃ কিছু কালের জন্যও পরার্থে প্রাণ-উৎসর্গের ইচ্ছা মনোমধ্যে বলবতী হইবে। আর বাহুবল অপেক্ষা নৈতিক বলের শ্রেষ্ঠতা যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, যিনি বুঝিতে উৎসুক, তাঁহাকে একবার 'তপোবল' পাঠ করিতে পরামর্শ দিতেছি। এই চিত্রপটে মনুষ্যত্বের বিরাট চিত্র জাজ্বল্যমান। মনুষ্যকে যে কেন সৃষ্টির শেষ বিবর্ত্তন, সৃষ্টির ললাম, চরম উৎকর্ষ বলা হয়, ইহা পাঠে তাহা উপলব্ধি হইবে। আর যিনি ভক্তের প্রাণের উচ্ছ্বাস, ভক্তির লীলাবিকাশ দেখিতে চাহেন, তিনি 'বিল্বমঙ্গল' পাঠ করুন। প্রেমের উদয়ে দুরন্ত রিপু কিরূপে কিরূপ ঘৃণিত হইয়া পড়ে তাহার উজ্জ্বল ছবি ইহাতে দেখিতে পাইবেন।

তাহার পর, তাঁহার দ্বিতীয় স্তরের নাটক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে বাঙ্গালীর আধুনিক সমাজচিত্রই প্রতিফলিত। বর্ত্তমান সমাজদেহে যে সকল ব্রণ বা স্ফোটক দেখা গিয়াছে, তাহারই উপর শস্ত্রপ্রয়োগকল্পে এই শ্রেণীর নাটক কল্পিত। ইহাতে গিরিশচন্দ্র চোখে আঙ্গুল দিয়া বাঙ্গালী সমাজকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, স্বার্থান্ধ হইয়া ভাই ভাইয়ের গলায় যতদিন

ছুরি বসাইবে, যতদিন বুকে হাঁটু দিয়া বসিবে, ততদিন বাঙ্গালীর আর কোন আশা নাই। তিনি আরও দেখাইয়া দিয়াছেন যে, হিন্দু সমাজের উচ্চ আদর্শ ও উচ্চভাব সকলকে ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিলে অধঃপতনকূপে ডুবিয়া মরিতেই হইবে।

এই শ্রেণীর নাটকে আর এক বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব —এই নাটকের আভ্যন্তরীণ উদ্দাম নৃত্যলীলা! শান্ত-প্রকৃতি বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে এমন অশান্তির ভীষণ ঝটিকা উঠিতে পারে, তাহা 'প্রফুল্ল' ও 'বলিদান' নাটক রচিত হইবার পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিল না। অথচ বাঙ্গালী ঘরের এমন সুন্দর, স্বাভাবিক ও পরিস্ফুট ছবিও বুঝি বঙ্গসাহিত্যে দুই একখানি ছাড়া বেশী নাই।

গিরিশচন্দ্রের তৃতীয় স্তরের নাটকগুলি ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত। এই শ্রেণীর নাটকে অপূর্ব্ব রাজনীতি-ব্যাখ্যা নিহিত আছে। দেশপ্রীতি ও আত্মোৎসর্গ ভাবের অস্তিত্ব থাকা সত্বেও যে কি দুর্ব্বলতার প্রভাবে দেশবাসীর সমস্ত যত্ন, সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়,—প্রাণান্তক পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়,—তাহা অতি সুন্দর করিয়া 'সৎনাম', প্রভৃতি নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার সামান্ত লোক-শক্তি কিরূপে রাজকীয় অত্যাচারের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া কিসের বলে মাথা উঁচু করিয়া তুলে,—আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়; তাহারও জলন্ত ছবি এক আধখানি ঐতিহাসিক নাটকে চিত্রিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক নাটক কয়খানিতে গিরিশচন্দ্র ইহাই আমাদের বারংবার বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, ঐক্যই শক্তি।—অনৈক্যই দুর্ব্বলতা।

গিরিশের চতুর্থস্তরভুক্ত যে কয়েকখানি নাটক আছে, তাহার আখ্যানবস্তু গুলি প্রায়ই মৌলিক। তাঁহার সামাজিক নাটকের 'প্লট' সকলও মৌলিক বটে কিন্তু এই শ্রেণীর নাটকের সহিত তাঁহার সামাজিক নাটকের পার্থক্য এই যে, ইহার 'প্লট' সকল কোনও সমাজ বিশেষের গার্হস্থ্য চিত্র অবলম্বনে কল্পিত নহে। ইহা কতকটা মানবত্বের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'মুকুল-মুঞ্জরা' ও 'ভ্রান্তি' প্রভৃতি গ্রন্থ এই শ্রেণীর নাটক। এই নাটকগুলি কেবলমাত্র যে আখ্যান-সম্বল, তাহাও নহে। ইহার মধ্যে লোকশিক্ষারও যথেষ্ট উপাদান সঞ্চিত আছে। পরোপকার মহাব্রতের যে ধ্যান-কথা 'ভ্রান্তি' নাটকে মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেরূপ মহতী মূর্ত্তি আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। বুঝি মানব-কল্পনায় সৃষ্টি (অবশ্য রামায়ণ ও মহাভারত ব্যতীত) উহার উর্দ্ধে আর যাইতে পারে না।

গিরিশের 'মিলনান্ত' বা 'বিয়োগান্ত' যে কোন নাট্য-কাব্যই হউক, কোন খানিতেই তিনি পাপের শোচনীয় পরিণাম দেখাইতে ভুলেন নাই। তাঁহার নাটকের ইহাও এক শ্রেষ্ঠ কাব্যোচিত গুণ বলিতে হইবে। কারণ, পাপ যতই দুর্দ্দমনীয় হউক, পরিণামে তাহার পরাজয় আছেই—এই বিশ্বজনীন-নীতি যাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা কোন মতেই কাব্য-জগতে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য নহে।

তাঁহার নাটকের উপরি-লিখিত চারিটী স্তর ব্যতীত তিনি গীতি-নাট্য, প্রহসন, গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতিতেও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'আবুহোসেন' ও 'মায়াতরু' প্রভৃতি গীতি-নাট্য তাঁহার বেল্লিকবাজার' ও 'আয়না' প্রভৃতি প্রহসন তাঁহার 'বাঙ্গাল' ও 'কর্জ্জনার মাঠে' প্রভৃতি গল্প, তাঁহার 'দীনবন্ধু' ও 'অভিনয় ও অভিনেতা' প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং তাঁহার 'ধুতুরা' ও 'হলদীঘাটের যুদ্ধ' প্রভৃতি কবিতা, এ সমস্তই বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে আদরের সম্পত্তি স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। তবে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়ই যে 'আহামরি' বা 'চমৎকার' হইয়াছে, এমন কথা বলিতেছি, কেহ যেন মনে না করেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, গিরিশচন্দ্র সাহিত্যের যে যে বিভাগে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, প্রায় সেই সকল বিভাগেই তিনি কিছু না কিছু এমন জিনিস রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা অমরত্বের তরণীতে নিশ্চিতই স্থান পাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ, যাহা সৌন্দর্য্য-সম্পৃক্ত তাহার বিনাশ নাই। সৌন্দর্য্য—অমৃত!

গিরিশচন্দ্র অসাধারণ কল্পনা কুশল ছিলেন। তাঁহার কল্পনা-বিহঙ্গ যেন কখনও সমগ্র আকাশ জুড়িয়া পক্ষ বিস্তার করিয়াছিল। অথচ তাঁহার কল্পনা-রাজ্যে কোন 'কিম্ভুত কিমাকার'কে আশ্রয় লাভ করিতে দেখি নাই। পুষ্প দেখিয়া নন্দন-কানন বা পত্র দেখিয়া মহারণ্য কিম্বা জলবিন্দু দেখিয়া মহাসাগর কল্পনা করা যদি কাহারও সাধ্য হয় তবে তাহা গিরিশচন্দ্রের ছিল। তাঁহার নাট্য-গত ঘটনা ও বিচিত্র চরিত্রের কল্পনা আমাদের এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিবে।

গিরিশচন্দ্র যে নাট্য-জগৎ গড়িয়া গিয়াছেন, তাহার কর্ম্মপ্রবাহ বিধাতার জাগতিক কর্ম্ম প্রবাহের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। এই জাগতিক ব্যাপার-সমূহ যেমন কার্য্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত হইয়া অবাধগতিতে বহিয়া যাইতেছে, তাঁহার নাটকীয় ব্যাপারসমূহও সেইরূপ সেইভাবে প্রবাহিত দেখা যায়।

এই নাট্যকাব্যে পাঠকগণকে এতই প্রবলভাবে তন্ময় করে যে, তাহাতে নাট্যকারের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে হয়। ইহা পড়িবার সময় গিরিশের অসাধারণ মানব-চরিত্রাভিজ্ঞান বা অসামান্য সূক্ষ্মদর্শন বা অত্যদ্ভুত নাট্য-কৌশল, এই সকল কিছুতেই লক্ষ্য করিবার অবকাশ থাকে না। এইরূপ আত্মগোপনই নাট্য-কৌশলের একটী অতি প্রধান অঙ্গ। গিরিশচন্দ্র ইহাতে মন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন।

তাঁহার নাটকে ভাবী শুভাশুভ ঘটনার ইঙ্গিতস্বরূপ কখনও কোন পাত্র পাত্রীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পন্দিত হইতে দেখি নাই। প্রকৃতি যে কখনও কাহারও হাসি-কান্না বা জীবন-মরণের 'তোয়াক্কা' রাখে না, তাহা তিনি জানিতেন; তিনি জানিতেন যে, সূর্য্য সূতিকাগৃহ ও শ্মশান সমভাবেই আলোকিত করে। সেইজন্ত তাঁহার নাটকে আলো ও আঁধার, সুখ ও দুঃখ পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইস্থলে আমরা 'প্রফুল্ল' নাটকের প্রথম অঙ্কান্তর্গত প্রথম দৃশ্যের নাম করিতে পারি। যোগেশ—বিপুল সুখৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর যোগেশ—যে অতি অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, পূর্ব্বে তাহার সামান্যতম আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। সুখের মদিরা পানে বিভোর হইয়া যোগেশ যখন পত্নীকে বলিতেছেন,—"বড়বউ, আজ বড় আমোদের দিন"—সেই সময়ে বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত হইল। কোথা হইতে নিদারুণ ঘটনাচক্র আসিয়া যোগেশকে আঘাত করিল—"তোমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—ব্যাঙ্কে বাতি জ্বলেছে।" এই আঘাতের প্রতিঘাত হইল,—"য়্যাঁ য়্যাঁ, আমার যে যথাসর্ব্বস্ব সেথা! আজ বড় আমোদের দিন! আজ বড় আমোদের দিন! আবার ফকির হলুম!"

স্বভাবের এইরূপ অপূর্ব্ব ছবি, এইরূপ সুন্দর নাট্য-কৌশল, ভাষা ব্যবহারের এমনই অদ্ভুত কারিগরি, গিরিশের নাটকের সর্ব্বত্র ছড়ান আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা দেখাইবার সুযোগ নাই। তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাটক সমালোচনার সময় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ঐরূপ ভাব-বৈপরীত্যের চিত্র যাঁহাদের দৃষ্টিতে বিসদৃশ বলিয়া বিবেচিত হয়, নাট্যগত দোষ বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাঁহাদিগকে আমরা 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক একবার পড়িতে অনুরোধ করি। সেখানে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ডন্‌ক্যানের হত্যা রাত্রে ডন্‌ক্যান যখন ম্যাকবেথের দুর্গ-তোরণে গমন করিতেছেন, তখন তাঁহার চিত্ত অতি প্রফুল্লতাময়—জগতের

সমস্তই তখন তাঁহার কাছে সুন্দর বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি ব্যাঙ্কোকে বলিতেছেন,—

"এ অতি সুন্দর পুরী,
বায়ু মৃদুমন্দগতি মধুর পরশে কায়!"

ব্যাঙ্কো এই কথায় আবার যোগ দিয়া বলিল,—

"বসন্তের অতিথি এ বিহঙ্গ সুন্দর"—ইত্যাদি।

ভাবী বিপদের কোনও কুলক্ষণ বা কুচিহ্ন দ্বারা ডন্‌ক্যান্‌কে আমরা একবারও অভিভূত হইতে দেখি না।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যচিত্রপটে হাস্যরস ও অন্য রসের ছবি যে ভাবে পাশাপাশি সাজাইয়া গিয়াছেন, সাজাইবার সে প্রণালীও বঙ্গসাহিত্যে নূতন। শুধু নূতন বলিয়া যে ইহা উল্লেখযোগ্য, তাহা নহে। এই রস-বৈপরীত্যের সমাবেশে নাট্যকাব্যে যে রসের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহারই উপায় তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, কোন এক রসের 'এক ঘেয়ে' ভাব পরিবর্জ্জন জন্য নাটকে মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা নিতান্ত আবশ্যক এবং তাহাতে সফলতা লাভ করিতে পারিলে তাহা নাট্যকলা প্রতিভারই দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে। বিলাতী দৃষ্টান্ত নহিলে যাঁহারা একথা ভাল বুঝিবেন না, তাঁহাদিগকে আমরা ডন্‌ক্যানের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে Porter sceneএর হাস্যরসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

এই জগৎ একটি ধারাবাহিক কর্ম্মপ্রবাহ। আমরা যাহাকে ঘটনা বলি, তাহা এই কর্ম্মপ্রবাহের সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ মাত্র। এই ভগ্নাংশই—ইতিহাস ও উপাখ্যানের উপকরণ। এই ভগ্নাংশের 'ফটো' তুলিবার জন্য ইতিহাসের আয়োজন, আর তাহাকে সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ সুন্দর করিয়া অঙ্কিত করিবার জন্যই উপাখ্যানের আবশ্যক। তারিখ ও নাম ব্যতীত উপাখ্যানকেও এক প্রকার ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

এই উপাখ্যান লিখিবার আবার তিনটি প্রধান প্রণালী প্রচলিত আছে; যথা—আখ্যায়িকা, নভেল ও নাটক। ইহার মধ্যে নাটক লেখাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কেন না, নাট্যকবি আখ্যায়িকা বা নভেল-রচয়িতার মত উপাখ্যান সম্বন্ধে নিজে কিছু বলিবার অবসর বা সুযোগ পান না। তাঁহাকে অন্তরালে থাকিয়া নাট্যোল্লিখিত পাত্র পাত্রীর কথোপকথনের সাহায্যে আমূল গল্প করিয়া যাইতে হয়। কেবল কথোপকথনের দ্বারা সুন্দর গল্প রচনা করিলেই আবার

চলিবে না। ঐ কথোপকথনের শিরায় শিরায় ঘাত-প্রতিঘাতের স্রোত প্রবল ভাবে প্রবহমান থাকা চাই। এই ঘাত-প্রতিঘাতই নাটকের আত্মা। এই আত্ম-সমন্বিত নাটক গিরিশচন্দ্রের নাটকের পূর্ব্বে 'নীলদর্পণ' ও 'নয়শো রূপেয়া' ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় বাহির হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি আঁকিতে হয় বলিয়াই নাটক-মধ্যগত প্রত্যেক কথার বিশেষ উপযোগিতা থাকা চাই। উপযোগিতার অর্থ এই যে, যে ভাবাবেশে যাহার যতটুকু বক্তব্য, সেই ভাবাবেশে তাহাকে ততটুকু বলাইতে হয়। নহিলে চরিত্র অস্বাভাবিক ও বাগাড়ম্বর বিশিষ্ট হইয়া উঠে। হৃদয়—হর্ষ বা বিষাদ, ভয় বা বিস্ময়—যখন যে ভাবাপন্ন হয় তখন কিছু হৃদয়ের সমগ্র ভাবটা ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয় এবং কতকটা হয় না। যতটুকু ব্যক্ত হয়, তাহা মানুষের ক্রিয়া এবং কথার দ্বারা। এই ক্রিয়া এবং এই কথাই নাট্যকারের অবলম্বন,—সামগ্রী। এই সামগ্রীর যিনি যতটুকু সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ নাটকাংশে ততই উচ্চদরের হইয়াছে। এই সামগ্রীর উপর গিরিশের যে প্রভূত আধিপত্য ছিল, ইতিপূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এইবারে উদাহরণ দ্বারা কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি।

'রাজা ও রাণী' নামাঙ্কিত নাটকে রাণী সুমিত্রার মৃত্যুতে বিক্রমদেবের মুখে রবীন্দ্রনাথ যে শোকোচ্ছ্বাস বসাইয়া দিয়াছেন, আর 'প্রফুল্ল' নাটকে পত্নী জ্ঞানদার মৃত্যুতে যোগেশের মুখে কিম্বা 'বলিদান' নাটকে কন্যার মৃত্যুতে করুণাময়ের মুখে গিরিশচন্দ্র যে শোকের কথা বসাইয়া গিয়াছেন, এই উভয় কবির শোকোচ্ছ্বাস তুলনা করিয়া দেখিলে ঐ উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নায়কের মুখ দিয়া হৃদয়ের বক্তব্য ও অবক্তব্য এই দুই অংশই বাহির করাইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র কিন্তু বক্তব্যের অতিরিক্ত একটি কথাও তাঁহার নায়কদ্বয়ের মুখ দিয়া বলান নাই। অথচ নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিক্রমদেবের দুঃখ অপেক্ষা শত সহস্র গুণ দুঃখ যোগেশ ও করুণাময়ের অল্প কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। শোক বা দুঃখ যতই গভীর, ততই তাহা বাক্যের অতীত হয়। তাই আমরা করুণাময়কে কন্যার মৃত্যুতে 'কপালে করাঘাত, কেশোৎপাটন, পতন, মূর্চ্ছা বা সুদীর্ঘ বক্তৃতা' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে বলিতে শুনি ;—"আমার শান্ত মেয়ে—রাস্তায় যাবে না— লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না। মা—মা, অন্ন দিতে পারি নেই, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছ! আহা জল খেয়ে কি শীতল হ'য়েছ?"

এইরূপে গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে দুই একটা ভাষার রেখাপাতে বিচিত্র চিত্র বৃত্তির, বিবিধ ভাবের যথাযথ প্রতিকৃতি ফুটাইয়া গিয়াছেন। মানুষের যত প্রকার ভাব আছে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ভক্তি, প্রীতি, দয়া ও প্রেম প্রভৃতি তাঁহার নাটকে সকল ভাবেরই যথাযথ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

রমেশের প্রতি প্রপীড়িত সুরেশের সুতীব্র ঘৃণার চিত্র কেমন অল্প কথায় সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। সুরেশ রমেশকে বলিতেছে —"তোমার জেল হয় না কেন, তা জান? আজও তোমার যোগ্য জেল ত'য়ের হয়নি।" তীব্র ঘৃণার কি সুন্দর অভিব্যক্তি!

জ্ঞানদার দুইটী কথায় তাঁহার পুত্রবাৎসল্য ও হৃদয়ের নিদারুণ ব্যথা কি চমৎকার অভিব্যক্ত হইয়াছে! জ্ঞানদাকে যখন আমরা প্রফুল্লের প্রতি বলিতে শুনি,—"বোন, তোমার কাছে আমার একটা মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো!"—তখন অশ্রুসম্বরণ করা বাস্তবিকই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

আবার 'বিষাদে'র মুখে "মন্ত্রি, আমি বেশ্যা হ'ব।"—এই একটা কথায় 'বিষাদ' চরিত্রের বিশেষত্ব, তাঁহার নিশ্চেষ্ট সরলতা ও অসামান্য পতিভক্তি কেমন অপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে, দেখিতে পাই!

ভাষা ব্যবহারে গিরিশচন্দ্রের এইরূপ অপূর্ব্ব কৌশলের আর কত উদাহরণ উদ্ধৃত করিব? সমস্ত দেখাইতে গেলে, বোধ করি, দুই বৎসরের সমগ্র 'অর্চ্চনা'তেও ইহার স্থান সঙ্কুলান হইয়া উঠিবে না।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে বহিঃ প্রকৃতিরও ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকে বাহ্য প্রকৃতির ছবি সম্বন্ধে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "নাট্যকবিরও পাখীর গান, ভ্রমর গুঞ্জন দর্শককে শুনাইতে হইবে, বর্ণনায় নয়—ঘাত-প্রতিঘাতে। কেবল বর্ণিত হইলে নাট্যরস থাকিবে না। "রোমিও জুলিয়েট"এ চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তাহা বর্ণিত চন্দ্র নয়,—হৃদয়-প্রতিঘাতী চন্দ্র। তপোবনে বারিসিঞ্চন, ভ্রমর গুঞ্জন—বর্ণিত নহে—হৃদয়-প্রতিঘাতকারী।" বলা বাহুল্য, গিরিশের নাটকে বাহ্য প্রকৃতির যে ছবি আছে, তাহাও হৃদয় প্রতিঘাতকারী;—বর্ণিত নহে। "রাজা ও রাণী" পুস্তকে যেমন কোথাও কিছু নাই অবান্তরভাবে ইলা ও কুমারসেন বর্ষা বর্ণনা করিতেছেন, গিরিশচন্দ্রের নাটকে সেরূপ বর্ণনার অস্তিত্ব বড় একটা কোথাও নাই। বিল্বমঙ্গল নাটকে 'ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধতরঙ্গিনী' ও

সিরাজদ্দৌলা নাটকে 'মেঘাবৃত রজনী' প্রভৃতির যে সকল চিত্র দেখিতে পাই, সে সমস্তই হৃদয় প্রতিঘাতকারী। খেয়ালের বশে তাঁহার কোন নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়া কখনও কোন বর্ণনা বাহির হয় নাই।

গিরিশের অসামান্য প্রতিভার যাহা সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব, সে সম্বন্ধে এখনও আমরা কিছু বলি নাই। সে বিশেষত্ব—তাঁহার চরিত্র সৃষ্টি!

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যে দেশে রাম লক্ষ্মণ সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই দেশে নিমচাঁদ এখন আধিপত্য করিতেছে।" সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের আজ আর সে দিন নাই। বঙ্কিম ও গিরিশের অসাধারণ সৃষ্টিশক্তির প্রভাবে আমাদের সে দুঃখ মোচন হইয়াছে। শুধু যে চরিত্র-সৃষ্টির দুঃখ ঘুচিয়াছে, তাহা নহে। গিরিশ-সৃষ্ট-চরিত্র সমূহ লইয়া বঙ্গ-সাহিত্য আজ যে কোন অপর সাহিত্যের সহিত অনায়াসে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অগ্রসর হইতে পারে। ব্যাস বাল্মিকীর সৃষ্টি ভিন্ন আর কোথাও এত বিভিন্ন প্রকারের চরিত্র-কল্পনা দেখা যায় না। গিরিশের নাটকাবলী যিনি একটু মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমাদের এই কথায় সায় দিতে হইবে। বলিতেই হইবে যে,—"হাঁ, এত বিবিধ বিচিত্রতার সাক্ষাৎ আর কোন 'আর্ট গ্যালারী'তে বড় একটা পাওয়া যায় না।"

এইরূপ চরিত্র-বৈচিত্র্য তাঁহার নাটকে না থাকিবেই বা কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘটনা-কল্পনায় গিরিশচন্দ্রের তুলনা নাই। কিন্তু ঘটনা যাহাই হউক, হৃদয়ের সহিত তাহা শতসূত্রে আবদ্ধ আছে। সুতরাং ঘটনা-বৈচিত্র্য দেখাইতে গেলেই চরিত্র-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি আপনিই হইয়া পড়িবে। বেশ্যার লাঞ্ছনায় লম্পটের প্রগাঢ় বৈরাগ্য-উদয়ের ছবি আঁকিতে হইলেই বিল্বমঙ্গল আঁকিতে হইবে। নাস্তিকতার হৃদয়-জ্বালা বুঝাইতে হইলে 'কালাপাহাড়ে'র মত চরিত্রেরই অবতারণা আবশ্যক। বিলাসের পঙ্কিলস্রোত কেমন করিয়া মানুষকে অধঃপতন-কূপে টানিয়া লইয়া যায়, তাহার চিত্র আঁকিতে গেলে প্রকাশ ও ভুবনের মত চরিত্র-সৃষ্টি অনিবার্য্য। কুবাসনা বিবেককে ঘুষ দিয়া কেমন করিয়া মানুষকে হৃদয়হীন করিয়া তুলে, তাহার আলেখ্য দেখাইতে হইলে মোহিনীর মত চরিত্রের সৃষ্টি করিতে হয়। পুরুষকার দৈবের নিকট কেমন করিয়া পরাজয় স্বীকার করে, তাহার চিত্র ফুটাইতে হইলে 'যোগেশে'র মত চরিত্র-অঙ্কনই প্রয়োজন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়দণ্ড কিরূপে জাগ্রত হইয়া উঠে তাহার চিত্র লোক-সম্মুখে ধরিতে হইলে, শিবাজীর মত চরিত্র আঁকিয়া

দেখাইতে হয়। আর সর্পের প্রতিহিংসা-বৃত্তি মানুষে দেখাইতে হইলে জহরা ও চঞ্চলা যে ঘটনাধীন হইয়াছিল, সেই ধরণের ঘটনা-কল্পনা আবশ্যক।

গিরিশ-সৃষ্ট চরিত্রাবলীর আর কত উল্লেখ করিব! তাঁহার মুকুল, বিষাদ, নসীরাম, চিন্তামণি, জ্ঞানদা, প্রফুল্ল, তারা, বৈষ্ণবী,গুল্‌নেয়ার, রঙ্গলাল,ভজহরি, গঙ্গাবাই, থাকমণি, রমেশ, অঘোর, বরুণচাঁদ, অশোক, শঙ্করাচার্য্য ও ব্রহ্মণ্যদেব প্রভৃতি প্রত্যেকটিই অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এ সকল সৃষ্টিতে পুনরুক্তি দোষ একেবারে নাই। মানবের হৃদয় ও মস্তিষ্ক গিরিশের নখদর্পণে ছিল। মানব-হৃদয়ের এমন কোন রহস্য খুঁজিয়া পাই না, যাহা গিরিশের প্রদীপ্ত প্রতিভায় আলোকিত হয় নাই। অথচ কোন চরিত্রই অঙ্গহীন বা বিকৃত নহে,—সকল গুলিই সুসম্পূর্ণ।

স্বপ্নে এমন দেখিয়াছি যে আমার সহিত আর একজনের কোন বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। আমি যে কথা বলিলাম, তাহার যে প্রত্যুত্তর হইবে আমি মনে মনে স্থির করিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, দেখিলাম আমার সেই কল্পিত উত্তর না হইয়া অন্য উত্তর হইল। নিদ্রিত অবস্থায় আমরা এইরূপ যে নিত্য সত্যের সন্দর্শন পাই, জাগ্রত অবস্থায় গিরিশের নাট্যকলায় সেই অদ্ভুত কৌশল দেখিতে পাইয়া থাকি। তাঁহার সমস্ত চরিত্রই স্বাধীন, জীবন্ত। চরিত্র-কল্পনায় তিনি অত্যদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং ইহাই তাঁহার অমর কীর্ত্তি! আর এই অমানুষী কল্পনাশক্তির অধিকারী বলিয়াই তিনি মহাকবি!

আজ আমরা এই মহাকবির তিরোভাবে সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমের ভাষায় বলিতে পারি যে, "যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি?—বাঙ্গালীর মধ্যে মানুষ জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব, শ্রীমধুসূদন, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীগিরিশচন্দ্র। ......এই সকল নামের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল!......কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও— তাহাতে নাম লেখ—"শ্রীগিরিশচন্দ্র।"

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

বিষ্ণুসংহিতায় দণ্ডবিধি

যাহাতে এক ব্যক্তির অসাবধানতায় বা অপরাধে জনসাধারণের স্বাস্থ্যাদি হানি না হয়, সাধারণ প্রজামণ্ডলীকে অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় বা সাধারণের নীতি জ্ঞান কলুষিত হইতে না পারে তজ্জন্য আধুনিক সভ্য জগত বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে বিরত হয় না। এবং এ বিষয়টি দণ্ডবিধির অধীনে আনিয়া অপরাধীর দণ্ডের বিধান করিয়া থাকে। পিনাল কোডে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আইন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে কার্য্যে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষায় বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে বা যে কার্য্যের দ্বারা জন সাধারণের বিপদ বা বিরক্তি উৎপাদিত হইবার সম্ভাবনা, সে কার্য্য ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ। যদি কেহ অসাবধানতা বশতঃ এমন কার্য্য করে যাহাতে সমাজ মধ্যে কোনও সংক্রামক প্রাণহানিকর ব্যাধির বিস্তার হইতে পারে তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। অশুদ্ধ স্বাস্থ্যহানিকর খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলে বা অশুদ্ধ ঔষধ বিক্রয় করিলে পিনাল কোডের আইনে অপরাধ। সাধারণের পানীয় জল কলুষিত করিলেও দোষীর নিস্তার নাই। অসাবধানতা বশতঃ বারুদ প্রভৃতি লইয়া কার্য্য করাও অপরাধ। সবেগে শকট চালনা করিয়া কলিকাতার মত সহরে নিত্য লালবাজারের আদালতে কত ব্যক্তির অর্থদণ্ড হইতেছে তাহা সহরবাসী মাত্রেই অবগত আছে। অশ্লীল পুস্তক বা চিত্রাদি বিক্রয় করাও এই অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাধের তালিকাভুক্ত।

আজকাল অর্দ্ধশিক্ষিত এমন কি সময়ে সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে Citizen Life বা সাম্প্রদায়িক জীবন কিরূপে যাপন করিতে হয় সে ধারণা প্রাচীন ভারতবাসীর কেন, প্রাচ্যবাসীর ছিল না। প্রাচ্যে স্ব স্ব পরিবার লইয়াই লোকে ব্যস্ত থাকিত, প্রাচীন হিন্দুর অপর পরিবারস্থ লোকের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবিবার আবশ্যক থাকিত না। আমরা উপরে যে সকল অপরাধের বর্ণনা করিলাম, সেগুলি সাম্প্রদায়িক জীবন সম্বন্ধীয় অপরাধ। যাহাতে আমরা পরস্পরের স্বাস্থ্য ও নিরাপদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জীবনযাপন করিতে পারি তজ্জন্য এই সকল আইনের সৃষ্টি। যে কেহ হিন্দুর সংহিতাগুলি পাঠ করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন যে তাহাতে এই শ্রেণীর অপরাধের বর্ণনার অভাব নাই। ফলতঃ পিনাল কোডের যে অপরাধগুলি উপরে বর্ণনা

করিলাম স্মৃতিগ্রন্থে এক সজোরে শকট চালনা ব্যতীত সকল অপরাধের দণ্ডের বিধান আছে। বলা বাহুল্য, সে সমাজে আজ কালিকার মত এত অধিক শকটের বাহুল্য ছিল না, সুতরাং আমরা এ শ্রেণীর অপরাধের বর্ণনা বিষ্ণু বা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় পাই না। এই অপরাধের বর্ণনার অভাব হেতু কেহ হিন্দু সভ্যতাকে নিকৃষ্ট বলিতে পারে না।

সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে বিষ্ণু সংহিতায় বিধান আছে—"গৃহে পীড়াকরং দ্রব্যং প্রক্ষীপন পণশতং" পর গৃহে পীড়াকর দ্রব্য প্রক্ষেপ করিলে শত পণ দণ্ড। সাধারণের বিরক্তি ও স্বাস্থ্যহানি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "পথ্যুদ্যানোদক সমীপেং-শুচিকারী পণশতম" অর্থাৎ পথে, উদ্যানে বা উদক সমীপে অশুচি আবর্জ্জনা ফেলিলে শতপণ দণ্ড এবং তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে।

যাহাতে ভক্ষ্য দ্রব্য বা ঔষধাদি কলুষিত না হয় তৎসম্বন্ধে অনেক বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

> ভেষজস্নেহলবণ গন্ধধান্যগুড়াদিষু
> পণ্যেষু প্রক্ষিপন হীনং পণান্ দাপ্যস্তু ষোড়শ।

অর্থাৎ "ঔষধ, ঘৃত, তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য, লবণ কুঙ্কুমাদি গন্ধ ধান্য গুড় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিলে ষোড়শ পণ দণ্ড হইবে।" বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

> "জাতিভ্রংশ কুরস্তাভাক্ষ্যস্ত ভক্ষয়িতা বিবাসাঃ।
> অভক্ষ্যস্তাবিক্রেয়স্ত চ বিক্রয়ী।"

অর্থাৎ "জাতিভ্রংশকর অভক্ষ্য ভোজন করাইলে নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে এবং অভক্ষ্য ও অবিক্রেয় বস্তু বিক্রয় করিলেও ঐরূপ দণ্ড হইবে।" আবার বিষ্ণুসংহিতায় দেখি—

> "অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণদূষয়িতা ষোড়শ সুবর্ণান।
> জাত্যাপহারিণা শতং। সুরয়া বধ্যঃ।"

"ব্রাহ্মণকে অভক্ষ্য খাওয়াইয়া দূষণীয় করিলে ষোড়শ সুবর্ণ দণ্ড। জাত্যাপহারীর শত সুবর্ণ দণ্ড এবং সুরা দ্বারা জাতিসংহার করিলে বধদণ্ড।" বলা বাহুল্য, একই গ্রন্থে দুই স্থলে একই অপরাধের দুইপ্রকার দণ্ডের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে টীকাকারদিগের তর্ক যুদ্ধ এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে অভক্ষ্য খাওয়াইলে বা তাহাদের জাতি মারিলে অপেক্ষাকৃত কম দণ্ড হইত।

এ সম্বন্ধে আমরা পাশ্চাত্য আইনে ও প্রাচীন বিধিতে একটা পার্থক্য দেখি। পাশ্চাত্য আইন কেবল স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীন জগত ধর্ম্মজ্ঞান সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছে। হিন্দু, য়িহুদী বা মুসলমান জাতি কতক শ্রেণীর খাদ্যকে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সুতরাং এই সকল জাতির মধ্যে সেই ধারণা পূর্ণমাত্রায় প্রবল রাখিবার জন্য বিধানাদিরও সৃষ্টি করিয়াছে।

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে চিকিৎসা শাস্ত্র না জানিয়া চিকিৎসা করিত তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইত। সাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইহা অতি উত্তম বিধান। অশ্লীল বা নাস্তিক সাহিত্যাদি বিক্রেতাকেও দণ্ডভোগ করিতে হইত।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কবিতা-কুঞ্জ।

সাধনা

সারাদিন বড় সাধে মালা গাঁথি আনি'
আঁখি-নীরে ধুয়ে বালা দিবা-অবসানে
কার দুটি চরণের উদ্দেশে না জানি
ভাসা'ল নদীর জলে বিভল পরাণে।

জ্বালায়ে প্রদীপটিরে আরতির তরে,
তটিনী-সোপানে বসি', কার মুখ স্মরি'
ধীরে ধীরে ভাসাইল নদীর লহরে ;
অনির্ব্বাণ দীপ-শিখা দোলে উর্ম্মি'পরি।

সন্ধ্যার শীতল বায়ু খেলিছে অলকে,
অবিরিতে নদী-জলে ছুটিছে অঞ্চল ;
আঁখি দুটি শুধু দূরে চাহে ক্ষীণালোকে,
ঝরা ফুল সহ ঝরি' পড়ে আঁখিজল।

কে জানে গো কোন্ পারে দূর বন্ধু তার
পরিল সে দীপালোকে ভাসা ফুল-হার!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

মাতৃহীনের সন্ধ্যা

সন্ধ্যা আসিয়াছে নামি', গৃহে দীপ জ্বালা
সবে রত গৃহ কাজে। আমি যে একেলা,
স্থির আঁখি চেয়ে আছি আকাশের পানে
যেথায় দাঁড়ায়ে সন্ধ্যা অরুণ নয়ানে
বন অন্তরালে। শুধু জাগিতেছে মনে
ওগো মা তোমারি মুখ, ব্যাকুল বচনে
গড়া আশীর্ব্বাদ-বাণী। তব স্নেহ রাশি
স্মরিয়া আজিকে মোর পরাণ উদাসী।

নিবিড় তিমির যে মা। তোর বাহুছায়ে
আজিকে ধরিলিনে তো সন্তানে লুকায়ে,
দিলিনে তো একটা চুম্বন! ধূলি ঝাড়ি'
নিলিনে তো কোলে। তোর বক্ষ'পরি
রাখিয়া এ শ্রান্ত শির গাহিলিনে গান,—
তৃষা মোর মিটিল না, জুড়া'ল না প্রাণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

তুমি ও আমি।

তুমি ব'সে আছ আজ উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে,
প্রকৃতি ঢালিছে ধন মুক্ত হস্তে তোমার ভাণ্ডারে
আমি হীন পড়ে আছি হতাশার সর্ব্ব নিম্নস্তরে,
ম্লান,শীর্ণ, ক্লিষ্টমুখে বাঁধি বুক ক্ষীণ আশাডোরে!

তুমি ব'সে আছ সুখে বিদ্যা বুদ্ধি যশঃ বিমণ্ডিত,
অদৃষ্ট-গগনে তব সমুজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত;
আমি বহিতেছি আজ কলঙ্কিত ধিক্‌ত জীবন,
ভাগ্যাকাশে ঘন ঘটা-সমাচ্ছন্ন সুখের তপন।

তুমি উঠিতেছ ধীরে মহত্ত্বের উন্নত সোপানে,
অমিত পুণ্যের পথে সতর্কিত পদ-সঞ্চালনে;
পাপের পিচ্ছিল পথে ভ্রমি আমি বিভ্রান্ত-চরণে,
কক্ষভ্রষ্ট উল্কাসম ধাই দ্রুত পাপ-আকর্ষণে!

তোমার করুণাহস্ত প্রসারিত দীনের কুটীরে,
প্রভাতে তোমার নাম শত কণ্ঠ গায় উচ্চৈঃস্বরে,
ভ্রমি আমি দিবানিশি আলাময়ী ক্ষুধার তাড়নে,
শ্রম-ক্লান্ত শীর্ণদেহে মুষ্টিমেয় অন্নের সন্ধানে।

তোমার জীবনকুঞ্জে বসন্তের কোকিল কুহরে,
দেবতার আশীর্ব্বাদ পড়িতেছে সদা তব শিরে,
জীবন-উদ্যানে মোর বাসনার অস্ফুটন্ত কলি,
কীটদষ্ট পড়ে ঝরি না ফুটিতে উল্লাস-উজলি!

সৌধ অট্টালিকা মাঝে সুখে তুমি করিতেছ বাস,
সহিতেছি নিত্য আমি নিয়তির তীব্র-উপহাস;
তুমি ধনী, আমি দীন—যাপি দিন মরমে মরিয়া,
তুমি আমি দুইজনে দুই স্রোতে যেতেছি ভাসিয়া।

শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী।

টাইটানিক পোত।

সাগরের পথে ছুটিছে নির্ভয়,
সাধ্য কার করে দিকের নির্ণয়?
ভেদিয়া ঝটিকা তরঙ্গ নিচয়,
টাইটানিক পোত ঐ জগতে বিদিত।

ডুবিবার ভয় কেহ নাহি করে,
সুবৃহৎ পোত ধরণী ভিতরে,
জীবন্ত ও বাসনা ভ্রমিতে সাগরে;
নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য হেরি সকলে বিস্মিত।

তুলি উচ্চ শির আকাশ ভেদিয়া,
সগর্ব্বে বৃটিশ পতাকা ধরিয়া,
পবনের বেগে চলিছে ধাইয়া,
উপেক্ষিয়া জলধিরে করিয়া বিদ্রূপ।

করিল এ পোত সিন্ধু-দর্প চূর;
সাগরের পথে যাইতে সুদূর,
আরোহিরা লভে আনন্দ প্রচুর,
স্বপনে ভাবেনি শঙ্কা কেহ কোনরূপ।

সাগরের জলে ডুবিল তপন,
আঁধার আকাশ, বারিধি ভীষণ,
উঠিছে পড়িছে ঊর্ম্মি অগণন,
নীরধিতে প্রকৃতির প্রমত্ত আকার।

জলধির বক্ষে গভীর নিশায়,
আরোহিরা কেহ সুখে নিদ্রা যায়,
কেহ বা নিমগ্ন স্বদেশ চিন্তায়,
কেহ হাসে কেহ খেলে, উল্লাস সবার।

তুষার পর্ব্বতে সহসা আহত,
বাজিল সহস্র অশনির মত,
নিয়তির চক্র ঘুরিছে নিয়ত,
বিদীর্ণ অর্ণবপোত, কাঁপিল সঘনে।

চমকি উঠিল আরোহি সকলে,
কাঁদিল সন্তান জননীর কোলে,
আর্ত্তনাদ উঠে রমণী-মণ্ডলে,
চকিতে চাহিল স্বামী প্রেয়সী-বদনে।

পোতাধ্যক্ষ ত্বরা ইঙ্গিতে জানায়,—
"সাবধান হও আরোহি সবায়,
বিপদ নিকটে, নাহিক উপায়,
জীবন রাখিতে ধর জীবন-তরণী।

বাঁচাও রমণী শিশুর পরাণ—
বীরদন্তে মর ব্রিটিশ-সন্তান—
ব্রিটিশ তোমরা ব্রিটনের মান—
ব্রিটিশ-শোণিতে পূর্ণ, সবার ধমনী।"

কেহ বায় ছুটে কেহ পায়ে লুটে—
কেহ বা স্তম্ভিত, কথা নাহি ফুটে—
কেহ বা কাপ্তেনে ধরি করপুটে
কাতরে যাচিছে স্বীয় পতি ভিক্ষাদান।

কেহ না তাদের শুনে হাহাকার;
গভীরা রজনী, চৌদিক আঁধার,
দুস্তর বারিধি অতল অপার,
ঈশ্বরে সঁপিল প্রাণ, পোতে পরিত্রাণ।

ফুরাইল সব প্রাণের বাসনা
মুখে নাহি বাণী নাহিক চেতনা
মেহাগে করুণে বাজিল বাজনা
সাগর-কল্লোল সনে মিশিল সে স্বর।

সিন্ধু গ্রাসে পোত উচ্চ নাদ তুলি,
প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের পুতুলি,
কোথা গেল সব ধরণীরে ভুলি!
পূত স্মৃতি ধরামাঝে জাগে নিরন্তর।

শ্রীনলিনীমোহন মণ্ডল।

মহামতি ষ্টেড্।

সম্পাদককুলচূড়ামণি ভারতহিতৈষী বিশ্বপ্রেমিক মহামতি ডবলিউ, টি, ষ্টেড মহোদয় আর ইহজগতে নাই! সারাজীবন জগতের শান্তির জন্ত, অধঃপতিত জাতির অভ্যুত্থানের জন্ত, শাসন-পীড়িত মানবের অশ্রুমোচনের জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া টিটানিক পোতে তরঙ্গায়িত এটল্যান্টিক মহাসাগরের হিমগর্ভে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন, সেইজন্য সমগ্র সুসভ্য জগৎ আজ তাঁহার অভাবে হাহাকারে পূর্ণ! তিনি একাধারে জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের মহত্ব, তাঁহার হৃদয়ের মহানুভবতা, তাঁহার বিশ্বজনীন প্রেম, তাঁহাকে সকল দেশে সকল সমাজে অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে। ভারতবর্ষের জন্ত তাঁহার যেরূপ প্রাণ কাঁদিত তাহা একবারও ভাবিলে আমরা তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-মন্দিরে প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতার ডালি না দিয়া থাকিতে পারি না। যে নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্ত অনেক সময় তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট অপ্রীতিভাজন হইতেন তাহারই বলে তিনি আরব্ধ কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইতেন এবং জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিতেন!

চাক্ষুষ পরিচয় না থাকিলেও পত্র-ব্যবহারে তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্টতা হইয়াছিল এবং তাঁহার মহৎ হৃদয়ের কতক পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম।

যেমন জীবনে তেমনি মরণে উইলিয়ম ষ্টেড্ বীরত্বের পূর্ণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ দশা মনে করিলে যেমন হৃদয় শোকার্ত্ত হয় তেমনি মৃত্যুকালীন তাঁহার নির্ভীকতা ও বীরত্বের কাহিনী তাঁহার প্রতি জগতবাসীর প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলে!

যাও মহামতি ষ্টেড্, অমরধামে চিরবিশ্রাম করিয়া জগতে তোমার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর!

সাহিত্য-সমাচার।

সাহিত্য।—বৈশাখ। বৈশাখের 'সাহিত্য' পাঠ করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয় যে মাসিক সাহিত্যে বহুদিন এরূপ সংখ্যা পাঠ করি নাই। প্রত্যেক প্রবন্ধটী উৎকৃষ্ট, চিন্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। 'মাসিক এক শত পৃষ্ঠা' বা ততোধিক পৃষ্ঠার মাসিকের ন্যায় 'সাহিত্য' কেবল 'ছ'কুড়ি সাত' মাত্র বজায় করিয়া চলে না, আবর্জ্জনা-স্তূপ বহন করে না। 'সাহিত্যে'র মন্তব্য পৌরুষ, গম্ভীর, স্পষ্ট ও নিরপেক্ষ—তাহাতে ন্যাকামির আবরণ নাই, ধৃষ্টতার লেশ নাই। বলা বাহুল্য, এই সকল নানা কারণে 'সাহিত্য' এখন মাসিক সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

সমালোচ্য সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "ভারতশিল্পের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধটী বেশ চিন্তাকর্ষক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের 'আজ' (কবিতা) কবিবরের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। প্রথম কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"সতী,
মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি!
তুমি যাহে রেখে পদ,—
সে যে ফুল্ল কোকনদ!
সে নহে শ্মশান-চুল্লী ভীষণ-মূরতি।
মৃত্যু যদি নাহি হয়
প্রেম হ'তে মধুময়,
দিবেন কস্তারে মৃত্যু কেন বিশ্বপতি?"

শ্রীযুক্ত শশধর রায় 'বংশানুক্রম' প্রবন্ধে বংশানুক্রম কি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। পল্লীচিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "ডাক্তারের নির্বুদ্ধিতা" গল্পটী তাঁহার লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট ভাষায় Sir Sidney Lee-র Principles of Biography নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে "জীবনচরিতের মূলসূত্র" সঙ্কলন করিয়াছেন। যাঁহারা জীবনচরিত লিখেন তাঁহাদের এ প্রবন্ধটী পাঠ করা উচিত, যাঁহারা আত্মজীবনকথা লিখেন তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত—"পূর্ণভাবে নিরহঙ্কার, স্তুতি-নিন্দার অতীত যে হইতে না পারে, যে প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী হইতে না পারে, সে যেন আত্মজীবনকথা লিখিতে উদ্যত না হয়। একেবারে ভিতরটা খুলিয়া, ভিতরে বাহিরে উলঙ্গ হইয়া, তবে আত্মজীবনকথা লিখিতে হয়। লেখক জীবিত থাকিতে আত্মজীবনকথা ছাপিতে নাই। * * যাহারা স্বীয় জীবনে ইতিহাসের উপাদান গড়িয়া বা সংগ্রহ করিয়া যাইতে না পারে, তাহারা যেন আত্মজীবনকথা না লেখে।" আর এক স্থলে—"রুসো রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে এক আমি 'সত্যবাদী', আর ভারতের বেদব্যাস আমা অপেক্ষা বড় সত্যবাদী; কেন না, তিনি নিজের জননীর কলঙ্ক কথা লিখিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।"

মনে পড়ে কথাপ্রসঙ্গে একবার আমরা কবিবর গিরিশচন্দ্রকে আত্মজীবনকথা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি মৃদুহাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"যদি আমি ব্যাসের মত সত্যবাদী হইতে পারিতাম, অকপটে উঁহার মত নিজের জীবনের সব কথা প্রকাশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আত্মজীবনকথা লিখিবার চেষ্টা করিতাম।" এই কথাগুলি খাঁটি সত্য, ইহার সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের "আনন্দ-লাড়ু" পাঠকের গল্প-পাঠ-স্পৃহা নিবৃত্তি করিবে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ভারতবর্ষের 'প্রাচীন শিল্প-পরিচয়' প্রদান করিতে এবার 'জুতা-তত্ত্ব' করিয়াছেন। প্রবন্ধটী জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। এই শ্রেণীর 'গবেষণা'ই সাহিত্যের মঙ্গলবিধায়ক। কতকগুলি ইংরাজী ও সংস্কৃত পাদটীকা এবং গ্রন্থাদির উল্লেখ ও শ্রাদ্ধ করিয়া 'জগা খিচুড়ি' প্রস্তুত করা আমাদের "গবেষক"দের সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আশা করি, অতঃপর এই 'জুতা' আধুনিক গবেষণাকারীদের আদর্শ হইবে। শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষের 'বিদেশী' গল্পটী ভাল জমে নাই। 'গিরিশচন্দ্র' ও বিলাতের বিখ্যাত সম্পাদক 'মহামতি ষ্টেড্'—সম্পাদক মহাশয়ের রচিত সাময়িক শোকোচ্ছ্বাস। 'সহযোগী সাহিত্যে' এবার শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্ষ-সমালোচনা'র প্রারম্ভেই বলিতেছেন—"গত বৎসরে ইউরোপ বা আমেরিকার কোনও সভ্য দেশেই এমন কোনও কাব্যগ্রন্থ বা নব-সিদ্ধান্তপূর্ণ পুস্তক বা পুস্তিকা প্রকাশিত হয় নাই, যাহার প্রভাবে জগতের ভাব-ভাণ্ডারের পুষ্টি হয়। গত বৎসরে কেবল পুরাতন সিদ্ধান্তরাশির শ্রেণীবিভাগ ও সমালোচনাই হইয়াছে।"—ইহার পর ফ্রান্স, জর্ম্মনী, রুষ, তুর্কী, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের 'সাহিত্য-চর্চ্চার বিচার-বিভাগ' করিয়াছেন। প্রবন্ধটী মনোরম ও লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

এবারের চিত্রগুলি ভালই হইয়াছে, তবে 'লক্ষ্মী'র মুখটী আর একটু কোমল হইলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শিশির।—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ।০ আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। পুস্তকের গোড়াতেই দেখি যে, 'প্রকাশকের নিবেদন' নামে একটি certificate রহিয়াছে। এরূপ সার্টিফিকেট্-সম্বলিত পুস্তক যে এই প্রথম দেখিলাম, তাহা নহে। 'ভূমিকা' বা 'প্রকাশকের নিবেদন' প্রভৃতির আকারে প্রশংসাপত্র যুকে আঁটিয়া বহি বাহির করা, আজকালকার দিনে একটা 'ফ্যাসন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমালোচকগণের মুখ বন্ধ করিবার আশায় বোধ করি, গ্রন্থকারগণ এই পন্থাটি অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিব, যে তাঁহারা এ উপায় অবলম্বন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। ইহাতে বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। ইহা জনসাধারণের

সহানুভূতি-আকর্ষণের পরিবর্ত্তে উপেক্ষা-অর্জ্জনের পথই প্রশস্ত করে। কেন না, যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হ'য়েন, অর্থাৎ "ভূমিকা" লিখেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ গ্রন্থকারের আত্মীয় স্বজন, কেহ বা বন্ধু। এ অবস্থায় 'ভূমিকা' পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

এই ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থের 'প্রকাশকের নিবেদনে'ও সেই দোষ ঘটিয়াছে। স্থল বিশেষে প্রশংসা মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। প্রকাশক মহাশয় 'নিবেদনে'র প্রারম্ভেই বলিতেছেন,—"আমাদিগের মনে হয়, বঙ্গভাষায় রচিত আধুনিক শিশু-পাঠ্য কবিতা-পুস্তকগুলিতে মহতী নীতি-কথার কোনও অভাব না থাকিলেও, গল্প-ছলে নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও, উহাদিগের মধ্যে এমন একটা জিনিষের অভাব আছে যাহা কেবল শিশু-চিত্তের এবং শিশুবৎ সরল কবি-হৃদয়ের অনুভব-গম্য।"—কথাটা কি ঠিক? কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' নামক খণ্ডকাব্য যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি কি উপরি উক্ত উক্তিতে সায় দিতে সাহস করিবেন?

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের কবিতা গুলিতে কবিত্ব আছে। ভাষায় মধুরতা আছে। কবি শব্দ-যোজনায় সুনিপুণ হইলেও স্থানে স্থানে 'পাহাড়খানি' 'গিরিখান' প্রভৃতি প্রয়োগ আমাদের বিসদৃশ বোধ হয় এবং ইহার সমস্ত কবিতাগুলিই এক সুরে গ্রথিত বলিয়া বড় 'একঘেয়ে' লাগে। মাঝে মাঝে রস-বৈপরীত্য ঘটাইতে পারিলে পুস্তকখানি আরও উপাদেয় হইত। গ্রন্থের সমস্ত কাহিনীই 'ট্র্যাজিডি'তে অবসান করিয়া গ্রন্থকার সদা প্রফুল্ল শিশু-হৃদয়ের প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বঙ্গদেশে শিশু প্রতিপালন—"অর্থাৎ জন্মাবধি কি কি করিলে সুস্থ ও সবল-কায় শিশুকে মানুষ করা যায় তৎসম্বন্ধীয় উপদেশ।" আমরা বলি 'সুস্থ ও সবলকায় শিশুকে মানুষ করিতে' বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। বোধ হয় গ্রন্থকার বলিতে চাহেন "জন্মাবধি কি কি করিলে শিশুকে সুস্থ, সবলকায় ও মানুষ করা যায়…ইত্যাদি।" ভাষাগত এরূপ দোষ অনেকস্থলে দৃষ্ট হইল। লেখক বলিতেছেন "লালন পালনের ত্রুটিতেই বেশী শিশু মরে,ব্যারামই মৃত্যুর কারণ নহে।"

এই গ্রন্থে সকল প্রকার শিশু-রোগের উৎপত্তির কারণ, তাহার শুশ্রূষা ও প্রতিকার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। আহারাদির দোষেই যে শিশুরা মারাত্মক ব্যাধি-কবলে নিপতিত হয় গ্রন্থকার তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে প্রকারে শিশুদিগের লালন পালন ব্যবস্থা ছিল,যাহার ফলে মানব শতায়ুঃ হইত বর্ত্তমান সময়ে সে রীতি-পদ্ধতি বিলুপ্ত প্রায়; অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়টী পর্য্যন্ত আমরা পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণ করিতেছি। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত বিষয়ে আমাদের এখনও ভাল অভিজ্ঞতা হয় নাই। 'মেলিন্স ফুডে'র বিজ্ঞাপন প্রচার এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় এই গ্রন্থের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

অর্চনা, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

আদি দম্পতী।

---

(১)

ধরণীর অঙ্ক'পরে
তরুলতা স্তরে স্তরে—
গিরি, নদী, সরোবরে পূর্ণ কায়া তার।
অনন্ত গগন গায়
অনন্ত তারকা তায়,
রবি আর শশি ধায় বিশ্ব চারিধার।
সকল সৃষ্টির পর
লোকেশ সৃজিল নর—
শূন্য প্রাণ নিরন্তর সে নর তখন,—
নাই তার কোন আশা,
নাই সুখ ভালবাসা
নাহি বুঝে কেন তার হেন নির্ব্বাসন।
সাগর সৈকতে এসে
সীমা শূন্য ঊর্দ্ধ দেশে
চাহে নর শূন্য প্রাণে যেন কি আশায়;—
কভু সে কল্লোল রোল,
সফেন তরঙ্গ দোল,
হেরিয়া ভাবিছে হায় আসিনু কোথায়!
অনন্ত আকাশ শিরে,
সম্মুখে অনন্ত নীরে
চাহিতেছে চারিধারে চঞ্চল নয়ন;
কোথা যেন কি অভাব,
অভাবে অপূর্ণ ভাব
অন্তর অপূর্ণ যেন তার অনুক্ষণ!
বিধাতা হেরিয়া তায়
দুর্ব্বহ জীবন তার,
দুঃখভারে হয়ে তার রহিল চেতনা;
প্রকৃতির অংশে পরে
অঙ্গনা সৃজন করে
ঘুচাইল পুরুষের মানস বেদনা।
সকল সৃষ্টির শেষে
ধরা বুকে এল ভেসে
সে নারী পুরুষ পাশে যেন অকস্মাৎ!
সেই দিন যেন গান
ভরিল বিশ্বের প্রাণ,
সে দিন সৃষ্টির যেন হ'ল সুপ্রভাত।

(২)

মুগ্ধ নর পূর্ণ প্রাণ,
মুগ্ধ তার দু'নয়ান,
শত ভাবে শত গান গাহে হিয়া তার!
লয়ে বামা পাশে পাশে
কত সে সোহাগে ভাসে,
বহে আজি তার প্রাণে সুখ পারাবার!
দিন যায়, নিশি আসে,
ফিরে পূর্ব্বে রবি হাসে,
আবার ফিরিয়া আসে সেই সন্ধ্যা, উষা;
এরি মাঝে এক স্থানে,
এই ভাবে দুই প্রাণে
কেমনে রাখিবে রুদ্ধ বৈচিত্র্য-পিপাসা।
ক্ষুদ্র অন্তরীপ তার
ভাল নাহি লাগে আর,
অদূরে হেরিয়া গিরি বন-উপবন;—
চলে নর ধীরে ধীরে
কোলে লয়ে রমণীরে
তাহার নিষেধ-বাণী করিয়া লঙ্ঘন!

(৩)

সীমাশূন্য পারাবার
ক্ষুদ্র পথ মাঝে তার—
মধ্য পথে যবে নর আশার আশ্বাসে ;
দেখিল চৌদিকে ফিরে,
তরঙ্গ পাহাড়ে ঘিরে
জাগাইয়া গিরি যেন নাচিছে উল্লাসে।
ঊর্ম্মিপরে ঊর্ম্মিচয়
ধায় যেন শূন্যময়,
আবার আছাড়ি পড়ে গভীর নির্ঘোষে ;
বিস্তারিয়া যেন ফণা
বাসুকি বিক্ষুব্ধ মনা—
বিশ্ব ধ্বংসে আশে দ্রুত ছুটিছে সরোষে।
পবন পাগল প্রায়
হাহা রবে ধেয়ে যায়,
ফেনিল কল্লোলে কভু ঊর্দ্ধে লয়ে তুলে ;
সাপটিয়া ফিরে তারে
ফেলিতেছে চারি ধারে
পুষ্প সম ফেনপুঞ্জ সিন্ধু বুকে দুলে।
তরঙ্গে তরঙ্গে রণ
কি ভীষণ আক্রমণ !
চূর্ণ হয় আস্ফালন ফিরে ফর্গে ছুটে।
ঊর্দ্ধে ঘোর মেঘ ভার
মসী মাখা বক্ষে তার
শত সর্প সম যেন সৌদামিনী লুটে।

(৪)

তখন দিবস শেষ
ধরায় ধূসর বেশ—
তখনো হয়নি নিশি গভীর আঁধার।
সেই কালে সেই নর
লয়ে নারী বক্ষোপর
আকুল অন্তরেউর্দ্ধে চাহে বারম্বার।
প্রাণের প্রিয়ারে লয়ে
ব্যাকুল বিহ্বল হয়ে
ডাকে নর, "এ প্রলয়ে কে আছ কোথায়।
এসেছি মরণ-কূলে
ধাতার নিষেধ ভুলে
ডুবিব কি তাই বলে তব উপেক্ষায়।
কত তুচ্ছ ক্ষুদ্র আমি—
তুমি জগতের স্বামী,
তোমারি হাতের আমি খেলার পুতুল ;
না হতে প্রভাত গান,
হবে দিবা অবসান !
না ফুটিতে বৃন্তচ্যুত হবে কি মুকুল।
প্রকৃতির মহারণ
প্রলয়ের এ সৃজন,
এ কি শুধু সেই তব আদেশ লঙ্ঘনে !
এত রোষ তারি তরে,
তুচ্ছ এই তৃণ পরে,
পলকে যে যায় ঝরে হেরিলে মরণে।"

(৫)

দুখে শোকে সবিস্ময়ে
সে যবে চাহিছে ভয়ে,
সহসা ধাতার মূর্ত্তি হইল প্রকাশ।
রুদ্র রূপে বিধাতার,
মানবের হৃদি যার
কাঁপিয়া নিমেষে ত্রাসে হইল হতাশ।
নির্ম্মম পরুষ স্বরে
বিধাতা কহিল নরে,
"আমারে লঙ্ঘন করে পৌঁছে যেই মত
তেয়াগিলে সেই ঠাঁই,
প্রতিফলে আজি তাই
অনন্ত নরকে ভুঞ্জ দুখ অবিরত।"
কহে নর বিধাতায়,
"দোষী আমি তব পায়
বিনা দোষে ললনার শাস্তি নাহি সাজে।
পুরুষ কঠিন আমি
বাহা দেবে লব স্বামি !
আমিই একাকী যাব নরকের মাঝে।"

"তাই হবে, তাই হবে!"
উত্তরিল ধাতা যবে,
সে নারী আবেগ ভরে কহিল তখন—
"ভালবাসি—ভালবাসি—
আমি এর চিরদাসী
নরকে ইহারি সাথে করিব গমন!"

বিধাতা কহিল হেসে,
"থাক সুখে ভালবেসে-
আমি রব চিরদিন তোদের পশ্চাৎ।"
সেই দিন প্রেমগান
মানবেরে দিল প্রাণ—
সে দিন সৃষ্টির সেই সবে সুপ্রভাত।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

অযোধ্যা

রামায়ণী সভ্যতার কেন্দ্র ভূমি অযোধ্যা। কলনাদিনী সরযূর তরঙ্গ-চুম্বিতা মহানগরী অযোধ্যা, ধনে, জ্ঞানে ও সভ্যতায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহার সেই অতীত সম্পদ্ আজ কোন স্বপ্ন-সমুদ্রে চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়াছে,—তাহার সভ্যতা উপহসিত, অম্বর-চুম্বী প্রাসাদ সমূহ কালের কঠোর নিয়মে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছে। নগরের নানা অতীত সাক্ষী,—জীর্ণ স্তূপ, ভগ্ন অট্টালিকা ও কল্পনা-পুষ্ট জনপ্রবাদ অপসারিত করিয়া আজি তাহার অতীত ইতিহাসের ধারণা করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা কি না কে বলিতে পারে? একদিন ছিল, যখন তাহার নাম ভারতের নর-নারী কণ্ঠে ঘোষিত হইত। তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জানিত "অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা; পুরী, দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।" কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে কিছুই অপরিবর্ত্তনীয় নহে। তাহার পর ভারতের রাজনৈতিক গগন অন্ধকার করিয়া ঝড় উঠিল। ভারত-জননীর স্বর্ণ-মুকুট অশনিসম্পাতে খসিয়া পড়িল, ভারতের রত্নসিংহাসন অতলে ডুবিয়া গেল। তাই কাল যেথায় মর্ত্ত্যে নন্দনকানন ছিল,—যাহার উৎসবের কলহাস্যে দিগন্ত মুখরিত হইত, যাহার পারিপাট্য সকলকে মোহিত করিত; আজ আছে সেথায় ধ্বংস স্তূপ, ক্ষীণ স্মৃতি, ভক্তের অশ্রু ও ঐতিহাসিকের আজন্ম সাধনার উপাদান।

অযোধ্যার অপর নাম সাকেত। রামায়ণে লিখিত আছে যে অশ্বজিত-সাকেত-পতি দশরথের হস্তে স্বীয় কন্যা কৈকেয়ীকে সমর্পণ করেন। ইহা সরযূর

উপকূলে অবস্থিত ছিল। কণিংহাম সাহেব বলেন যে য়ুয়েংশং যে বিশাখা নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রামায়ণের অযোধ্যা। বিশাখা বৌদ্ধজগতে সুপরিচিতা। বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি যে তিনি সাকেত বা অযোধ্যায় বাস করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই নামানুসারে অযোধ্যা বৌদ্ধজগতে পরিচিত হইয়া থাকিবে। চৈন পরিব্রাজক কৌশাম্বী দর্শন করিয়া, তথা হইতে ১৭০।১৮০ লি (প্রায় ২৫।৩০ ক্রোশ) অতিক্রম পূর্ব্বক বিশাখা রাজ্যে উপনীত হন। তাঁহার সময়েও ইহা একটী প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল ; ইহার বহু বিস্তৃত রাজধানী ও শাস্ত এবং মোক্ষকামী অধিবাসিগণের উল্লেখ করিয়া, য়ুয়েংশং প্রসঙ্গক্রমে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তৎকালে বিশাখায় ২০টী সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিতা ছিল, এবং তথায় হীনায়ন সম্প্রদায়ভুক্ত ৩০০০ শ্রমণ বাস করিতেন। রাজধানীর উত্তরে রাজপথের বামপার্শ্বে একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামে ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব বাস করিতেন। ইহারই নিকটে বুদ্ধদেবের নির্ম্মাল্যপরিত্যক্ত পুষ্পবীজোৎপন্ন একটী বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল। ইহা উচ্চে প্রায় ৭ ফিট। এইস্থানে বিশাখা একটী সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ হার্ডি সাহেব অনুমান করেন।

রামায়ণে কথিত হইয়াছে যে, অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত নগরে ব্যবসাব্যপদেশে দেশদেশান্তরের বণিকগণ ক্রয় বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইত। সুবিভক্ত রাজপথ, নানায়ুধসমন্বিতা দুর্গপরিখা এবং বিচিত্র পুষ্পরাজি শোভিত উদ্যান ইহার যশঃ দেশ বিদেশে ঘোষিত করিয়াছিল। তথায় প্রজাগণ পরম সুখে বাস করিত ; বেদাধ্যয়ন রত ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠে সমস্ত নগর মুখরিত থাকিত। প্রজাগণ জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাক ছিলেন। পরম শক্তিশালী দশরথ, ইন্দ্রের ন্যায় এই পুরী শাসন করিতেন। এই পুরী স্বয়ং মনু নির্ম্মাণ করেন। অযোধ্যার এবম্বিধ বর্ণনা পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের মধ্যে অযোধ্যা অতি প্রাচীনকালেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণকর্ত্তৃক বহুকাল এইস্থান শাসিত হইবার পর মহাভারতের মহাসমরকালে অযোধ্যার অবনতি ঘটে। বিক্রমাদিত্য পুনরায় বন কাটাইয়া এইস্থানে বর্ত্তমান নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। কণিংহাম প্রভৃতি প্রাচ্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে বর্ত্তমান সময়ে তত্রত্য হিন্দু মন্দিরাদি রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর নিদর্শন অযোধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধ-বিপ্লবের

সময়ে নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির প্রভৃতি বহু প্রাচীন মন্দিরাদি বিনষ্ট হইয়াছে।

অযোধ্যায় বহু রাজ্য-বিপ্লব ঘটিয়াছে। সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের পতন হইলে, বিক্রমাদিত্য এই স্থান শাসন করেন। তৎপরে সমুদ্রপাল নামক জনৈক যোগী বিক্রমাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া, এই স্থান অধিকার করেন। প্রবাদ আছে যে, ইহাঁর সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত প্রায় ৬৪৩ বৎসর ধরিয়া, এই স্থান সমুদ্রপালদিগের অধিকারে ছিল।

বহু ধর্ম্মবিপ্লবের জন্যও অযোধ্যা প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেব অযোধ্যায় আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দাতন বৃক্ষের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার সন্নিকটে শ্রাবস্তী। ইক্ষ্বাকু হইতে অষ্টমপুরুষ পরে যুবানাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত রাজা এই নগর স্থাপন করেন। এই স্থান বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলনের জন্য বিখ্যাত ছিল। জৈনদিগের প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ অযোধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ, চতুর্থ তীর্থঙ্কর অভিনন্দন নাথ, ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর সুমন্তনাথ এবং চতুর্দ্দশ তীর্থঙ্কর অনন্তনাথ, ইহাঁরা সকলেই অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন।

খৃষ্ট অষ্টম শতাব্দীতে আরু নামক এক অসভ্য পার্ব্বত্যজাতি হিমালয় পর্ব্বত হইতে আসিয়া অযোধ্যার জঙ্গল পরিষ্কার করে। কিন্তু তাহারা রাজ্য বিস্তার করিবার কোন চেষ্টা করে নাই। অযোধ্যায় আরুগণের পদার্পণের পর, একশত বৎসর গত হইলে, জৈনধর্ম্মাবলম্বী সোমবংশীয় নৃপতিগণ আরুগণকে অযোধ্যা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া এই স্থান শাসন করেন। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কনোজের রাজা চন্দ্রদেব, চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণকে দূরীভূত করিয়া, অযোধ্যা অধিকার করেন। ইহার পর অযোধ্যা ভড় নামক অসভ্য জাতির অধিকারে আইসে। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে শাহাউদ্দীন ঘোরী কনোজ জয় করিয়া অযোধ্যা লুণ্ঠন করেন। এই সময়েই প্রাচীন অযোধ্যা নগরী যবনঅধিকারভুক্ত হয়।

অযোধ্যায় বহু হিন্দু মন্দির আজিও মোক্ষকামী হিন্দুর ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিতের নিকট তাহারা প্রাচীনত্বের দাবী রক্ষা করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা নিতান্তই আধুনিক যুগে নির্ম্মিত; কোন কোনটী ২০০ শত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। তথাপি আমরা নিম্নে কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ করিলাম:—

১। অযোধ্যার মধ্যে রামকোট একটী প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা নগরের পূর্ব্বধারে অবস্থিত। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র নগর রক্ষা করিবার জন্য প্রাচারবেষ্টিত এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার চারিধারে বিশটী বুরুজ ছিল; হনুমান সুগ্রীব প্রভৃতি সেনাপতিরা ইহার উপরে অবস্থান করিয়া নগর রক্ষা করিতেন। এই দুর্গের উপরে একটী ক্ষুদ্র মন্দির দৃষ্ট হয়। কণিংহাম সাহেব বলেন যে, এই স্থান বহু পুরাতন এবং ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু রামকোটের উপরিস্থ মন্দির মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।

২। অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেই নিকটে মণি পর্ব্বত। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হইলে হনুমান বিশল্যকরণী আনিতে গিয়া সমস্ত গন্ধমাদন পর্ব্বত মস্তকে ধারণ করিয়া শূন্যপথে আসিবার সময়ে ভরততূণ-নিঃসৃত বাণাহত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান। গন্ধমাদনের ভগ্নাংশই বর্ত্তমান মণি পর্ব্বত।

মণি পর্ব্বত উচ্চে ৪৪ হাত। ইহা ভগ্ন ইষ্টক ও কঙ্করে পরিপূর্ণ। এক কালে ইহার চারিধারে প্রাচীর ছিল, ইহার এক একখানি ইট ১১ ইঞ্চি দীর্ঘ। এই স্তূপের কাল নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অনেকের ধারণা যে, ইহা একটী বৌদ্ধ স্তূপ মাত্র। য়ুয়েংসাং যে অশোক স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন, অনেকের বিশ্বাস মণি পর্ব্বত সেই অশোক স্তূপ। কিন্তু এই স্তূপের নিম্নে একবার একখানি ফলক পাওয়া গিয়াছিল; তাহাতে লিখিত আছে যে, মগধরাজবংশের নন্দবর্দ্ধন নামক জনৈক নরপতি মণি পর্ব্বত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

৩। মণি পর্ব্বত ব্যতীত অযোধ্যায় কুবের পর্ব্বত ও সুগ্রীব পর্ব্বত নামক দুইটী কৃত্রিম ক্ষুদ্র স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কুবের পর্ব্বত উচ্চতায় ২৮ ফিট এবং সুগ্রীব পর্ব্বত ১০ ফিট মাত্র। ইহারা এক্ষণে ধ্বংসস্তূপ ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কুবের পর্ব্বতের নিকটে গণেশকুণ্ড নামক একটী ক্ষুদ্র জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানগণ প্রতি বৎসর এই জলাশয়ে "তাজিয়া" বিসর্জ্জন দেয় বলিয়া, তাহারা ইহাকে "ইমাম তলাও" নামে অভিহিত করে।

য়ুয়েংসাংয়ের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অযোধ্যায় একটী স্তূপে বুদ্ধের কেশ ও নখ রক্ষিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই স্তূপের অনুসন্ধান করিয়াছেন। কণিংহাম সাহেব বলেন যে, আলোচ্য স্তূপ বর্ত্তমান সময়ে কুবের পর্ব্বত নামে পরিচিত। এই স্তূপের সন্নিকটস্থ গণেশকুণ্ড নামক

জলাশয়ের উল্লেখ উক্ত স্তূপের বর্ণনাপ্রসঙ্গে দেখা যায়। ইহাতে তাঁহার মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। সুগ্রীব পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে ৫০০ ফিট এবং বিস্তারে ৩০০ ফিট হইবে। য়ুয়েংসাং অযোধ্যায় একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠের উল্লেখ করেন। মহাবংশে বর্ণিত পূর্ব্বরামই উক্ত মঠ বলিয়া পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন। কণিংহাম সাহেব বলেন, কুবের পর্ব্বত উক্ত মঠের ধ্বংসাবশেষ। ইহার বিস্তৃতি ও আকার তাঁহার মতই সমর্থন করে। এতদ্ব্যতীত এই স্তূপের মধ্যস্থলে কতিপয় গৃহ ও একটি কূপের চিহ্ন আবিষ্কৃত হওয়াতে এককালে যে ইহা একটি বৌদ্ধ মঠ ছিল, এ বিষয়ে আর কাহার সন্দেহ নাই।

৪। মণি পর্ব্বতের নিকট দুইটি কবর আছে। মুসলমানগণ বলেন, ঐ কবরে সেথ ও জব পয়গম্বর সমাহিত আছেন। গ্লডউইন্ সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত আইনী আকবরী গ্রন্থেও এই কবরটির উল্লেখ দেখা যায়। তৎকালে এই দুইটি কবর যথাক্রমে দৈর্ঘ্যে ৭ ফিট ও ৬ ফিট ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহারা যথাক্রমে দৈর্ঘ্যে ১৭ ফিট ও ১২ ফিট হইবে। উহারই নিকটে সোমগিরি নামে আরও দুইটি ছোট ছোট স্তূপ আছে। সোমগিরির বিশেষ বৃত্তান্ত জানা যায় না।

অযোধ্যায় এখন সর্ব্বসমেত ৯৬টি মন্দির আছে। তন্মধ্যে ৬৩টি বিষ্ণু মন্দির এবং ৩৩টি শিবমন্দির। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্য ৩৬০টি মন্দির নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলিই কালে বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে স্বর্গদ্বারের অতিশয় দুরবস্থা। যশবন্ত রায়ের পত্নী অহল্যা বাইয়ের অর্থে স্বর্গদ্বারস্থ রামসীতার মন্দিরের সংস্কার হয়। আজিও এই দেবালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ইন্দোর হইতে প্রতি বৎসর ২৩১ টাকা বৃত্তি পাওয়া যায়। অযোধ্যায় প্রতি বৎসর রামনবমীর সময়ে একটী মেলা হয়, তাহাতে বহু লক্ষ লোকের সমাগম হয়।

হিন্দু মন্দির ব্যতীত অযোধ্যায় কতিপয় মসজিদ ও কয়েকটী বৈষ্ণবদিগের মঠ আছে। স্বর্গদ্বারের নিকট মুসলমানদিগের একটি মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ঔরঙ্গজেবের সময় নির্ম্মিত হইয়াছে। হনুমানগড়ে নির্ব্বাণী সম্প্রদায়ের একটি মঠ আছে। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা চারিটি শাখায় বিভক্ত;—যথা কৃষ্ণদাসী, তুলসীদাসী, মণিরামী এবং জানকীশরণ দাসী। এতদ্ব্যতীত রামঘাটে ও গুপ্তঘাটে নির্ম্মোহীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের একটি আখড়া আছে। ইহাঁরা সকলে ভূমি ভোগ করিয়া থাকেন।

অযোধ্যা, কোশল নগরের রাজধানী ছিল। এই সমৃদ্ধিশালী জনপদের ইতিহাস এখনও সংগৃহীত হয় নাই, কখন হইবে কি না সন্দেহ। আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অতি প্রাচীনকালে কোশল রাজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। বহুদিন হইল তাহার সে গৌরব-জ্যোতিঃ অপসৃত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে অযোধ্যায় ধ্বংসকার্য্য বহুদিন পূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সেই সুবিখ্যাত রাজধানী চুইবার জনহীন প্রান্তরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাহার পর তাহার শেষ স্মৃতিটুকু বিস্মৃতির তমঃকীর্ণ যবনিকার অন্তরালে বিলীন হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

শ্যাংঘাই।

হংকঙ হইতে আমরা শ্যাংঘাই গিয়াছিলাম। যে পথ দিয়া অর্ণবপোত বন্দরটী ত্যাগ করে, সে পথের দৃশ্য অতিশয় মনোহর। সমুদ্রের চতুর্দ্দিক পর্ব্বতময়। মধ্য দিয়া জাহাজ অতি সন্তর্পণে চলিয়াছে, পথিমধ্যে কোন পর্ব্বত দৃশ্যমান হইলে, জাহাজ সেটাকে বেষ্টন করিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল। জল নিম্নেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদ্রি। সে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য পোতখানিকে কখন কোন গিরির পাদমূল দিয়া কখনও বা অতি দূরবর্ত্তী স্থান দিয়া চলিতে হয়। জল অতি স্থির, জাহাজের কোন রূপ স্পন্দন অনুভব হয় না, সে জন্য এস্থানে ডেকে বসিয়া বেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। সমুদ্র-পথেও জাহাজখানি চীন-সাম্রাজ্যের উপকূল দিয়া গমন করিয়া থাকে। একপার্শ্বে সে শ্যামল উপকূল বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। জেলেরা তরণীতে পাল তুলিয়া অনেক দূর অবধি চলিয়া গিয়াছে। জাহাজ হইতে ক্ষুদ্র তরণীর বীচি বিক্ষেপে আন্দোলন দেখিলে আনন্দের সহিত মনে কতকটা ভয়েরও সঞ্চার হয়। কেন না, যদি হঠাৎ ঝড় উঠে তখন উত্তাল তরঙ্গে সে তরণী রক্ষা করা মনুষ্য-শক্তির অতীত হইয়া পড়িবে। কিন্তু জেলেরা মেঘ দেখিয়া বায়ুর গতি পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখে।

এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা শ্যাংঘাইএর দিকে যাইতে লাগিলাম। শ্যাংঘাই একটী ক্ষুদ্র নদীর উপর অবস্থিত। একারণ আমাদিগকে

ধীরে ধীরে নদীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। সমুদ্রের নীল জল ছাড়িয়া আমরা নদীর ঘোলা জলে আসিয়া পড়িলাম। নদীর দুই পার্শ্বে শস্য শ্যামলা উর্ব্বরা ক্ষেত্ররাজি। চাষীরা টোকা মাথায় দিয়া, জানু অবধি ইজের পরিয়া ভূমিকর্ষণ করিতেছে। এখানকার দৃশ্যটা ঠিক আমাদের শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গভূমির মত। আমার মনে হইল যেন আমি ভাগীরথীর মধ্য দিয়া স্বদেশে ফিরিতেছি। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে এমন একটা আনন্দ পাইলাম যে সে ভাব ঠিক ভাষায় বর্ণনা করিতে পারি না।

ক্রমে ধীরে ধীরে অর্ণবপোতখানি বন্দরে প্রবেশ করিল। নদীর এক উপকূলে শ্যাংঘাই নগরী, অপর উপকূলেও অনেক সৌধশ্রেণী; প্রায় সকল-গুলিই কোন না কোন উচ্চ চিম্‌নি বিশিষ্ট কারখানা বলিয়া মনে হইল। শ্যাংঘাই বন্দরের অনেকটা কাঠের জেটী দিয়া বাঁধা। সেজন্য জাহাজ একেবারে জেটীতে গিয়া লাগে। জাহাজ হইতে নামিয়া বরাবর জেটী দিয়া রাস্তায় উঠিতে হয়।

ছোট ছোট ঝোলান ঝুড়ি হাতে করিয়া অনেকগুলি চীন যুবতী জেটীতে দাঁড়াইয়াছিল। জাহাজ জেটীতে লাগিলে তাহারা সকলে জাহাজে আসিয়া নানা প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই সেলায়ের কার্য্য করিয়া থাকে। যাত্রীদের ছেঁড়া জামা, পায়জামা, কামিজ প্রভৃতি ইহারা বেশ সুন্দররূপে মেরামত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। সকলেরই মুখে মধুর হাসি, মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া দ্বিগুণ মূল্য চাহিয়া লয়। রসিক যাত্রীরা রসালাপে মোহিত হইয়া এরূপ অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। সেজন্য যুবতীরা রসিকদেরই (?) কাজ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। জাহাজে অনেক রকমের খেলনা বিক্রয় হয়, তাহার মধ্যে কাঠের কারুকার্য্যই প্রধান।

জেটী হইতে অবতরণ করিয়া সম্মুখে একটী প্রশস্ত রাস্তা পাওয়া যায়, তাহার নাম 'ব্রডওয়ে' (Broadway) এই পথটী নদীর ধার দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। দুই পার্শ্বে নানা দ্রব্যের বিপণি, মধ্য দিয়া তড়িৎ ট্রামগাড়ী চলিয়া গিয়াছে। এই পথ হইতে নগরের সর্ব্বত্র অনেক রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

শ্যাংঘাই একটী প্রকাণ্ড সহর। ইহাতে অনেকগুলি পাশ্চাত্য জাতি স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইংরেজ, ফরাসীস ও আমেরিকানই

প্রধান। নগরের এক প্রান্ত ফরাসীদের অধিকৃত। সেখানে পথগুলির সমস্ত ফরাসীয় নাম। সে সকল রাস্তায় যে বৈদ্যুতিক ট্রাম গিয়াছে তাহার টিকিট গুলি অবধি ফরাসী ভাষায় লিখিত। আবার, যে দিকটা ইংরাজের অধিকৃত সেখানে পথের নামও ইংরাজী, ট্রামগাড়ীর টিকিটগুলিও ইংরাজী ভাষায় লিখিত, যেমন প্রকাণ্ড সহর তেমনি সুন্দর রথ্যাসমূহ এবং অধিকাংশ পথে বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ী। এত অধিক ট্রামলাইন একস্থানে অতি অল্পই দেখা যায়। সকল পথগুলিই বেশ প্রশস্ত ও দুই পার্শ্বে সুন্দর সৌধশ্রেণী। প্রায় সকল পথেই ট্রামলাইন থাকাতে, সহরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে কোনই কষ্ট হয় না। সহরের সাধারণ দৃশ্য বেশ মনোরম। এখানে পথে রুষিয়ান, জার্ম্মান, ইটালিয়ান, প্রভৃতি নানা প্রকার পাশ্চাত্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানীদের সংখ্যা এখানে অতি অল্প।

বন্দ্ (The Bund)।—নদীর উপকূলে একটী সুন্দর বিহারের স্থান রচিত হইয়াছে। এই স্থানটীর নাম "বন্দ্"। বেশ শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমিখণ্ড,তাহার চারি পার্শ্ব ও মধ্য দিয়া সুন্দর পথসমূহ চলিয়া গিয়াছে। কোথাও বা শ্রেণীবদ্ধ বিটপীরাজি সূর্য্যাতপ হইতে বিহারার্থীদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য রক্ষিত হইয়াছে। মনিষীগণের স্মৃতি রক্ষার্থ মধ্যে মধ্যে দু'একটা প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে ; সুন্দর অশ্বযানে ধনকুবেরগণ এই সকল পথে সান্ধ্য বায়ু সেবন করিয়া থাকেন। পাদচারিগণের পথ ও ক্ষেত্র সর্ব্বত্রই বিচরণ করিবার অধিকার আছে। বহুদূর ধরিয়া এই বিহার-ক্ষেত্র নদীর কূলে কূলে চলিয়া গিয়াছে। নদীর ধারে স্থানে স্থানে বসিবার জন্য বেঞ্চ। সেখানে সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়ায় বেশ সুশীতল শিকরসিক্ত বায়ু উপভোগ করা যায়। রাত্রিকালে স্থানটী বৈদ্যুতিক আলোকে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। কর্ম্মক্লিষ্ট দিবসের পর এখানে আসিয়া বেশ একটু বিশ্রাম-সুখ লাভ করা যায়।

পবলিক্ গার্ডেন।—এখানে নদীর উপকূলে একটী বড় মনোরম উদ্যান আছে। ইহাই এখানকার "পবলিক্ গার্ডেন্"। উদ্যানটীর তিন দিক বৃত্তাকারে নদীর দ্বারা বেষ্টিত। বৃক্ষাদির মধ্যে নানা প্রকার ফুলের গাছই বেশী, ঋতুপুষ্পের বীথিকাগুলি বড়ই সুন্দর। উদ্যানটীর মধ্যে বেশ ভাল ভাল পথ। পথের দুই পার্শ্বে উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী। সেই বিটপীশ্রেণীর তলে তলে বসিবার স্থান। স্থানে স্থানে পুষ্প-বৃক্ষের কুঞ্জ ; তাহাদের মধ্যেও বেশ উপবেশনের জায়গা আছে। উদ্যানটীর যে তিন দিক নদীর দ্বারা বেষ্টিত, সেখানে বেশ একটী

সুন্দর পথ চলিয়া গিয়াছে। পথের পর কাঠের বেড়া। তাহার পর নদী। নদীর ধারে অনেকগুলি নৌকা বাঁধা। সামান্য অর্থ ব্যয় করিলে সেই সকল নৌকাযোগে নদীতে বিহার করিতে পারা যায়। অনেক নৌকাতে বিজ্ঞাপনের কাগজ আঁটা দেখিলাম। এখানে যাহারা বিহার করিতে আসেন, তাঁহারা এ সকল বিজ্ঞাপন পড়িয়া থাকেন। আমরা নদীর ধারে বসিয়াছিলাম। একটী নৌকায় কতকগুলি সাহেব গান গাহিতে গাহিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের পরিধানে চীনাদের ঢিলা চায়নাকোট ও পায়জামা, মস্তকে চীনাদের ন্যায় লম্বিত বেণী। তাহারা আমাদের হস্তে অনেকগুলি চীনা ভাষায় ও ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত কাগজ প্রদান করিল। তখন বুঝিলাম যে তাহারা চীনবেশধারী খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক, চীনদেশে আসিয়া চীনাদের বেশ পরিধান করিয়া চীনাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকে। সঙ্গে অনেকগুলি চীনা-খ্রীষ্টান রহিয়াছে। আমাদের সম্মুখে তাহারা নৌকার উপর হইতে যীশু নামগান করিতে লাগিল। গান শেষ হইলে চীনা-খ্রীষ্টান চীনভাষায় একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা আরম্ভ করিল, তাহার কথা আমরা কিছুই বুঝিলাম না। তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী চীনবেশী সাহেব ইংরাজীতে খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও চীনাদের অজ্ঞান অন্ধকারের কথা বলিতে লাগিল। বক্তৃতা শেষ হইলে তাহারা আবার গান গাহিতে গাহিতে নৌকায় চলিয়া গেল। চারিদিক হইতে বিহারার্থীগণ গান বা বক্তৃতার দ্বারা সেস্থানে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সাহেবের চীনবেশ দেখিয়া আমরা অতিশয় কৌতুহলাবিষ্ট হইয়াছিলাম। "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" সাহেবেরা এই নীতিটুকু বেশ অবলম্বন করিয়াছেন দেখিলাম।

উদ্যানটী বন্দরের অতি সন্নিকট এবং দেখিবার যোগ্য।

দেবমন্দির।—সহরের মধ্যস্থলে একটী চীনাদের উপাসনার মন্দির আছে। ইহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মধ্যস্থলে মন্দির মধ্যে একটী প্রকাণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তরের বৌদ্ধ মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটী বেশ বৃহদায়তন কিন্তু কারুকার্য্যবিহীন বলিয়া তাদৃশ দেখিবার উপযোগী নহে।

স্নানাগার।—এখানে স্থানে স্থানে অনেকগুলি স্নানাগার আছে। অধিকাংশই ব্যবসার জন্য রক্ষিত। সহরের এক প্রান্তে একটী অতীব বৃহৎ স্নানাগার আছে। যে অট্টালিকার মধ্যে স্নানাগার অবস্থিত, সে সৌধটী বৃহৎ ও বিদেশীদিগের দেখিবার যোগ্য। কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিয়া এখানে স্নান করিলে দীর্ঘ অবসাদের পর বেশ তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে।

নূতন উদ্যান।—স্নানাগারের অনতিদূরেই একটী অতি বিস্তৃত উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে। উদ্যানটীর মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমিই অধিক। এই সকল ভূমিখণ্ডে নানাপ্রকার ব্যায়াম ক্রীড়া হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে পুষ্প-বৃক্ষের 'কেয়ারী' আছে বটে, কিন্তু তাহা তাদৃশ মনোহর নহে। উদ্যানটী আমি অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিয়াছিলাম।

সমগ্র সহরের সাধারণ সৌন্দর্য্য ব্যতীত শ্যাংঘাই নগরে বিশেষ দ্রষ্টব্য আর কিছুই পাই নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম।

কাব্যে "গন্ধ"।

রবীন্দ্রনাথের এখনকার লেখা পড়িতে আমরা বড়ই ভয় পাই। তাঁহার পাকান-ঘোরাণ-প্যাঁচওয়ালা ভাষা-ব্যূহ যদি বা কোন প্রকারে ভেদ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার 'মর্ম্মকোষের গন্ধ' 'ঘনানন্দ' প্রভৃতি কবিত্ব-কুহেলিকা মনে এমন একটা বিষম বিভীষিকা জন্মাইয়া দিয়াছে যে সেজন্য তাঁহার আধুনিক রচনাগুলি পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। সেদিনকার 'সাহিত্য' ও 'অর্চ্চনা' পত্রিকার 'মাসিক সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিকে 'উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক' বলা হইয়াছে দেখিয়া উহা পড়িতে কৌতূহল হইয়াছিল। সেই কৌতূহল বশতঃই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে 'জীবনস্মৃতি' পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু পড়িতে গিয়া তাহাতে চিত্তাকর্ষকের 'চি' পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইলাম না। ভাবিলাম, শ্রদ্ধেয় 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় হয়ত আমাদিগকে জব্দ করিবার জন্যই এইরূপ রহস্য করিয়া থাকিবেন কিম্বা হয়ত চৈত্রের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত উহার পূর্ব্বাংশটুকু সত্যসত্যই 'চিত্তাকর্ষক' হইয়া থাকিবে!

দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের নানা জটিল তত্ত্ব ভাষা-সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি। এমন কি, বিদেশী ভাষায় লিখিত দুরূহ বিষয়ের গ্রন্থাদি বুঝিতেও তত কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত কবিবরের এই

'জীবনস্মৃতি'র স্থলবিশেষ আমাদের কাছে দুরধিগম্য,—যেন তাবার গোলকধাঁধা; এই কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অন্ধ ভক্তগণ হয়ত একটু মুখ মুচ্কি হাসিয়া বলিবেন,—"ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ!"

গন্ধই বটে! বিনয়ের বেড়ায় ঘেরা আত্মম্ভরিতার এমন ঝাঁজাল তীব্র গন্ধ আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। কেহ কেহ 'জীবনস্মৃতি'কে ঝুটো 'সেন্টিমেন্টালিটি'র চূড়ান্ত উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। কেহবা ইহাতে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিতে পাইতেছেন। বলিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁহার বাটীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া সহসা যে একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসারসমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত দেখিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া তাঁহার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক যে একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছিল," (জীবনস্মৃতি) এই আধ্যাত্মিক আনন্দময়তা রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা এবং এই মৌলিকতাই তাঁহার ঋষিত্বের একটি বিশেষ প্রমাণ। যাউক, এ সকল মতামত সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু বলিতে চাহি না। তিনি এই রচনায় অস্পষ্ট কবিতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। 'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে অস্পষ্ট কবিতার সমর্থন জন্য তাঁহার ওকালতীর অভিনয়টিই সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য।

মনে পড়ে, পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে একবার রবীন্দ্রনাথের অতিভক্তগণ তাঁহার অস্পষ্ট কবিতাকে বাঁচাইবার জন্য অসার যুক্তিতর্কের বাণ্ডরা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, "এই কবিতার মধ্যে একটা বৃহৎ আইডিয়ার প্রকাশ আছে। সেই আইডিয়াটী দু-এক কথায় বুঝাইবার মত নহে—তাহা অনেকাংশেই কবির নিকটেই প্রচ্ছন্ন—অথচ তাহারি প্রকাশ ইন্দ্রধনু বিচ্ছুরিত বর্ণের ন্যায় নানা সময়ে নানা আকার ধারণ করিয়া পাঠকের চিত্তের সম্মুখে ঝরিয়া পড়ে।" ('কাব্যের প্রকাশ' প্রবন্ধ)। বলা বাহুল্য, এই অর্থহীন তর্কজাল অতিভক্তির বেতালা অভিব্যক্তি বোধে সাধারণের উপেক্ষায় ফুৎকারে উড়িয়া গিয়াছিল।

আজ আবার দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই অস্পষ্ট শ্রেণীর কবিতাকে পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গম হেঁয়ালী রচনা করিয়াছেন। 'জীবন-স্মৃতি'র একস্থলে লিখিয়াছেন,—"প্রতিধ্বনি" নামে একটি কবিতা দার্জ্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম। সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল

যে একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থ নির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল। হতাশ হইয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্ত আসিয়াছিল। আমার সহায়তায় সে বেচারা যে বাজি জিতিতে পারিয়াছিল এমন আমার বোধ হয় না।"

"কিছু একটা বুঝাইবার জন্য কেহও কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে বুঝিলাম না, তখন বিষম মুস্কিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বলে কিছু বুঝিলাম না তাহাকে এই কথা বলিতে হয় ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ।"

ফুলের গন্ধের সহিত কবিতা বুঝা-না-বুঝা ব্যাপারের তুলনা করার কি সার্থকতা আছে, বুঝিতে পারি না। এ ঘোঁয়াটে ধরণের উপমা প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পষ্ট না হইয়া আরও ঝাপসা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ফুলের গন্ধই বল, আর তাহার সুন্দর আকৃতিই বল, এ সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়াই হৃদয়ে প্রবেশ করে। সুতরাং কোন এক পুষ্প বিশেষের গন্ধ শুঁকিয়া বা তাহার আকৃতি দেখিয়া মনের সকল অবস্থাতেই কিছু মনে একই ধরণের ভাবের উদয় হয় না। মানসিক অবস্থা ভেদে একই পুষ্পের গন্ধে কখনও বা মনে দুঃখের তরঙ্গ উঠে, কখনও বা সুখের তরঙ্গ উঠে। কিন্তু কবিতা জিনিসটা মানুষেরই তৈয়ারী জিনিস। মানবহৃদয়ের উপভোগের জন্যই ইহার সৃষ্টি। কবিতা নিজেই ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া মানব মনে একটিমাত্র ভাবের উদ্রেক করে। যাহা দুঃখের কবিতা, তাহা চিরদিনই দুঃখের কবিতা। আর যাহা সুখের কবিতা, তাহা চিরদিনই সুখের কবিতা। যা' তা' অনির্দ্দিষ্ট ভাবের উদ্রেক করাই যদি কবিতার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে কোকিলের কুহু-স্বরও কবিতার স্থান অধিকার করিত।

কবিতা বুঝাইবার জন্য লিখিত হয় কি না, জানি না; কিন্তু ইহা যে বুঝিবার জিনিস সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকৃতির Interpretation অর্থাৎ ব্যাখ্যা দেওয়ারই নাম কলাবিদ্যা। কবিতা সুকুমার কলাবিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত। অতএব কবিতার বুঝা ব্যাপারটা কখনই উপেক্ষনীয় হইতে পারে না। কবিতা কেবল শব্দরঞ্জিত চিত্র মাত্র নহে।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমরা নিজে বেশী কিছু বলিতে চাহি না। রবীন্দ্র-নাথ ইতিপূর্ব্বে স্বয়ং কাব্য কাহাকে বলে, কাব্যের উদ্দেশ্য কি এবং তাহার

অস্পষ্টতার কারণ প্রভৃতি বিষয় আমাদিগকে যেরূপভাবে বুঝাইয়াছিলেন, আমরা আজ সেই সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার আধুনিক মতের অসারতা প্রমাণ করিয়া দিব। তাহা হইলে, রবীন্দ্রনাথের উক্তি যাঁহাদের বেদবাক্য বলিয়া ধারণা, তাঁহাদের সে ভুল ধারণা ভাঙ্গিতে পারে। আর যাঁহারা সত্য কথা অপ্রিয় হইলেই বিদ্বেষ বলিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিতে বসেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কথার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কথা কাটিতে দেখিলে প্রমাদ গনিবেন।

রবীন্দ্রনাথ গীতি-কাব্য সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, "আমরা যাহাকে গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ—ঐ যেমন বিদ্যাপতির—

'ভরা ভাদর মাহ ভাদর—
শূন্য মন্দির মোর',

সেও আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা-বাদলে ভাদ্রমাসে শূন্য ঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে—যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল, অমনি সকলেরই এই অনেক দিনের কথাটা মূর্ত্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।" ('সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধ)।

"একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর কোন লোকের অধিগম্য নহে; তেমন হইলে তাহাকে পাগ্‌লামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার নিজের সুখ দুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও হৃদয়ের মর্ম্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।" ('রামায়ণী কথা'র ভূমিকা)।

পাঠকের বুঝাবুঝির উপরেই যে কবিতা-জন্মের সার্থকতা নির্ভর করে, সে কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাল করিয়া বহুবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন "হৃদয়ের ধর্ম্মই এই, সে নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বাঁচিয়া যায়।" ('সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধ)।

"গাছে ফল যে ক'টা ফলিয়া উঠে, তাহাদের এই দরবার হয় যে, ডালের মধ্যে বাঁধা থাকিলেই আমাদের চলিবে না—আমরা পাকিয়া, রসে ভরিয়া, রঙে রাঙিয়া, গন্ধে মাতিয়া, আঁটিতে শক্ত হইয়া গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব,

সেই বাহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই। ভাবুকের মনে ভাবনাগুলা ভাব হইয়া উঠিলে তাহাদেরও সেই দরবার। তাহারা বলে, কোন সুযোগে যদি হওয়া গেল, তবে এবার বিশ্ব-মানবের মনের ভূমিতে নবজন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব। প্রথমে ধরিবার সুযোগ, তাহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমি লাভ করিবার সুযোগ, এই তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের ভাবনা কৃতার্থ হয়।" ('সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধ)।

"এই যে এক-মনের ভাবনায় আর এক মনের মধ্যে সার্থকতা লাভের চেষ্টা মানবসমাজ জুড়িয়া চলিতেছে, এই চেষ্টার বশে আমাদের ভাবগুলি এমন একটী আকার ধারণ করিতেছে, যাহাতে তাহারা ভাবুকের কেবল একলার না হয়। ··· ··· একথা বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোন বন্ধুর কাছে যখন কথা বলি, তখন কথা সেই বন্ধুর মনের ছাঁদে নিজেকে কিছু-না-কিছু গড়িয়া লয়। ··· বস্তুত আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুই জনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে।" ('সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধ)।

রবীন্দ্রনাথ এইরূপে বহু প্রবন্ধে নানা উপায়ে বুঝাইয়াছিলেন যে, "একটি কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে,—সাহিত্য দুই রকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়। এক সে সত্যকে মনোহর রূপে আমাদিগকে দেখায়, আর সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয়।······সেইজন্ত যখন আমরা দেখি, একটা কথা কেহ অত্যন্ত চমৎকার করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তখন আমাদের এত আনন্দ হয়। প্রকাশের বাধা দূর হওয়াটাই আমাদের কাছে একটা দুর্ম্মূল্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।" (সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য প্রবন্ধ) আর "অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করতে পেরেছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য্য; —সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ সেইখানে তত সৌন্দর্য্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্ব্বাঙ্গীন অসামঞ্জস্য।" ('সাহিত্য' প্রবন্ধ)।

কাব্যের প্রকাশ যে সুস্পষ্ট অর্থাৎ বুঝাইবার মত হওয়াই উচিত এবং তাহার ব্যতিক্রমে যে কাব্যে দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা আমরা রবীন্দ্রনাথের উক্তির দ্বারাই বুঝাইয়া দিলাম। এইবারে রবীন্দ্রনাথের কথার দ্বারাই কাব্যের প্রকাশ ধোঁয়াস কেন হয়, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি।

ভাষার দীনতা ছাড়া কবিতায় অস্ফুটতা দোষ ঘটিবার প্রধানতঃ আরও দুইটী কারণ আছে। একটী কারণ,—'ভাবুক চিত্তে যে ভাবটী আকার ধারণ

করিবার পুরা অবকাশ পায় নাই, সেই ভাবকে আকার দান করিতে গেলেই তাহা অপরিস্ফুট হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইহাকে 'জালিয়াতের কল্পনা' বলা যাইতে পারে। আর দ্বিতীয় কারণ, রবীন্দ্রনাথ নিজেই একদিন ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—"এক মানুষের মধ্যে যেন দুটো মনুষ্য আছে, ভাবুক এবং লেখক। যে লোকটা ভাবে, সেই লোকটাই যে সব সময়ে লেখে তা ঠিক মনে হয় না। লেখক-মনুষ্যটী ভাবুক মনুষ্যটীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। তিনি অনেক সময়ে অনবধানতা বশতঃ ভাবুকের ঠিক ভাবটী প্রকাশ করেন না। আমি মনে কর্‌চি, আমার যেটী বক্তব্য আমি সেটী ঠিক লিখে থাকি, এবং সকলের কাছেই সেটা পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠ্‌চে, কিন্তু আমার লেখনী যে কখন্ পাশের রাস্তায় চলে গেছেন আমি হয়ত তা' জান্‌তেও পারি নি।" ('সাহিত্য' প্রবন্ধ)।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া এখন আমরা অনায়াসে বলিতে পারি, অস্পষ্ট কবিতার মধ্যে 'বৃহৎ আইডিয়া'র যে ভান করা হয়, সেটা শুধু ভান মাত্র। তাহাতে সত্যের সম্পর্ক নাই। সে কবিতা সম্বন্ধে আমরা রসিকপ্রবর Gifford সাহেবের কথায় বলিতে পারি—

> "Abortive thoughts, that right and wrong confound,
> Truth sacrificed to letters, sense to sound,
> False glare, incongruous images, combine,
> And noise and nonsense clatter through the line."

তবে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে আজ অস্পষ্ট কবিতার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন তাহার এক কারণ আছে। তাহার কৈফিয়ৎ রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—"যেটা ঠিক আমার মত নয় সেইটেকেই আমার মত বলে' ধরে নিয়ে প্রাণপণে লড়াই করে' যেতে হয়। কারণ আমার নিজের মধ্যে যে একটা গৃহ বিচ্ছেদ আছে সেটা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ কর্‌তে ইচ্ছে করে না।" ('সাহিত্য' প্রবন্ধ) ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

শিল্পীর প্রেম।

ক

তাহাদের ভিতরে তর্ক হইতেছিল, সরোজ, কুমারী ইন্দিরাকে ভালবাসিত কি না?

প্রমোদ বলিল, "আল্‌বৎ ভালবাসিত।"

সুরেন সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া বলিল, "কিসে জানলে তুমি?"

প্রমোদ বলিল, "তার লক্ষণে।"

কুমুদ কহিল, "লক্ষণ বুঝতে তোর যে মোটেই ভুল হয় নি, তার প্রমাণ?"

প্রমোদ গম্ভীর ভাবে বলিল, "তার প্রমাণ আমি। আমি যখন প্রেমে পড়েছিলুম, তখন আমাতে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, সরোজেও তা' পূর্ণ-মাত্রায় দেখ্‌ছি।"

দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটটা 'অ্যাশ-ট্রে'র উপরে নিক্ষেপ করিয়া, সুরেন বলিল, "লক্ষণগুলো কি, শুনতে পাই না?"

"বলি শোন। প্রেমে পড়ে, কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'ত না বড় একটা! খালি অলি গলি খুঁজে বেড়াতুম,—কিসে একটু একলা হব। কবিতা লিখ্‌তুম—"

বাধা দিয়া কুমুদ বলিল, "এইখানে তোমার প্রথম ভুল। সরোজ কবিতা লেখে না—ছবি আঁকে।"

প্রমোদ বলিল, "ও এক কথা—র‍্যাফেল আর সেকস্‌পিয়ার দুই সমান,—দুই-ই পাগল। তারপর শোন, কবিতা লিখ্‌তুম—মাসিকে পাঠাতুম—যদিও সম্পাদকেরা প্রাপ্তিস্বীকারের পরে আর কোন উচ্চবাচ্য কর্ত্তেন না,—কিন্তু তাতে আমি হতাশ হতেম না একেবারে! বাবা, বিবাহের প্রস্তাব করলে সাফ্‌ জবাব দিতাম, ওসব বিয়ে টিয়ে আমাকে দিয়ে হবে না।"

সুরেন বলিল, "কিন্তু বিয়ে কর্ত্তে ভুল করনি তুমি! উপভোগও করেছ—কারণ এখন তোমার ঘরে 'পুত্র কন্যা'র প্রবল বন্যা!"

প্রমোদ বলিল, "সেটা বাধ্য হয়ে ভাই! একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রণয়িনীর ঠিকানায় একখানি প্রেম-লিপি পাঠিয়ে, পরদিন সন্ধ্যাকালে তার বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম—যদি একবার দেখতে পাই তাকে! কিন্তু তার

অঞ্চলের একটী চঞ্চল প্রান্তও দেখ্‌তে পেলুম না। তার বদলে দেখা গেল, একটা ষণ্ডা লোককে! তাকে দেখে, আমার প্রণয়িনী বলে মোটেই ভ্রম হ'ল না, কারণ তার হাতে ছিল তৈলপক্ক একগাছা বংশদণ্ড! তারপরে যখন অনুধাবন করলুম, লোকটার উদ্দেশ্য শনৈঃ শনৈঃ আমারই দিকে আগমন, তখন প্রেমের যষ্টিবহুল রাস্তা সরল নয় বুঝে, বিবাহের রাস্তা লক্ষ্য করেই দৌড় দেওয়া গেল।"

কুমুদ বলিল, "কিন্তু কুমারী ইন্দিরা—।"

বাধা দিয়া, প্রমোদ বলিল, "চুপ্। সরোজ আস্‌ছে।"

বলিতে বলিতে চিত্রকর সরোজকুমার, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রমোদ বলিল, "এস এস বঁধু এস,—সরোজ! তোমার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ!"

সরোজকুমার, ধীরে ধীরে বলিল, "আমার সৌভাগ্য। কিন্তু আমার সঙ্গে কুমারী ইন্দিরার নাম কেন,—আমি আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌তে পেলাম।"

কুমুদ কহিল, "প্রমোদ এতক্ষণ সপ্রমাণ কর্‌ছিল, যে তুমি কুমারী ইন্দিরাকে ভালবাস্‌তে।"

একটু বিরক্ত হইয়া, সরোজ বলিল "ছিঃ! একটী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার নাম এরূপ ভাবে আলোচনা করা বড়ই অন্যায়। বিশেষ, সেই মহিলা যখন পরলোকে।"

বন্ধুরা হাসিয়া খুন! সরোজ, বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিল।

খ

বিদ্যা, যশঃ, রূপ, গুণ—এবং অর্থ,—এগুলিকে একসঙ্গে বড় একটা দেখা যায় না। যাহাতে দেখি, তাকে আমরা সুখী বলি। অতএব, সরোজকেও সুখী বলিতে হইবে।

কিন্তু তথা-কথিত সুখে সুখী হইলেও সুখী হয়ত আপনাকে দুঃখী মনে করিতে পারে। সরোজও আপনাকে দুঃখী ভাবিত।

তাহার হৃদয়ের একাংশ অপূর্ণ ছিল। পৃথিবীতে পার্থিব আর কিছুর বিনিময়ে এ অপূর্ণতা, পূর্ণ হইবার নয়। তাহার এই গোপন হৃদয়, সে কাহাকেও খুলিয়া দেখাইত না,—তার ব্যথা কি, কেহ বুঝিতও না।

তার এক প্রতিজ্ঞা,—বিবাহ করিবে না। জিজ্ঞাসা করিলেও কারণ বলিত না। এজন্য বন্ধুগণ তা'কে একটা রহস্যের মত ভাবিত, এবং তাহার বিবাহে অমত লইয়া সকলে নানারূপ কারণ ও অকারণের সৃষ্টি করিত।

কিন্তু সরোজ অটল। কিছুতেই সে আত্মপ্রকাশ করিত না। এদিকে সে বিশেষ সাবধান ছিল। তার উত্তর, বিবাহ করিবে না।

আপনার পল্লীভবন সে এমনি সাজাইয়াছিল—যেন একখানি সুন্দর চিত্র! পৃথিবীতে সে সুখ পাইত, একমাত্র সৌন্দর্য্যসাধনায়। তাহার পল্লী-ভবনের অবস্থান তাই, প্রকৃতির বুকে, নদীর ধারে, খোলা হাওয়ায়, বিজনে।

সবুজ ঘাসের উপরে বসিয়া, সে কান পাতিয়া জলের গান শুনিত। সেই অশ্রান্ত কলতানে সরোজ, সৌন্দর্য্য-বেদের কোন অলিখিত কাহিনী শুনিতে পাইত। প্রকৃতি তার দোসর। লোকে বলিত, এটা তার বাতিক।

ভাল চিত্রকর বলিয়া তাহার দেশজোড়া নাম হইয়াছিল। সে স্থির করিয়া-ছিল, এই নির্জ্জনতার মাঝে চিত্রকলার অনুশীলনে সারাজীবন কাটাইয়া দিবে। আপন মনোভাবকে চিত্রফলকে ফুটাইয়া তুলিবে।

* * * * *

কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিতে হইল। হঠাৎ তাহার জননী পীড়িতা হইলেন। পীড়া, দেখিতে দেখিতে সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। ডাক্তারেরা জবাব দিয়া গেল।

সরোজ জননীর, মৃত্যুশয্যার পাশে আসিয়া বসিল। তাহার পিতা পরলোকগত। পৃথিবীতে মা-ই তার অবলম্বন ছিলেন। কিন্তু তিনিও বুঝি ছাড়িয়া চলিলেন।

মা, ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন,—"সরোজ!"

"মা, মা!"

মাতা, আপনার রোগশীর্ণ হাতখানি ছেলের মাথার উপরে রাখিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন "সরোজ, বাবা, বংশের তুই একমাত্র কুলতিলক। বংশ রক্ষা করা কি তোর কর্ত্তব্য নয়?"

সরোজ কোন উত্তর দিতে পারিল না, নীরবে মায়ের হাতখানি আপনার বুকের ভিতরে টানিয়া লইল, এবং শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার শেষ কথা, "আমার মরণ কালের সাধ, তুই বিবাহ কর্।"

এক বৎসরের ভিতরে, মাতৃবিয়োগব্যথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে না ভুলিতে সরোজ বিবাহ করিল। বন্ধুজনেরা বড় ঘটার কলার মারিল; কেহ কেহ সরোজের কুমার-ব্রত ভঙ্গ লইয়া টিট্‌কারি দিল। কিন্তু বিবাহের কারণ কি, তা কেহ জানিল না।

গ

বিবাহের পরে একটী বৎসর গেল। অমলা, 'ঘর বসতে' আসিল। পত্নীকে লইয়া সরোজ আপনার যত্নসজ্জিত পল্লীভবনে গিয়া উপস্থিত হইল।

সরোজ, সাবধানে পত্নীর সঙ্গে ব্যবহার করিত। যেখানে প্রেমের অভাব, সেখানে মৌখিক যত্নটাই বেশী। সেখানে মন-যোগানো থাকিতে পারে। সেটা কর্ত্তব্যের অনুরোধে।

বাজারে একটা নূতন জিনিস উঠিলে, সরোজ অমনি সেটি কিনিয়া আনিয়া অমলার হাতে দিত। কাপড়ের পর কাপড়ে, গহনার পর গহনায়, অমলার বাক্স ও আল্‌মারি ক্রমেই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সরোজের কোন ব্যবহারেই অমলার মনঃপূত হইত না।

ইহার কারণ আছে। রমণী যেমন সহজে পুরুষের মন বুঝিতে পারে, পুরুষ তেমন পারে না। কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া যত্নই প্রকাশ পায়—হৃদয় বোঝা যায় না।

অমলা বুঝিত, তার স্বামী, কর্ত্তব্যপালন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অন্ধকার। সেখানে অমলার প্রীত্যর্থে একবিন্দু প্রেমও সঞ্চিত নাই।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে, সরোজ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে একটী ঘরে প্রবেশ করিত। সেটি তার চিত্রশালা। ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া সরোজ আপনার কাজের ভিতরে ডুবিয়া থাকিত, এবং যতক্ষণ না ঘরের ভিতরে প্রচুর দিবালোকের অভাব হইত, ততক্ষণ বাহিরে আসিত না।

সে কক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশের অধিকার ছিল না—অমলারও না! ঘরের ভিতরে কি আছে? প্রবল কৌতূহলে এক একদিন অমলার প্রাণ, দেহের ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিত; কিন্তু, উপায় নাই—উপায় নাই।

ঘ

সেদিন, অমলা দেখিল, চিত্রশালার দ্বার মুক্ত! ঘরের ভিতরে কেহ নাই। আনন্দে, আগ্রহে, সে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। চমৎকার ঘর! কি সাজানো! দেওয়াল জুড়িয়া চারিদিকে হাতে-আঁকা ছবি,—কোনখানি জীবজন্তুর, কোনখানি মানবের, কোনখানি প্রকৃতির। কোনখানিতে দুগ্ধশুভ্র জ্যোৎস্নাদীপ্ত আকাশ,—অনাহত, অনন্ত, মেঘমৌনী! কোনখানিতে ক্রমাভিসৃচী বনপথ, দুধারে তাহার সার-মিলানো তালীকুঞ্জ, কোথাও চুম্বিতমুখ শ্যামলতা, পাতার আশে পাশে থোকো থোকো ফুল ফুটিয়াছে—এবং মধুলুব্ধ ভ্রমরেরা সেই পুষ্পসম্পুট খুলিবার জন্য দল বাঁধিয়াছে।

একদিকে একখানি সদ্যঃ বর্ণনির্লিপ্ত অসমাপ্ত ছবি ; অমলা তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। উপরে,—মেঘ আর মেঘ আর মেঘ! সেই মেঘরাজ্যে এক মঞ্জুশ্রী ললনা। তাঁহার মুখে যৌবনের সুষমা এবং বাল্যের সরলতা! রমণীর নিম্নার্দ্ধে জলদ-প্রচ্ছাদনী। মূর্ত্তির পিছনে বোধ হয় সূর্য্যোদয় হইতেছে ; কারণ অন্তরালগুপ্ত তপনের রাঙা আলো রমণীর চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়া এক জ্যোতির্মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার পদ্ম-পেলব হাত-দুখানি ভঙ্গীসহকারে লীলায়িত।

নিম্নে, দুর্ব্বাঙ্কুরিৎ পৃথিবী। তৃণাসনে এক যুক্ত-কান্ত যুবক ; তাঁহার কাতর দৃষ্টি সেই শূণ্য-প্রস্থিতা রমণীর আনত দৃষ্টির সহিত মিলিয়াছে। ঊর্দ্ধে রমণী, নিম্নে যুবক—মাঝে বড় ব্যবধান, ওগো বড় ব্যবধান!

ছবির তলায় লেখা—'প্রেমের বিদায়!'

ঙ

অমলা ভাল করিয়া যুবককে দেখিতে লাগিল। এ যে চেনা মুখ! সে আরও কাছে সরিয়া গেল, একেবারে ছবির উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন চিনিল, এ প্রতিমূর্ত্তি তাহারই স্বামীর!

পাশের ত্রিপায়ায় একখানা পোর্টফোলিও পড়িয়াছিল। হঠাৎ সেদিকে অমলার দৃষ্টি পড়িল। তাহার ভিতরে একখানা ফটো—তাহাতে একটী রমণীর মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দেখিয়া, অমলা আর একবার চিত্রলিখিত মূর্ত্তির দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তে, তাহার হৃদপিণ্ড যেন ফাটিয়া গেল। সে টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল—তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার চাপিয়া ধরিল ;—ফটোর আর চিত্রের মূর্ত্তি এক!

সহসা, দরজা ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল,—সরোজ! অমলার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তিরস্কারের স্বরে সরোজ ডাকিল—"অমলা!"

সরোজের মুখ, মেঘের মত গম্ভীর। সরোজ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"অমলা, একি!"

নীরবে, নতশিরে অমলা সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

চ

দু'জনের মাঝে এক নীরবতার আড়াল আসিয়া পড়িল।

অমলা, আগে একটা কানাঘুষা শুনিয়াছিল, তার স্বামী, অন্যে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর বিবাহে অমত ছিল ; কেবল মায়ের অনুরোধে তিনি বিবাহ

করিয়াছেন। কথাটার, সে প্রথমে বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু, স্বামীর প্রাণশূন্য ব্যবহারে, তাহার মনে যে সন্দেহ মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিত,—এখন তাহা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল।

পূর্ব্ব ঘটনার পরে, সরোজ বড় একটা বাড়ীর ভিতরে আসিত না। রাত্রিতে, না আসিলে নয়, তাই একবার আসিত। দু'জনে এক শয্যায় শয়ন করিত, এক শয্যায় নিদ্রা যাইত—কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কথা কহিত না।

শেষে, অমলা আর পারিল না—এমন করিয়া ক'দিন চলে? সেদিন, সরোজ যখন ঘরের ভিতরে আসিল, অমলা একেবারে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সরোজ বিস্মিত হইয়া অমলার দিকে চাহিল। দু'জনে দুজনার হাত ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল,—দুজনে দুজনার দিকে চাহিয়া রহিল—এমনি অনেকক্ষণ! অবশেষে, সরোজই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, "কি বল্‌তে চাও অমলা? কোন কথা আছে কি?"

কথা নাই? অমলার বুকে যে কথার সাগর বহিতেছে!

অমলা, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তুমি—তুমি তাকে—।" আর কিছু বলিতে না পারিয়া অমলা হঠাৎ থামিয়া গেল।

সরোজের বিস্ময় বাড়িল। কহিল "বল অমলা, থাম্‌লে কেন?"

"তুমি তাকে ভালবাসতে?"

সরোজের বুক কাঁপিয়া উঠিল। প্রায় স্তম্ভিত ভাবে বলিল "কাকে?"

"তাকে,—ওগো-তাকে!" অমলা, স্বামীর হাত আরও জোরে চাপিয়া ধরিল। সরোজ বুঝিল। কিন্তু একি প্রশ্ন? ইহার উত্তর কি? মিথ্যা বলিব? না! তবে?—অমলা, সাশ্রুনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বল্‌বে না?"

দৃঢ়কণ্ঠে সরোজ কহিল, "কেন বল্‌ব না! তুমিত সব বুঝেছ! হাঁ, আমি—আমি ভালবাস্‌তুম্।"

"বাস্‌তে? এখন?"

"তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এখনও ভালবাসি।"

অমলা, মূর্চ্ছিতার মত শয্যার উপরে লুটাইয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ের ভিতরে প্রাণ যেন হাহাকারে ফাটিয়া মরিয়া গেল। আগে যাহা সন্দেহ করিয়াছিল, পরে যাহা বিশ্বাস করিয়াছিল, আজ অমলা তাহা স্বকর্ণে শুনিল!

সরোজ, স্তম্ভিতের মত বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন, মেঘের আড়ালে, পূর্ণিমার চাঁদ ডুবিয়া যাইতেছে, এবং বাঁশঝাড়ের ভিতরে উতলা বাতাস দীর্ঘশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

ছ

সরোজ কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব করিল। অমলা, আগ্রহের সহিত সম্মতি দিল। এস্থানে বাস, তাহার কাছে অভিশাপের মত বোধ হইতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে উভয়ে যাত্রা করিল। মাঝে পদ্মা। ষ্টীমারে যাইতে হইবে। পূর্ব্বাহ্ণেই কামরা রিজার্ভ করা ছিল।

ষ্টীমারে উঠিয়া, অমলা কামরার ভিতরে গেল। সরোজ, ডেকের উপরে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। এই ভাবে দিনটা কাটিল।

কামরার ভিতরে গিয়া অমলা, আগে আপনার জিনিষপত্রগুলি আনা হইয়াছে কি না, তাহাই দেখিতে বসিল। এটা, ওটা, সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ একটা ঢাকা দেওয়া জিনিষ দেখিয়া অমলা সেটা তুলিয়া ধরিল। সেই ছবি! অমলার বুকে কে যেন দণ্ডাঘাত করিল। ঘৃণাভরে ছবিখানা একদিকে ফেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কামরার জানালার দিকে গেল।

দিনের আলো তখনও নিবিয়া যায় নাই, কিন্তু মেঘের তাজমহলে সন্ধ্যাতারা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে মায়াচিত্রের মত অস্পষ্ট ছায়ালোকের ভিতরে দৃশ্যের পরে দৃশ্য চলিয়া যাইতেছে। ধূ ধূ ধূ বালু-বেলা, তাহার পরে বঞ্জুল-মঞ্জুল শ্যামলিতা ভূমি, তাহার পরে হরিৎ-ধূসরাভ বনান্তরেখা। কর্ষিত ক্ষেত্র দিয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছ গো-পাল ছুটিয়াছে, নীলাঞ্জনীল আকাশে শুক্ল-লেখা অর্পণ করিয়া হাঁসের সার উড়িয়া যাইতেছে। ঐ একদল কলাগাছ নীল-নিশান দুলাইতেছে—তার পাশে এক শিবালয়,—সেখানে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। সেই পবিত্র শান্তির আবাহন, অমলাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না,—তাহার প্রাণ তখন বড় চঞ্চল।

বাহির হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সে আর একবার বস্ত্রাবৃত ছবিখানার দিকে চাহিল। তাহার পর, এক সংকল্প করিল। সে বড় অন্যায় সংকল্প। কিন্তু যতই অন্যায় হোক্, রমণী-জীবনে এমন এক অশুভ মুহূর্ত্ত আসে, যখন অশেষ গুণশালিনী হইলেও সে আপনাকে সংবরণ করিতে পারে না। রমণী, সব সহিতে পারে—সহ্য করিতেই বুঝি তার পৃথিবীতে আগমন! কিন্তু স্বামী, অন্যে অনুরক্ত,—এ চিন্তা তার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। স্বামীর প্রণয়ভাগিনীকে

সে কখনও ভালবাসিতে পারে না। যাকে ভালবাসিয়া স্বামীর সুখ—তাকেও ভালবাস—প্রেমযজ্ঞে আত্মদান কর! ইহা কাব্য-গীতার মন্ত্র। শুনিতে মিষ্ট—করিতে কাকেও বড় দেখি না। অমলাও কাব্য-জগতের মহিমময়ী নয়, অতশত সে বোঝে না। পৃথিবীতে তাহার একমাত্র অবলম্বন—তাহার সহায়, তাহার স্বামী—তাহার নয়। এ দুর্ভাবনা প্রাণে তার আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল, তাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। তা যাই বল, এ অবস্থায় তাকে একটা অন্যায় করিতে দেখিলে, তাকে সাধারণ মানবীমাত্র মনে করিব—পাপিষ্ঠা বলিতে পারিব না। কারণ, ইহা স্বাভাবিক।

জ

অনেক রাত্রিতে, হঠাৎ সরোজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ষ্টীমারখানা, তখন ভয়ানক দুলিতেছে—বাহির হইতে রহিয়া রহিয়া ঝড়ের গর্জ্জন বাড়িয়া উঠিতেছে!

সরোজ, তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল। কামরার ভিতরে দপদপে আলো,—কিন্তু বাহিরের আকাশ অন্ধকার। সরোজের দৃষ্টি প্রথমে জানালার দিকে পড়িল,—কি তীব্র বিদ্যুৎবিভা! সে দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া, সরোজ সবিস্ময়ে দেখিল, অমলা বিছানায় নাই। কামরার চারিদিকে চাহিল—অমলা নাই! এই দুর্য্যোগে কোথায় গেল সে!

হঠাৎ তাহার দৃষ্টি কামরার মেঝেতে পড়িল। সেখানে তাহার রেশমের চিত্রাবরণী লুটাইতেছে—কিন্তু ছবি, ছবি? সর্ব্বনাশ! সরোজের তন্দ্রা-জড়িমা এক মুহূর্ত্তে টুটিয়া গেল,—এক লাফে সে শয্যাত্যাগ করিল এবং কামরার চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল,—কিন্তু ছবি নাই! আর, আর—অমলাও নাই!

তাহার গভীর প্রেমের বহিঃবিকসিত লীলা-শতদল,—তাহার দীপ্তমঙ্গলশ্রী শ্রেয়সী মানসী—সে যে কত সাধনায় ফুটিয়াছে! একি শুধু ছবির মূর্ত্তি? এ স্মৃতিদীপ্ত আলেখ্য কত যত্নে সে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে,—ভক্ত যেমন দেবীকে রক্ষা করে—কৃপণ যেমন রত্নরাশিকে রক্ষা করে! এ যে তপস্যার ফল, একি শুধু ছবির মূর্ত্তি?

হঠাৎ সরোজের মনে একটা সন্দেহের উদয় হইল। কামরার দরজা টানিয়া, সে তাড়াতাড়ি বাহির হইতে গেল—দুকবারপথে কামরার ভিতর হইতে

আলোক-রেখা বাহিরে গিয়া পড়িল। সেই আলোকে সরোজ দেখিল—বাহিরে, রেলিংয়ের ধারে অমলা দাঁড়াইয়া।

স্তম্ভিতনেত্রে সরোজ দেখিল, অমলা, কি একটা জিনিষ মাথার উপরে তুলিয়া ধরিল—কি সে? ভ্রূসঙ্কোচ করিয়া সরোজ চাহিয়া দেখিল,—কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না, বড় অন্ধকার! উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া সে দু'হাতে অমলাকে চাপিয়া ধরিল,—কিন্তু অমলা তখন জিনিষটা জলে ফেলিয়া দিয়াছে!

সহসা আকাশে বাজ্ ডাকিল, এবং সৃষ্টিবিসারী তিমিরাঞ্চল বিদীর্ণ করিয়া এক তীক্ষ্ণ অগ্নিশিখা তীব্রবেগে নীচে নামিয়া আসিল; তদ্দণ্ডে পদ্মাতটে এক বৃক্ষ বজ্রানলদগ্ধ হইয়া জ্বলিয়া উঠিল!

সরোজ, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে কর্কশকণ্ঠে বলিল "অমলা! কি ফেলে দিলে?"

অমলা হাসিয়া উঠিল।

স্ত্রীর দুহাত আপন হস্তমধ্যে সবলে নিষ্পীড়ন করিয়া, সরোজ কহিল, "বল, বল, বল!" স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অমলা শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুটকণ্ঠে বলিল,—"ছবি!"

ছবি!—ছবি? সরোজ, রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পদ্মার দিকে চাহিল। তেমনি ঝড় বহিতেছে—তেমনি অন্ধকার! সেই অন্ধকারে ষ্টিমারের 'সার্চ্-লাইট্' ধূমকেতুর মত পদ্মার বুকে গিয়া পড়িয়াছে। পদ্মা যেখানে আলোকমধ্যগত, সেখানে তাহার প্রখর স্রোতঃ কুণ্ডলিনী অজাগরীর মত ফুলিয়া ফুলিয়া, দুলিয়া, নিঃশ্বসিয়া উঠিতেছে।

আবর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া কি একটা দ্রব্য মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছিল। সরোজের দৃষ্টি সেইখানে স্থির হইল,—ক্ষণিকের জন্য। তাহার পর, সে একটুও ইতস্ততঃ করিল না—দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া সরোজ সেই ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ মৃত্যু-স্রোতঃমধ্যে ঝম্প দিল!

অমলা বজ্রাহতের মত ডেকের উপরে পড়িয়া গেল। এবং তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাঁচাও! বাঁচাও! আমার স্বামীকে বাঁচাও!"

৯

ষ্টিমারের কাপ্তেন দেখিলেন, একটি লোক জলে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সেইদিকে 'সার্চ-লাইট্' প্রসারিত হইল। সেই সঙ্গে একখানা নৌকাও ভাসিল।

সরোজ, প্রাণপণে আবর্ত্তের দিকে সাঁতারিয়া যাইতে লাগিল। তরঙ্গেরা

ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে অন্তদিকে ঠেলিয়া দিতে লাগিল—পাতালের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

পিছনে, নৌকা বাণবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল। নৌকার উপর হইতে একজন হাঁকিল, "হুসিয়ার! সাম্‌নে ঘূর্ণি!" কিন্তু চকিতের ভিতরে সরোজ আবর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়িল এবং পলক না পালটিতে ডুবিয়া গেল।

নৌকার লোকেরা, নৌকা থামাইয়া গোলমাল করিতে লাগিল। "ঐ আবার ভাসিয়া উঠিয়াছে!"—"ওরে, নৌকা ঐ দিকে চালা!"—"লোকটা হাতে কি একটা রহিয়াছে না?"—"হ্যাঁ! নিজে ডুবিয়া যাইতেছে, কিন্তু জিনিষ প্রাণপণে উঁচুতে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে!"—"ঐ ঐ—যাঃ! একেবারে বুঝি তলাইয়া গেল!"—

ঝড় ও পদ্মার গর্জ্জন ডুবাইয়া, দূর হইতে আবার কাহার আকুল চীৎকার জাগিয়া উঠিল "বাঁচাও!—ওগো বাঁচাও! আমার স্বামীকে বাঁচাও গো!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পথের কথা।

(৪)

ওলড কোর্ট-হাউস ষ্ট্রীট্।

যাঁহারা কলিকাতায় বাস করেন, বা লালদিঘীর আফিস অঞ্চলে চাকরী করেন, ওলড কোর্ট-হাউস্ ষ্ট্রীটের অবস্থান স্থান তাঁহাদিগকে আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। এই রাস্তাটীর একটী পুরাতন ইতিহাস আছে। আজকাল যেখানে "স্কচ্ চার্চ" বা স্কচদিগের সেণ্ট এণ্ড্রুজ গির্জ্জা অবস্থিত তাহার পশ্চিমেই "লিয়নস্ রেঞ্জ"। (Lyons Range) আমরা ১৭২৭ সালের কথা বলিতেছি। জব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর ৩৭ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তখনও এইস্থানে বর্ত্তমান গির্জ্জা নির্ম্মিত হয় নাই।

এই সময়ে কলিকাতায় মিঃ রিচার্ড বুরচিয়ার নামক একজন মহদাশয় ইংরাজ বাস করিতেন। তিনি কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কৌন্সিলের একজন সদস্য ও কলিকাতা বন্দরের পরিদর্শক ছিলেন। বুরচিয়ার সাহেব,

বর্ত্তমান স্কচ্ গির্জ্জার অধিকৃত স্থানের অতি নিকটে, কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় অবশ্য দরিদ্র ইংরাজ বালকগণের জন্যই খোলা হয়। এই বুরচিয়ার সাহেব আগে ইংরাজের বোম্বাই কুঠীর গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার স্থাপিত স্কুলে প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের খৃষ্টান বালকগণ শিক্ষালাভ করিত। জনশ্রুতি এই—বুরচিয়ার সাহেবই, ক্লাইভ্ ও ওয়াটসনকে ১৭৫৬ খৃঃ গেরিয়া আক্রমণের উপদেশ দেন।

বুরচিয়ারের প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরে উঠিয়া যায়। বুরচিয়ারও শেষ দশায় দেউলিয়া হইয়া পড়েন। ১৭২৬ খৃঃ অব্দের পুরাতন কাগজ পত্র হইতে জানিতে পারা যায়, বুরচিয়ার কর্ত্তৃক বিদ্যালয় স্থাপনের একবৎসর পুর্ব্বে, এই বাটীতে ইংরাজের এদেশে সর্ব্বপ্রথম আদালত Mayor's Court বসিত। ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে এই বাটীর স্বত্বাধিকারী, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইহা বিক্রয় করেন। বিক্রয়ের স্বত্ব এই যে কোম্পানী বাৎসরিক চারি হাজার টাকা বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য প্রদান করিবেন।

পলাশীর যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পরে, এই বাড়ীটাকে আরও বাড়াইয়া তোলা হয়। নূতন বিধানানুসারে সুপ্রীম-কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই বাড়ীতেই সুপ্রীম-কোর্ট বসে। এই সুপ্রীম কোর্টের বাটীতেই মহারাজা নন্দকুমারের জাল অপরাধের বিচার হয়।

দানিয়েল নামক এক ইংরাজ ভ্রমণকারী, কলিকাতার তদানীন্তনকালের কয়েকখানি চিত্র প্রকাশ করেন। সেই চিত্রের মধ্যে এই সুপ্রীম-কোর্টেরও একটী ছবি ছিল। ছবিগুলি ১৭৮৬ খৃঃ-অব্দের। এই ছবি হইতে প্রমাণ হয় আদালত বাড়ীটা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। উপরে থামওয়ালা বারান্দা। কামরাও অনেকগুলি ছিল।

এই সুবৃহৎ বাটীর অন্যান্য অংশে, প্রাচীন কলিকাতার আদি টাউন হল, এক্সচেঞ্জ, পোষ্ট-আফিস প্রভৃতি ছিল। অপরাংশে আদালত। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশের প্রথম Freemason Society এইস্থানে তাঁহাদের কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭৯২ খৃঃ অব্দে ইঞ্জিনিয়ারের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয়, এই ওল্ড কোর্ট হাউসের বনিয়াদ, মেঝে ও গাঁথুনী তত নিরাপদ নহে। সামান্য ঝড় ঝটিকাতে বাড়ীটী ভূমিসাৎ হইতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারগণ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার পর বাড়ীটী ভাঙ্গিয়া সমভূমি করা হয়।

এই ওল্ড কোর্ট হাউসের নিকটবর্ত্তী স্থান, সেরাজের কলিকাতা আক্রমণের সময় অতি ভয়ানক অবস্থা ধারণ করে। লালদিঘীর চারি পার্শ্বেই নবাব সৈন্য ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। এই কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ হইয়াছিল।

লালবাজার পুলিষ আফিস।

আজকাল যাহা লালবাজার পুলিস আফিস বলিয়া পরিচিত, তাহা আধুনিক যুগের। আমরা এ নূতন বাটীর প্রারম্ভ ও শেষ হইতে দেখিয়াছি। ইহার পূর্ব্বে এইস্থানে যে বাড়ীটী ছিল, তাহা জন পামার সাহেবের সম্পত্তি। জন্ পামারের পিতা লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল উইলিয়াম পামার, স্বনামখ্যাত বঙ্গের প্রথম গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র জন পামার সেকালের কলিকাতার একজন নামজাদা সওদাগর ছিলেন। তাঁহার মত দাতা ও সদাশয় ইংরাজ ভারতে খুব কম আসিয়াছিলেন। এই পামার সাহেবের একখানি তৈলচিত্র আজও টাউন-হলে আছে। পামার সাহেব কোম্পানীর স্থানাভাব দেখিয়া কলিকাতার পুলিস কোর্টের ব্যবহার ও নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার নিজের আবাস বাটিটী কোম্পানীকে বিক্রয় করেন।

পুলিস আফিসের পশ্চিমদিকে আর একটী বাটী ছিল। সেটির আর এখন কোন চিহ্নই নাই। সেটী প্রাচীন কলিকাতার একমাত্র "হামাম" বা উষ্ণ জলের স্নানাগার। সাধারণে মূল্য দিয়া এইস্থানে স্নান করিতে পারিতেন। প্রাচীন পুলিস কোর্টের ঠিক সম্মুখেই সুপ্রসিদ্ধ হারমোনিক ট্যাভার্ণ, (Harmonic Tavern) ইহা কলিকাতার আদি ইংরাজ হোটেল। ইহারও এখন কোন চিহ্ন নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, স্থাপত্য কার্য্যে এ বাটিটীর যথেষ্ট সৌন্দর্য্য-গৌরব ছিল। প্রাচীন পুলিস কোর্টের সান্নিধ্যেই পুরাতন জেলখানা ছিল। জেলখানার সন্নিকটস্থ একটী তেমাথার পথে, অপরাধীদের ফাঁসী দিবার স্থান ছিল। এখনও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে ছড়ায় শুনা যায় "লালবাজারে ফাঁসি যায়।" কথাটা মুখে মুখে এ যুগ অবধি আসিয়া পড়িয়াছে। এখন তাহাদের সকল স্মৃতি লোপ হইয়াছে।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বিষ্ণুসংহিতায় দণ্ডবিধি।

ভারতবর্ষীয় পিনাল কোডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে লোকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অপরাধের দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দু জাতির সকল অনুষ্ঠানই ধর্ম্মমূলক। সুতরাং লোকের ধর্ম্ম বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে তাহাকে ইহজগত ও পরজগতে কিরূপ ভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়, তাহার বর্ণনায় হিন্দুদিগের শাস্ত্র পুরাণাদি পূর্ণ। কেবল যে পরকালে শাস্তির ভয় দেখাইয়া পূজ্যপাদ ঋষিগণ পাষণ্ডদিগকে অপরের ধর্ম্মে ব্যাঘাতরূপ পাপ-অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে। এরূপ পাপের রাজদ্বারে শাস্তিরও ব্যবস্থা সংহিতা-গুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহামুনি বিষ্ণু বলিয়াছেন,—

"জাতিভ্রংশ করস্যাভক্ষ্যস্য বিবাসঃ"

যে ব্যক্তি জাতিনাশকর অভক্ষ্য অপরকে ভোজন করায় তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড। যে ব্যক্তি ঐরূপ গর্হিত পদার্থ বিক্রয় করে তাহারও ঐ দণ্ড। ইহা ব্যতীত বিধান আছে,—

"অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণ দূষয়িতা ষোড়শ সুবর্ণান্ জাত্যপহারিণা শতম। সুরয়া বধ্যঃ।"

অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে ষোড়শ সুবর্ণ দণ্ড। জাতি অপহরণ করিলে শত এবং সুরাপান দ্বারা জাতিনাশ করিলে অপরাধীর বধদণ্ড। প্রাচীন আর্য্যসমাজে সুরাপান কার্য্য কিরূপ নীতিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত গৌতমসংহিতায় নিম্নলিখিত বচন হইতে তাহা প্রমাণ হইবে,—

"সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাসিঞ্চের সুরামাস্যে। মৃত শুদ্ধেতস্যা।"

অর্থাৎ মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ মদ নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে মৃত্যু হইলে তবে উহার পাপ ক্ষয় হয়।

এই পরিমাণে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদিগের জাতিনাশের দণ্ড বর্ণিত হইয়াছে।

"দেবপ্রতিমাভেদকশ্চোত্তমসাহসদণ্ড।"

দেবপ্রতিমাভঙ্গকারীর উত্তম সাহস দণ্ড। মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যের সংহিতায় দেখিতে পাই,—

"মৃতাঙ্গলগ্ন বিক্রেতুর্গুরোস্তাড়য়িতুস্তথা।"

যে ব্যক্তি মৃত শরীরের বস্ত্র বিক্রয় করে বা যে গুরুকে তাড়না করে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। হিন্দুশাস্ত্রে গুরুর স্থান অতি উচ্চ। তজ্জন্য গুরুকে

তাড়না করিলে লোককে বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইতে হইত। এই নিয়মটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রত্যেক কুকর্ম্মের গণ্ডী নির্ণয় করিয়া অপরাধের নামকরণ আধুনিক ব্যবহার-শাস্ত্রের প্রথা। মানবদেহ সম্বন্ধীয় অপরাধের তালিকায় নরহত্যা, নরদেহে গুরুতর বা সামান্যরূপ আঘাত করা প্রভৃতি অপরাধের মাত্রাভেদে নানারূপ শাস্তির বিধান ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে দৃষ্ট হয়। প্রাচীন আর্য্যজাতির স্মৃতিগ্রন্থে সে সমস্ত অপরাধের দণ্ডের বিধান দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু তারতম্যানুসারে তাহাদিগের বিভিন্ন নামকরণ নাই। বলা বাহুল্য, তাহাতে দুষ্টের দমনের কিছু ব্যতিক্রম হইত না। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজও যে সকল কুকার্য্যকে রাষ্ট্রের শান্তির অন্তরায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করে তদানীন্তন কালের সমাজও সেই সকল কুকর্ম্মগুলিকে দণ্ডনীয় বলিয়া মনে করিত। সুতরাং সাধারণ লোকের নীতিজ্ঞান আধুনিক সমাজে কিছু অধিক সূক্ষ্ম সে কথা বলিবার কারণ নাই। স্মৃতিতে নানাপ্রকার বাচনিক পার্থক্য না থাকিলেও দেহ সম্বন্ধীয় অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব ভেদে দণ্ডের প্রভেদ নাই তাহা নহে। সে হিসাবে আমাদিগের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে এমন অনেক অপকর্ম্মের উল্লেখ হইয়াছে যাহা পাশ্চাত্য ব্যবহার শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। হিন্দু ব্যবহারে নাই কেবল বাচনিক বর্ণনা।

নরহত্যার জন্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেরই প্রাণবধ করা হইত। সংহিতা-গুলিতে ব্রাহ্মণের নানারূপ কঠোর কর্ত্তব্যাদি নির্ণীত হইলেও ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করিলেই লোকে ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হইত বলিয়াই বোধ হয়। এ বিষয়ে হারীতসংহিতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর গর্ভে এবং ব্রাহ্মণের ঔরসে উৎপন্ন ব্যক্তি মাত্রই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত। ব্রাহ্মণের বৃত্তি সম্বন্ধে মহামুনি হারীত বলেন,—

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যাজনং যজনং তথা
দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি ষট্ কর্ম্মানীতি বাচ্যতে।

অর্থাৎ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন্, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কার্য্য ব্রাহ্মণের। শ্রুতি এবং স্মৃতি ব্রাহ্মণের চক্ষু বলিয়া কথিত হইয়াছে। শাস্ত্র জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ অন্ধের সমান। অপিচ

স্মৃতিহীনায় বিপ্রায় শ্রুতিহীনে তথৈবচ,
দানং ভোজনমন্যচ্চ দত্তং কুলবিনাশনম্।

শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞানবিহীন ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিলে কিংবা ঐরূপ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সেই দান-ভোজনাদি কর্ম্ম দাতার কুলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল বচন স্বত্বেও ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইত, শাস্ত্র পাঠ করিয়া এবং হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয়। সুতরাং মহাপাতক করিলেও ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব কাহাকেও বধদণ্ড পাইতে হইত না।

অপরকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে ইংরাজি আইন মতে প্রাণবধ দণ্ড হয় না। পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে শস্ত্র উত্তোলন করিলে যাজ্ঞবল্ক্যের মতে উত্তম সাহস দণ্ড হয়। আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা ইংরাজী আইনানুসারে দণ্ডনীয়।

ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ

তাং নিঘ্নতাং কিং ন হতং তাং রক্ষতাং কিং ন রক্ষিতম্।

ইত্যাদি বচন হিন্দুশাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয় এবং আত্মঘাতীর মৃত্যুর পর নরকবাসের নানাপ্রকার কথা উক্ত আছে। কিন্তু আত্মহত্যা করিবার চেষ্টায় যাহারা বিফলমনোরথ হইয়াছে তাহাদিগকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় করিবার ব্যবস্থা কোনও স্মৃতিগ্রন্থে দেখি নাই। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য দণ্ডবিধিতে এ আইন লিপিবদ্ধ থাকিবার উদ্দেশ্য এই যে. দণ্ড পাইবার ভয়ে লোকে আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা করিবে না। কিন্তু যে বিষাদগ্রস্ত হইয়া পার্থিব ক্লেশের নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণরূপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু নষ্ট করিতে উদ্যত, সে যে সে কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইলে রাজদণ্ড পাইবে এই ভয়ে ঐরূপ কার্য্য করিবে না এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। বরং আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আদালতে লাঞ্ছিত হইতে হইবে এই আশঙ্কায় মানীলোক আত্মহত্যায় এমন উপায় অবলম্বন করিবে যাহাতে অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা না থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র পরকালের ভয় দেখাইয়া এবং নীতিশিক্ষা দিয়া মন্দ কার্য্য করে নাই।

মনুষ্যের প্রাণহানিকর অপরাধের বর্ণনার পর আমাদের আধুনিক দণ্ডবিধি গর্ভপাত সম্বন্ধীয় অপরাধের বর্ণনা করিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতিও গর্ভপাত অপরাধে গুরুদণ্ড প্রদান করিত।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা বলে,—

"গর্ভস্য পাতেন চোত্তমদণ্ড।"

অর্থাৎ যে অপরের গর্ভপাতিত করে তাহার উত্তম দণ্ড বিধেয়। যে স্ত্রীলোক নিজের গর্ভ নষ্ট করে তাহার গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত করিবার ব্যবস্থা মহামুনি কৃত স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ব্যবস্থাটা বড় নির্দ্দয়। তবে পাপটাও বড় গুরুতর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুরুপাপে গুরু দণ্ডের ভয় না থাকিলে দুষ্টবুদ্ধি প্রজাবৃন্দকে সৎপথে পরিচালন করা বড় কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

অপরকে সামান্য বা গুরুতররূপে আঘাত প্রভৃতি করার দণ্ডবিধানও অতি বিশদরূপে স্মৃতিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুমুনি বলেন—

"হস্তেনাবগোরয়িতা দশ কার্ষাপণান। পাদেন বিংশতিম।
কাষ্ঠেন প্রথম সাহসম পাষাণেন মধ্যমম্। শস্ত্রেণোত্তমম্।"

অর্থাৎ প্রহারার্থ হস্ত উদ্যত করিলে দশ কার্ষাপণ এবং চরণ উদ্যত করিলে বিংশতি কার্ষাপণ দণ্ড। কাষ্ঠ দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইলে প্রথম সাহস, প্রস্তর গ্রহণ করিলে মধ্যম সাহস এবং শস্ত্র উদ্যত করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। যাহাকে ইংরাজি আইনে 'গুরুতর আঘাত' বা grievous hurt বলে সে সম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতার বিধান এইরূপ—

"করপাদদন্তভঙ্গে কর্ণনাসাবিকর্ত্তনে মধ্যমম্।"

অর্থাৎ কর পাদ কিম্বা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে অথবা কর্ণ বা নাসিকা ছেদন করিয়া দিলে মধ্যম সাহস দণ্ড। অপিচ

"চেষ্টাভোজনবাগ্রোধে প্রহারদানেচ। নেত্র কন্ধরা বাহসকথ্যংস ভঙ্গে চোত্তমম।"

অর্থাৎ যাহাতে গমনাদি চেষ্টা ভোজন বা বাক্‌শক্তি রহিত হয় এরূপ ভাবে প্রহার করিলেও মধ্যম সাহস দণ্ড। নেত্র, কন্ধরা, বাহু, সক্থি এবং স্কন্ধ ভঙ্গে উত্তম সাহস দণ্ড। কিন্তু—

"উভয় নেত্রভেদিনং রাজা যাবজ্জীন বন্ধনান্নবিমুক্তেৎ। তাদৃশমেব বা কুর্য্যাৎ।"

অর্থাৎ উভয় নেত্রভেদীকে রাজা যাবজ্জীবন বন্ধন হইতে মোচন করিবেন না। অথবা উভয় নেত্র রহিত করিয়া দিবেন।

আধুনিক রাষ্ট্রীয় নিয়মানুসারে প্রহারকর্ত্তাকে দণ্ডভোগ করিতে হয় এবং আহতের ক্ষতি পূরণ করিতেও সে আইনানুসারে বাধ্য। প্রাচীন সংহিতা গ্রন্থেও আমরা এ সম্বন্ধে অনুরূপ বিধান দেখিতে পাই। মহামুনি বিষ্ণু বলেন—

"সর্ব্বে চ পুরুষপীড়াকরাস্তদুত্থানব্যয়ং দদ্যুঃ।"

অর্থাৎ পুরুষ পীড়াপ্রদ সকলেই আহতের ব্রণরোপণাদি ব্যয় দিবে।

অপরকে আঘাত করা অপরাধের কথা যাজ্ঞবল্ক্য মুনির সংহিতাতেও অত্যন্ত

বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিরূপ সাবধানতার সহিত এই শ্রেণীর অপরাধের বিচার করিতে হয় সে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"অসাক্ষিকহতে চিহ্নৈর্যুক্তিভিশ্চাগমেন চ
দ্রষ্টব্যো ব্যবহারস্তু কূটচিহ্নকৃতো ভয়াৎ।"

আঘাত চিহ্ন এবং যুক্তি ও জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সাক্ষীরহিত প্রহারের মোকদ্দমা সাবধানে বিচার করিবে। লোকে কৃত্রিম চিহ্ন করিয়া মারপিটের মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইতে পারে বিচারক মনে এই আশঙ্কা রাখিবেন। তাহার পর নানা প্রকার দণ্ড-পারুষ্য অপরাধের বিষয় তিনি বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। একজন অপরের গাত্রে ভস্ম, পঙ্ক কিম্বা ধূলি প্রদান করিলে অপরাধীর দশ পণ দণ্ড। অপবিত্র বস্তু, পাদস্পর্শ বা নিষ্ঠীবন জলস্পর্শ করাইলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড। অবশ্য এ নিয়ম সমবস্থ ব্যক্তির পক্ষে। উৎকৃষ্ট ব্যক্তি বা পরস্ত্রীর প্রতি ঐরূপ আচরণ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড এবং হীন ব্যক্তির প্রতি ঐরূপ করিলে অর্দ্ধ দণ্ড। পাদ, কেশ, বস্ত্র কিম্বা হস্তগ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে দশ পণ দণ্ড। এ বিষয়ে বিষ্ণুসংহিতার বিধান

"পাদ কেশাংশুককরলুণ্ঠনে দশ পণান্ দণ্ড্যঃ।"

বস্ত্র দ্বারা বন্ধন, গাঢ় মর্দ্দন এবং আকর্ষণ পূর্ব্বক পাদ প্রহার করিলে শত পণ দণ্ড হইবে। এবং বিষ্ণুসংহিতার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা বলিয়াছে—

"শোণিতেন বিনা দুঃখং কুর্ব্বন্ কাষ্ঠাদিভির্নরঃ।
দ্বাত্রিংশতং পণান্ দাপ্যো দ্বিগুণং দর্শনেঽসৃজঃ।"

কাষ্ঠাদি প্রহারে আহত ব্যক্তির রক্তপাত না হইলে ঐ প্রহর্ত্তা ব্যক্তির দ্বাত্রিংশ পণ এবং রক্তপাত হইলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। বিষ্ণুসংহিতায় বর্ণিত অপরাপর প্রকারের আঘাতের দণ্ডের বিধান করিয়া সংহিতাকার যাজ্ঞবল্ক্য মুনিও আহত ব্যক্তিকে ক্ষতি পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"দুঃখমুৎপাদয়েদ্ যস্তু স সমুত্থানজব্যয়ম্
দাপ্যো দণ্ডঞ্চ যো যস্মিন কলহে সমুদাহৃতঃ।"

যে ব্যক্তি মনুষ্যের দুঃখ উৎপাদিত করিবে সে তাহাদিগের ব্রণরোপণাদি ব্যয় দিবে এবং যাদৃশ কলহে যে দণ্ড উদাহৃত সেইরূপ দণ্ড দিবে।

ভ্রাতৃজায়াকে প্রহার করিলে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির বিধানানুসারে অপরাধীকে পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড স্বীকার করিতে হয়। এবং

"দুঃখোৎপাদি গৃহে দ্রব্যং ক্ষিপন্ প্রাণহরং তথা
ষোড়শাদ্যঃ পণান্ দাপ্যো দ্বিতীয়ো মধ্যমং দমম্।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরগৃহে দুঃখজনক (কণ্টকাদি) দ্রব্য নিক্ষেপ করে তাহার ষোড়শ পণ দণ্ড এবং যে পরকীয় গৃহে প্রাণহর দ্রব্য (বিষ, সর্পাদি) নিক্ষেপ করে তাহার মধ্যম সাহস দণ্ড।

কোনও স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার হানি হইতে পারে এরূপ ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিলে আধুনিক ইংরাজি দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এ পাপের শাস্তি অতিশয় গুরুতর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"দূষণে তু করচ্ছেদ উত্তমায়াং বধস্তথা।"

অকামা কন্যাকে নখক্ষতাদি দ্বারা দূষিত করিলে করচ্ছেদন দণ্ড হইবে এবং ঐ কন্যা উচ্চজাতীয়া হইলে বধদণ্ড হইবে।

মনুষ্যের প্রতি নানারূপ আঘাতাদি অপরাধের দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিরাকরণ করিবার জন্য নানারূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি পশুদিগের দেহরক্ষা করিবার ব্যবস্থা, তাহাদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা দমনের জন্য দণ্ডের বিধান, হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের বিশেষত্ব। পাশ্চাত্যে আধুনিক পশুক্লেশ নিবারিণী সভার অনুগ্রহে যে সামান্য মাত্রায় আইনাদি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, আর্য্যদিগের স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানের সহিত তাহার তুলনা হয় না। আমরা এস্থলে অতি সংক্ষেপে সে বিধির আলোচনা করিব।

"দুঃখে চ শোণিতোৎপাদে শাখাঙ্গচ্ছেদনে তথা
দণ্ডঃ ক্ষুদ্রপশূনাং স্যাদ্ দ্বিপণ প্রভৃতি ক্রমাৎ।"

অর্থাৎ ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর দুঃখোৎপাদনে বা তাড়নে, শোণিতপাতে, শৃঙ্গাদি ছেদন এবং করপদাদি অঙ্গচ্ছেদনে যথাক্রমে দুই পণ, চারি পণ, ছয় পণ এবং আট পণ দণ্ড। অপিচ

"লিঙ্গস্যচ্ছেদনে, মৃত্যৌ মধ্যমো মূল্যমেব চ
মহাপশূনামেতেষু স্থানেষু দ্বিগুণো দমঃ।"

অর্থাৎ উহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদন করিলে বা উহাদিগকে হত্যা করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে এবং পশুস্বামীকে পশুর মূল্য প্রদান করিতে হইবে। গবাদি মহাপশু সম্বন্ধে উক্তরূপ অপরাধ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। মহামুনি বিষ্ণু বলেন—

"আরণ্য পশুঘাতী পঞ্চাশতং কার্ষাপণান। পক্ষিঘাতী মৎস্যঘাতী চ
দশ কার্ষাপণান্। কীটোপঘাতী চ কার্ষাপণম্।"

অরণ্য পশুঘাতীর পঞ্চাশত কার্ষাপণ, পক্ষী ও মৎস্যঘাতীর দশ কার্ষাপণ এবং কীটোপঘাতীর এক কার্ষাপণ দণ্ড। কিন্তু

"গজাশ্বোষ্ট্রগোঘাতীম্বেককর পাদ কার্য্যঃ।"

অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্রকে যে হত্যা করে, তাহার এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিবে। তবে

"নখিনাং দংষ্ট্রিণাঞ্চৈব শৃঙ্গিণামাততায়িনাম
হস্ত্যশ্বানাং তথান্যেষাং বধে হন্তা ন দোষভাক।"

অর্থাৎ নখী দংষ্ট্রী শৃঙ্গী হস্তী অশ্ব বা অন্ত কোনও পশু যদি আততায়ী হয়, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া উহাদিগকে বধ করিলে কোনও দোষ হয় না।

ষষ্ঠদশবর্ষের ন্যূন বয়স্কা কন্যাকে অভিভাবকের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া গেলে পিনালকোড অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। এ বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের বিধান—

"অলঙ্কৃতাং হরন্ কন্যামুত্তমস্তন্যথাধমম্।
দণ্ডং দদ্যাৎ সবর্ণাসু প্রাতিলোম্যে বধঃ স্মৃতঃ।"

সাধারণতঃ কন্যাহরণ করিলে প্রথম সাহস দণ্ড, অলঙ্কৃতা কন্যা হরণ করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। অবশ্য এ ব্যবস্থা, সবর্ণা কন্যা হরণ সম্বন্ধে। কন্যা যদি উচ্চবর্ণা হয় তাহা হইলে বধদণ্ড হইবে। নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হরণ করিলে প্রথম সাহস দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

বলাৎকার এবং অনৈসর্গিক উপায়ে মৈথুনের দণ্ডের বিধান লিপিবদ্ধ করিয়া পিনালকোড দেহ সম্বন্ধীয় অপরাধের অধ্যায় শেষ করিয়াছেন, আমরা এ স্থলে ঐ সম্বন্ধে হিন্দু আইনের পরিচয় দিব।

"পুমান্ সংগ্রহণে গ্রাহ্যঃ কেশাকেশি পরস্ত্রিয়াঃ
সদ্যো বা কামজৈশ্চিহ্নৈঃ প্রতিপত্তৌ দ্বয়োস্তথা।"

পরস্ত্রীর কেশগ্রহণ প্রভৃতি ক্রীড়া বা পরস্পরের দেহে অভিনব কাম সম্ভোগের চিহ্ন কিম্বা ঐ উভয়ের কথা হইতে পুরুষকে পরস্ত্রী গমনে প্রবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে। তথা

"নীবীস্তন প্রাবরণ সক্থিকেশাভিমর্শনম্
অদেশকালসম্ভাষং সহৈকস্থানমেব চ।"

নীবীস্তনাবরণ বস্ত্র, জঘন এবং কেশাদি স্পর্শ, নির্জ্জনাদি প্রদেশে এবং নিশীথাদি কালে পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ এবং উহার সহিত একাসনে উপবেশন প্রভৃতি লক্ষণে সেই পুরুষকে পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত বলিয়া জানিবে। পুরুষ সবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইলে উত্তম সাহস দণ্ড, হীনবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইলে মধ্যম সাহস দণ্ড, উৎকৃষ্ট বর্ণা স্ত্রীতে গমন করিলে বধ দণ্ড।

কেশাদি গ্রহণ বা বক্ষের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিলে অথবা নিভৃত সাক্ষাতে কিম্বা স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে পরস্ত্রী গমনের পাপভোগ করিতে হয়, এ আইন ইংরাজি দণ্ডবিধিতে নাই। প্রকৃত সহবাস না করিলে ইংরাজি আইনে কাহাকেও দণ্ডনীয় হইতে হয় না। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের সতীত্বের ধারণা পুরাকাল হইতেই অত্যন্ত উচ্চ এবং স্ত্রীলোকের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে তাহারা চিরকাল যত্নবান। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার এই বিধান হইতেই একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

অনৈসর্গিক উপায়ে মৈথুন দ্বারা পাপাচরণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যও হিন্দু সমাজ বিশেষ যত্নবান ছিল।

"পশূন গচ্ছঞ্ছতং দাপ্যো হীনাং স্ত্রীং গাঞ্চ মধ্যমম।"

পশুগমন করিলে শত পণ দণ্ড, গোগমন করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড। অনৈসর্গিক উপায়ে নিজের স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলেও চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড।

ক্রমশঃ।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

প্রাচীন কলিকাতা।

আজ প্রায় ৭০ বৎসরের কথা, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য Peninsular Oriental Company প্রথম বাষ্পীয় পোতের ব্যবহার করে। Southampton হইতে কলিকাতা অবধি ভাড়া ভদ্রলোকের পক্ষে ছিল ১৪৩ পাউণ্ড এবং ভদ্রমহিলার পক্ষে ১৫৩ পাউণ্ড। সেই সময় ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য রিচার্ডসন্ নামক একজন ইংরাজ এদেশে ভ্রমণ করিতে আসেন। পরে তিনি একখানি ভ্রমণ-কাহিনী * লিখিয়া স্বজাতিকে উপহার দেন। আমরা সেই পুস্তক হইতে কলিকাতা সম্বন্ধে দুই একটা প্রাচীন কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

সাগর দ্বীপের নিকট পৌছিয়া রিচার্ডসন্ সাহেব প্রথম "দুর্ব্বল, খর্ব্বাকার, তাম্রবর্ণ বাঙ্গালীর নমুনা" দেখিতে পান। যে সকল বাঙ্গালী স্বচ্ছন্দে কলিকাতায় বসিয়া থাকে তাহারা অপেক্ষাকৃত সবল। বিলাতের লোকের অর্থ থাকিলে

* The Anglo Indian Passage, Homeward and Outward. ১৮৪৪ সালে Madden and Malcolm কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্থূলকায় হয় না। এখানে এমন কোনও ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না 'যাহার মুদ্রার থলি পূর্ণ অথচ দেহ স্থূলকায় নহে'। কিন্তু বাঙ্গালীর এই প্রেমযুক্ত দেহের ভিতর মানসিক তীক্ষ্ণতা ও আশ্চর্য্যজনক বুদ্ধিমত্তা আছে, লেখক তাহা আপনার পাঠকবর্গকে বিশেষরূপে বুঝাইয়াছেন। তদানীন্তন কালের গবর্ণর জেনেরাল লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবাসীদিগের শিক্ষার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিতেছিলেন এবং তাঁহার শ্রম সফল হইতেছিল।

রিচার্ডসন্ সাহেব কলিকাতার হোটেলগুলির খুব সুখ্যাতি করিয়াছেন। ইউরোপীয়দিগের কলিকাতায় বাস করিবার জন্য তখন তিনটি প্রসিদ্ধ হোটেল ছিল। Spences, Benton এবং The 'Auckland' নামক David Wilson এর হোটেল। এ সকল স্থলে অনেক সম্ভ্রান্ত ইয়ুরোপীয় ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেন।

তখন কলিকাতায় খুব পাল্কির প্রচলন ছিল। রিচার্ডসন্ সাহেব পালকী ও বেয়ারাদের যে নির্দ্দিষ্ট ভাড়ার তালিকা দিয়াছেন আমরা তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পাল্কি।

সারা দিনের (১৪ ঘণ্টায়ভাড়া)— ।•

অর্দ্ধ দিন (এক ঘণ্টার অধিক এবং ৫ ঘণ্টার ন্যুন কাল)— ৶•

বাহক।

সারা দিনের (১৪ ঘণ্টায়) অবশ্য যথাযোগ্য বিশ্রাম ও আহারাদির সময় ব্যতীত— ।•

অর্দ্ধ দিন (এক ঘণ্টার অধিক এবং ৫ ঘণ্টার ন্যুন কাল)— ৶•

এক ঘণ্টার ন্যুন প্রতি বাহক— ⁄•

সে সময় কলিকাতায় ইউরোপীয়ানদিগের আড়গোড়া হইতে ভাল ঘোড়া ও বগী দিন পাঁচ টাকা হইতে আট টাকা ভাড়ায় পাওয়া যাইত। জুড়ি ঘোড়ার গাড়ি দিন ১২৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা ভাড়া ছিল। চিৎপুর রোডে ভারতবাসীদের এক ঘোড়ার পাল্কি গাড়ি ছিল চারি টাকা হইতে পাঁচ টাকার মধ্যে ভাড়া পাওয়া যাইত। তবে সে গাড়িগুলা জীর্ণকায় এবং ঘোড়াগুলা কেবল সরু গলি দিয়া চলিতে চেষ্টা করিত এবং মধ্যে মধ্যে পশ্চাদের পদের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিত।

কোন বিদেশী কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্রই পাল্কির বেহারারা আসিয়া তাহাদিগকে টানাটানি করিত। লেখক বলেন তাড়াতাড়ি প্রথম পাল্কিতে উঠিয়া পড়াই মঙ্গল এবং দেশের ভাষা না জানিলে বলা উচিত—"পেকল সাহেব

কা পৌঁচ ঘর।" জাহাজে কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র কতকগুলা 'সরকার' বা 'দেশী কেরাণী' আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা ইংরাজি বলিতে পারে এবং প্রথম প্রথম বিদেশী ভ্রমণকারীর বড় উপকার করে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহারা বড় দুষ্ট (rogues) এবং অধিক টাকার দ্রব্যাদি খরিদ করিবার সময় ইহাদের বিশ্বাস করা উচিত নহে।

পুরাতন ও নূতন চীনাবাজারে সস্তায় পোষাক ও গৃহ-সরঞ্জাম বস্তু পাওয়া যাইত। "দোকানদারেরা অধিকাংশই হিন্দু এবং ইংরাজি বলিতে পারে। সাধারণতঃ তাহারা প্রথমে যে দর বলে শেষে তাহার অর্দ্ধেকে সম্মত হয়।" দেশী দোকানের গৃহ-সরঞ্জাম বস্তু চটকদার ও সস্তা হইলেও অল্পদিন স্থায়ী হইত। তাই লেখক ইংরাজি দোকানের টেবিল চেয়ার খরিদ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

কলিকাতায় সারা বর্ষ ধরিয়া কদলী, ইক্ষু, নারিকেল, পেয়ারা, আনারস, পেঁপে, আতা, কাঁঠাল, দেশী বাদাম, তেঁতুল, আমড়া, বরবটী প্রভৃতি পাওয়া যাইত। শীতকালে আতা ও কাঁঠাল কিরূপে পাওয়া যাইত বলা কঠিন। লেখক বোধ হয় ভ্রম করিয়াছেন। বৈশাখ মাসে তপ্সে (mangoe fish) মাছ খাইয়া সাহেব বড় প্রীত হইয়াছিলেন। পৃথিবীতে এরূপ সুস্বাদু মৎস্য আর নাই তিনি এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। সেকালে এপ্রেল মাসে দুই টাকা হইতে চারি টাকায় এক কুড়ি তপসে মাছ পাওয়া যাইত। মে মাসের শেষে টাকায় কুড়িটি এবং জুনে টাকায় দুই তিন কুড়িও পাওয়া যাইত। গ্রীষ্ম-কালে মাগুর মাছও পাওয়া যাইত।

জুলাই মাসের বর্ণনায় সাহেব বলেন "এই সময়, বস্তুতঃ সারা বর্ষ ধরিয়াই, রুই, কাতলা, কই, শোল, মাগুর, চিংড়ি, ট্যাংরা এবং চুণা মাছ পাওয়া যায়। এই সময় ইলিশ মাছ দেখা দেয়। এই মৎস্য বেশ সুস্বাদু।" ইলিশ মাছ ও তেঁতুলের টক সাহেবের হেরিংমৎস্যের মত ভাল লাগিয়াছিল।

কলিকাতায় বাড়ী মাসিক ৬০৲ টাকা হইতে ৬০০৲ টাকা ভাড়ায় পাওয়া যাইত। তিনি দেশী ভৃত্যাদিগকে সুখ্যাতি করেন নাই। তিনি বলেন, ভারত-বর্ষে জাতিভেদের জন্য ইংরাজগণ ভাল শ্রেণীর ভৃত্য পাইত না। যাহারা ইংরাজদিগের নিকট কার্য্য করিত তাহারা সমাজ পরিত্যক্ত অতি নীচ শ্রেণীর লোক। রিচার্ডসন সাহেব ভৃত্যদিগের মাসিক বেতনের একটা তালিকা দিয়া-ছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

খিদমদগার—	৬৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা।
মশালচি	৪৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকা।
বাবুর্চি বা পাচক	৬৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা।
গৃহ দরজি	৬৲ টাকা হইতে ১৫৲ বা ২০৲ টাকা।
ধোবী	৬৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা।
সরদার বেহারা	৬৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা।
সহিস	৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা।
ঘেসেড়া	৩৲ টাকা হইতে ৩॥০।
ভিস্তি	৫৲ টাকা।
মেথর	৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

পঞ্চ প্রদীপ।—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, সুরম্য বাঁধাই, মূল্য দশ আনা মাত্র। রুসীয় লেখক ঋষিকল্প কাউন্ট টলষ্টয়ের পাঁচটি মনোরম গল্প লইয়া লেখক সেগুলিকে নিজের ভাষায় বাঙ্গালা গল্পের ছাঁচে ফেলিয়াছেন। একে টলষ্টয়ের গল্প তাহাতে আবার পাত্র পাত্রী দেশ কাল সকল দেশী সুতরাং গল্পগুলি যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। সুবোধ বাবুর লিখনভঙ্গীও উচ্চদরের, তাঁহার গল্প বলিবার ক্ষমতাও যথেষ্ট। যাঁহারা কাউণ্টের ইংরাজিতে অনুদিত গল্প পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাও দেখিবেন যে দেশী আকারে বাঙ্গালায় লিখিত হইয়া গল্পগুলি বাঙ্গালী পাঠকের কিরূপ চিত্তরঞ্জক হইয়াছে। প্রথম গল্পটি "শেষ বিচার"। ইহা "God sees the Truth, but waits" নামক গল্প লইয়া গঠিত। মূল গল্পের নায়ক Ivan Dmitritch Aksyonof; বলা বাহুল্য নায়কের নামোচ্চারণ করিতে গেলে চোয়াল ভাঙ্গিয়া যায়। সুবোধ বাবু সে স্থলে নায়কের নামকরণ করিয়াছেন সুন্দরলাল। ঘটনাও এদেশী, সুতরাং বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে গল্পটি মনোরম হইয়াছে। 'বিধাতার বিধান' গল্পটি "What men live by" গল্পের ভাবগ্রহণে লিখিত। 'Where Love is God is" নামক গল্পটি 'প্রত্যক্ষ দেবতা' নামে প্রকৃত উন্নতি করিয়াছে। বৈষ্ণব পাঠক এ গল্প এদেশী পুরাণের গল্প বলিয়া মনে করিতে পারিবে। 'Two old men' গল্পের বাঙ্গালা "তীর্থযাত্রী" পাঠ করিতে চক্ষে জল আসে। জেরুজেলাম অপেক্ষা শ্রীক্ষেত্র বাঙ্গালীর প্রিয়। 'How much land does man need' গল্পের নামকরণ হইয়াছে "আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি" এ গল্পটিও সুন্দর হইয়াছে। আমরা এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। যাহাতে ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হইতে পারে সুবোধবাবুর সে বিষয়ে একটু "যোগাড়" করা আবশ্যক। টলষ্টয়ের অপর গল্পগুলিও এইরূপ বাঙ্গালায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। আশা করি, সুবোধবাবু এ কথা স্মরণ রাখিয়া দ্বিতীয় ভাগ বাহির করিতে পিছপাও হইবেন না।

হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মণ।

উন্নতির উচ্চসোপানে দাঁড়াইয়া আমরা যখন নীচের দিকে দৃষ্টি করিতে ভুলিয়া যাই, অত্যধিক অহঙ্কার তখন আমাদিগকে নিরুদ্যম করিতে থাকে। দাম্ভিকতার উত্তেজনায় সৌভাগ্য-গর্ব্ব যখন আপনাকে অতুলনীয় মনে করাইয়া দেয়, আত্মসম্মান যখন আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধ করাইতে কুণ্ঠিত হয় না এবং অন্যের প্রতি অবজ্ঞা যখন অন্য সহায়তার প্রতীক্ষা করে না, অভ্যুদয়ের মস্তক তখন হইতে মুড়াইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণের প্রতি কটাক্ষ কর, ইহাই দেখিতে পাইবে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিয়ন্তা সমাজশাসক ব্রাহ্মণেরা যখন হিন্দুসমাজের উপর সার্ব্বভৌম আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা তখন হইতে আত্মহৃদয়ে দর্পবীজ রোপণ করিতেছিল। পুরুষপরম্পরায় অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও শাখা-প্রশাখায় সুবিস্তৃত সে বিশাল বিটপী এক্ষণে মুকুলিত হইয়া, বিষবৃক্ষের ন্যায় তিক্ত ফল প্রসব করিয়াছে। অতি দর্পই ব্রাহ্মণকে অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞা করিতে শিখাইয়াছে, সেই দর্পসম্ভূত মহীরুহমূলে দাঁড়াইয়া, ব্রাহ্মণ তাহার আত্মসম্মানে যে আঘাত করিয়াছে, সে আঘাত দিনে দিনে তাহাকেই দুর্ব্বল করিতেছে। ব্রাহ্মণের অলৌকিক শক্তি একদিন যে কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ করিতে পারিত, তাই পুরাতন ঋষিরা ব্যক্তি নির্ব্বাচিত করিয়া, যজ্ঞীয় সোমরসে পূত করিয়া লইতেন। ঋগ্বেদে যতগুলি ঋষি আছেন, বিশ্বামিত্র ও মধুচ্ছন্দা সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ। মহাত্মা কুশিকের পৌত্র, গাধের বিশ্বামিত্র একজন গণ্যমান্য নরপতি ছিলেন এবং মধুচ্ছন্দা তাঁহারই পুত্র। উপচীয়মান ব্রহ্মশক্তি একদিন ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণত্ব দিতে সঙ্কুচিত হয় নাই, আর অপচীয়মান ব্রহ্মশক্তি এখন তাহারই বংশধরকে উত্তরাধিকার-প্রাপ্য ব্রহ্মণ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অধস্তন ব্রাহ্মণেরা যখন ব্রাহ্মণধর্ম্মের কঠোরতা দেখিয়া পিছাইয়া পড়িলেন, অর্থচিন্তা যখন পার্থিব সুখে আকৃষ্ট করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান হইতে তাঁহাদিগকে বিযুক্ত করিল, তখনও তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস থাকিল, আমরা যা' করি না কেন, আমরা

ব্রাহ্মণ, আমাদের মর্য্যাদা চিরদিনই ভুবনমোহিনী থাকিবে, আমাদের পদরজঃ মানবজাতিকে পবিত্র করিবে। কিন্তু যৌবনশ্রী যে বার্দ্ধক্যের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে পারে, কালে যে অতুল্য রূপরাশিকেও কলঙ্কিত করিতে পারে, ব্যাধি যে বাহুবলে বিজিত হয় না, সৌভাগ্যের দিনে সে কথা প্রায় কাহারও মনে পড়ে না। ব্রাহ্মণও তাহা মনে করিলেন না; পূর্ব্বতন বিশুদ্ধ বুদ্ধি ক্রমাগত পঙ্কিল পথে পর্য্যটন করিয়া, ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত এমন বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে এমনই কলুষিত করিয়া তুলিল।

হিন্দু নামে যে সনাতনধর্ম্ম সত্যযুগ হইতে প্রতিষ্ঠা পাইয়া অদ্যাপি কঙ্কাল-মাত্রে অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একমাত্র সত্যবাদিতায় সিদ্ধিলাভ করিতে পূর্ব্বতন ঋষিরা মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন। সংযমেই সিদ্ধি! বহুকালব্যাপী কঠোর বাক্‌সংযমে যখন তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতেন, তখন তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ বা অভিসম্পাত কুত্রাপি নিষ্ফল হইত না। সত্যনিষ্ঠা ব্রাহ্মণকে প্রতিষ্ঠাভাজন করিয়াছিল; সত্য হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া, সনাতনধর্ম্ম দুরধিগম্য ব্রহ্মকেও প্রত্যক্ষ করিত। ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন ব্রাহ্মণেরাই করিয়াছিলেন, সে অনুশীলনের ফলও ব্যর্থ হয় নাই। ব্রাহ্মণের বাক্য অবহেলা করিবার নয়; শাস্ত্রবাক্যে আমরা সম্পূর্ণ আস্থাবান্। সে কেবল যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা তাঁহারা পরিহাসেও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই; স্বপ্নেও সত্যকে কলুষিত করিতেন না। সেজন্য সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহ সমর্থ হয় নাই। আপৎকালে বৃদ্ধ-বাক্যের মত, সামাজিক বিকার-বিশৃঙ্খলায় সূচিকাভরণের মত, বৈষয়িক আধির তাড়নায় মকরধ্বজের মত, জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাক্য সর্ব্বথা গ্রহণীয়। সমাজের দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিতে ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তি যে উপদেশ-অমৃত বর্ষণ করে, তাহাতে প্রচুর জৈবন্য-বীজ নিহিত থাকে। সে বাক্য আপাতমধুর না হইলেও কটু-কষায় ঔষধের মত সমাদরে গ্রহণ করিতে হইবে।

চিরপুরাতন সত্যকে আশ্রয় করিয়া, এহেন বিস্তৃত সনাতনধর্ম্ম জাগিয়া রহিয়াছে। বিচার করিলে বুঝা যায়, মানব শূদ্রবৃত্তি লইয়াই জন্মপরিগ্রহ করে। শিশুর পরমুখাপেক্ষিতা শূদ্রতারই পরিচায়ক। বয়োবৃদ্ধির সহিত শক্তির প্রাচুর্য্য ও স্বভাবের শিক্ষা যখন তাহার আহরণ-বৃত্তিকে বিকশিত করে, তখন সে বৈশ্য হয়। আহরণ-বৃত্তি যৌবনে যখন রক্ষণবৃত্তিকে ব্যাপক করিতে থাকে, তখন সে ক্ষত্রিয়বৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, ইহা বাহুবলসাপেক্ষ।

পরিপুষ্ট বাহুবল যখন বাধা মানে না, বিবেকহীন মস্তিষ্কের চালনায় সে যখন ভাল-মন্দ বিচার করিতে পারে না, অন্যের প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে যখন তাহার সঙ্কোচ সরিয়া যায় এবং দাম্ভিকতা যখন দস্যুতার রূপ ধরিয়া নিতান্ত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে, তখন জ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন তাহাকে সংযত করা যায় না। জ্ঞানানুশীলন এমন এক অলৌকিক শক্তিকে জাগরিত করে, যাহা অতি বড় অদম্যকেও সংযত করিতে পারে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সত্তা লইয়া মনুষ্যত্ব। অনুশীলন করিলে মানব যে কোন সত্তাকে উদ্বোধিত করিতে পারে। প্রকৃতিগত যে সত্তা তাহার আভ্যন্তরীণ জাতীয়তার সত্যটুকু বিকাশ করে, সেই জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" ভগবানের এই বাক্য চির সত্য এবং সেই সত্যকে বিকৃত না করিয়া, অঙ্কুরিত ক্ষুদ্রকে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত করিতে, জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণই সর্ব্বজাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কঠোরসংযমসিদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে সর্ব্ববিধ অশান্তি দূর করিয়া সর্ব্বজাতির হিতসাধন করেন, তাই ব্রাহ্মণ সকলের পূজনীয়। কুটীরে বাস করিয়াও সমৃদ্ধিশালী, ছিন্নবস্ত্রাবৃত থাকিয়াও লক্ষশাটপটাবৃত এবং পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়াও সুখসুপ্ত। সম্রাটও তাঁহার চিত্তবৃত্তির অনুশীলনকরিতে একান্ত আগ্রহ করিয়া থাকেন। শত শত নৃপতির কর্ম্মযোগে প্রজাপালন, জ্ঞানযোগে চিত্ত-শুদ্ধি, অবশেষে নিবৃত্তি-নিস্পৃহায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্যক্ত করিয়া, অতীতের ইতিহাস ব্রাহ্মণগৌরবেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করাই ব্রাহ্মণের নিজস্ব। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তাঁহারা সেই সত্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যুগযুগান্তরব্যাপী নির্ব্বাক্ চিন্তায়, যে জাগতিক সত্য লোকলোচনে প্রতিভাত হইয়াছে, সে চিন্তা ব্রাহ্মণেরই মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া উদ্গত হইয়াছিল। কতকাল ধরিয়া আপনার সুখদুঃখে উদাসীন থাকিয়া, ব্রাহ্মণ আপনার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সে উৎসর্গ সকলের হিতসাধন করিয়াছে, সুতরাং সকলের নিকট শ্রদ্ধা-ভক্তি পাইতে ব্রাহ্মণের পূর্ণ অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ ঘাড় ধরিয়া কাহারও মাথা নুওাইয়া দেন নাই, আমরা স্বেচ্ছায় নতিস্বীকার করিয়াছি। এখনও আধিব্যাধি-দুর্ব্বল-হৃদয় যখন জীবনের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিতে অবসর পায় না, তখন সেই ব্রহ্মবাক্যই মনে পড়িয়া থাকে।

জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় যে সকল মহাত্মা জড়জগতের ভিতর হইতে

মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর সুখসাধ্যতা সম্পন্ন করেন, তাঁহারা আদর্শ পুরুষ। আমরা তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান দেখাইতে একান্ত আকুল হই এবং তাঁহার বুদ্ধিমত্তার, তাঁহার চিন্তাশীলতার দিকে নির্ব্বাক্ ভাবে চাহিয়া থাকি। সেইরূপ যাঁহারা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূলতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া কেমন করিয়া সংস্কার মার্জ্জিত করিতে হয়, মার্জ্জিত-সংস্কার কেমন করিয়া জন্মপরম্পরায় উৎকর্ষপ্রাপ্তির উপায় করিতে পারে, ইহজীবনের বিশুদ্ধসংস্কার কেমন করিয়াই বা বিশুদ্ধ সংস্কারপিণ্ডে পরিণত হয়, এবং সংস্কারের অত্যন্তাভাব কেমন করিয়াই বা অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে, ইহা যিনি বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে অনন্যসাধারণ উন্নতপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে কাহার না বাসনা হয়? ব্রাহ্মণ ইহা করিতে পারিতেন; জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আদর্শ তাঁহারাই প্রথমে আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। আমরাও তাঁহাকে অপ্রত্যক্ষ অনির্দ্দিষ্ট দেবতা অপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবেশন করাইয়া নির্দ্দিষ্ট প্রত্যক্ষ দেবতায় পরিণত করিয়াছিলাম। হায় ব্রাহ্মণ! রাজাধিরাজের প্রণম্য তোমার সে রত্নসিংহাসন কে কাড়িয়া লইল?

ব্রাহ্মণ যদি বরেণ্য না হইতেন, তবে আমরা ব্রাহ্মণ লইয়া আন্দোলন করিতাম না। চিন্তাশীলমাত্রেই বুঝিতে পারেন, জাতীয়তাকে জানিতে হইলে ব্রাহ্মণের দিকেই দৃষ্টি পড়ে। ব্রাহ্মণই হিন্দুর উদাহরণ, অথবা ব্রাহ্মণত্বই হিন্দুত্ব। সেই ব্রাহ্মণ যদি উন্নত না হয়, তবে কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে, সুবর্ণ বণিক বৈশ্য হইলে, কিম্বা কৈবর্ত্ত মাহিষ্য হইলে, জাতীয়তার গৌরব বাড়িবে না। জাতীয় গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, গায়ের জোরে বড় হইলে চলিবে না। হিন্দু যাহা লইয়া অভিমান করে, অতীত সৌভাগ্যের স্মৃতি, যাহা আমাদিগকে আনন্দে, বিষাদে, দর্পে আকুল করে, তাহা ব্রাহ্মণকে লইয়া। ব্রাহ্মণকে বাদ দিলে হিন্দুর দেখাইবার মত কি থাকিল! জড়দেহে মস্তকের আর সমাজ-শরীরে ব্রাহ্মণের উচ্ছেদ করিলে, উভয়ের আদর্শই মুছিয়া যায়।

ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মণ্য হইতে স্খলিত না হইতেন, তাঁহাদের লোলুপদৃষ্টি যদি সুবর্ণ হইতে সরিয়া আসিত, প্রতিগ্রহ যদি অলোভ হইতে আকর্ষণ না করিত, তবে বুঝি ভারতের জাতীয় ইতিহাস অন্যত্র পরিচালিত হইত। ব্রাহ্মণের দুর্দ্দম আগ্রহ পরশুরাম হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ক্ষত্রিয়তেজে যে ফুৎকার দিয়াছিল, সে যখন প্রবল হইয়া কুরুক্ষেত্রে দাবাগ্নি জ্বালাইয়া ভীষণ অনর্থপাত ঘটাইল, তখনও সেই চিরস্মরণীয় সংহার-লীলায় তাহার পূর্ণাহুতি হইল না,—এখনও

সমগ্র জাতিকে দগ্ধ করিতেছে। যে অগ্নির তীব্রতাপে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইল, সে অগ্নিসমুদ্রে ভারতের ধন হইতে জাতীয় জীবন পর্য্যন্ত পুড়িয়া, ছাই হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি নির্ব্বাপিত হয় নাই, ধিকি ধিকি জ্বলিয়া প্রতিগৃহ ভস্মসাৎ করিতেছে।

দূর পরিণামদর্শী শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট স্থূল কর্ম্মসমষ্টি এক দিকে যেমন অত্যন্ত বিলুপ্ত অপ্রত্যক্ষ স্বর্গকামনায় পশুহত্যাদি নিকৃষ্টবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতেছিল, আর একদিকে প্রতিগ্রহ তেমনই দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ধনাকাঙ্ক্ষায় ছুটিতেছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য যেমন সরিয়া যাইতেছিল, সর্ব্বজাতির কর্ত্তব্যনিষ্ঠাও তেমনই পিছাইয়া পড়িতেছিল। তাই তিনি অর্জ্জুনকে কেন্দ্রে রাখিয়া, তাঁহার উদারনীতি অবলম্বন করিয়া, নিজ নিজ জাতিগত ধর্ম্মাশ্রয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছিলেন— "বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মই কর্ম্ম নহে; মানুষের যাহা করণীয় তাহাই কর্ম্ম। সে কর্ম্মে মানবমাত্রেরই অধিকার, ইহাতে মন্ত্র নাই, হোতা নাই, আচার্য্য নাই, ঋত্বিক্ নাই, আছে শুধু চিত্তশুদ্ধি। যাহা কর্ত্তব্য বুঝিবে, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিবে। ইহাতে আত্মসুখ খুঁজিও না! আত্মদুঃখের হেতু হইলেও উদ্বিগ্ন হইও না! কামনা করিয়া কল্পনার সুখে ডুবিও না! পরিণাম চিন্তা করিয়াও ব্যাকুল হইও না! আত্মীয়-স্বজনের কথা কি, যদি পুত্রবিনাশ কর্ত্তব্য হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্তিগত ধর্ম্ম নহে, সমাজগত বা দেশগতও নহে, উহা মানবধর্ম্ম। মানবধর্ম্ম মানুষেরই প্রতিপালনীয়। কোন দেশের কোন সম্প্রদায়ের সহিত ইহার বিরোধ নাই। এই সর্ব্বব্যাপী বিরাট মানবধর্ম্মই সার সনাতন ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ-নির্দ্দিষ্ট সেই সনাতন ধর্ম্ম যদি ধারাবাহিক চলিয়া যাইত, তবে ভারতের দুঃখবিভাবরী তিমিরাবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিত, শীতাংশুর শুভ্রদেহে জীবনসঞ্চারের সূচনা করিত, নবোদ্ভাসিত সূর্য্যকিরণ একদিন পূর্ব্বগগনে সুপ্রভাতের সঙ্কেত করিত। তাহা হইবার নহে, বিধিলিপি ভারতের ভাবী অদৃষ্টকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাই কত কাল ধরিয়া সে উদারনীতির আলোচনা করিয়াও বুদ্ধ যখন নূতন উদ্যমে আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মেরই সংস্কার করিলেন, তখন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ" শ্রীকৃষ্ণের সে বিশেষত্বটুকু ভুলিয়া জাতিধর্ম্মের উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

জাতিধর্ম্ম না থাকিলে সমাজবন্ধন শিথিল হইবে, সনাতন ধর্ম্মের গ্রন্থি

থাকিবে না, বহুবিধ স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়া মানবসমাজকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়া তুলিবে। অপিচ শ্রেণীবিভাগ না থাকিলে, কর্ম্মযোগেরও সারবত্তা থাকিবে না, বুদ্ধ তাহা ভাবেন নাই। জাতির উচ্ছেদ সাধন করিয়া, তিনি যেমন অন্যান্য আপতিত অন্তরায় দূর করিলেন, জাতিভেদপ্রথা না থাকায়, নিরঙ্কুশ কর্ম্ম একদিকে যেমন শিল্পবিজ্ঞান-সাহিত্যের উন্নতি করিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি হিন্দুর জাতিগত গৌরব ক্ষীণ হইয়া, সনাতন ধর্ম্মকে নিতান্ত নিঃসহায় করিয়া তুলিল। নিরাশ্রয় ধর্ম্ম তখন রূপান্তরে আংশিক প্রতিফলিত হইয়া, কোন কোন ব্যক্তিকে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল, অবশিষ্ট অধিক-সংখ্যক ব্যক্তি ধর্ম্মহীন হইয়া, কেবল কর্ম্মের উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিল।

সমাজের এমন অবমাননার দিনেও যতদিন বুদ্ধের মূলমন্ত্র জীবিত ছিল, তত-দিন জাতি না থাকিলেও নীতি ছিল, বৈদিক কর্ম্ম না থাকিলেও ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু অশোকের সাম্রাজ্যচিন্তা যে দিন হিংসা-রাক্ষসীর সন্নিধে আত্মসমর্পণ করিল, সে দিন নীতি-ধর্ম্ম আর থাকিল না, ধর্ম্মের যে একটা বন্ধন ছিল, তাহাও ছিন্ন হইল। "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মহামন্ত্রে যেদিন আঘাত লাগিল, সে দিনের সে ক্ষতিপূরণ করিতে এ পর্য্যন্ত যে সব ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছ, হে হিন্দু! তোমারই তা' সম্ভবীয়! তুমি বলিয়াই সহিয়াছ! তুমি বলিয়াই এখনও বাঁচিয়া আছ!

কতকাল গিয়াছে! কতকাল ধরিয়া হিংসা আমোদর পূর্ণ করিয়াছে! সে একদিন অতীতে মিশিয়াছে, যে দিন হিংসা ছিল না শান্তি ছিল; ভয় ছিল না, প্রণয় ছিল; জাতি ছিল না, রীতি ছিল। এখন শৃঙ্খলা নাই, সমাজ নাই, সাম্য নাই, মৈত্রী নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্মেরও ভিত্তি নাই। এখন আবার সেই বৈদিক কর্ম্মের প্রয়োজন! এতকাল পরে সাবেক ধর্ম্ম পাশ ফিরিয়া চক্ষু মেলিয়া ইঙ্গিত করিলেন, সমাজবন্ধন ব্যতীত মনুষ্যত্ব থাকে না, ধর্ম্মহীন কর্ম্মের কোন মূল্য নাই। তখন পরিবর্ত্তনের নেতৃত্ব লইয়া, ভূমিষ্ঠ হইলেন শঙ্করাচার্য্য। বহু আয়াসে, বহু পরিশ্রমে, বৈদিক কর্ম্মে উৎসাহিত করিয়া শঙ্করাচার্য্য অসাধ্য সাধন করিলেন। লোকে বুঝিল, এ জীবনে বস্তুতঃ সমাপ্তি নাই, পরে একটা কিছু আছে। ইহজীবনের দুঃখ-নিবৃত্তির আর সে অজ্ঞাত সুখসংপ্রাপ্তির একমাত্র লক্ষ্য কর্ম্ম, যাহা ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকে। রাজসী শ্রদ্ধাক্রমে আবার যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিল, অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল, কিন্তু তখনও তাহা অন্তঃ-

সারশূন্য কাচপাত্রের মত নিতান্ত ভঙ্গপ্রবণ রহিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ যাহা একাকী বুঝিয়াছিলেন বুদ্ধ ও শঙ্কর তাহার দুই দিক ধরিয়া পরিচালন করিলেন, কেহই তাহা সম্পূর্ণ বুঝিলেন না। বৌদ্ধধর্ম্মে যাহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল, শিক্ষাদীক্ষার অভাবে বহুকালের অনভ্যস্ত প্রকৃতি সে ধর্ম্মের দিকে হেলিয়া পড়িল না। ধর্ম্ম-কর্ম্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে, শঙ্করাচার্য্যের উদ্যমও ব্যর্থ হইল। স্বেচ্ছাচার উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

পরবর্ত্তী কালে আরও একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, যিনি ব্রাহ্মণকে সুগঠিত করিতে, বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও কৌলীন্য-রীতিকে বংশগত করিয়া, পরিণাম নষ্ট করিলেন। বংশপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত গৌরব যে ব্যক্তিগত অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহাতে সংশয় নাই। ব্যক্তিগত গৌরব ঈর্ষাপ্রণোদিত করাশায়, আপেক্ষিক উৎকর্ষপ্রাপ্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সমাজকে উন্নত করিতে পারে। আর বংশগৌরব ক্রমশঃ নিকৃষ্টতম হইয়া, নরকঙ্কালে সৌন্দর্য্য-প্রতিষ্ঠার মত অতীতকেই স্মরণ করাইয়া দেয়; নিজের দিকে দৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইতে থাকে। আমাদের সমাজ এইরূপেই আপনাকে হারাইয়াছে; এখন আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কৌলীন্যের যখন পূর্ণ প্রভুত্ব, তখন একজন কুলাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণের মেল বন্ধন করিলেন। মেলবন্ধন শৃঙ্খলিত হওয়ায় স্বঘরে পাত্র পাওয়া গেল না, বহু বিবাহ বাড়িয়া গেল। ইহাতে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিলেও ব্রাহ্মণ বিস্তৃত হইল, কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আর উৎপন্ন হইল না। কর্ম্মকাণ্ডে আস্থাশূন্য অবিশ্বাসী যাজক, তদ্বিধ যজমানের যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, তাহাতে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাও কমিয়া গেল। যে কোন একটা আধির তাড়নায় বা ব্যাধির যন্ত্রণায়, কর্ত্তব্যকর্ম্মে উৎসাহশূন্য হইল। সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সরিয়া গেল। এখন আর ব্রহ্মবৃত্তি আশ্রয় করিয়া, বহু ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহ হয় না, অগত্যা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল।

অধঃপতন যখন আরম্ভ হয়, অন্তর্বিপ্লবও তখন বাড়িয়া যায়। নিদারুণ অন্তর্বিপ্লবে যখন অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়ও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইল, তখন শক্তির অভাবে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি আর ধনের অভাবে বৈশ্যবৃত্তিও লুপ্ত হইল; আলস্য আসিয়া, হৃদয়ে আসন পাতিল। উচ্চসিংহাসন হইতে পতিত হইয়া, ব্রাহ্মণ এখন শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, দাসত্বই এখন ব্রাহ্মণের উপজীবিকা। ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, আচারে আস্থা নাই; কুসংস্কার বলিয়া পুরাতন প্রথাকে ঘরের বাহির করিয়াছি।

কখন মুসলমান, কখন খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম বা বৈষ্ণব, বা কর্ত্তাভজার দলে মিশিয়া সবরকম হইতে চেষ্টা করি। বস্তুতঃ কোন বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস না থাকায়, ক্রমাগত নিরাশ্রয়ে দিন কাটাইয়া, এখন এমন একস্থানে আসিয়াছি, যেখানে আমাদের নিজের জিনিস আর দেখা যায় না, পরের জিনিসেও প্রাণ ভরে না। এখন কেবল ভাবিতে পারি, "বস্তুতঃ আমরা এমন ছিলাম না, অনেক বড় ছিলাম। কিন্তু কিসে বড় ছিলাম, কোন্ গুণে পূজ্য ছিলাম, তাহা ভাবিতে ভুলিয়া যাই। আমাদের অস্তিত্ব ছিল ব্রহ্মবিশ্বাসে, সাধনা ছিল ব্রহ্ম-নিরূপণে। এখন কোথা গেল সে বিশ্বাস, আর কোথায় আছে সেই সাধনা! যে ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদের মহত্ব, সে জ্ঞান যে মাধ্যাকর্ষণে দাঁড়াইয়াছিল, সে ব্রাহ্মণ আর নাই। তাই অতি বড় মনস্তাপে অতীতের দিকে চাহিয়া দেখি। কি শান্ত-স্নিগ্ধ তপোবনে আমরা কুটীর বাঁধিয়াছিলাম, আর কি হিংস্রশ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যে এখন সৌধনির্ম্মাণ করিয়াছি! এখানে অহর্নিশ হাহাকার! অবিরত অশ্রুপাত! নিয়ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা! ব্যাকুলতা এখানে উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে, যন্ত্রণা এখানে কাতরতার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

তাই আবারও বলি, "হে ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ! তোমার মুক্ত আত্মা কোন এক মহাপুরুষে আবির্ভূত হউক! আমরা পুরাকালের একটী মাত্র ব্রাহ্মণের শান্ত, স্নিগ্ধ, সমুজ্জ্বল, তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় সার্থক করি! একখণ্ড নৈমিষারণ্যে একটী মাত্র ঋষির আশ্রম ফুটিয়া উঠুক! যেখানে ময়ূরের পক্ষতলে সুসুপ্ত ভুজঙ্গের অঙ্কে দর্দ্দুরের অবস্থিতি, পরস্পর যেখানে হিংসা নাই, কুটিলতা যেখানে আসন পায় না, আনন্দ যেখানে ছুটাছুটী করে, সূর্য্যকিরণও যেখানে হিমাংশুর অনুকরণ করে, দিনান্তে একবারও সেই ভূস্বর্গে, সেই মহা-পুরুষের পদতলে, সেই জ্ঞানময় কল্পবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, এ পৃথিবীর শোক-তাপ-জ্বালা-যন্ত্রণাময় জীবনের উপসংহার করি। ইত্যলম্।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।

এস তুমি।

১

ঐ যে তুমি আস্‌ছ নেমে, আকাশ-পথে, বাতাস দলে পায়।
তোমার পায়ের তরল কিরণ চিক্‌মিকিয়ে ফুটছে মেঘের গায়।
এই জীবনের উষাকালে, সাঁঝের বেলা, মায়ের কোলে শুয়ে,
দেখেছিলাম প্রথম তোমায় এম্‌নি করে' আস্‌তে নেমে ভুঁয়ে।
সে দিন থেকে তোমার সাড়া, তোমার আলো, তোমার আগমন,
আমার চোখের কাছে কভু, ঢাকেনিক কোন আবরণ।
তুমি জীবন, তুমি মরণ, একই সঙ্গে আঁতে-আঁতে গাঁথা,
তুমি আমার—জাগরণে, তুমি আমার সুপ্তিমাঝে বাঁধা।

২

উষা গেল, প্রভাত গেল, টলে গেল দ্বিপ্রহরের বেলা,
মাটো হয়ে এল আলো, খাট হয়ে এল দিনের খেলা।
চিরদিনই তোমার শুভ্র হাস্তে উঠি উৎসাহেতে কেঁপে;
কটা মেঘের মাঝে তোমার ভ্রুকুটিতে থম্‌কে দাঁড়াই কেঁপে।
কুজ্ঝটিকায় ঢাকা তোমার অঙ্গ থেকে আলো আঁচ্‌ড়ে খেয়ে,
সন্ধ্যা ভুলে, আঁধার ভুলে, থাকি তোমার হাসির পানে চেয়ে।
ভোরের পাখীর মত আমি গীতি-স্বরে ভরিয়া ভুবন,
সুপ্ত আঁখির তলায় তলায় জাগিয়ে তুলি নব জাগরণ।

৩

যৌন-সুখে শিহরিয়ে কবে যেন গেয়েছিলাম গান,—
জড়িয়ে আছে কণ্ঠ-তটে আজো তাহার একটু মিঠে তান।
জালিয়ে নিতে সে সুরটুকু,—ডরিয়ে উঠি, মুছে ফেলি যদি!
গাহিতে না পারি গীতি; স্মৃতিটুকুই পুষি নিরবধি।

* * * *

সাম্‌নে যারা উঠ্‌ছে বেড়ে,—দীপ্তহাস্যে নব যৌন-সুখে,
আমার প্রাণের মধুটুকু ছড়িয়ে পড়ুক তাদের ফুল্ল বুকে।
বিতরিয়ে জীবন আমার, উত্তরিয়ে যাব অন্ধকারে!
এস তুমি, এস নেমে, আকাশ-পথে আলো-ছায়ার ধারে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সংস্কৃত কথা-সাহিত্য

জগতের অন্যান্য ভাষার কথা-সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে, আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে কয়খানি সংস্কৃত কথা-গ্রন্থ দেখিতে পাই তাহা সংখ্যায় অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়। মানবমন চিরকালই মনোহর গল্পশ্রবণে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য অসভ্য ও সভ্যজাতি উভয় শ্রেণীরই চিত্তবিনোদিনী আখ্যায়িকা-মালা অতীব প্রিয়। কল্পনাবহুল কোন কোন জাতি অলৌকিক ঘটনাবলী-সমন্বিত উপাখ্যান শুনিতে ভালবাসে। অদৃশ্য রাজ্যের অধিবাসী দৈত্যগণের ক্রীড়াকলাপ, পরীস্থানের মোহন দৃশ্য, বিচিত্র ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রভৃতি কোন কোন জাতির মানস মুগ্ধ করে। তাই আরব্য উপন্যাসের অদ্ভুত উপাখ্যানসমূহ অনেকের অতি প্রিয়। যখন বুদ্ধি ও বাস্তব জগতের জ্ঞান সরিয়া দাঁড়ায়, কেবল কল্পনাই বিকাশ পাইতে থাকে, তখনই এইরূপ গল্প অতি প্রীতিপ্রদ হয়। শিশুরা তাই এই শ্রেণীর গল্পের অনুরাগী। বাঙ্গলার 'রূপকথা'ই হউক বা বিদেশীয় 'নার্সারি টেল্‌স্'ই হউক, উভয়েই এই কল্পনার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত। বয়স্ক মানবও সময় সময় তর্ক পরিত্যাগ করিয়া কল্পনার বন্ধনপাশ ছেদন করেন। তখন সেক্সপীয়রের 'নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন' বা 'ঝটিকা' তাঁহাদেরও প্রীতি প্রদান করে।

প্রাচ্য জগতে এই কল্পনার যতদূর বিকাশ, প্রতীচ্য ভূখণ্ডে সেরূপ নহে। আরব, পারস্য প্রভৃতি প্রদেশে আরব্য উপন্যাসের ন্যায় বহু গ্রন্থ প্রচলিত। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও যক্ষ, ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতির অলৌকিক আচরণের বহু উদাহরণ বিদ্যমান। যোগবলে অসীম ক্ষমতালাভ, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় অকালে বৃক্ষের পুষ্পোদ্গম প্রভৃতি বহু বিচিত্র বার্ত্তা আমাদের সুপরিচিত। প্রাচীন সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের এই একটি দিক্—এদিকে রশ্মিমুক্ত তুরঙ্গমের ন্যায় কল্পনার উদ্দাম গতি।

কিন্তু আর একটি দিক্‌ও বিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রতীচ্যখণ্ডে যেমন কাল্পনিক অসম্ভব ঘটনাবলী অপেক্ষা সম্ভবপর ঘটনাবলীর আদর অধিক, ভারতেও সেইরূপ সম্ভবপর ঘটনাবলী অসম্ভব ঘটনাবলীর সহিত একত্র স্থান লাভ করিয়াছে। এই উভয়বিধ ঘটনাবলীই সংস্কৃত কথা সাহিত্যে বর্ণিত। ইতালির বোকাশিও, ফ্রান্সের রাবেলা প্রভৃতি যে সকল গল্প একসময় ইউরোপের কবিগণের মনে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন তৎসদৃশ গল্প সংস্কৃত কথা-সাহিত্যেও

বিরাজমান। একটি উদাহরণে এ কথা পরিস্ফুট হইবে। বোকাশিও-রচিত ডেকামেরণে জনৈক যুবক এক রমণীকে কৌশলে এক উচ্চ প্রাসাদের উপর বিকৃতবেশে আরোহণ করাইয়াছিলেন,—এই কাহিনী বর্ণিত আছে। সংস্কৃত কথা-সরিৎ-সাগর গ্রন্থে এক প্রতারিত যুবক প্রতিশোধেচ্ছায় এক রমণীকে নগরীর এক উচ্চস্থলে বিকৃত মূর্ত্তিতে স্থাপন করেন,—এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ সাদৃশ্য কেবলমাত্র ঘুণাক্ষরবৎ হইয়াছে মনে করা উচিত নয়। কারণ উপাখ্যান-সমূহ লোকমুখে বিবিধ দেশে প্রচারিত ও রূপান্তরিত হওয়াই সম্ভব। অবশ্য কে এ সকলের উদ্ভাবক তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এইরূপ কথা-সরিৎ-সাগরের উপাখ্যানের সহিত 'টেল্‌স্ অফ্ বিড্‌পাই' নামক গ্রন্থের গল্পের সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃত 'করটক ও দমনকের উপাখ্যান' পহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। তাহা হইতে 'কোয়ালিলাগ্ ও দিম্‌নাগ' নামে সিরীয় অনুবাদ প্রচারিত হয়। 'শুকসপ্ততি' নামক সংস্কৃত উপাখ্যান গ্রন্থের সহিত ফার্সী 'তুতিনামা'রও তুলনা করা যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সংস্কৃত কথা-সাহিত্যে উভয় প্রকারেরই আখ্যায়িকা বিদ্যমান। কোন কোন উপাখ্যান অপ্রাকৃত ও অতিরঞ্জিত, কোন কোনটি সম্ভবপর ও স্বাভাবিক। এখন সংস্কৃত কথা-গ্রন্থগুলির একে একে পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাতবাহন রাজার রাজত্বকালে (ঐতিহাসিকগণ ইঁহাকে হাল্ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন) গুণাঢ্য কবি বৃহৎকথা নামক বহুবিস্তৃত এক কথা-গ্রন্থ পৈশাচী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থ অধুনা লুপ্ত, কিন্তু ঐ গ্রন্থ হইতে উপাখ্যানগুলি সংগৃহীত করিয়া বৃহৎকথামঞ্জরী ও কথাসরিৎসাগর নামক দুইখানি গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। শেষোক্ত দুইখানি গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান। কথাসরিৎসাগর হইতেই গুণাঢ্যের পরিচয় ও বৃহৎকথা রচনার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহারাজ সাতবাহন নিজের মূর্খতা দূর করিবার জন্য ভাষাশিক্ষার জন্য যত্ন করিলে গুণাঢ্য বলেন, "ব্যাকরণ-শিক্ষার জন্য বহু সময় আবশ্যক।" তাহাতে সর্ব্ববর্ম্মা নামক মন্ত্রী বলেন যে, তিনি অতি অল্পদিনেই সাতবাহনকে ব্যাকরণে সুশিক্ষিত করিবেন। তাহা শুনিয়া গুণাঢ্য প্রতিজ্ঞা করেন যে "যদি ইহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার পরিত্যাগ করিব।" দৈবযোগে সর্ব্ববর্ম্মা কলাপ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া সাতবাহনকে অল্পদিনেই

ব্যাকরণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া দেওয়াতে গুণাঢ্য স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ মৌনী হইয়া নগর পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে তিনি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সাহায্য না লইয়া পৈশাচী ভাষায় বৃহৎ কথা নামক বহুবিস্তৃত কথাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই গ্রন্থ সাতবাহন কর্ত্তৃক সমাদৃত না হওয়াতে গুণাঢ্য একে একে গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা সকল অনলে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। যখন গ্রন্থের প্রায় পঞ্চমাংশ দগ্ধ হইয়াছে তখন সাতবাহন নিজে আসিয়া অবশিষ্ট অংশ সম্মান-সহকারে যাচ্ঞা করেন। তাহাতেই এই গ্রন্থ একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

এই গ্রন্থনাশের বিবরণে বোধ হয় মূল গ্রন্থ অতীব বৃহৎ ছিল। যে অংশ ধ্বংস হয় নাই তাহা হইতেই বৃহৎকথামঞ্জরী ও কথাসরিৎসাগর নামক গ্রন্থদ্বয়ের উৎপত্তি।

বৃহৎকথামঞ্জরী ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত। ইনি কাশ্মীররাজ অনন্তের সময় ১০৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। [Journal of Bombay Royal Asiatic Society Vol. XVI. পৃষ্ঠা ৮৩-৮৫ দ্রষ্টব্য] কথাসরিৎসাগর সোমদেব রচিত, হর্ষদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সোমদেব এই গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচনা করেন। এই দুইখানি গ্রন্থই শ্লোকে রচিত।

কথাসরিৎসাগরের উপাখ্যানমালা পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় গুণাঢ্যকৃত বৃহৎকথা ভারতের প্রাচীন কবিদিগের চিত্তে অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। যদি এ কথা সত্য হয় যে, গুণাঢ্যের বৃহৎ-কথাই কথাসরিৎ-সাগরের একমাত্র উপাদান, তাহা হইলে এ কথাও সত্য যে শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট প্রভৃতি সংস্কৃত কবিগণ গুণাঢ্যের নিকট বহুলপরিমাণে ঋণী। যে কাদম্বরী গদ্যসাহিত্যে শীর্ষস্থানীয়,তাহারও ভিত্তি বৃহৎকথার এক আখ্যায়িকা, যে রত্নাবলী নাটিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহারও মূল বৃহৎকথার এক উপাখ্যান।

গল্পাবলীর প্রাচুর্য্য পালিভাষায় রচিত জাতকসমূহে যেরূপ বিরাজমান এরূপ আর কোথাও নহে। এই জাতকসমূহ বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ইতিহাস প্রদান করিয়াছে ও প্রসঙ্গক্রমে বহু উপদেশ প্রচার করিয়াছে। এই বৌদ্ধ-জাতকসমূহে পশু-পক্ষীর বহু উপাখ্যান বিরাজিত। ঈশপের গল্পাবলী বিশ্ববিদিত। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রও এই পশুপক্ষীর গল্পে পূর্ণ। কথাসরিৎসাগরেও বহু পশুপক্ষীর গল্প বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি পঞ্চতন্ত্রের গল্পের সহিত অভিন্ন।

রমণীগণের অসচ্চরিত্রতামূলক বহু গল্প পারস্যদেশে প্রচলিত। এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত "Some Current Persian Tales" নামক পুস্তকের ভূমিকা পাঠে অবগত হওয়া যায়, এই সম্বন্ধীয় গল্প পারস্যবাসিগণের বিশেষ প্রিয়। কতকগুলি লোক কেবল গল্প আবৃত্তি করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা গল্প আবৃত্তি করিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ কণ্ঠস্বরে বিবিধ ভঙ্গীতে বাক্য উচ্চারণ করে ও অঙ্গভঙ্গী করে। নটের কার্য্যও অনেকটা ইহাদের অভ্যস্ত। ইহা হইতে পারস্যবাসীদের গল্পপ্রিয়তা বেশ বুঝিতে পারা যায়। "বাহারদ্যানেশ", "চাহার দরবেশ" প্রভৃতি গ্রন্থেও এই শ্রেণীর গল্প বিদ্যমান। কথাসরিৎসাগরেও এরূপ উপাখ্যান অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি আরব্য উপন্যাসের ভূমিকায় শত অঙ্গুরীয়কধারিণী রমণী ও দৈত্যের ইতিবৃত্তটি কথাসরিৎসাগরে অবিকল বর্ণিত হইয়াছে।

কথাসরিৎসাগরে ঐতিহাসিক অনেক ব্যক্তি-সম্বন্ধে উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, শকটার, ব্যাকরণাচার্য্য পাণিনি, কাত্যায়ন, সর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতির নামও পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন হিন্দুগণের ব্যোমযাননির্ম্মাণপ্রণালী ও বিবিধ যন্ত্রনির্ম্মাণের নিপুণতা কথাসরিৎসাগর হইতে অবগত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির বহুল পরিচয়ও এই গ্রন্থে পরিস্ফুট।

এক্ষণে কথাসরিৎসাগর ও বৃহৎকথামঞ্জরীর ভিত্তিস্বরূপ বৃহৎকথা যে বিদ্যমান ছিল তাহার প্রমাণ কি একথা জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। অবশ্য কথাসরিৎসাগর দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। উহাতে লিখিত আছে যে, পৈশাচীভাষায় রচিত বৃহৎ কথা হইতেই উহার উদ্ভব। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ প্রমাণের উপর নির্ভর না করিলেও আমরা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে বৃহৎকথার উল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি। দণ্ডী স্বীয় কাব্যাদর্শে লিখিয়াছেন :—

"কথা হি সর্ব্বভাষাভিঃ সংস্কৃতেন চ বধ্যতে।
ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাম্॥"

[প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থাৎ কথাগ্রন্থ সমস্ত ভাষায় ও সংস্কৃতে রচিত হয়। অদ্ভুত ঘটনাবলীপূর্ণ বৃহৎকথা পৈশাচী ভাষায় রচিত বলিয়া কথিত আছে। বাণভট্টও স্বীয় হর্ষচরিতে লিখিয়াছেন,—

"সমুদ্দীপিত কন্দর্পা কৃতগৌরী প্রসাধনা।
হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা ॥"

[প্রথম উচ্ছ্বাস

সুবন্ধুকবি স্বীয় বাসবদত্তা গ্রন্থে স্পষ্টতঃই উল্লেখ করিয়াছেন যে, গুণাঢ্যই বৃহৎ-কথার প্রণেতা যথা "কেচিৎ বৃহৎকথানুবন্ধিনো গুণাঢ্যাঃ"। ঐ গ্রন্থেই অন্যত্র আছে "অস্তি····· বৃহৎকথারম্ভৈরিব শালভঞ্জিকোপেতৈঃ······কুসুমপুরং নাম নগরম্।" এই সকল প্রমাণ হইতে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা নামক গ্রন্থ এককালে বিদ্যমান ছিল ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

পঞ্চতন্ত্র একখানি উপাখ্যান-গ্রন্থ। ইহার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারই সারভাগ লইয়া বিষ্ণুশর্ম্মা 'হিতোপদেশ' গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রন্থ প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে।"

অর্থাৎ পঞ্চতন্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সারভাগ লইয়া লিখিতেছি। এই হিতো-পদেশ—মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারিভাগে বিভক্ত। ইহার অধিকাংশ গল্পই পশুপক্ষী লইয়া রচিত।

বেতাল-পঞ্চবিংশতি নামক একখানি গ্রন্থ বিদ্যমান। তাহাতে বেতাল এক একটি উপাখ্যান বলিয়া এক একটি প্রশ্ন করিতেছে ও বিক্রমাদিত্য তাহার উত্তর দিতেছেন। এইরূপ পঞ্চবিংশতিটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় ইহা 'বেতাল পচিসী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া অনূদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকর্ত্তার বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন ইহা জম্ভলদত্তের রচনা, কেহ বলেন শিবদাস ইহার প্রণেতা। ওয়েবর্ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সম্ভবতঃ বেতাল-ভট্ট এই গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার কতকগুলি উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে।

বিক্রমাদিত্য-সম্বন্ধীয় আর একখানি কথাগ্রন্থ বিদ্যমান, তাহার নাম 'সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা'। ইহাতে ভোজরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিতে যাইতেছেন, সেই সময় সিংহাসনের বাহনস্বরূপ দ্বাত্রিংশটি পুত্তলিকার মধ্যে এক একটি তাঁহাকে নিষেধ করিতেছে। এই নিষেধ করিবার সময় বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী-সূচক এক একটি উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছে। এগেলিংএর মতে এই গ্রন্থ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রচিত প্রাচীন গল্প হইতে সঙ্কলিত ও ক্ষেমঙ্কর বিরচিত। ক্ষেমঙ্কর সম্ভবতঃ ভোজরাজের সময় বিদ্যমান ছিলেন। ইহার কাল দশম শতাব্দী।

ভোজ-প্রবন্ধ নামে আর একখানি কথা-গ্রন্থে বহু উদ্ভট কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। ভোজরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলে বহু পণ্ডিত তাঁহার সভায় সমাগত হন ও সমস্যাপূরণ প্রভৃতি বহু শ্লোক রচনা পাঠ করেন। ভোজরাজও তাঁহাদের অনেককে শ্লোকের প্রতি অক্ষরে এক এক লক্ষ মুদ্রা দান করেন। এই পুস্তকের ঐতিহাসিক মূল্য কিছুমাত্র নাই। কারণ, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি বিবিধ কবি সমকালীনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একেবারেই অসম্ভব। তবে কৌতূহলজনক উদ্ভট শ্লোকগুলিই ইহার অস্তিত্ব-রক্ষার সহায়তা করিয়াছে। ইহার ভাষাও খুব সরল। বল্লাল কবি ইহার রচয়িতা।

সংস্কৃত কথা-সাহিত্যে দণ্ডী, বাণভট্ট ও সুবন্ধু এই তিন কবির স্থান অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। দণ্ডীর দশকুমারচরিত একখানি অতি উৎকৃষ্ট কথাগ্রন্থ। সরল-তার সহিত ওজস্বিনী ভাষার মিশ্রণ,—সমাসবহুল হইয়াও ইহা ক্লান্তিদায়ক নয়। বর্ণনার ছটায় উপাখ্যান আবরিত হয় নাই। প্রত্যেক উপাখ্যানই বেশ কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। দশজন কুমারের বিবিধ দেশভ্রমণ ও নানাবিধ কার্য্যকলাপ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তাই ইহার নাম দশকুমারচরিত। প্রবাদ আছে, দণ্ডী এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরাও যে গ্রন্থ পাইয়াছি তাহা সম্পূর্ণ নহে। বোম্বাই প্রদেশ হইতে মুদ্রিত পুস্তকে উপাখ্যান সমাপ্ত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষাংশ ভিন্ন ব্যক্তির রচিত। দণ্ডীর সময় ষষ্ঠ শতাব্দী। [মল্লিখিত 'মহাকবি দণ্ডী' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; ভারতী, বৈশাখ ১৩১৯] দশকুমারচরিতে বহু আখ্যানের সহিত সেই সময়কার সমাজের উত্তমরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

তাহার পর সুবন্ধু কবির বাসবদত্তা গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানির লিপিকৌশল অতি আশ্চর্য্য। গ্রন্থের অধিকাংশই দ্ব্যর্থ শব্দপূর্ণ। সুবৃহৎ সমাসযুক্ত বাক্যা-বলীও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এক রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রণয়-বৃত্তান্তই ইহার মূল বর্ণনীয় বিষয়। বাঙ্গালা 'বাসবদত্তা' নামক কাব্যে ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই গ্রন্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সংস্কৃত গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে বর্ণনাবলী এত বৃহৎ যে, সময় সময় রচনাকৌশলে মূল বিষয় মন হইতে সরিয়া যায়। ভাষা অলঙ্কারভারে কতদূর পীড়িত হইতে পারে ও সাধারণ বস্তুকে বর্ণনাছটায় কতদূর বৃহৎ করা যায়, বাসবদত্তা তাহার নিদর্শন। বাণভট্ট-কৃত কাদম্বরী ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও আমাদের বোধ হয় কৃত্রিমতায় ও আড়ম্বরে

ইহা বাণভট্টের রচনাকেও অতিক্রম করিয়াছে। বাণভট্ট নিজেই স্বরচিত হর্ষচরিতে বাসবদত্তার নিম্নলিখিত প্রশংসা করিয়াছেন—

"কবিনাম গলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।
শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরম্।"

সুবন্ধুও নিজে লিখিয়াছেন সরস্বতীবরেই এই প্রত্যক্ষর শ্লেষযুক্ত আখ্যায়িকা তিনি রচনা করিয়াছেন; যথা—

"সরস্বতীদত্তবর প্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈক বন্ধুঃ।
প্রত্যক্ষরশ্লেষময়প্রবন্ধবিন্যাস বৈদগ্ধ্যনিধির্নিবন্ধম্।"

বাণভট্ট দুইখানি গদ্য গ্রন্থে নিজ অসামান্য শক্তি প্রদর্শন করিয়া সংস্কৃত গদ্য-রচয়িতাগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। সে দুইখানি গ্রন্থ কাদম্বরী ও হর্ষচরিত। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইখানির মধ্যে একখানিও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কাদম্বরীর শেষাংশ রচনা করিয়া পিতার গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু হর্ষচরিত অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। হর্ষচরিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যসময়ের পরিচয় দেওয়াতে ঐতিহাসিকগণের পক্ষে অতিশয় আদরণীয়। ইহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলিত হইতে পারে। [মল্লিখিত "হর্ষচরিতে ঐতিহাসিক উপাদান" দ্রষ্টব্য। প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৮] হর্ষবর্দ্ধনের পরিচয় এই গ্রন্থের মূল বিষয়। কবির নিজ জন্মাদির বিবরণও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা সমাসবহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ।

কাদম্বরী অতি সুনিপুণভাবে লিখিত। ইহার উপাখ্যানবস্তু যত কৌতূহলোদ্দীপক হউক না কেন, ইহার বর্ণনাকৌশল অত্যাশ্চর্য্য। রাজসভা, সরোবর, মন্দির, সৈন্যশিবির প্রভৃতি কবির কৌশলে চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে। সমাসযুক্ত দীর্ঘ বাক্যাবলী, শ্লেষবহুল বচনসমূহ ও স্থলে স্থলে অতিরঞ্জিত বর্ণনাদি থাকিলেও সকলে সাদরে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। বাসবদত্তা গ্রন্থ যেরূপ অলঙ্কারভারে ও কেবল বচনচ্ছটায় অপ্রিয় হইয়া উঠে, কাদম্বরীর কোন স্থলই সেরূপ নহে। বাণভট্টের সময়কার রাজগণ, তাঁহাদের সভা, মন্ত্রী, প্রতীহারী, করঙ্কবাহিনী সেনাপতি প্রভৃতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। যখন শূদ্রক নৃপতির বর্ণনা ও তাঁহার সভার শোভা শ্রবণ করি, তখন অলক্ষ্যে মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে যে, বুঝি বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের সভার প্রতিচ্ছবি দেখাইতেছেন। শুকনাসের চন্দ্রাপীড়ের প্রতি উপদেশ-প্রসঙ্গে অনেক বহুমূল্য প্রস্তাবের

অবতারণা করিয়াছেন। বাস্তবিকই রচনানৈপুণ্য যদি কেবলমাত্র অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে কাদম্বরী, হর্ষচরিত ও বাসবদত্তা অন্যান্য সমস্ত কথাগ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ।

এই প্রবন্ধের মধ্যে গদ্য আখ্যায়িকাগুলির উপাখ্যানের সারাংশ দেওয়াও অসম্ভব। তাহাদের বিস্তৃত সমালোচনারও স্থানাভাব। আশা রহিল, ভবিষ্যতে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধে ইহাদের প্রত্যেকটির উপাখ্যান ও সমালোচনা প্রকাশ করিব।

এই কয়খানি ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইচারিখানি গদ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে "শুক-সপ্ততি" নামক গ্রন্থে এক শুক তাহার প্রভুপত্নীর অসদভি-প্রায় দূর করিবার জন্য প্রতিদিন এক একটি করিয়া সত্তরটি উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছে। এই সপ্ততি দিবস অতীত হইলে রমণীর স্বামী প্রত্যাবৃত্ত হওয়াতে সে নিজ অসদিচ্ছা পরিত্যাগ করিল।

এক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনচরিত লইয়াও দুই একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে দেখা যায়। "শঙ্কর বিজয়'' ও "শঙ্কর-দিগ্বিজয়'' নামক গ্রন্থদ্বয়ে শঙ্করা-চার্য্যের চরিত বিবৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের জীবনী এক্ষণে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত হইয়াছে।

প্রাকৃত ও পালিভাষায়ও অনেক কথাগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধজাতকমালার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। জৈন সাহিত্যেও কথাগ্রন্থ বিদ্যমান। "তিলকমঞ্জরী" নামক আখ্যায়িকা বোম্বাই হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষায় 'কুমারপালচরিত' নামক এক কাব্যগ্রন্থ আছে। তাহাতে অনহিলবারার কুমারপাল নায়করূপে গৃহীত হইয়াছেন। হেমচন্দ্র এই গ্রন্থের প্রণেতা। এতদ্ব্যতীত 'গৌড়বহ' প্রভৃতি কাব্যও বিদ্যমান। আমরা সেগুলিকে কথাগ্রন্থের মধ্যে না ধরিলেও পারি।

এক্ষণে কথাগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ করিয়া উহাদের ভাষা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে 'কথা' নাম গদ্যাত্মক উপাখ্যানের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'আখ্যায়িকা' নামক আর এক গদ্যকাব্যের বিভাগ-বিশেষেরও উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রযুক্ত 'কথা' শব্দের অর্থগ্রহণ করি নাই। পদ্যে রচিত কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থও কথাসাহিত্যের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু প্রধানতঃ গদ্যই কথাসাহিত্যের উপযুক্ত ভাষা। সংস্কৃত-সাহিত্যে বেশীর ভাগ গ্রন্থই শ্লোকে কিংবা সূত্রে গ্রথিত। সূত্রে রচিত গ্রন্থের বিশেষ

সুবিধা এই যে, অল্প সময়ে ও সহজে এগুলি স্মরণ রাখা যায়। যখন প্রাচীন হিন্দুগণ বেদ, ব্যাকরণ, দর্শনাদি আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ রাখিত, তখন সূত্রাকারে বা ছন্দে গ্রথিত গ্রন্থসমূহ যে অতিশয় উপযোগী হইবে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এ প্রয়োজন কথা-সাহিত্যে নাই। কারণ উপাখ্যানমালা ঠিক একই শব্দবিন্যাসে আবৃত্তি করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তা ছাড়া, কথাগ্রন্থ সকল যখন রচিত হইয়াছিল, তখন লিপি প্রচলন হইয়াছে। কাজেই স্মরণ-শক্তির উপর ততটা নির্ভর করিতে হইত না। কাজেই ক্রমে সরল হইতে বহু আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় কথা-সাহিত্য লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

সংস্কৃত গদ্যের আদিম স্তর—ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্। এই উভয়বিধ গ্রন্থেই বৈদিক ভাষা বিশেষরূপে ব্যবহৃত। ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে ভাষার বেশ সতেজ গতি বিদ্যমান। অলঙ্কার খুব অল্প। এক ভাবের কথা যখন দুইবার বলিতে হয়, তখন একরূপ বচনাবলীই পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে। মহাভারতের যে যে অংশ গদ্যে বিরচিত তাহাও এইরূপ। ভাষা সরল। একভাবের পুনঃ প্রসঙ্গে পূর্ব্বকথারই পুনরাবৃত্তি। কতকগুলি বিশেষণ ব্যক্তিবিশেষের নামে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। যেখানে ঐ শব্দ সেইখানেই বিশেষণটিও প্রযুক্ত হইয়াছে। এই পুনরুক্তিই প্রাচীন গদ্যের একটি বিশেষ লক্ষণ।

ক্রমশঃ এই সরল ভাষা জটিল হইয়া উঠিল। ভোজ প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে ভাষায় সরলতা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে দণ্ডী যখন দশকুমারচরিত রচনা করিলেন, তখনই ভাষা অলঙ্কারে সজ্জিত হইতেছে। সমাসবহুল বাক্যাবলী তখন ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তখনও পাণ্ডিত্য-প্রকাশ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠে নাই। কাজেই ভাষার গতি তখন একেবারে সরল না হইলেও ক্রমভূষিত তীর নদীর প্রবাহের ন্যায় মনোরম। দুই তীরের মোহন দৃশ্য—দেখিতেও ইচ্ছা হয়, আবার নদীর প্রবাহের সহিত ছুটিয়া যাইতেও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। রচনাকৌশল দেখিতেও ইচ্ছা হয়—আবার উপাখ্যানের অনুসরণ করিতেও কৌতূহল অক্ষুণ্ণ থাকে।

তাহার পরই কৃত্রিমতার ও আড়ম্বরের প্রসর। কাদম্বরী ও হর্ষচরিতে সুদীর্ঘ সমাস ও জটিল শব্দপ্রয়োগ, দ্ব্যর্থ আর্য্যাসমূহ, শ্লেষপূর্ণ বচনপরম্পরা ক্রমশঃই সুধিগণের আদরণীয় হইয়া উঠিল। তখন স্বর্ণপাত্রে লৌহপুত্তলিকাস্থাপনের ন্যায়, বহুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বানরের অবস্থানের ন্যায়, ভাষার ও উপাখ্যানের

সহিত সামঞ্জস্য রহিল না। কেবল নিপুণ বাক্যবিন্যাস ও বহুল অলঙ্কার-প্রয়োগ। ক্রমে এই গতি চরমসীমায় উঠিল—তাহার নিদর্শন-'বাসবদত্তা'।

কিন্তু এই অলঙ্কারভারপীড়িতা, বহুশব্দসঙ্কুচিতা ভাষার মধ্যেই কবির অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ; সঙ্গে সঙ্গে ঐকান্তিক যত্ন, অনুরাগ ও পরিশ্রমের পরিচয়। কে আজ এরূপ যত্নে শব্দচয়ন করিয়া গ্রন্থ রচনা করে? কে আজ বিচিত্র কুসুমভূষণের ন্যায় মাতৃভাষার অঙ্গে অলঙ্কারবিন্যাস করিতেছে? অতীতের গুহালীন কবিগণ! তোমাদের প্রভাব বর্ত্তমান সাহিত্যে সঞ্চারিত কর। এস, গুণাঢ্য, বাণ, সুবন্ধু, দণ্ডী—তোমাদের আদর্শে শিক্ষা দাও—অক্লান্ত সেবা, অত্যধিক আগ্রহ, ঐকান্তিক অনুরাগ ও নিয়ত-চর্চ্চাই ভাষার উন্নতির একমাত্র উপায়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

লিখন।*

(১)

জ্যৈষ্ঠ মাস—দ্বিপ্রহর। পৃথিবী অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—হু-হু শব্দে আগুনের হল্কার মত 'লু' চলিয়াছে। পথে লোকসমাগম নাই। 'জ্যেষ্ঠতাপে' বনের হরিণও গ্রামের বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে শুষ্ককণ্ঠ ময়ূরের কেকারব শুনা যাইতেছে। এই সময়ে আলোয়ার হইতে জয়পুরের পথে দুইজন পথিক উষ্ট্রারোহণে যাইতেছিলেন—উভয়েই পিপাসায়

* জয়পুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ রামসিংহ হারুণ-অল্-রসিদের মত নিজ রাজ্যের নানাস্থান এবং নিকটবর্ত্তী রাজ্যসকলের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। সুশিক্ষিত উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া একমাত্র পারিষদ সঙ্গে করিয়া তিনি যাইতেন—তাঁহাকে চিনিবার কোনও উপায় থাকিত না। এই প্রকার ভ্রমণকালে যে সকল ঘটনা ঘটিত, তাহা হইতে মহারাজের চরিত্রের এক অংশ বেশ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। এমনই একটা ঘটনা-অবলম্বনে বর্ত্তমান আখ্যায়িকার অবতারণা। এইখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আলোয়ার রাজ্য পূর্ব্বে জয়পুররাজ্যের অংশ ছিল এবং তথাকার রাজারা জয়পুরের করদ রাজা ছিলেন—পরে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া স্বাধীন হন। সেই অবধি উভয় রাজবংশমধ্যে বংশানুক্রমে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে—দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ বা পত্র-ব্যবহার পর্য্যন্ত নাই।

কাতর। উটটির অবস্থা আরও শোচনীয়—এমন কষ্টসহিষ্ণু মরুবাসী সেও যেন আর চলিতে পারিতেছে না।

উটের পিঠে সামনের বৈঠকে যিনি বসিয়াছিলেন তাঁহার বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর—সাধারণ রাজপুতের মত চেহারা—পাতলা, মজবুত গঠন, পোষাকও বাহুল্যমাত্রবর্জ্জিত। কেবল মুখে যে স্থিরপ্রতিজ্ঞা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইতেছিল—তাহা অনন্যসাধারণ। চশমার ভিতর দিয়া উজ্জ্বল চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পায়।

পিছনের বৈঠকে যিনি বসিয়াছিলেন,—তাঁহার শ্মশ্রুবহুল মুখমণ্ডল, বলিষ্ঠ দেহ এবং যোদ্ধৃবেশ—কোমরে তলোয়ার ও রিভলভার এবং পৃষ্ঠে বন্দুক।

উষ্ট্রের অবস্থা দেখিয়া প্রথম আরোহী বলিলেন—"মোহনজি উট্'ত আর পারে না—কাল সমস্ত রাত চলিয়াছে, আজ এত বেলা পর্য্যন্ত একবারও বিশ্রাম করিতে পায় নাই—একবার ছাওয়ায় বসাইয়া ঘি খাওয়াইতে না পারিলে জয়পুরে পৌছান শক্ত হইবে। আমাদের অবস্থাও এর চেয়ে বেশী ভাল তা' বলিতে পারি না। কিন্তু জল কোথায়? সাম্‌নে গ্রাম ত দেখি না।"

মোহন সিং বলিল, "অন্নদাতা, আসিবার সময় আমরা অন্যপথে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার যেন মনে হইতেছে আর ক্রোশ খানেক আগে একটা ছোট বাগান আছে—সেখানে পৌঁছিলে জলের যোগাড় হইতে পারে।"

মোহন সিংহের অনুমান সত্য—উভয়ে নীরবে এই ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করিলে একটি ছোট বাগান দেখিতে পাইল। সেটাকে বাগান বলিলে ঠিক বলা হয় না—গোটাকতক নিমগাছ ও কয়েকটা আম ও শিশুগাছের সমষ্টিমাত্র। এই ছায়াহীন রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে এই কয়েকটা মাত্র গাছে স্থানটিকে এক অপূর্ব্ব শান্ত-শ্রী দান করিয়াছে। বৃক্ষান্তরালস্থ ঘুঘুর করুণ কূজন এবং মধ্যে মধ্যে কর্কশকণ্ঠ কেকার কাংসক্রেঙ্কারধ্বনি সেই 'নিস্তব্ধ নিঝুম রৌদ্রময়ী রাতি'র নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। কচি আমের এবং নিমফুলের গন্ধে সমস্ত স্থানটা যেন ভরিয়া রহিয়াছে।

আরোহীদ্বয় উট হইতে নামিয়া তাহাকে একটা নিমের তলে বাঁধিয়া রাখিলেন—সেটা অবিলম্বে কচি নিমপাতার রস গ্রহণে মন দিল—সে রসে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল। আরোহীরা দেখিলেন সামনে একটা শিশুগাছের নিম্নে এক বৃদ্ধা দু'তিন কলসী জল, কিছু গুড় ও ছোলা লইয়া বসিয়া আছে।

প্রথম আরোহী বৃদ্ধার নিকটে গিয়া হাত-মুখ ধুইয়া কেবলমাত্র জলপান

করিলেন। বৃদ্ধা গুড় ছোলা লইবার জন্ত অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহার সঙ্গীকে দিবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন। মোহন সিং গুড় ছোলার যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া আকণ্ঠ জলপান করিয়া লইল এবং উটের পিঠে বাঁধা ছোট 'মটকী' হইতে ঘি লইয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল। প্রথম আরোহী ততক্ষণ বৃদ্ধার সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন—তাহার ছেলেপুলে কি, কে কি করে, কি করিয়া চলে, আর কে আছে, এখানে জলসত্র কেন খুলিয়াছে, ইত্যাদি।

বৃদ্ধা এমন ধৈর্যাশীল শ্রোতা বোধ হয় বহুদিন পায় নাই, সে তাহার কাহিনী বলিতে লাগিল—সে জাতিতে ক্ষত্রিয়, তাহার স্বামী ছিল আলোয়ার রাজের সিপাহী,জয়পুরের সঙ্গে সীমানা লইয়া একবার ভারী লড়াই হয়,সেই সময় তাহার স্বামী অত্যন্ত আহত হয়। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে বাড়ী পৌছিয়া দিবার জন্ত আনিতেছিল, আসিতে আসিতে পথে এই জায়গায় তাঁহার মৃত্যু হয়। সেও জ্যৈষ্ঠমাস, এখানে আসিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গীরা বাড়ীতে সংবাদ পাঠায়; এখান হইতে তাহাদের গ্রাম প্রায় তিন ক্রোশ—সকলে আসিয়া দেখে তখন ঘোর প্রলাপের অবস্থা—অতিরিক্ত তৃষ্ণায় 'জল, জল' করিতেছেন। কাহারও নিকট জল নাই, যাহা ছিল পথেই ফুরাইয়া গিয়াছে, বাড়ীর লোকেরও আসিবার সময় জল আনার কথা মনে ছিল না। বলিতে বলিতে বৃদ্ধার অশ্রু আর বাধা মানিল না,সে বলিল, "জল, জল,করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ বাহির হইল—আমি তাঁহার সেই মৃত্যু-শয্যায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম—এইখানে জলসত্র খুলিয়া নিজে তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে জল দিব। তখন আমার বয়স অল্প—আমি একমাত্র পুত্র লইয়া বিধবা হইলাম। তাঁহার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল,—'মুক্তায়' আমি বেশী খরচ করিতে দিলাম না। নিজের যাহা কিছু সামান্ত গহনা ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া এই জলসত্রের জন্য রাখিয়া ছিলাম। সেই অর্থে আজ এত দিন ধরিয়া চালাইলাম। সে আজ কত বৎসরের কথা—তখন আমার ছেলের বয়স পাঁচ বৎসর—আজ তাহারই প্রায় দু'কুড়ি বছর বয়স হইতে চলিল। 'ইনামে' সামান্য ক'বিঘা জমী ও দু'টা কুয়া ছিল, তাহাতেই এতদিন আমাদের খাওয়া-পরা চলিয়াছে—এখন ছেলের বিয়ে দিয়েছি তাহারও কচি-কাচা হয়েছে—আর ত চলে না। আমারও জলসত্রের টাকা ফুরাইয়াছে, নিজেরও আর সামর্থ্য নাই যে এই তিনক্রোশ হইতে জল আনি—বৌ বাড়ীতে একা ছেলেপুলে লইয়া বিব্রত, সেও পারে না। আজ কয়দিন হইতে একটি লোককে মাসে দশসের গম দিব বলিয়া জল আনিবার জন্ত লাগাইয়াছি। হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিতেছে—এমন করিয়া কতদিন চালাইতে পারিব? তাই ছেলেকে আলোয়ারে পাঠাইয়াছি—

রাজার কাছে। তাহার বাপ রাজার জন্য লড়িয়া প্রাণ দিয়াছে, এখন রাজা তাহাকে একটা সিপাহীর চাকরী দিলে আমরা রক্ষা পাই। কিন্তু এজন্য আজ পাঁচ বছর হইতে সে চেষ্টা করিতেছে—কিছুই ত হইল না। ছেলে মানুষ, ভৈরু ভাবিয়া ভাবিয়া তারও শরীর যেন শুকিয়ে উঠেছে।" এই বলিয়া বৃদ্ধা চক্ষু মুছিল।

প্রথম আরোহী এ সকল কোন কথার জবাব না দিয়া পাশে কলসী-ভাঙ্গা যে খোলা পড়িয়াছিল—তাহারই একটা কুড়াইয়া লইলেন এবং ক্ষণেক ভাবিয়া একটা পাথরের টুকরা দিয়া তাহার উপর কি লিখিলেন। লেখা শেষ হইলে সেই অপূর্ব্ব লিপিখানি বৃদ্ধার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমার ভৈরু ফিরিয়া আসিলে তাহাকে এই লেখাখানি দিও, বলিও সে যেন কাল প্রাতেই এইটুকু লইয়া মহারাজ বনেসিংহের সহিত দেখা করে।"

বৃদ্ধা অবাক্ হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু কোন কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না। দূরে দাঁড়াইয়া মোহন সিং বৃদ্ধার ভাব দেখিয়া হাসিতেছিল। প্রথম আরোহী আবার বলিলেন—"এটা ভৈরুকে দিতে ভুলিও না—আর এই মোড়কটি রাখ, ইহা হইতে তোমার জলসত্র কিছুদিন চলিবে। তোমার ছেলের যদি আল্‌ওয়ারে চাকরী না হয়, জয়পুরে যাইও—এই খোলা হারাইও না।" এই বলিয়া তিনি সঙ্গীকে উট আনিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন এবং অবিলম্বে সেখান হইতে রওনা হইলেন।

বৃদ্ধা এতক্ষণ বিস্মিত হইয়া এই পথিকের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, তাঁহারা চলিয়া গেলে তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে মোড়কটি খুলিয়া ফেলিল—একি! মোড়কের মধ্যে পাঁচটি মোহর! তবে কি সে এতক্ষণ কোন রাজার সঙ্গে কথা কহিতেছিল! ইনি কি তবে মহারাজ বনেসিং! জানি না কি ভাবিয়া বৃদ্ধা কাহার উদ্দেশে দুই হাত জুড়িয়া প্রণাম করিল।

(২)

ভৈরু সিং সন্ধ্যার পর আলোয়ার হইতে গৃহে ফিরিল—ঘোড়াটাকে কিছু শুক ঘাস দিয়া 'আলে' বাঁধিয়া সে আঙ্গিনায় একখান চারপাই টানিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার শুকমুখ দেখিয়া বৃদ্ধা বুঝিল তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। কিছুক্ষণ পরে ভৈরুর স্ত্রী তাহার আহার্য্য আনিয়া দিল—বৃদ্ধা পাশে আসিয়া বসিল —জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা কি হইল?" "মাজি, কি আর হবে? দরখাস্ত রাজার কাছে পৌঁছে নাই। একজন বলিয়াছে—যদি পঁচিশ টাকা দিতে পার তবে তোমার দরখাস্ত রাজার কাছে পেশ করিয়া দিতে পারি—এখন কি

তোমাকেও সেলাম করিবার সুযোগ করিয়া দিব। তা' টাকা কোথায়? শুধু মুখের কথায় কে কাজ করিবে? তাহার উপর আমি তেমন খোসামোদ করিতে পারি না।"

বৃদ্ধা বলিল,—"বাবা, আজ এক সুযোগ হইয়াছে।" এই বলিয়া দ্বিপ্রহরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। শেষে বলিল,—"একটা মোহর আমি দিব, কাল তুই এই লেখা খোলাটা লইয়া যা'স—দরখাস্তের কোন দরকার নাই।"

ভৈরু খোলার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল,—"মাজি, তুমি যেমন পাগল—কত বড় বড় লোকের দরখাস্ত সেখানে পৌঁছে না,আর আমার এই কলসীভাঙ্গা রাজার হাতে পৌঁছিবে?—এ'টা দেখিলে লোকে আমাকেও পাগল বলিবে।" বৃদ্ধার তখনও সেই পথিকের দীপ্ত মুখশ্রী এবং গম্ভীর স্বর মনে পড়িতেছিল—সে বলিল, "দরখাস্ত ত অনেক করেছিস্, কিছু হো'ল কি? একবার চেষ্টা করে ত দেখ, তারপর না হয় তোকে নিয়ে আমি জয়পুর যা'ব।"

"মাজি, জয়পুর কি আমাদের এই রকম ছোট্ট একটা গাঁ যে সেখানে গিয়ে তোমার সেই পথিককে খুঁজে পাবে?—সে যে আলোয়ারের চেয়েও বড় সহর।"

অনেক তর্কবিতর্কের পর বৃদ্ধারই জয় হইল—স্থির হইল পরদিন প্রাতে ভৈরু একটা মোহর ও সেই অদ্ভুত 'লিখন' লইয়া আলোয়ারে যাইবে।

পরদিন যথাসময়ে আলোয়ারে গিয়া তাহার বন্ধুকে মোহর দিয়া সেই কলসী-ভাঙ্গার কথা বলিল। শুনিয়া সে অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত ভৈরুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার মনে হইতেছিল, লোকটা চাকরী-চাকরী করিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছে। শেষে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং ভৈরুর কাকুতি-মিনতিতে ও মোহরের লোভে সে তাহাকে পরদিন প্রাতে মহারাজের কাছে সেলাম করিবার জন্য লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিল; কিন্তু সে সেই কলসী-ভাঙ্গা লইয়া পেশ করিতে কিছুতেই স্বীকার করিল না—বলিল, "তুমি পার ত দিও।"

* * * * *

পরদিন প্রাতে প্রথামত সকলে যখন মহারাজকে সেলাম করিতে গেল, ভৈরু সিংও সেই দলে মিশিয়া পড়িল এবং কৌশল করিয়া সকলের পশ্চাতে রহিল। একটা খোলা বারান্দায় চৌকীর উপর মহারাজ বখ্‌তসিং বসিয়া ছিলেন। একে একে সকলে "অন্নদাতা, পৃথ্বীনাথ" বলিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। সর্ব্বশেষে ভৈরু সিং সেলাম করিয়া জোড়হাতে দাঁড়াইয়া

রহিল—তাহার সে ভাব মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—তিনি পার্শ্বস্থ পরিচারককে বলিলেন—"এ লোকটা কে ? ওর কি বলিবার আছে জিজ্ঞাসা কর।"

মহারাজের কথায় ভৈরুর সাহস হইল—সে বিনীতভাবে অগ্রসর হইয়া সেই ভাঙ্গা খোলাখানি মহারাজের পায়ের কাছে রাখিল। মহারাজ কৌতূহলের সহিত সেখানি তুলিয়া লইলেন। ভৈরু কাঁপিতেছিল—সে ভাবিল এ বেয়াদবীর জন্য তাহার তৎক্ষণাৎ কারাবাসের আজ্ঞা হইবে। কিন্তু ক্ষণেক পরে সে ভয় কাটিয়া গেল—মহারাজ তাহাকে লেখক-সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন—সেও তাহার মা'র কাছে যেমন শুনিয়াছিল তেমনই বর্ণনা করিল।

ভৈরুকে ছুটি দিয়া মহারাজ আবার সে অদ্ভুত লিখনটী পড়িতে লাগিলেন—তাহাতে ছিল,—

"যাহার পিতা আপনার জন্য প্রাণ দিয়াছে—তাহাকে আশ্রয় দিলে আমি আনন্দিত হইব। ইতি

সওয়াই * রামসিং।"

* * * * *

সেই দিন হইতে ভৈরু সিং মহারাজের খাস্ রেসালার সওয়ার শ্রেণীভূক্ত হইল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

প্রতিবাদ।

গত আষাঢ় মাসের (১৩১৯ সাল) 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয় তাঁহার দিগন্তবিশ্রুত শালীনচিত্ততা ও গাম্ভীর্য্যের স্খলন ঘটাইয়া অসামাজিকতার পরিচয় দিয়াছেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ সর্ব্বদাই দূষণীয়। কি প্রতীচ্য বা কি প্রাচ্য জনপদ সর্ব্বত্রই ইহা সাধুজনসমক্ষে ক্ষুদ্রমার্গ বলিয়া বিবেচিত। তিনি আমার

---

* মোগল বাদসাহ-প্রদত্ত এই "সওয়াই" উপাধি জয়পুরের মহারাজেরা নিজ নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করেন। ইহা হইতে এ পত্রলেখক যে জয়পুরের মহারাজ রামসিংহ তাহা বুঝিতে পারা যায়—নতুবা রামসিং নাম অতি সাধারণ।

"শাল ও সন কি এক ?" (অর্চ্চনা, জ্যৈষ্ঠ—১৩১৯) প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে যাইয়া সমাজপতি মহাশয় ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিতেছেন—

"উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন সাল ও সন কি এক ?" প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—এ উত্তর এক নহে। গুপ্ত বিদ্যারত্ন প্রাচীন লেখক, এমন বিষয় নাই, যাহাতে তিনি ওয়াকিব-হাল নহেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর ও সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় রামদাস সেন মহোদয়গণের ভ্রম আবিষ্কার করিয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন, এবং "বিপ্রকুলকল্পলতা" নামক একখানি তথাকথিত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গলা দেশে শালবান্ নামে যে বৈদ্য রাজা ছিলেন, শাল অব্দ তাঁহারই প্রবর্ত্তিত এবং উহা একটী 'বৈদ্যাব্দ'। ভবিষ্যতে কোনও ব্রাহ্মণ উহা 'ব্রাহ্মণাব্দ' ও কোন দেববর্ম্মা উহা 'ক্ষত্রাব্দ' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন, আমরা এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি।"

আমরা সমাজপতি মহাশয়ের এই সমালোচনা অথবা উপহাসপটুতা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। কেন না তাঁহাকে আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি। তিনি একজন সহৃদয় ও বিচক্ষণ সমালোচকও বটেন। কিন্তু আমার প্রবন্ধের সমালোচনা কালে তিনি যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া চাপল্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাল ও সন এক নয়, বিদ্যাসাগর ও রামদাস সেনের কোনও ভ্রম হয় নাই, আমার উপস্থাপিত প্রমাণ ক্ষুণ্ণ ও অবিশ্বাস্য, তিনি ইহা দেখাইয়া তবে আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেই ভাল হইত। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া তাঁহার বাক্যই যেন বেদবাক্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রামদাস বাবু যেন অভ্রান্ত মহাপুরুষ, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তৎপর আমাকে কিঞ্চিৎ অম্লমধুর বাণী শুনাইয়া বিরাম লভিয়াছেন।

"অরে মূর্খ! আটলান্টিকেরও কি আবার পার আছে ?"

একদিন ইউরোপের তামস যুগে এই কথা শোভা পাইয়াছিল, কিন্তু এখন আর উহা শোভা পাইতে পারে না। তদ্রূপ অঋষি ও অসর্ব্বজ্ঞ বিদ্যাসাগর এবং মানুষ রামদাস সেনের প্রমাদ হইতে পারে না, একথাও আর এ যুগে শোভা পাইতে পারে না।

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ

মুনিরাই বা মুনিকল্প আচার্য্যেরাই ইহা বলিয়া গিয়াছেন যে, মুনিদিগেরও মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে, তথায় মানুষ বিদ্যাসাগর ও মানুষ রামদাস সেন কোথায় ?

যুক্তিযুক্ত মপি গ্রাহ্যং বচনং বালকস্য চ।
অযুক্ত মপি চেন্নৈব বচনং পদ্মজন্মনঃ॥

যদি একটী ক্ষুদ্র বালকও যুক্তিযুক্ত কথা বলে, তবে তাহা সাদরে গ্রহণীয়, কিন্তু স্বয়ং পদ্মজন্মা ব্রহ্মাও অযুক্ত বাক্য বলিলে সাধুরা তাহা গ্রহণ করিবেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমি আমার অভীষ্ট-দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি, আমার যে কোনও প্রবন্ধে আমি তাঁহাকে "মানব-দেবতা" বলিয়া সংসূচিত করিয়া থাকি। কিন্তু তিনি পূজনীয় হইলেও তাঁহার প্রমাদ পূজনীয় হইতে পারে না। আমি তাঁহাদিগের কোনও প্রমাদের আবিষ্কর্ত্তা নহি—পরন্তু তাঁহারাই তাঁহাদিগের স্ব স্ব গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাদের সূচয়িতা।

প্রত্যেক অধীয়ান ও সাহিত্যসেবী ব্যক্তিই জানেন যে শালের পরিমাণ ১৩১৯ ও হিজিরা সনের পরিমাণ ১৩২৯—৩০। সুতরাং এই দুইটী বস্তু কি প্রকারে এক হইতে পারে? এলাহী সনের পরিমাণও ১৩২০—২১। সুতরাং ইহার সহিতও শালাব্দের সমীকরণ হইতে পারে না।

প্রবীণেরা ইহাও ভাবিয়া দেখিবেন যে হিজিরা ও এলাহী সন (মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন কাল হইতে হিজিরা ও তাঁহার উপরতিদিন হইতে এলাহী সনের প্রচলন) চান্দ্র ও শালাব্দ সৌর গণনানুসারে গঠিত। সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা এবং চান্দ্র বৎসর ৩৫৬ বা ৩৬০ দিনে পরিগণিত। সুতরাং এই তিনটি পৃথক্ বস্তু কখনই এক হইতে পারে না। পঞ্জিকাপ্রণেতারা এই শালাব্দকে "বঙ্গাব্দ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তাঁহারা হিজিরা ও এলাহি সনের নামও স্বতন্ত্র লইয়াছেন।

কোনও পণ্ডিত হিজিরা বা এলাহী সনকে বঙ্গাব্দ বলিয়া জানেন না ও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন না। হিজিরা সন আরবে, এলাহী সন দিল্লীতে এবং শালাব্দ বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত ও সমারব্ধ। সরলপ্রাণ মহামনাঃ বিদ্যাসাগর এই ক্ষুদ্র পার্থক্যের কথা না ভাবিয়া বোধোদয়ে হিজিরা সনকে বাঙ্গলা শাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—সুতরাং আমি কি প্রকারে তাঁহার স্খলনের আবিষ্কর্ত্তা হইলাম?

অশেষ শ্রদ্ধাভাজন রামদাস সেন মহাশয়ের ঐতিহাসিক রহস্যের বহু প্রবন্ধও আমাকে গভীর শ্রদ্ধার সহিতই অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। আমি তাঁহার এক জন গুণানুরক্ত ভক্ত। কিন্তু তাঁহার বা তাঁহার অধ্যাপক (প্রবন্ধের প্রকৃত লেখক) মহাত্মা কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের গবেষণা-বৈরূপে যে কোনও স্খলন ঘটিয়া থাকিলে তাহা কি প্রমাদ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না? সেন মহাশয় লিখিতেছেন—

"সুবিখ্যাত শালিবাহন নৃপতি মগধে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইঁহার দ্বারা খৃষ্ট জন্মের আটাত্তর বৎসর পরে শকের সৃষ্টি হয়"।

—২য় ভাগ ঐতিহাসিক রহস্য, ২০৭ পৃষ্ঠা।

আমরা ইহা তাঁহার স্খলন বলিয়া মনে কার, কেন না পৃথিবীর কোনও জাতির কোনও ইতিহাসে কিংবা জনশ্রুতিতেও এমন একটি কথা নাই যে—মগধ দেশে শালিবাহন নামে একজন রাজা ছিলেন ও শকাব্দ তাঁহার প্রবর্ত্তিত, যে শকাব্দের বয়ঃক্রম খৃষ্ট হইতে ৭৮ বৎসর ন্যূন। তিনি ইহার পরেই লিখিয়াছেন—

"আমরা অদ্য মহারাষ্ট্রাধিপতি শালিবাহনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব, ইনি মগধেশ্বর শালিবাহন হইতে পৃথক্ ব্যক্তি"।—ঐ।

যদি তাহাই সত্য হয়, এই দুই ব্যক্তি যদি স্বতন্ত্র ব্যক্তিই হয়েন—আমরাও তাহা ঠিক বলিয়া মনে করি—তাহা হইলে রামদাস বাবু কেমন করিয়া মগধেশ্বর শালিবাহনের প্রতি শকাব্দপ্রবর্ত্তনের কর্ত্তৃত্ব সমারোপিত করিয়া বসিলেন? শকাব্দের প্রবর্ত্তন কি মহারাষ্ট্র দেশে মহারাষ্ট্রাধিপতি শালিবাহনকর্ত্তৃক হইয়াছিল না? শকাব্দ কি বিহার বা বাঙ্গলা দেশের পৈতৃক সম্পৎ? রামদাস বাবু তৎপরই লিখিতেছেন যে—

"শালিবাহন বা সাতবাহন মহারাষ্ট্র প্রদেশের প্রতিষ্ঠানপুরীর অধীশ্বর। তাঁহার রাজধানী গোদাবরী তটে স্থাপিত ছিল। শালিবাহন শক একণে মহারাষ্ট্রদেশের নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে এবং বিক্রমাব্দ ঐ নদীর উত্তরাংশে প্রচলিত আছে"।—ঐ।

এখন সকলে ভাবিয়া দেখ যে শকাব্দ নর্ম্মদার দক্ষিণ সৈকতে প্রচলিত, তাহা মহারাষ্ট্রাধিপ শালিবাহনের প্রবর্ত্তিত, কি মগধের শালিবাহনের প্রবর্ত্তিত? সেন মহাশয় মগধের শালিবাহনকে শকাব্দপ্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া কি প্রমাদের উদ্‌গিরণ করিয়া যান নাই? তৎপর রামদাস বাবু কোন্ প্রমাণ বা মহাজন বাক্যের অধীন হইয়া মগধের সিংহাসনে একজন শালিবাহনের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গেলেন? রামদাস বাবুর বাক্য কি পরমার্থতই আপ্তবাক্য?

পক্ষান্তরে আমরা বাল্যকালে বৃদ্ধবৃদ্ধাগণের নিকট বাঙ্গলা দেশে একজন শালবান্ নামে বৈদ্য রাজার অস্তিত্বের কথা শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। ভুবনেশ্বর ও ধলেশ্বর নামেও এক এক জন বৈদ্য রাজা ছিলেন ইহাও বাল্যকালের শ্রুতি। পরে যখন আমরা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বৈদ্যকৃত "চতুর্ভুজ" কুলপঞ্জিকা ও ব্রাহ্মণকৃত "বিপ্রকুলকল্পলতা" পাঠ করি, তখনই আমরা শালবান্ কে? ও শালাব্দ কাহার প্রবর্ত্তিত, তাহা জানিতে পারি।

বিপ্রকুলকল্পলতায় আছে—

আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গরাজ্যাধিরাজঃ স স্বধর্ম্মপরিপালকঃ॥
তদ্বংশে জনিতশ্চৈকঃ প্রতাপচন্দ্রভূপতিঃ।
তৎকুলে জনিতশ্চাস্ত তেজঃশেখরসংজ্ঞকঃ॥
বিধুবাণাচলমিতে শকাব্দে বিগতে পুরা।
তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ॥

আমরা এই পঞ্জিকাখানীর বয়ঃক্রম কত, কাহার লিখিত, তাহা জানি না, কিন্তু ভবানীপুরের অম্বষ্ঠসম্মিলনী সভার অধ্যক্ষ হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ও জমিদার শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে ইহা আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। দুর্গাকান্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কৃত লঘুভারতেও এইরূপ কাহিনী আছে—সমাজপতি মহাশয় কেন যে ইহাকে "তথাকথিত" পঞ্জিকা বলিয়া অবগীত ও উপেক্ষিত করিলেন তাহার কারণ তিনিই জানেন। হাণ্টার ও খোদাবকশ যাহা সত্য বলিয়া সার্টিফাই না করিবেন, তাহা কি প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবেই না? তবে এ কালের তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা একালে অর্থলোভে জালবচন ও জালপাতি, দিয়া শূদ্রগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেও সেকালের প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা তাহা করিতেন না, একারণ এই ব্রাহ্মণপঞ্জীখানিকে ব্রাহ্মণ সমাজপতি মহাশয় প্রকৃত ভাবিলেও পারিতেন।

চতুর্ভুজ পঞ্জী—

বঙ্গে শ্রীশালবান্ নাম ভূপো বিখ্যাতবিক্রমঃ।
শালাব্দো নির্ণয়ো যস্য সর্ব্বলোকাবগোচরঃ॥
বৈদ্যবংশসমুদ্ভূতঃ স চ ভূপঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্যাজ্ঞয়া সর্ব্ববর্ম্মা চকার শব্দশাসনম্।
ব্যাকরণং কলাপাখ্যং মূলসূত্রং বিচক্ষণঃ॥

অর্থাৎ বঙ্গদেশে শালবান্ নামে একজন বৈদ্য রাজা ছিলেন, শালাব্দ তাঁহারই প্রবর্ত্তিত। এবং তাঁহার গুরু শর্ববর্ম্মাচার্য্য তাঁহারই শিক্ষার জন্য কলাপ ব্যাকরণ রচনা করেন।

আমি যশোহর, ফরিদপুর, দিনাজপুর ও বিক্রমপুর হইতে পাঁচখানি চতুর্ভুজ গ্রন্থ আনাইয়া ইহা ও আরও বহু বচন প্রাপ্ত হই। ৺বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ও আমাকে একখানি চতুর্ভুজ প্রদান করেন। দিনাজপুরের জজের উকিল

খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি-এ, বি-এল মহাশয় আমাকে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত যে চতুর্ভুজ প্রদান করেন, তাহাতেও উক্ত বচনাবলী বিবৃত রহিয়াছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমাজপতি মহাশয় আমাকে উপহাস করিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানির বচনের একবারও সমুল্লেখ করেন নাই। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য কৃত এই দুইখানি প্রাচীন পঞ্জিকার বচন মিথ্যা, আর কায়স্থ রামদাস বাবুর বাজলা কথাটাই প্রকৃত সত্য, ইহা কোন্ যুক্তিতে স্থিরীকৃত হইল, ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। চতুর্ভুজ লিখিতেছেন যে—

চতুর্ভুজঃ সেনকুলাবতংসঃ।
বৈদ্যঃ প্রিয়া সর্ব্বগুণানুরাগী।
শাকেঽষ্টবাহশশিপ্রমাণে।
চকার পঞ্জীং ভিষজাং কুলস্য।

সুতরাং ইহার প্রণয়ন কাল ১২৮৯ শকাব্দ বা ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ইহা যে কেন অপ্রামাণ্য হইবে তাহা সমাজপতি মহাশয় বুঝাইয়া বলেন নাই।

অবশ্য ভক্তিভাজন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রমের কথা বলা ধৃষ্টতাবিশেষ। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যখন আমরা বড় হইয়াছি ও আমাদিগের অনন্তর বংশেরাও বড় হইবে, জ্ঞান পাইবে, তখন ইহার ভুলভ্রান্তিগুলি দেখাইয়া দেওয়াই ভাল। আমরা জানি পূর্ব্ববঙ্গের একজন সাধারণ পণ্ডিত একবার এই বোধোদয়ের ধাতুপ্রকরণের একটী ভুল পত্রদ্বারা জানাইলে মহামনাঃ বিদ্যাসাগর তাহা সংশোধন করিয়া ভূমিকায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। এবং শ্রীহট্টের একজন মুসলমান ভদ্রলোক এই হিজিরা সালের পরিভাষা বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলে তিনি সেবারও কৃতজ্ঞতার সহিত আপনার ভুল শুধরাইয়া লয়েন। আমরাও বিনীতহৃদয়ে জিজ্ঞাসু শিশুগণের কল্যাণার্থ জ্ঞান ও দয়ার সাগর মানবদেবতা বিদ্যাসাগরের প্রমাদের নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নপ্তা, সমাজপতি মহাশয়ের হৃদয় কেন ধৈর্য্যবিহীন হইল তাহা তিনিই জানেন।

আমরা প্রবন্ধের উপসংহারে বিনীতহৃদয়ে কেবল হিতৈষণাপ্রণোদিত হইয়াই বলিতেছি যে কোনও মাসিক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় অন্যের লিখিত এরূপ একটী প্রবন্ধ আপনার পত্রিকায় স্থাপন করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার ন্যায় ও স্বাধীনচিন্তার পরিভ্রংশ ঘটিয়াছে। যাঁহারা ধনবলে অন্যের দ্বারা গ্রন্থ

শিখাইয়া নিজ নামে প্রচারিত করেন, তাঁহারা প্রকৃত বন্দনীয় ও স্তুতিযোগ্য বটেন কি না তাহা ধীরমনে স্থিরচিত্তে চিন্তনীয়। পরিশেষে

নহু বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা
গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ।

এই মহাজনবাক্য পাঠ করিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দান করিলাম। "গুণাঃ পূজাস্থানং" এই মহাজন বাক্যেরও সাফল্য হউক, পরন্তু পদ, পরিচ্ছদ বা ধন-বস্তাদির নহে। সাহিত্য সম্পাদক "স্তায়বান্", গুণগ্রাহী, "সত্যসন্ধ" ও "স্বাধীনচেতাঃ" লোকের এই যে ধারণা আছে তাহা যেন নষ্ট না হয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

বিষ্ণুসংহিতায় দণ্ডবিধি।

স্মৃতিশাস্ত্রে সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অপরাধের বর্ণনাও খুব বিশদ। প্রজার সম্পত্তি রক্ষা করা রাজধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। যে দেশে দুষ্ট লোকে যদেচ্ছাক্রমে অপরাপর প্রজার অর্জ্জিত সম্পত্তি হরণ করে সে দেশের লোকে পূর্ণ মাত্রায় পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ হয়। নিজের পরিশ্রমের ফল নিজের ইচ্ছামত ভোগদখল করিতে পারিবে না, এ কথা জানিলে লোকে প্রাণপাত পরিশ্রম দ্বারা কৃষি শিল্পের উন্নতি করিতে যত্নবান হয় না। রাজধর্ম্ম বর্ণনা করিবার সময় মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"চাটুতস্করদুর্ব্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ
পীড়্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ।"

প্রতারক, তস্কর, দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণ ইত্যাদি এবং বিশেষতঃ কায়স্থগণ দ্বারা নিরন্তর উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবেন। রাষ্ট্র মধ্যে হিতকরী বিদ্যার প্রসারের জন্য নরপতি ধীমান ব্যক্তিবর্গকে শান্তিতে রক্ষা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিবেন। মহামুনি বলেন—

"দৃষ্ট্বা জ্যোতির্ব্বিদোবৈদ্যান দদ্যাদ্গাং কাঞ্চনং মহীম।"

তিনি জ্যোতির্ব্বিদ ও বৈদ্যগণকে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে কাঞ্চন ও ভূমি দান করিবেন।

সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অপরাধ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি প্রথমেই চুরির উল্লেখ

করিয়াছে। ঠিক কি কার্য্য করিলে চুরি করা হয় তাহার সিদ্ধান্ত লইয়া আইনকারদিগকে অনেক বাক্যব্যয় যুক্তিতর্ক করিতে হইয়াছে। আধুনিক সভ্য জগতের অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে এরূপ বর্ণনা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে। বড় বড় রাষ্ট্রে বিচার ভার সহস্র সহস্র ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। সুতরাং চুরি করা অপরাধটার ধারণা যদি বিচারকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের হয় তাহা হইলে বিচারফলের পার্থক্য ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রাচীন আর্য্যজাতির স্মৃতিশাস্ত্রে নানা প্রকারের চুরির দণ্ড নিরূপিত হইলেও চুরির কোনও বর্ণনা নাই।

বিষ্ণুসংহিতায় দেখিতে পাই

"অজামাপহাপ্যেককরশ্চ"

অজা হরণ করিলে এক হস্ত কাটিয়া দিবে। ধান্যাপহারীর অপহৃত ধনাপেক্ষা একাদশ গুণ দণ্ড। অন্য শস্যাপহারীরও ঐ দণ্ড।

"সুবর্ণরজতবস্ত্রাণাং পঞ্চাশতস্ত্বভ্যধিকমপহরণ বিকরঃ।"

পঞ্চাশৎ পলাধিক স্বর্ণ রজত বা পঞ্চাশৎ সংখ্যক বস্ত্র অপহরণ করিলে রাজা অপরাধীর করচ্ছেদ করিয়া দিবেন। তন্যূন সুবর্ণাদি হরণে অপহৃত দ্রব্যের একাদশ গুণ অর্থ দণ্ড। সূত্র, কার্পাস, গোময়, গুড়, দধি, ক্ষীর, তক্র, তৃণ, লবণ, মৃত্তিকা, ভস্ম, পক্ষী, মৎস্য, ঘৃত, তৈল, মাংস, মধু, বৈদল, বেণু, মৃণ্ময় পাত্র অথবা লৌহভাণ্ড হরণ করিলে সেই অপহৃত দ্রব্যের তিন গুণ অর্থদণ্ড। পক্কান্ন হরণেও তাহার মূল্যাপেক্ষা তিন গুণ অর্থদণ্ড। শাকমূল ফল হরণেও ঐ দণ্ড। রত্ন হরণ করিলে উত্তম সাহস দণ্ড।

"অনুক্তদ্রব্যাণামপহর্ত্তা মূল্যসমম।"

যে সকল দ্রব্য উল্লেখিত হইল না তাহা অপহরণে মূল্যের সমান অর্থদণ্ড। সমস্ত অপহৃত দ্রব্য অবশ্য দ্রব্যস্বামী প্রাপ্ত হইতেন। চোর উপরি উক্ত নিয়মানুসারে দণ্ডিত হইত।

সমুদ্র গৃহভেদকের বা যে চাবিবদ্ধ গৃহ গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে উদ্ঘাটিত করে তাহার শত কার্ষাপণ দণ্ড।

চৌর্য্যাপরাধের দণ্ড বর্ণনা ক্রমে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

ক্ষুদ্রমধ্যমহাদ্রব্যহরণে সারতো দমঃ

দেশ কালবয়ঃ শক্তীঃ সঞ্চিন্ত্য দণ্ডকর্ম্মণি।

অর্থাৎ ক্ষুদ্র মধ্য বা মহাদ্রব্য হরণে অপহৃত দ্রব্যের মূল্যানুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবে এবং এই কল্পনা করিবার পূর্ব্বে দেশ, কাল, বয়স, শক্তি, জাতি প্রভৃতিও চিন্তা করিবে।

আধুনিক দণ্ডবিধি অনুসারে কোনও ব্যক্তি চৌর্য্যাদি কতকগুলি অপরাধে একবার দণ্ডিত হইবার পর পুনর্ব্বার ঐ অপরাধ করিলে তাহাকে দ্বিতীয় বারে অধিক শাস্তি ভোগ করিতে হয় এবং সে যতবার অপরাধ করে ততবার তাহাকে পূর্ব্ববারাপেক্ষা অধিক কঠোর দণ্ড পাইতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার কতকটা অনুরূপ বিধান যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

উৎক্ষেপকগ্রন্থিভেদৌ করসন্দংশহীনকৌ।
কার্য্যৌ দ্বিতীয়াপরাধে করপাদৈক হীনকৌ॥

উৎক্ষেপক বা ছিঁচকে চোর, এবং গ্রন্থিভেদক বা গাঁইটকাটাদিগের যথাক্রমে করচ্ছেদ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীচ্ছেদ কর্ত্তব্য। উহারা দ্বিতীয়বার ঐরূপ অপরাধ করিলে এক এক হস্ত ও পাদ কাটিয়া দিবে।

তস্কর দমনের জন্য শাস্ত্রে হিন্দু রাজপুরুষদিগকে নানারূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহার নিকট অপহৃত দ্রব্য পাওয়া যাইত, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে চৌর্য্যাপরাধ জন্য দণ্ডভোগ করিয়াছে অথবা যাহার বাসস্থান সাধারণের নিকট বিদিত নহে এ সকল লোককে রাজপুরুষগণ সন্দেহবশতঃ ধরিতে পারিত। এ বিধান আধুনিক ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৫৪ ধারার অনুরূপ। শেষোক্ত আইনের ৫৫ ধারানুসারে সন্দেহ মাত্রে বদমায়েস প্রভৃতির গ্রেপ্তারের কথা সকল পাঠক অবগত আছেন সন্দেহ নাই। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার একটা বিধান আধুনিক আইনের ঐ অংশটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি বলেন—

অন্যেঽপি শঙ্কয়া গ্রাহ্যা জাতিনামাদিনিহ্নবৈঃ
দ্যূত স্ত্রীপানসক্তাশ্চ শুষ্ক ভিন্নমুখস্বরাঃ।
পরদ্রব্য গৃহাণাঞ্চ প্রচ্ছকা গূঢ়চারিণঃ
নিরয়া ব্যয়বন্তশ্চ বিনষ্টদ্রব্যবিক্রয়াঃ॥

"সন্দেহ হইলে ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি ব্যক্তিকে ধরিতে পারা যায়—যাহারা জাতি, নাম প্রভৃতির অপহ্নব করে, যাহারা দ্যূত, বারাঙ্গনা, মদ্যপানাদি ব্যসনে অত্যাসক্ত, রক্ষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহাদের মুখ শুষ্ক হয় বা স্বর পরিবর্ত্তন হয়, যাহারা বিনা কারণে পরধন ও পরগৃহের বিবরণ জিজ্ঞাসা করে, যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করে, যাহাদিগের আয় নাই ব্যয় আছে এবং যাহারা প্রায়ই বিনষ্ট দ্রব্য বিক্রয় করে"।

আধুনিক ভারতবর্ষের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন গ্রামের মণ্ডল, গ্রামের হিসাবনবীস, চৌকীদার, ভূম্যধিকারী বা ভূম্যধিকারীর কর্ম্মচারীর উপর কতক-

গুলা দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। গ্রামের মধ্যে কোনও অপহৃত-দ্রব্য-গ্রাহক অথবা ঠগ্ দস্যু বা পলাতক আসামী থাকিলে, কিংবা শান্তিভঙ্গ বা আকস্মিক অপমৃত্যু ঘটিলে অথবা হত্যা, দস্যুতা প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর অপরাধ ঘটিলে বা তাহার সম্ভাবনা থাকিলে, সেই গ্রামের মণ্ডল প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে অচিরে সন্নিকটবর্ত্তী থানায় সংবাদ প্রেরণ করিতে হয়। তাহা না করিলে আইনে তাহারা দণ্ড পাইতে পারে। এইরূপ ভাবে গ্রাম্য মণ্ডল, ভূম্যধিকারী প্রভৃতিকে স্বগ্রামের শান্তি-রক্ষার জন্য কথঞ্চিৎ দায়িত্ব প্রদান করিবার পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত আকারে মোগল ভূপতিদিগের শাসন সময়ে প্রচলিত ছিল। পাঠান কুলবীর সেরসাহও নিজ বিক্রমর্জ্জিত পরগণা সমূহের শান্তি রক্ষার জন্য ঐ প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন।

প্রথাটা কিন্তু মুসলমান বা ইংরাজের নিজস্ব নহে। ভারতবর্ষীয় গ্রাম্যশাসন প্রথায় একটা নূতনত্ব আছে, তাহা সার হেনরী মেন প্রভৃতি মনীষিগণ বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। হিন্দুস্থানে গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের উপর গ্রামের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব আবহমান কাল হইতে অর্পিত হইয়া আসিতেছে। আমরা মনুসংহিতায় সে প্রথার বর্ণনা পাঠ করি। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় দেখি—

> ঘাতিতেঽপহৃতে দোষো গ্রামভর্ত্তুরনির্গতে
> বিবীতভর্ত্তুস্তু পথি চৌরোদ্ধর্ত্তুরবীতকে।
> স্বসীম্নি দদ্যাদ্ গ্রামস্তু পদং বা যত্র গচ্ছতি
> পঞ্চগ্রামী বহিঃক্রোশাদ্দশগ্রাম্যথবা পুনঃ।

গ্রাম মধ্যে নরহত্যা বা দ্রব্য অপহৃত হইলে যদি গ্রামরক্ষক চোরের নির্গমন পথ প্রদর্শন করাইতে না পারে তাহা হইলে সে দোষ তাহার। বিবীত স্থলে অপরাধ হইলে তাহা বিবীত পালকের এবং পথিমধ্যে হইলে দোষ রক্ষীদের। গ্রাম-সীমান্ত ভাগে হত্যা,অপহরণাদি হইলে গ্রামবাসীদিগকেই চোর ধরিয়া দিতে হইবে বা ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে। নির্গমন-পদচিহ্ন গ্রামান্তরে প্রবিষ্ট হইলে,সেই গ্রামপালককে ঐরূপ করিতে হইবে। বহুগ্রামের মধ্যস্থলে এক ক্রোশ অন্তরে হত্যা, অপহরণাদি হইলে পঞ্চগ্রামের লোক বা দশগ্রামের লোক উক্তরূপে অপরাধের প্রতিবিধান করিবে।

আধুনিক আইন কেবলমাত্র গ্রামবাসীদিগের উপর রাজপুরুষদিগকে অপরাধের সংবাদ দিবার দায়িত্ব প্রদান করে। হিন্দুর ব্যবহার তাহাদিগের উপর চোর ধরিয়া দিবার দায়িত্ব অবধি অর্পণ করিত। তদানীন্তন কালে এ প্রথা

অত্যন্ত হিতকর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে শাসনব্যয় লাঘব হইত এবং প্রজাদিগকে সতর্ক করিয়া রাখা হইত। এ বিধানের অনুগ্রহে গ্রামবাসীগণের পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি পাইত—এক গ্রামবাসী প্রজাবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থ সমগ্র গ্রামের স্বার্থে নিমজ্জিত হইত।

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার নিকট হইতে কোনও পদার্থ লইলে বা ঐরূপ ভীত ব্যক্তির নিকট হইতে কোনও দলিলাদি লিখাইয়া লইলে প্রথম ব্যক্তি ইংরাজি আইনানুসারে 'একষ্টরসান্' অপরাধে অপরাধী হয়। বলা বাহুল্য, অপরাধটি উপরোক্ত কতকগুলি অপ-রাধের সংমিশ্রণে গঠিত। সুতরাং হিন্দুসংহিতায় ইহার বিভিন্ন নামকরণ হয় নাই। এরূপ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ডপ্রদান করিবার যথেষ্ট উপায় ছিল। বলপ্রকাশ করিয়া দলিলাদি সাক্ষরিত করিয়া লইলে সে দলিল আদালতে গ্রাহ্য হইত না, সে সম্বন্ধে বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। যে যে দোষ থাকিলে ইংরাজি আইনানুসারে দলিল বাতিল হয় প্রায় সেই সেই কারণে হিন্দু ব্যব-হারানুসারে তাহা অগ্রাহ্য হইত। বিষ্ণুসংহিতায় লেখ্য ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক।

"রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত-কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ করচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম।"*

রাজ-বিচারালয়ে রাজ-নিযুক্ত কায়স্থ লিখিত এবং বিচারালয়াধ্যক্ষের কর চিহ্নিত লেখ্য রাজসাক্ষিক দলিল বলিয়া পরিগণিত হইত, অপর স্থানে সাধারণ ব্যক্তির লিখিত সাধারণ সাক্ষিগণের হস্তচিহ্নিত লেখ্য সসাক্ষিক। আর কেবল স্বহস্ত লিখিত অপর সাক্ষিরহিত দলিল অসাক্ষিক। কিন্তু ঐরূপ লেখ্য নানা কারণে অপ্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত।

"তদ্বলাৎকারিতমপ্রমাণম। উপধিকৃতাচ সর্ব্ব এব। দূষিতকর্ম্মদুষ্টসাক্ষ্যঙ্কিতং তৎ সসাক্ষিকমপি। তাদৃশিধেন লিখিতঞ্চ।"

অর্থাৎ (দলিল) বলপূর্ব্বক সাধিত হইলে তাহা রাজদ্বারে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। ছলপূর্ব্বক সাধিত লেখ্যও বিচারালয়ে গ্রাহ্য নহে। যাঁহারা দলিল সম্বন্ধীয় ইংরাজী আইন অবগত আছেন তাঁহারা জানেন ঠিক উপরোক্ত কারণে আধুনিক আদালত দলিলাদি নামঞ্জুর করিতে পারে। হিন্দু আইন আধুনিক

* আমার বোধ হয় প্রাচীন ভারতে আধুনিক রেজিষ্ট্রির সমতুল্য রাজসাক্ষিক করিবার কোন উপায় ছিল সে কথা ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

আইনাপেক্ষা একটু অধিক দূর গমন করিত। দূষিত কর্ম্ম দুষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক সাক্ষ্যরূপে সাক্ষরিত লেখ্য বা তাদৃশ দূষিত কর্ম্ম দুষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত দলিলও অপ্রমাণ। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। মন্দলোকের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা নিরাপদ নহে।

কিরূপ শ্রেণীর লোক দলিল করিতে পারে সে সম্বন্ধে আধুনিক ব্যবহারের বিধান আছে। উন্মত্ত ব্যক্তি কোনও প্রকার আইনসম্মত চুক্তি বা দান বিক্রয় করিতে পারে না। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উইল, দানপত্র বা বিক্রয়লেখ্য মঞ্জুর নহে। এ বিষয়ে বিষ্ণুসংহিতার বিধান—

"স্ত্রীবালাস্বতন্ত্রমত্তোন্মত্ত ভীততাড়িতকৃতাশ্চ।"

অর্থাৎ 'স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত এবং তাড়িত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত দলিল প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না।' বলা বাহুল্য, আধুনিক ব্যবহার-শাস্ত্র স্ত্রীলোককে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে এবং তাহাদিগের সাধিত লেখ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করে। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন নীতি একটু কঠোর ছিল। হিন্দু-দিগের ধারণা ছিল—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার রক্ষণাধীন থাকিবে, যৌবনে তাহাকে স্বামী রক্ষা করিবে। এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রই তাহার রক্ষাকর্ত্তা। স্ত্রীলোকের কদাপি স্বাতন্ত্র্য উচিত নহে। এ নিয়ম আধুনিক নীতির চক্ষে দেখিলে কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তদানীন্তন কালে ইহাই নীতি ছিল। সেই নীতি অনুসারে মহামুনি বিষ্ণু লেখ্য প্রকরণে স্ত্রীলোক সাধিত লেখ্যকে অপ্রমাণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যাহাতে হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোক যথেষ্টরূপে সম্মানিত হয় এবং তাহাদিগের কোনওরূপ অভাব না থাকে তজ্জন্য হিন্দু শাস্ত্র-কারগণ স্পষ্ট অক্ষরে আজ্ঞা প্রচার করিতে বিরত হয়েন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় হিন্দুগণ আদিষ্ট হইয়াছে—

ভর্তৃভ্রাতৃপিতৃজ্ঞাতিশ্বশ্রূশ্বশুরদেবরৈঃ
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।

অর্থাৎ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণ অলঙ্কার বস্ত্র ও ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা স্ত্রীগণকে পরিতুষ্ট করিবেন।

আধুনিক ব্যবহারশাস্ত্র সাধারণ নীতিবিগর্হিত চুক্তি (কন্‌ট্রাক্ট) প্রভৃতি

আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করে না। বিষ্ণুসংহিতায় দেখিতে পাই যে, দেশাচারবিরুদ্ধ লেখ্য প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইত না।

একটইরসানের পর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন দস্যুতা এবং ডাকাতির শাস্তি বর্ণনা করিয়াছেন। এ দুইটি অপরাধও একাধিক অপরাধের মিশ্রণে ঘটিয়া থাকে। তাহা হইলেও হিন্দু জাতির ব্যবহারশাস্ত্রে দস্যুতার বিভিন্ন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

দস্যুতা বা সাহসিকতা এবং চৌর্য্যের পার্থক্য মনুসংহিতায় নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

স্যাৎ সাহসন্ত্বন্বয়বৎ প্রসভং কর্ম্ম যৎ কৃতম্।
নিরন্বয়ং ভবেৎ স্তেয়ং হৃত্বাপহ্নূয়তে চ যৎ॥

দ্রব্যস্বামীর সমক্ষে বলপূর্ব্বক যে অপহরণ তাহাকে 'সাহস' বলে। অসমক্ষে গোপনভাবে অপহরণের নাম চুরি। এবং কেহ কাহারও নিকট দ্রব্য লইয়া যদি তাহার অপহ্নব অর্থাৎ অস্বীকার করে তাহাকেও চুরি বলে। ইংরাজি আইনানুসারে শেষোক্ত অপরাধের নাম 'আত্মসাৎ' করা। বলা বাহুল্য, যে ব্যবহারশাস্ত্রে দস্যুতার শাস্তির বিধান নাই, সে ব্যবহারশাস্ত্র অসম্পূর্ণ।

পরদ্রব্য আত্মসাৎ করা বা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পরদ্রব্য নিজস্ব করা অপরাধেরও বিষ্ণু, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ শাস্তির বিধান করিয়াছেন। "সাধারণ্যাপলাপ" এবং 'যোষিতস্যাপ্রদাতা' অর্থাৎ সাধারণ বস্তু আত্মসাৎ করিলে এবং অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত দ্রব্য নিজস্ব করিলে, বিষ্ণুসংহিতা মতে অপরাধীকে মধ্যম সাহস দণ্ড ভোগ করিতে হইত।

অপহৃত দ্রব্য জ্ঞানতঃ দস্যুতস্করাদির নিকট হইতে গ্রহণ করা আধুনিক ও প্রাচীন ব্যবহারের চক্ষে অপরাধ। বলা বাহুল্য, এ বিধান সমাজের পক্ষে প্রভূত পক্ষে হিতকর। অবশ্য না জানিয়া কোনও দ্রব্য ক্রয় করিলে, পরে তাহা চৌর্য্য লব্ধ বলিয়া সপ্রমাণ হইলেও ক্রেতাকে হিন্দু বা ইংরাজি আইনানুসারে দণ্ডভোগ করিতে হয় না।

"অজ্ঞানানঃ প্রকাশং যঃ পরদ্রব্যং ক্রীণীয়াৎ তত্র তস্যাদোষ।"

"যে অজ্ঞানতঃ এবং প্রকাশিত ভাবে পরদ্রব্য ক্রয় করে সে দোষী নহে।" তবে আধুনিক কালের মত সে অপহৃত বস্তু দ্রব্যস্বামীই প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু

"যদ্যপ্রকাশং হীনমূল্যাক ক্রীণীয়াৎ তদা ক্রেতা বিক্রেতা চ চৌর চহ্মাসৌ।"

"গুপ্তভাবে অল্প মূল্যে পরদ্রব্য ক্রয় করিলে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই

চোরের সমান দণ্ড পাইতে হয়।" বিষ্ণুসংহিতা বর্ণিত উপরোক্ত নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বলিতেছেন—

"বিক্রেতুর্দর্শনাচ্ছুদ্ধিঃ"

বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিতে পারিলে অপহৃত দ্রব্য-ক্রেতা নিষ্কৃতি পাইবে। এই বিবাদে দ্রব্য স্বামীকে ক্রয় কিম্বা উপভোগের সাক্ষ্য দিতে হইত। তাহা না হইলে চোরের বা চুরিলব্ধ দ্রব্য ক্রেতার কোনওরূপ দণ্ড হইতে পারিত না।

ক্রমশঃ।

এস।

গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিমরাশি,
আদরে দুলায় শাখা প্রভাত-পবন আসি';
ঝরিতেছে হিমভার,
সরিতেছে অন্ধকার;
পাণ্ডুর অধরে তার ফুটিছে রক্তিম হাসি।

ওগো, তুমি এস—এস, খসিয়া সে প্রেমশ্বাস!
কত দিন আছি বেঁচে—ক্রমে হয় অবিশ্বাস!
এস, মৃত্যু-দ্বার ভাঙ্গি'—
আকাশ উঠুক রাঙ্গি',—
পড়ুক হৃদয়ে মোর তোমার হৃদয়াভাস!

আবার দাঁড়াও, দেবী, দৃষ্টি মুগ্ধ করি' হিয়া,
নারীসম ভালবেসে সুখে দুখে আলিঙ্গিয়া!
কৈশোর-কল্পনা সম
জড়ায়ে জীবন মম,
আধ-স্বপ্ন-জাগরণে—জগতে আড়াল দিয়া।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সাহিত্য-সমাচার।

ব্যবসা ও বাণিজ্য।—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯। শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য—৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা। এই নূতন মাসিকখানির বিজ্ঞাপন আড়ম্বর দেখিয়া মনে হইয়াছিল বাঙ্গালায় মাসিক-সাহিত্য-রাজ্যে ইহা বুঝি সত্যসত্যই 'যুগান্তর আনয়ন করিবে'। এখন দেখিতেছি, 'যত গর্জ্জন তত বর্ষণ নহে',—এ প্রবচন মিথ্যা নহে। অন্ততঃ এই মাসিকের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। কাগজখানির মলাটে লেখা আছে,—"নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র।" আমরা কিন্তু ইহার ভিতর তন্ন তন্ন করিয়াও বিশেষ কিছু নূতনত্ব খুঁজিয়া পাইলাম না। 'নূতনত্বে'র মধ্যে শুধু দেখিলাম, বিলাতী 'পঞ্চে'র অনুকরণে ইহাতে এক আধটু রঙ্গরস করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু অক্ষমের অনুকরণ সচরাচর যেমন শোচনীয় হইয়া থাকে, দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। ইহাতে লোক হাসিয়াছে বটে; কিন্তু হাস্যের পাত্র ইহার রচয়িতা স্বয়ং। রচয়িতা জানেন না যে, রসিকতা সুপ্রযুক্ত না হইলে তাহা 'ছিব্‌-লামি'তে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ একস্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

পাঁচুগোপালের পিতা পাঁচুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বলি, হ্যাঁরে পেঁচো! কি, হোয়েছে কি রে? আমার দিকে চেয়ে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছিস্ কেন রে!"

পাঁচু! (মাটীর দিকে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) তবে বল্‌বো বাবা?—এবার তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফিরে গেছে। আমার শালার নাম আর তোমার নাম এক দেখ্‌চি।

উদাহরণ দ্বারা না দেখাইলে আমাদের কথা কেহ ভাল বুঝিতে পারিবেন না মনে করিয়া আমরা অনিচ্ছা সত্বেও এই বটতলার রসিকতা উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য 'অর্চ্চনা'র পাঠক পাঠিকাগণের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

শুধু যে এইরূপ রসিকতা (?) ইহাতে স্থান পাইয়াছে, তাহা নহে! এই সঙ্গে আবার মুরুব্বিয়ানাও যথেষ্ট আছে। একস্থলে লিখিত আছে,—"থিয়েটারে যাওয়াটাইত পাপ ও দুর্নীতিমূলক।" পাপই বটে! যে থিয়েটারে পরমহংসদেব স্বয়ং গিয়া নাট্যাভিনয় দেখিয়াছিলেন, যে থিয়েটারে কর্ম্মবীর বিদ্যাসাগর, সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অভিনয় দেখিতে কোনকালে সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই, সেই থিয়েটারে যাওয়া পাপ! আর রাজনৈতিক মঞ্চে উঠিয়া ভণ্ডামির অভিনয় করা পুণ্য! হায়রে অদৃষ্ট! লেখক স্মরণ রাখিবেন, বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক না কেন, ইহা কিন্তু এখনও বাঙ্গালার রাজনৈতিকক্ষেত্রের মত কপটতার লীলাভূমিতে পরিণত হয় নাই। এখানে তাঁহার যথেচ্ছাচারের অভিনয় অবাধে কেহ সহ্য করিবে না। জাগরণ এখানে জাগ্রত হইয়া আছে। থিয়েটার সম্বন্ধে ইহাই বলিতে পারি,—

> What pulpits reach not, and would fail to reach,
> The stage, well purified, would safely teach.

মনীষী বিপিনচন্দ্রও বঙ্গ রঙ্গালয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে একদিন দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন,—"আমাদের বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন ও তন্নিহিত স্বদেশহিতৈষার অভিনব ক-

প্রাণময় আদর্শ—এতদুভয়ই বহুল পরিমাণে বাঙ্গালা নাট্যকলা ও বঙ্গীয় রঙ্গালয় সকলের দীর্ঘকাল ব্যাপী চেষ্টার ফল। আরও অনেকে এক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বঙ্গ রঙ্গালয় সমূহ যেরূপভাবে যতটা বিস্তৃতরূপে ও যে পরিমাণে সফলতা সহকারে একার্য্য করিয়াছে, আর কেহ সেরূপ করিয়াছে কি না, সন্দেহ।

সর্ব্বপ্রথমে—সে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা—বঙ্গ রঙ্গমঞ্চই নীলদর্পণ, সুরেন্দ্রবিনোদিনী, শরৎসরোজিনী, পলাশীর যুদ্ধ ও ভারতমাতা প্রভৃতি নাটক ও রূপকের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালার প্রাণে এক উন্মাদিনা স্বদেশহিতৈষা জাগাইয়া দেয়।

সমাজসংস্কারেও তখন বঙ্গ রঙ্গালয় সকল স্বল্প সাহায্য করে নাই। কুলীনকুল সর্ব্বস্ব, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি নাটক রঙ্গমঞ্চে প্রকটিত করিয়া সময়োপযোগী সংস্কার কার্য্যেও জনগণকে ইহারা প্রচুর পরিমাণে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। * * ইত্যাদি।

এই সকল কারণে, বাঙ্গালা নাট্যকলা ও বঙ্গ রঙ্গালয় আমাদের জাতীয় জীবনে এমন একটা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, যাহাতে আর তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলা সঙ্গত হইবে না। ভাল হউক, মন্দ হউক, জনসাধারণের মতিগতির উপরে ইহাদের আধিপত্য প্রভূত। বঙ্গ রঙ্গালয়ের এই অপরিসীম শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংস্কৃত করিতে না পারিলে তাহাদের আপনার সফলতা ও আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি, উভয়েরই ব্যাঘাত উৎপন্ন হইতে পারে। প্রকৃত এই সকলকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, তদ্দ্বারা এমন শক্তি সঞ্চার করা সম্ভব, যাহা না কার্য্যে, না বাগ্মিতায়, না অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হইবে।"

'ব্যবসা ও বাণিজ্য' সম্পাদক এ উক্তিতে সায় দিবেন না, জানি। তাঁহার কাছে এ উপদেশ ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। কেন না, যাঁহাদের ধরিয়া তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে উঠিবার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহাদেরই স্বরূপ মূর্ত্তি বঙ্গ রঙ্গালয়ে 'বাবু' প্রভৃতি প্রহসনে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সুতরাং থিয়েটারের উপর ক্রোধ হওয়া ইহাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পাপী কাহারা? যাহারা ভণ্ডের মুখোস উন্মোচন করিয়া দিতেছে তাহারা? না, যাহারা ভণ্ড—তাহারা? ভণ্ডের চেয়ে বড় শত্রু দেশের আছে কি না, জানি না তবে একথা নিঃসংকোচে বলিতে পারি, যাহারা নিজের স্বার্থ-সাধন উদ্দেশে স্বদেশহিতৈষী সাজিয়া দেশের ও দশের অপকার সাধন করিতেছে, তাহারাই মহাপাপী। তাহাদের দমন না করিতে পারিলে দেশের কোন ভরসা নাই। আর এই দমন করিবার শক্তি একমাত্র বঙ্গ রঙ্গালয়েরই আছে, দেখিতেছি।

উপসংহারে বলিয়া রাখি, তিন টাকা ছয় আনা দিয়া এ কাগজ কেহ পাড়িবে বলিয়া মনে হয় না। যে দেশে লোকের আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহের অর্থাভাব সে দেশে এই 'জ্যাঠামী' মূল্য দিয়া কে কিনিবে?

ধ্রুব—বৈশাখ, ১৩১৯। বার্ষিক মূল্য ১৲। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত। সুন্দর কাগজ, আর্টপেপারে দুই রঙে ছাপা কভার, নানাবর্ণে মুদ্রিত সম্রাট সম্রাজ্ঞীর চিত্র, এবং অন্যান্য বহুচিত্র সুশোভিত। বর্ত্তমান সংখ্যায় মঙ্গলাচরণ—ধ্রুব (কবিতা)—পরিচয়—পুরী—নববর্ষ (কবিতা)—মান্মথ—চীনদেশে ছাত্রজীবন—সহজ গার্হস্থ্য শিল্প—কাঞ্চার—বুদ্ধির দৌড় (কবিতা)—স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার—এই কয়টী বিষয় আছে। প্রথমে "মঙ্গলাচরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় লেখক বলিতেছেন—"আমাদের ধ্রুব বলিয়া দিবে, বালক বালিকাই সমাজের হেমপিণ্ড—সোণার তাল। বিবাদের আঘাতে, পরাভক্তির অগ্নিতাপে, এই সোণার

তাহাকে গলাইয়া ভগবৎকৃপার ছাঁচে ঢালিতে পারিলে, ঘরে ঘরে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বিরাজ করিবে; ছেলে মেয়েরা দেবদেবীর আকার ধারণ করিয়া ভুবন আলো করিবে। ধ্রুব শিখাইবে যে ইহ জগতে ভগবান ছাড়া গতি নাই। * * * হিন্দু গৃহস্থের বালক বালিকাকে হিন্দুর হিসাবে সৎশিক্ষা দিবার চেষ্টা করিব, হিন্দু ছেলে মেয়েদের হিন্দু গড়িবার প্রয়াস পাইব।" বলা বাহুল্য, এত বড় সদুদ্দেশ্য লইয়া কোন শিশুপাঠ্য মাসিক ইতিপূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। সকল প্রবন্ধই শিক্ষাপ্রদ। "পরিচয়"—লেখক এক ইংরেজী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বালককে উপদেশচ্ছলে বুঝাইতেছেন যে নাম বলিতে হইলে প্রথমে "শ্রী" ব্যবহার করিতে হয় এবং পদবীর আগে "দেব শর্ম্মণঃ" বলিতে হয়—তেমনি স্বর্গীয় ব্যক্তির পরিচয়ে নামের আগে "স্বর্গীয়" বা ঈশ্বর" ব্যবহার করিতে হয়। বলা বাহুল্য আমাদের দেশে চিরকাল এ প্রথা প্রচলন থাকিলেও অধুনা ইংরেজী শিক্ষিত বাবুদের কৃপায় তাহা লুপ্তপ্রায়। ইহা শুধু বালকদের কেন অনেক বয়স্কেরও মনে রাখা উচিত। এই স্থানে একটা রহস্যের কথা বলি। এতাবৎ আমরা এই প্রবন্ধের লেখক বা উপদেষ্টাকে শ্রীযুক্ত 'জলধর সেন" বলিয়া জানিতাম, কিন্তু তিনি এ প্রবন্ধ লিখিয়াই নাম সহি করিয়াছেন "শ্রীজলধর দাস সেন।" বালকের হস্তে নিগৃহীত এবং বৈদ্য বা অন্য জাতিভুক্ত হইবার আশঙ্কা হইতে তিনি যে অব্যাহতি লাভ করিলেন ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। সাধু! আমরা এই নবজাত 'ধ্রুবে'র দীর্ঘ জীবন, উন্নতি ও বহুল প্রচার কামনা করি।

গ্রন্থ-সমালোচনা

তৃণপুঞ্জ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিরচিত। ইহা একখানি কবিতা পুস্তক, মনোরম বাঁধাই, মুদ্রাঙ্কন কার্য্য উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পাদিত। তৃণপুঞ্জের কবিতাপুঞ্জ নানা ছন্দে লিখিত এবং নানা বিষয়ক। "কোকিল" "বনমধু" "তরু" "জল" "জলের সঙ্গীত" প্রভৃতি সাধারণ পদার্থ লইয়া কবি যেরূপ দক্ষতার সহিত সনেট লিখিয়াছেন তেমনি দক্ষতার সহিত তিনি প্রেমের কবিতায় পুস্তকখানি সুরঞ্জিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের ধারণা অতি মহৎ। তাঁহার মতে

"ভালবাসা চিরস্থায়ী চিরজয়ী হবে,
প্রলোভিত পোড়া কাম দিনে ক্ষয় পাবে।"

কবির ধর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি বড় গম্ভীর অথচ আশাপ্রদ।

'আশ্চর্য্য' যাঁহার নাম
যিনি সর্ব্ব জীবারাম,
ঊর্দ্ধদিকে তাঁরি প্রতি কর নিরীক্ষণ,
ঘুচিবে ও অধীরতা, হ'বে শান্ত মন।

লেখক খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। প্রভু যীশু খৃষ্টে তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভরতা। আরাধ্যে এরূপ পূর্ণ বিশ্বাস বড় প্রীতিকর।

ভূধর, সাগর, হ্রদ   কল নিনাদিত নদ
উপত্যকা, বন, লতা   সুরঞ্জিত ফুলে গাঁথা
স্নিগ্ধ ঝরণার জল   মিষ্ট সুরসাল ফল
চারু সুবাসিত ফুল   কূজনিত পাখিকুল

বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল সুখকর পদার্থ "খৃষ্ট প্রেমে নিত্য নব।" এই কবিতার তিনি নামকরণ করিয়াছেন তত্ত্বস্নেহ। এই পুস্তকের প্রত্যেক কবিতাই সুন্দর, প্রত্যেকটিই উচ্চ ভাব সমন্বিত। আমরা এ গ্রন্থের বহুল প্রচারে সুখী হইব।

রত্নাবলী ও বিষবৃক্ষ।*

"রত্নাবলী" একখানি প্রথম শ্রেণীর প্রাচীন সংস্কৃত নাটিকা। ঘটনা, চরিত্র ও বর্ণনায় অনেকাংশে বঙ্কিম বাবুর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "বিষবৃক্ষে"র সহিত ইহার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় গ্রন্থের তুলনায় সমালোচনা করিয়া যথাশক্তি সেই সেই স্থানগুলি দেখাইবার চেষ্টা করিব।

রত্নাবলীর আখ্যায়িকা।

কৌশাম্বী নগরে 'বৎস' (অপর নাম উদয়ন) নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। রাজার প্রধান অমাত্য প্রভুভক্ত যৌগন্ধরায়ণ সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহুর দুহিতা রত্নাবলীর সহিত স্বীয় প্রভু বৎসরাজের পরিণয় সংঘটন করিবার জন্য নিরতিশয় উদ্যোগী হইলেন। কারণ, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছিলেন, রত্নাবলীর পাণিগ্রহীতা 'সার্ব্বভৌম নৃপতি' হইবে, কোনও সিদ্ধের এইরূপ আদেশ আছে। অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ এই বিশ্বাসে প্রভু বৎসরাজের জন্য বিক্রমবাহুর নিকট রত্নাবলীকে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বৎসরাজ সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্র হইলেও সিংহলেশ্বর মন্ত্রিবরের প্রার্থনা পূরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে—বৎসরাজ ইতিপূর্ব্বে বিক্রমবাহুর ভাগিনেয়ী অবন্তীরাজপুত্রী বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগিনেয়ীর সুখ শান্তির বিষয় চিন্তা করিয়াই সিংহলেশ্বর, কৌশাম্বীপতিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলেন না।

যৌগন্ধরায়ণ সিংহলেশ্বরের নিকটে এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইলেও রত্নাবলী লাভের প্রলোভন একেবারে ছাড়িতে পারিলেন না। তাঁহারই উপদেশানুসারে বিশ্বস্ত কঞ্চুকী বাভ্রব্য রাজমহিষী বাসবদত্তার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ লইয়া সিংহলে উপনীত হইলেন এবং রাজার বিবাহের জন্য আবার রত্নাবলীকে প্রার্থনা করিলেন। কৌশাম্বীরাজের সহিত একেবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হয়, এই জন্য এবারে বিক্রমবাহু যৌগন্ধরায়ণের প্রেরিত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্বীয়

* মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে "বারাণসী-শাখা সাহিত্য পরিষদে"র সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

অমাত্য বসুভূতির সহিত কন্যা রত্নাবলীকে কৌশাম্বী নগরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবতার অভাবনীয় বিড়ম্বনায় পথিমধ্যে সেই সুসজ্জিত তরী সমুদ্র-মগ্ন হইল।—যৌগন্ধরায়ণের বহুকাল পোষিত আশারাশি অতল জলে ডুবিয়া গেল। পরন্তু—

"দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ॥"

কৌশাম্বীর বণিকেরা সিংহল হইতে বাণিজ্য করিয়া ফিরিতেছিল, তাহারা বহুমূল্য রত্নমালা মণ্ডিত এক অসামান্য সুন্দরীকে জলমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া পোতে উঠাইয়া লইল, এবং আনিয়া অমাত্য যৌগন্ধরায়ণের নিকট প্রদান করিল। তিনি দেখিয়াই চিনিলেন যে,—এই সেই পূর্ব্ব পরিচিতা বহুবার প্রার্থিতা রত্নাবলী। যৌগন্ধরায়ণ এইরূপে দৈবের প্রতিকূলতানুকূলতার ঘাত প্রতিঘাতে রত্নাবলীকে লাভ করিলেন, কিন্তু এ বৃত্তান্ত ঘুণাক্ষরে কাহাকেও জানিতে দিলেন না। সপত্নীর সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া পাছে বাসবদত্তার কোপভাজন হন—এই আশঙ্কায় যৌগন্ধরায়ণ প্রকাশ্যভাবে রাজার সহিত রত্নাবলীর বিবাহের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইলেন না। তা'ই তিনি 'সাগরোপকূলে পাইয়াছি'—ইহা বলিয়া রত্নাবলীকে প্রভু-পত্নী বাসবদত্তার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার আশা, অন্তঃপুরে থাকিলে অবশ্যই একদিন না একদিন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই অসামান্য সুন্দরী রাজার দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন, এবং তাহা হইলেই ক্রমশঃ তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথ সুপ্রসন্ন হইবে। রাজ্ঞী বাসবদত্তা রত্নাবলীকে 'সাগরিকা' নামে অভিহিত করিয়া স্বীয় পরিজন-বর্গের অন্তর্ভূত করিয়া লইলেন।

যৌগন্ধরায়ণের আকাঙ্ক্ষিত ভবিতব্যতানুসারে রাজা ও রত্নাবলী পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। উভয়েই উভয়ের জন্য পাগল হইলেন। কিন্তু মিলনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইলেন—বাসবদত্তা। রত্নাবলী হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

রাণীর পরিচারিকাগণের মধ্যে সহৃদয়া 'সুসঙ্গতা' রত্নাবলীর 'অন্তর্গূঢ় মনোব্যথা'র কারণ বুঝিয়া লইলেন। তিনি রত্নাবলীকে পাইয়া অবধি সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিতেন। সখী রত্নাবলীর মুখে প্রেমের নৈরাশ্যময় হৃদয়ভেদী বিবিধ খেদোক্তি শুনিয়া সুসঙ্গতার রমণীজন-সুলভ কুসুম-কোমল হৃদয় সমবেদনার সুধাধারায় ভরিয়া উঠিল।

একদিন বৎসরাজের প্রিয় বয়স্ত বসন্তকের সহিত সুসঙ্গতার পরামর্শানুসারে মাধবীলতামণ্ডপে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় রাজা ও প্রেম-বিহ্বলা সাগরিকার (এখন হইতে রত্নাবলীকে সাগরিকা নামেই উল্লেখ করিব) মিলনের শুভ মুহূর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইল। স্থির হইল যে, সুসঙ্গতা নিজে রাজ্ঞীর প্রিয়সখী কাঞ্চনমালার বেশ-ধারিণী হইয়া সাগরিকাকে বাসবদত্তার পরিচ্ছদ পরাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে প্রদোষ সময়ে সঙ্কেত স্থানে সমাগত হইবে। কিন্তু দুর্দ্দৈবক্রমে এই গুপ্ত পরামর্শ রাণীর অনুগত সখী কাঞ্চনমালার কর্ণগোচর হয়। সে গিয়া বাসবদত্তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল।

রাজা বিমনায়মান হইয়া একাকী নানাবিধ খেদের কথা বলিতেছেন,—এমন সময়ে বয়স্ত বসন্তক আসিয়া রাজাকে মিলনের শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বসন্তক মকরন্দোদ্যানের মধ্যস্থ সঙ্কেতিত মাধবীলতামণ্ডপে রাজাকে লইয়া আসিলেন। রাজাকে সে স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বসন্তক বাসবদত্তার বেশধারিণী সাগরিকাকে আনিবার জন্য চলিয়া গেলেন। রাজা সেই জনশূন্য লতাগৃহে বসিয়া কত কি সুখের কল্পনা করিতে লাগিলেন। বসন্তকের আসিবার বিলম্ব দেখিয়া একবার ভাবিলেন, "তবে কি দেবী বাসবদত্তা সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন ?"

এদিকে বাসবদত্তা কাঞ্চনমালার মুখে রাজার গুপ্ত মিলনের কথা জানিতে পারিয়া অভিমানে, ক্ষোভে, রোষে সাগরিকা আসিবার পূর্ব্বেই কাঞ্চনমালার সহিত সেই লতামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাগরিকাকে লইয়া সুসঙ্গতা আসিয়াছে মনে করিয়া বসন্তকও দ্রুতপদে আসিলেন। রাজা বা বসন্তক কেহই চিনিতে পারিলেন না যে, কে আসিতেছে—বাসবদত্তার বেশ-ধারিণী সাগরিকা, না প্রকৃতই বাসবদত্তা। কারণ, লতামণ্ডপ তখন নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

রাজা মহিষী বাসবদত্তাকে নবপ্রণয়িনী সাগরিকা মনে করিয়া রুদ্ধ হৃদয়ের আবেগময় অনেক কথাই বলিয়া ফেলিলেন। বাসবদত্তা অনেকক্ষণ আত্মসম্বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আত্মবিস্মৃত স্বামীর মুখে সাগরিকার উদ্দেশে কথিত অসহনীয় প্রেমপূর্ণ বাক্যগুলি শুনিয়া রাণী আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না,—সরোষে অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করিয়া কহিলেন,—

"আর্য্যপুত্র, সত্যই আমি সাগরিকা। তুমি সাগরিকার চিন্তা-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া জগতের সমস্তই সাগরিকাময় দেখিতেছ।"

রাজা অতিমাত্র লজ্জিত ও ভীত হইয়া বসন্তকের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে কহিলেন, "বয়স্য, এ কি ?" বসন্তক আর কি বলিবেন! রাজা তখন কৃতাঞ্জলিপুটে রাণীকে কহিলেন, "প্রিয়ে, রাগ করিও না, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" রাজ্ঞী নয়নের অশ্রু রুদ্ধ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "আমাকে আর এসব কথা বলা কেন ? তোমার এ সকল কথারই উদ্দিষ্ট পাত্র অন্য।" অবসর পাইয়া বসন্তক রাজ্ঞীকে কহিলেন, "আপনি মহানুভাবা, প্রিয় বয়স্যের একটা অপরাধ ক্ষমা করুন।" বাসবদত্তা বলিলেন, "বসন্তক, প্রিয়তমের প্রথম মিলনের সময় ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়া আমিই ঘোর অপরাধ করিয়াছি, তোমার বয়স্যের কোনও অপরাধ নাই।"

ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া এইবার রাজা বাসবদত্তার চরণে নিপতিত হইলেন। রাণী বাধা দিয়া কহিলেন, "আর্য্যপুত্র, উঠ—উঠ। তোমার এইরূপ হৃদয় বুঝিয়াও যে রাগ করে, সে নির্লজ্জ। তুমি সুখী হও, আমি যাই।" এই বলিয়া মানিনী অভিমান-ভরে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপ অচিন্ত্যনীয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত সময়ে সাগরিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে যে কি ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সে তাহার কিছুই জানে না। রাজা তখনও অন্যমনস্ক হইয়া কহিতেছেন,—"দেবী বাসবদত্তার প্রসাদ সম্পাদন ব্যতীত আর উপায় দেখিতেছি না। বয়স্য, আইস, সেইখানেই যাই।"

সাগরিকা এই ভাবের কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিল যে, রাজ্ঞী সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন। তখন সে লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। বাসবদত্তার অবমাননা সহ্য করিয়া তাহার প্রসাদপ্রার্থিনী হইয়া থাকিতে হইবে—ইহা যেন তাহার জীবনের পক্ষে অসহ্য হইল। রমণী হৃদয়ের শালীনতা তাহাকে প্রেমে আত্ম-বলি দিতে প্ররোচিত করিল। যাহাকে শতবার—সহস্রবার—লক্ষবার—কোটীবার দেখিলেও নয়নের আকাঙ্ক্ষা মিটে না—প্রাণের তৃপ্তি হয় না—বাসবদত্তার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িলে আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না, এই মর্ম্মান্তিক চিন্তায় উদ্বেলিত হইয়া সে মৃত্যুকেই সর্ব্বদুঃখাপহারক বলিয়া মনে করিল।—সাগরিকা তখন সেই উদ্যান মধ্যেই লতাসমূহের দ্বারা রজ্জু রচনা করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার অভিলাষে সেই রজ্জু কণ্ঠদেশে জড়াইয়া অশোক তরুর তলে অগ্রসর হইল।

অকস্মাৎ বসন্তক দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজা সাগরিকার কণ্ঠ হইতে লতাপাশ অপনীত করিলেন। সাগরিকার আর মরা হইল না।

পরে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে ঘটনাচক্রে দেবী বাসবদত্তার অনুরোধেই সাগরিকাকে বিবাহ করিয়া রাজা সুখী হইলেন।

ইহাই হইল "রত্নাবলী"র সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান ভাগ। "বিষবৃক্ষে"র সহিত ইহার কোন্ কোন্ অংশে সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। আলোচ্য বিষয় আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইব।—
(১) ঘটনা, (২) চরিত্র, (৩) বর্ণনা।

ঘটনা সাদৃশ্য।

নগেন্দ্রনাথ নৌকারোহণে কলিকাতায় যাইতেছিলেন, দৈববিড়ম্বনায় তিনি পথিমধ্যে নৌকা হইতে অবতরণ করেন। নগেন্দ্রনাথ নদীর নিকটবর্ত্তী গ্রামে কুন্দনন্দিনীকে প্রাপ্ত হন, এবং তাহাকে আনিয়া পত্নী সূর্য্যমুখীর হস্তে সমর্পণ করেন। সুতরাং নগেন্দ্রনাথের গৃহে কুন্দনন্দিনীর আগমন, দৈববশেই সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ, নগেন্দ্রনাথ কোথায় কলিকাতায় যাইতেছিলেন, পথে তিনি ঝুমঝুমপুরে নামিবেন কেন? দৈবাৎ ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল, তা'ই তাঁহাকে পথিমধ্যে নামিতে হয়। দৈবদুর্ব্বিপাকে এইরূপ ঘটনা না ঘটিলে কখনই কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের মিলন সম্ভবপর হইত না।

"রত্নাবলী" নাটিকায় সাগরিকা (রত্নাবলী) যে বৎসরাজের গৃহে আনীত হইয়াছিলেন, তাহার ঘটনাও অনেকটা এই ভাবেরই। যদিও ঘটনার সমাবেশ তুল্য নহে, তথাপি ঘটনার কারণপরম্পরা প্রায়ই একরকম। ইহাতেও দৈবদুর্ব্বিপাকে জলযান সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রত্নাবলীকে আনিবার জন্ত যে পুরুষকারের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা এইখানেই সমাপ্ত হইল। দৈবাৎ কৌশাম্বীর বণিকেরা সমুদ্রপথে আসিতেছিল, তাহারা রত্নাবলীকে দেখিতে পাইয়া কৌশাম্বীতে লইয়া আসিল, এবং যৌগন্ধরায়ণের দ্বারা সে রাজমহিষী বাসবদত্তার হস্তেই অর্পিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উভয় গ্রন্থেই নায়কের গৃহে নায়িকার সমাগম দৈববশেই সংঘটিত হইয়াছিল। এবং কুন্দনন্দিনী ও রত্নাবলী উভয়েই প্রথমে ভাবী প্রেমাস্পদের পত্নীর কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল।

নগেন্দ্র ও কুন্দ উভয়েই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আর বৎসরাজ ও রত্নাবলীও পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন।

বৎসরাজ রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর নগেন্দ্রের সহিতও কুন্দনন্দিনীর বিবাহ নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

নগেন্দ্রকে ছাড়িয়া কমলের সহিত কলিকাতায় যাইতে হইবে, এই দুর্ব্বিষহ ভাবনায় কুন্দনন্দিনী অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিল,—

"সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, কাজে কাজেই আমার যেতে হবে, তা' পারিব না। তাই ডুবে মরি। মরিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্ম রাখিয়া গিয়াছিলে?"—

"কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। "* * * আমি কেন ম'লাম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব। এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবর-সোপান অবতরণ আরম্ভ করিল!" "* * * এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শ করিল। বলিল, 'কুন্দ!' কুন্দ দেখিল—সে অন্ধকারে দেখিবামাত্র চিনিল—নগেন্দ্র। কুন্দের সে দিন আর মরা হ'লো না।"

যাহাকে দেখিলে জগৎ সংসার ভুলিয়া যাইতে হয়, সেই প্রিয়তমের কমনীয় মুখখানি দেখিয়া কুন্দ মরার কথা ভুলিয়া গেল।

"রত্নাবলী"র সাগরিকাও প্রিয়তম বৎসরাজের সন্দর্শন-সুখে একেবারে হতাশ হইয়া উদ্বন্ধনে জীবন বিসর্জ্জন করিবার সময় মাতাপিতার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিয়াছিল,—"বাবা, মা, আজ আমি অনাথা, অশরণা, অভাগিনী এই প্রাণান্তকর মহাবিপদকে আলিঙ্গন করিলাম।"

এমন সময়ে বৎসরাজ ইহা দেখিতে পাইয়া সাগরিকার কণ্ঠদেশ হইতে লতা পাশ অপনীত করিলেন। সাগরিকার সে দিন আর মরা হ'লো না।

কুন্দ ও সাগরিকা দুই জনেই হৃদয়-ভরা ভালবাসার অপূর্ণতার আশঙ্কায় মরিতে উদ্যত হইয়াছিল। আবার প্রিয়তমের জন্মই দুইজনের আর মরা হইল না।

কুন্দ শেষে যে মরিবার জন্ম সত্য সত্যই বিষপান করিয়াছিল, "বিষবৃক্ষে"র সে ঘটনা স্বতন্ত্র, তাহার সহিত "রত্নাবলী"র মিল নাই। "রত্নাবলী"র কবি সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক রচনা নিষিদ্ধ বলিয়া সাগরিকাকে মরিতে দেন নাই।

রাজ্ঞী বাসবদত্তা সাগরিকাকে উজ্জয়িনীতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, একথা আমরা সুসঙ্গতা ও বসন্তকের পরস্পর আলাপে জানিতে পারি। যথা,—

সুসঙ্গতাকে কাঁদিতে দেখিয়া বসন্তক জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"সুসঙ্গতে, এখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছ কেন? সাগরিকার কি কোনও অমঙ্গল ঘটিয়াছে?"

সুসঙ্গতা বলিল—"আর্য্য বসন্তক, নিবেদন করিতেছি, শুন। দেবী বাসবদত্তা

সাগরিকাকে উজ্জয়িনীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এইরূপ জনপ্রবাদ উপস্থিত হইবার পর, সে বেচারী অর্দ্ধরাত্রে যে কোথায় নীত হইয়াছে, তাঁহা আর জানি না।"

বন্ধুবৎসল বসন্তক, সুসঙ্গতার মুখে এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া শেষে কহিলেন,—"দেবী বড় নির্দ্দয়ের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।"

কুন্দনন্দিনীও সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া গভীর রজনীতে নগেন্দ্রনাথের গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

আপাততঃ স্থূলদৃষ্টিতে উপরি লিখিত কয়েক স্থলেই "রত্নাবলী" ও "বিষ-বৃক্ষে"র ঘটনা-সাম্য দৃষ্ট হয়। 'সূর্য্যমুখীর পলায়ন' প্রভৃতি ঘটনার সহিত "রত্নাবলী"র সংস্রব নাই।

চরিত্র—(বাসবদত্তা ও সূর্য্যমুখী)।

সূর্য্যমুখী ও বাসবদত্তার চরিত্র সর্ব্বাংশে তুল্য না হইলেও দুইজনেই বড় গম্ভীর ও তেজস্বী।

"তিনি কিছু গর্ব্বিতা, এ সকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত।"

রাজ্ঞী বাসবদত্তাকেও সকলে ভয় করিত।

সাগরিকার সহিত মিলনের পূর্ব্বে একদিন তাহার একখানি আলেখ্য পাইয়া রাজা ও বসন্তক নানাবিধ রসালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে বাসবদত্তার পরিচারিকা সুসঙ্গতাকে সেখানে আসিতে দেখিয়া বসন্তক সন্ত্রস্ত হইয়া রাজাকে কহিলেন,—"ছবিখানি লুকাইয়া ফেল ; ওই দেখ রাণীর পরিচারিকা সুসঙ্গতা আসিতেছে।"

রাজা শুনিয়া তাড়াতাড়ি চিত্রখানি বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া কহিলেন,— "সুসঙ্গতে, আমি যে এখানে আছি, তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

সুসঙ্গতা হাসিয়া কহিল,—"কেবল আপনি যে এখানে আছেন, তাহাই নহে, চিত্রফলক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্তই আমি জানিয়াছি। যাই, রাণীকে গিয়া সব কথা বলি।" এই বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

তখন বসন্তক সুসঙ্গতার অলক্ষিতে রাজাকে গোপনে বলিলেন,—"বয়স্য, অসম্ভব নহে, এ বেটী যে রকম মুখরা এ সব করিতে পারে। সুতরাং ইহাকে সন্তুষ্ট কর।"

রাজা বসন্তককে কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ।"

তখন তিনি সুসঙ্গতার হাতে ধরিয়া কহিলেন, "সুসঙ্গতে, ইহা ক্রীড়ামাত্র। তুমি অকারণ দেবীর মনে ব্যথা দিও না। এই লও তোমার পারিতোষিক।"

এই বলিয়া কর্ণের আভরণ খুলিয়া দিতে গেলেন *। দেখিলেন, বাসবদত্তাকে সকলে কেমন ভয় করে!

স্বামীর প্রতি সূর্য্যমুখীর অগাধ প্রেম। সে অতলস্পর্শ প্রেম-সাগরের কূল কিনারা নাই। সূর্য্যমুখী তাহার প্রাণভরা ভালবাসা স্বামীর হৃদয়ে বিন্যস্ত করিয়া এবং বিশ্বাসের অমৃতসরে সরল হৃদয় আপ্লুত রাখিয়া সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কমলিনীর মত আপনার শোভায় আপনি ভাসিয়া বেড়াইত।

নগেন্দ্রের হৃদয়ে যখন কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনুরাগের ছায়াপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সূর্য্যমুখী বুঝিতে পারিয়া তখন তাহার প্রতীকারের চেষ্টায় যত্নশীল হইয়াছিলেন। তিনি দত্তগৃহ হইতে কুন্দকে সরাইবার জন্য ননদ কমলমণিকে লিখিয়াছিলেন,—

"আর এক কথা—পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বিদায় করি?"

বাসবদত্তা কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান। রাজ্ঞী যে দিন বিলাস-কাননের মধ্যবর্ত্তী অশোক পাদপের ছায়া-সুশীতল তলদেশে মদনদেবের পূজা করিতে আসিয়াছিলেন, সে দিন অন্যান্য পরিচারিকার সহিত কৈশোর-যৌবনের মধ্যপথবর্ত্তিনী অপূর্ব্ব সুন্দরী সাগরিকাকে উপস্থিত দেখিয়া—পাছে তাহাকে দেখিলে রাজার হৃদয়ে কোনও ভাবান্তর হয়—(রাজা পূর্ব্ব হইতেই প্রিয় বয়স্য বসন্তকের সহিত পূজাস্থানে বর্ত্তমান ছিলেন।) মনে মনে বলিলেন,—

"আহা, পরিচারিকাদিগের কি ভুল হইয়াছে! যা'র দৃষ্টিপথ হইতে কত রকম করিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছি, আজ তা'রই চোখে পড়িবে?"

ইহা ভাবিয়া একটা কার্য্যের ভার দিয়া সাগরিকাকে সে স্থান হইতে সরাইয়া দিলেন। বাসবদত্তা হৃদয়ের সহিত স্বামীকে ভালবাসিলেও স্বামীর প্রতি তাদৃশ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই।

---

* এখন পর্য্যন্ত রাজা সাগরিকাকে চোখে দেখেন নাই। কেবল ছবি দেখিয়াই তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতাময় নানারূপ কথা কহিয়াছিলেন। সুতরাং রাজা বা বসন্তক তখনও জানেন না যে, সুসঙ্গতা রাজ্ঞী বাসবদত্তার পরিচারিকা হইলেও তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের প্রতিকূল নহে, প্রত্যুত অনুকূল।

সূর্য্যমুখীও স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইয়াছিল। সূর্য্যমুখীর পত্র পাইয়া কমল প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন,—

"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার, তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর।"

সূর্য্যমুখী যখন জানিতে পারিলেন যে, নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীতে অতিমাত্র অনুরক্ত, তখন কুন্দের প্রতি মনে মনে তাঁহার যে একটা প্রতিহিংসার ছায়া জাগিয়া না উঠিয়াছিল, এমন নহে। সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীকে বহির্দৃষ্টিতে অন্য কারণে বিতাড়িত করিলেও কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের বিচ্ছেদ সংঘটন যে তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, তাহা তাঁহার নিজ উক্তিতেই প্রকাশিত হইয়াছে।— নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর তাড়াইবার কথা, সূর্য্যমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনুতপ্ত হইয়া অপরাধিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে কহিয়াছিলেন,—

"প্রাণাধিক তুমি। কোনও কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।"

"সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের যুগল চরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।"

সাগরিকার প্রতি বৎসরাজের আসক্তি যখন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে চলিল, তখন দেবী বাসবদত্তাও সাগরিকার সহিত রাজার বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য সাগরিকাকে উজ্জয়িনীতে বিতাড়িত করিয়াছেন, এইরূপ প্রবাদের প্রচার করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন *।

বাসবদত্তা ও সূর্য্যমুখী উভয়েই অত্যন্ত আত্মদমনশীলা। পতি অন্য রমণীর প্রণয়াসক্ত ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্তঃকরণে ক্ষোভের সঞ্চার হইলেও অভিমানিনী

* যে দিন রাত্রিতে মাধবীলতামণ্ডপে সাগরিকাকে উদ্বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া রাজা তাহার বাহুযুগল নিজ কণ্ঠদেশে অর্পণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন-সুখ অনুভব করিতেছিলেন, সেই সময়ে আবার হঠাৎ কাঞ্চনমালার সহিত বাসবদত্তা আসিয়া উপস্থিত হন। রাজার তাৎকালিক অপরাধ ঢাকিবার জন্য বসন্তক নানা কথার অবতারণা করিলে বাসবদত্তা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় পরিচারিকা কাঞ্চনমালাকে কহিয়াছিলেন,—

"কাঞ্চনমালা, এই লতাপাশের দ্বারাই এই ব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া ফেল। দুষ্ট মেয়েটাকেও অগ্রবর্ত্তী কর।"

পরে বাসবদত্তা নিজেই সাগরিকাকে সে স্থান হইতে ধরিয়া লইয়া গেলেন।

ইহার পরই প্রচারিত হইয়াছিল যে, রাজ্ঞী কর্ত্তৃক সাগরিকা উজ্জয়িনীতে বিতাড়িত হইয়াছে।

বাসবদত্তা স্বামীর প্রতি কোনও রুক্ষ ব্যবহার করিতেন না। কবি রাজার মুখে বাসবদত্তার ক্রুদ্ধভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"ক্রোধে ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইয়া উঠিলে প্রিয়া আমার তৎক্ষণাৎ মুখখানি নীচু করিয়া ফেলিলেন। আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটু হৃদয়ভেদী হাস্য করিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর কথা বলেন নাই। চক্ষুঃ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিলে আত্ম-সংযম শক্তিবলে তাহা নিমীলিত করিয়া ফেলিলেন—অশ্রু আর পড়িতে পাইল না। প্রিয়া আমার কোপের সময়েও সৌজন্য পরিত্যাগ করেন নাই।"

পতির হৃদয় হইতে বিচ্যুত হইয়া সাধ্বী সূর্য্যমুখী কেবল কাঁদিতেন *, নিজের জীবনকে ধিক্কার দেওয়া ভিন্ন একদিনও তিনি স্বামীকে কোনও তিরস্কার করেন নাই। রাজ্ঞী বাসবদত্তাও স্বামীর অকৃত্রিম প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়াই হৃদয়ের ভার কমাইতেন *।

স্বামী যখন কুন্দের জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন, নগেন্দ্র যে দিন কুন্দকে বলিলেন,—

"আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না, কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ীঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই।"

সাধ্বী সূর্য্যমুখী তখন স্বামীর সুখশান্তির বিষয় চিন্তা করিয়া কুন্দনন্দিনীর সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখীর নিকট কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ বৃত্তান্ত শুনিয়া কমলমণি বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—

"এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?"

সূর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কে?" মৃদু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—বৃষ্টির পর আকাশ প্রান্তে স্নিগ্ধ মেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস;—তখন জানিবে, তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? তাঁহার একদণ্ডের

---

* "সূর্য্যমুখীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন।"—১২শ পরিচ্ছেদ।

"সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।"—২৬শ পরিচ্ছেদ।

"তাঁহার (সূর্য্যমুখীর) চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল।"—২৭ পরিচ্ছেদ।

* "————————দেবী রুদত্যা যথা

প্রক্ষাল্যেব তয়ৈব বাষ্পসলিলৈঃ কোপোঽপনীতঃ স্বয়ম্।"

—৪র্থ অঙ্ক।

অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে। দেখিলাম দিবারাত্র তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার সুখ কি হইল? বলিলাম, 'প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব,'—তাই বিবাহ করিয়াছেন।"

স্বামীর হৃদয়ভাগিনী সাগরিকাকে বাসবদত্তা প্রথম অবস্থায় রাজার নয়নপথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেও, শেষে অগত্যা স্বামীর সুখ সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া রাজার সহিত সাগরিকার বিবাহ দিবার নিমিত্ত স্বামীর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

সাগরিকা বাসবদত্তার নিকটে মামাত ভগিনী রত্নাবলী বলিয়া পরিচিত হইলে পর, অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ হাসিয়া কহিয়াছিলেন,—

"প্রাপ্ত পরিচয় ভগিনীর প্রতি ইদানীং যাহা কর্ত্তব্য, তাহা দেবীই করিবেন।"

তখন বাসবদত্তা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"আর্য্য অমাত্য, স্পষ্টই বল না কেন—আর্য্যপুত্রের হস্তে রত্নাবলীকে (সাগরিকাকে) অর্পণ করুন।"

পরে তিনি স্বীয় গাত্রাভরণের দ্বারা রত্নাবলীকে সাজাইয়া তাহার হাত ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন—

"প্রিয়তম, এই লও তোমার রত্নাবলী।"

বাসবদত্তা স্বামীর সুখের জন্যই রত্নাবলীকে রাজার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। রত্নাবলীকে যে বিবাহ করিবে, সে 'সার্ব্বভৌম নৃপতি' হইবে, বাসবদত্তা ইহাও জানিতেন। সুতরাং যেমন করিয়াই হউক, স্বামীকে সুখী করিবার নিমিত্তই তিনি রাজাকে রত্নাবলীর পাণিগ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। কাজে কাজেই সূর্য্যমুখী ও বাসবদত্তা অন্য রমণীর সহিত স্বামীর যে বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য স্বামীকে সুখী করা। দুইজনেই অন্তর্দ্দাহী সন্তাপ চাপিয়া রাখিয়া পতিদেবতার প্রীতি-মন্দিরে আত্ম-সুখ বলি দিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

সাহারা মরুভূমিতে।*

১৮১৫ খৃঃ ইংরাজরাজের সহিত ফরাসীরাজের যে সন্ধি সংস্থাপিত হয় তাহাতে আফ্রিকার সেনিগল উপনিবেশটী ইংরাজ ফরাসীকে প্রত্যর্পণ করে। ঐ স্থান অধিকার লইতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কয়েকখানি রণতরী প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে "মেডুশা" একখানি। এই জাহাজে উক্ত উপনিবেশের শাসনকর্ত্তা এবং অন্যান্য অনেক আরোহী ছিলেন, তন্মধ্যে পাইকর্ড পরিবারের কথা বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় আলোচিত হইবে। মিঃ পাইকর্ড একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন; তাঁহার কয়েকটী কন্যা এবং স্ত্রী তাঁহার সহিত ছিল। কয়েকদিন তাহারা বেশ সুখে ও মনের আনন্দে জাহাজে যাইতেছিল—কয়েকখানি জাহাজ একসঙ্গেই ছিল। কিন্তু বায়ুর গতি অন্যরূপ হওয়ায় সব জাহাজগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। "মেডুশা" সুতরাং একাকী গমন করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে সুবিস্তৃত মরুভূমি সাহারা 'মেডুশা'র আরোহীদের নয়নগোচর হইল। সাগরের সহিত সঙ্গম-স্থলে এই মরুভূমির কয়েকটা বালুকার পাহাড় আছে। সমুদ্রের ঢেউ এই বালুকাকে গোলাকারে জলের মধ্যে লইয়া গিয়া এই জলপথটীকে নাবিকদের পক্ষে বড়ই বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলে। জাহাজের সমুদায় নাবিক ও আরোহী কাপ্তেনকে এই পথে জাহাজ না চালাইয়া একটু তফাতে অন্যপথে লইয়া যাইতে বার বার অনুরোধ করিল, কিন্তু 'একগুঁয়ে' কাপ্তেন তাহাদের সুপরামর্শে কর্ণপাত করা সঙ্গত বোধ করিল না। ফলে, সহসা সমুদ্রের জলের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। একস্থানে জল মাপিয়া দেখা গেল সেখানে ৩৬ হাত জল, পর মুহূর্ত্তেই জলের মাপ ১২ হাতে দাঁড়াইল। কাপ্তেন তখন প্রমাদ গণিয়া জাহাজ সরাইবার আদেশ করিল কিন্তু আর সময় না থাকায় ভীষণ শব্দে বালুকা চরে জাহাজ আবদ্ধ হইল! জাহাজের আরোহীর মধ্যে তখন খুব হাহাকার পড়িয়া গেল। কাহারও পরিত্রাণের উপায় নাই। সকলকেই অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। নাবিকেরা মৃত শবের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল! অন্যান্য ব্যক্তিকে ফেলিয়া রাখিয়া সেনিগলের নিযুক্ত গবর্ণর নিজের পরিষদবর্গ সহ জাহাজ হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন! অবশেষে জাহাজ হইতে

---

* From Chamber's Journal.

উপকূলে যাইবার জন্য কয়েকখানি তক্তা একত্র বন্ধন করা হইল এবং কয়খানি বোটও আরোহীগণকে লইয়া ছাড়িল। এই কয়খানি বোটের মধ্যে কেবলমাত্র দুইখানিতে খাদ্য দ্রব্যাদি ছিল! কিন্তু শাসনকর্ত্তা তাহা নিজের জন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন।

জাহাজের চারিশত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র দুই দল লোক উপকূলে পৌছিতে পারিয়াছিল, তন্মধ্যে পাইকর্ড সপরিবারে ছিলেন। মিঃ পাইকর্ডের প্রথম কন্যা তাহাদের বিপদের কথা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার মুখের কথাতেই তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

"কোন রকমে উপকূলে পৌছিয়া, প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আমরা যে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু সম্মুখে সাহারার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের শরীরস্থ শোণিত সলিলে পরিণত হইবার মত হইয়াছিল। পানাহারের অভাবে, অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় কিরূপে এই বালুকা-সমুদ্র অতিক্রম করিয়াছিলাম তাহা ভাবিতেও হৃদ্‌কম্প হয়। বেলা সাতটার সময় সমুদ্র হইতে কিছু অন্তরে পানীয় জলের জন্য আমরা দলবদ্ধ হইয়া বালুকা খনন করিতে আরম্ভ করিলাম এবং জলও পাইলাম, কিন্তু তাহা লবণাক্ত এবং গন্ধকের দুর্গন্ধে পূর্ণ। এই জলই আকণ্ঠ তৃপ্তির সহিত পান করিলাম এবং একঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে সেনিগলে যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। সকলে মিলিয়া এই ঠিক হইল যে স্ত্রীলোক ও বালকেরা দলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাইবে অন্যথা তাহাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকার সম্ভাবনা। সৈন্যগণ স্বেচ্ছায় কতগুলি শিশুকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল এবং সকলে মিলিয়া সমুদ্রের পার্শ্বেই যাইতে লাগিলাম। এখন বেলা ৮টা হইলেও বালীর এত তাত যে পা পুড়িয়া যাইবার মত হইতেছিল এবং আমাদের নগ্নপদে শামুকের খোলা ঝিনুক প্রভৃতি বিদ্ধ হওয়ায় আমরা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিতেছিলাম।

কিছু দূর গিয়াই আমরা একটা মৃগশিশু দেখিলাম কিন্তু উহা শীকার করিবার জন্য বন্দুক উত্তোলন করিতে না করিতেই কোথায় উহা অদৃশ্য হইয়া পলায়ন করিল। আমাদের গন্তব্যপথের সম্মুখে বিশাল মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে, কোথাও একটী তৃণকণাও নাই, কিন্তু তখনও আমরা যথা প্রয়োজন বালুকা খনন করিয়া জল পাইতেছিলাম। দুপুরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দুইজন সামরিক কর্ম্মচারী বলিলেন যে আমাদের জন্য তাঁহারা দ্রুত যাইতে পারিতেছেন না এবং আমাদের ফেলিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইবেন কি না তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাহাদের অনুযোগ সত্য, কারণ স্ত্রীলোক ও শিশুরা পুরুষের ন্যায় দ্রুত যাইতে অভ্যস্ত নহে।

এই কথা আমার পিতার কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের স্বার্থপরতা ও বর্ব্বরতার জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। কথায়-কথায় আমার পিতার সহিত তাহাদের বিবাদ পাকিয়া উঠিল। তাহাদের একজন একখানি তরবারি লইয়া পিতাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, পিতাও তাঁহার ছোরা-খানি বাহির করিয়া আত্মরক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। ইহাতে আমরা ঐ সৈনিক কর্ম্মচারী ও পিতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া পিতাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, হৃদয়হীন বর্ব্বর মুরগণের সাহায্য প্রার্থনা করা অপেক্ষা সপরিবারে মরুভূমিতে চির আশ্রয় গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। অবশেষে পদাতিক সৈন্যদলের অধ্যক্ষ সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ফরাসী সৈন্যগণ, আমি তোমাদের নেতা হইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি.এস সকলে মিলিয়া এই দুস্থ পরিবারকে আমরা যথা-সাধ্য সাহায্য করি, ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া নিজেদের ও ফরাসীর জাতীয় গৌরব হানি করা কর্ত্তব্য নহে।" এই কয়েকটা উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশে সৈনিকেরা লজ্জিত হইল এবং বলিল যে, আমরা দ্রুতগমন করিতে পারিলে তাহারা আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না। আমরাও পুনরায় প্রাণপণে তাহাদের সহিত দ্রুত চলিতে লাগিলাম। বেলা ১২টার সময় আমাদের সকলেরই ক্ষুধানল তীব্র-বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। নিকটস্থ বালীর পাহাড়ে কোন শাক-শব্জীর গাছ পাওয়া যায় কি না দেখিবার জন্য কয়েকজন গমন করিল এবং কয়েকগাছি খুব তিক্ত শাক লইয়া আসিল। তখন কয়েকজন আরও কতকদূর গমন করিয়া কতকগুলো বন্য ফল লইয়া আসিল এবং আমাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল। আমাদের ক্ষুধা তাহাতে একটুমাত্রও নিবৃত্তি হইল না। পুনরায় কতকগুলি সৈনিক সেই ফল অধিক পরিমাণে আনয়ন করিল। বলা বাহুল্য, ক্ষুধার তাড়নে সেই ফল অমৃত তুল্য বোধ হইল। জীবনে এত ক্ষুধা কখনও বোধ করি নাই। আমরা পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। উত্তপ্ত বালুকা যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় পদতল দহন করিতে লাগিল। মস্তকের কেশরাশী আমাদের টুপীর কাজ করিতেছিল! যখন আমরা সমুদ্র-তীরে আসিলাম তখন সকলে ছুটিয়া সমুদ্রের জলে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামলাভের পর আমরা (সমুদ্রের ঢেউ-গুলিতে) আর্দ্র বালুকার উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কতগুলি বন্য কদ্বা আপেল পাইলাম, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সেই ফলগুলি মধ্যে মধ্যে চুষিতে লাগিলাম। রাত্রি নয়টার সময় আমরা দুইটী বালুকা-পাহাড়ের মধ্যস্থলে উপনীত হইলাম এবং সেইখানেই নিশাযাপন করিব স্থির করিলাম। দূর

হইতে নেকড়ে বাঘের ডাক আমরা স্পষ্ট শুনিতেছিলাম কিন্তু সারাদিন অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমাদের দেহ ও পদ এত আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমরা অন্য কোনও নিরাপদ স্থান অন্বেষণ করিতে সক্ষম না হইয়া সেই স্থানেই নিশাযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সুখের বিষয়, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আমরা সকলেই দেখিতে পাইলাম কেহই ব্যাঘ্রমুখে জীবন বিসর্জ্জন করে নাই!

এস্থলটী আমাদের নিকট অধিকতর উর্ব্বর বলিয়া বোধ হইল। স্থানে স্থানে ঘাস ও বন্যগাছ দেখিলাম। উত্তরে ও দক্ষিণে এই অংশটী পাহাড়বেষ্টিত, কিন্তু কৃষিকার্য্যের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইল না। আমাদের কয়জন সঙ্গী কিছু অন্তরে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতে গমন করিল এবং ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে কিছু দূরে তাহারা আরবদের দুইটী তাবু দেখিয়া আসিয়াছে। আমরা সকলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান অভিমুখে গমন করিলাম। আমাদিগকে দেখিবামাত্র তিন চারিজন মুর দেশীয় কৃষক ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তাহারা একটা মরূদ্যানে ভেড়া ও ছাগল চরাইতেছিল। অবশেষে আমরা পূর্ব্বকথিত তাঁবুতে আসিয়া পৌঁছিলাম। তথায় তিনজন মুর এবং দুইটী শিশু ছিল। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা বিন্দুমাত্র ভীত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। আমাদের পদাতিক সৈন্যদলের অধ্যক্ষের সহিত একজন কাফ্রী পরিচারক ছিল। সে আমাদের সমুদয় ঘটনা উক্ত মুরদের বুঝাইয়া বলিল। তাহারা কতকগুলি ভুট্টা ও খানিকটা জল বিক্রয় করিতে সম্মত হইল। ত্রিশ পেন্স অর্থাৎ প্রায় দুই টাকা মূল্যে আমরা একমুষ্টি ভুট্টা পাইলাম এবং তিন ফ্র্যাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় দুই টাকা মূল্যে এক একগ্লাস পানীয় জল ক্রয় করিলাম। সামান্য একমুষ্টি ভুট্টা ও এক গ্লাশ জলে আমাদের মত ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ক্ষুন্নিবারণ অসম্ভব। আমার পিতা সেইজন্য দুইটী ছাগল ক্রয় করিয়া, জলে সিদ্ধ করিয়া আমাদের খাদ্য প্রস্তুত করাইলেন।

আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। পথে কতকগুলি মুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদের তাঁবুতে আমাদিগকে যত্ন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ তাহাদের তাঁবুতে আমাদের পরিচিত একজন মুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বলা বাহুল্য, ইহাতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা লিখিবার নহে। ইতিপূর্ব্বে সেনিগলে পিতা ইহাকে কতগুলি স্বর্ণালঙ্কারে কার্য্য করিতে দিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে এখন চিনিতে পারিয়া করমর্দ্দন করিলেন। এই মুরটী একটু একটু ফরাসীভাষা জানিত। সে আমাদের বিপদকাহিনী আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং বিনামূল্যে

আমাদিগকে খানিকটা দুগ্ধ ও পানীয় জল প্রদান করিয়া অতিথিসৎকার করিল।

উষ্ট্র, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুর চর্ম্মনির্ম্মিত একটী স্বতন্ত্র সুবৃহৎ তাঁবু আমাদিগের জন্য সে খাটাইয়া দিল—নিজের তাঁবুর মধ্যে আমাদিগকে স্থান দিল না, কারণ খৃষ্টানের সহিত একছাদের তলায় অবস্থান করা তাহাদের ধর্ম্মানুমোদিত নহে। সেই তাঁবুটীর মধ্যে খুব ঘন অন্ধকার। মুরবালক ও আমাদের লোকজন ভিতরে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দিল এবং সে আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া বলিয়া গেল—"সুখে নিদ্রা যান; খৃষ্টানের ঈশ্বরও যিনি, মুসলমানের ঈশ্বরও তিনি।"

পরদিন প্রাতে কতকগুলি মুর লইয়া সেনিগল অভিমুখে যাইবার জন্য আমরা পুনরায় সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী হইলাম এবং সমুদ্রে একখানি জাহাজ দেখিয়া আমাদের দলস্থ সকলে নিশানা করিল। জাহাজখানি প্রায় কিনারার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং আমাদের সমভিব্যাহারী মুরবালকগণ সন্তরণপূর্ব্বক জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইল। জাহাজ হইতে তিনটা 'ব্যারেল' জলে ফেলিয়া দিল—মুরবালকগণ সেগুলি ঠেলিতে ঠেলিতে কিনারায় আমাদিগের নিকট আনিয়া দিল। আমরা ব্যারেল তিনটী খুলিয়া দেখিলাম একটীতে বিস্কুট, একটীতে মদ্য ও ব্রাণ্ডী এবং অন্যটীতে পনীর। আমরা সকলে উহা ভাগ করিয়া লইলাম এবং প্রত্যেকের ভাগে একখানি বিস্কুট, এক গ্লাস মদ্য, অর্দ্ধ গ্লাস ব্রাণ্ডী এবং খানিকটা 'চিস্' পড়িল। আমাদের আর আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত দেহ, নানারূপ বিপদ ও কষ্টের মধ্যে এই মাদক দ্রব্য অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিল; আমাদের সকল ক্লান্তি নিমেষে দূরীভূত করিয়া দিল—আমরা যেন অমৃতরসে নব সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলাম। আমাদিগের ভারস্বরূপ জীবন এক্ষণে খুব মূল্যবান বোধ হইতে লাগিল। শত্রুকে মিত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; স্বার্থপরগণ নিজেদের স্বার্থ ভুলিতে লাগিল। জাহাজ-ভগ্নের পর শিশুরা এই প্রথম হাসিল। মোট কথা আমরা যেন দীর্ঘ ক্লান্তির পর নবজীবন লাভ করিলাম।

সন্ধ্যায় সময় পিতা বিশেষ ক্লান্তি বোধ করায় একটু বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করিলেন। আমি এবং আমার মা তাঁহার নিকট রহিলাম, অন্যান্য সকলে একটু অগ্রগামী হইল। আমরা তিনজনেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম, যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম সূর্য্য পূর্ব্ব গগনে চলিয়া পড়িতেছেন। দেখিলাম

আমাদের সঙ্গীরা চলিয়া গিয়াছে এবং কয়জন উষ্ট্রারোহণে আমাদিগের নিকট আসিতেছে। তাহাদের দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম এবং পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহারা আমাদের নিকটবর্ত্তী হইল এবং একজন ইংরেজীতে বলিল—"আপনারা নির্ভয়ে অবস্থান করুন। অর্দ্ধক্রোশ দূরে আপনাদের সঙ্গীরা অপেক্ষা করিতেছেন। আপনাদের বিপদের বার্ত্তা পাইয়া আপনাদের অন্বেষণে আমি বাহির হইয়াছি। আপনারা আমাদের উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া গমন করুন। এ স্থলের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর সহিত আমার খুব পরিচয় আছে।" তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের সহিত আমাদের দলের লোকের নিকট গমন করিলাম। যেখানে তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল সেখানে কয়টা পরিষ্কার জলের কূপ ছিল। সেইখানেই আমরা রাত্রি অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলাম। চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ শ্বাপদকুলের গর্জ্জন শ্রুত হইতেছিল। আমরা সৈন্যদিগকে কতকগুলি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাহারা উক্ত বন্য জন্তুদের ভয়ে যাইতে অস্বীকার করিল। আমাদের পূর্ব্বকথিত সদাশয় ইংরাজ ভদ্রলোকটী বলিলেন যে আমাদের সহিত যে সব মুর আছে তাহারাই উক্ত বন্য জন্তুদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে বিশেষ অভ্যস্ত। তাহারাই আমাদিগকে রক্ষা করিবে। রাত্রিটা খুব সুখেই অতিবাহিত হইল। ইংরাজ ভদ্রলোকটী আমাদিগের জন্য আহার অন্বেষণে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। বেলা ১২টার সময় এত গরম বোধ হইতে লাগিল যেন আমরা পুড়িয়া মরিব! মুর অনুচরগণেরও বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। অতঃপর আমরা স্থির করিলাম নিকটবর্ত্তী একটী বালুকা-পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়া বিশ্রাম করি এবং তৎক্ষণাৎ সকলে যাত্রা করিলাম। আমার এত কষ্ট হইতে লাগিল যে আমার বোধ হইল আমার মরিবার আর দেরী নাই। আমাদের সঙ্গী একটী ভদ্রলোক তাঁহার বুটজুতার ভিতর খানিকটা ঘোলা জল রাখিয়াছিলেন তিনি উহা আমাকে দিলেন। আমি একেবারে উহা আকণ্ঠ পান করিলাম। খানিক পরে পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ ভদ্রলোকটী আমাদিগের জন্য প্রচুর পরিমাণে ভাত,মাছ ও জল আনয়ন করিলেন। সকলে জল পান করিয়াই পেট ভরাইল। আমরা তা'র পর স্নান করিবার জন্য সমুদ্রের কূলে গমন করিলাম এবং জলে সমস্ত দেহটা নিমজ্জিত করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম।

তৎপর দিবসও আমরা এইরূপ কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। তাহার পর

ক্রমশঃ বৃক্ষাদি, পক্ষী, গৃহপালিত জন্তু আমাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল, পক্ষীর গানে প্রাণটা ভরিয়া উঠিল, আমরা সেনিগল নদীতে উপস্থিত হইলাম এবং সেখান হইতে নৌকাযোগে সেনিগল দুর্গে পৌছিলাম। সেই দুর্গে ইংরাজের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত সদাশয় ইংরাজ ভদ্রলোকটি এবং অন্যান্য অনেকে আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সকলে আমাদিগের সহিত করমর্দ্দন করিলেন—আমাদের কাহিনী শ্রবণ করিয়া সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

*   *   *   *

তাহার পর আমরা সকলে নিরাপদ হইয়াছিলাম। কিন্তু অত্যাধিক কষ্টে যে অবসাদ আনিয়াছিল তাহাতে ক্রমশঃ আমার মাতা এবং ছোট ভাইগুলির মৃত্যু হইল। পিতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি আর কাজ করিতে পারিলেন না, তাঁহারও মৃত্যু হইল। দেখিতে দেখিতে তিন মাসের মধ্যে আমার আত্মীয়-স্বজন সকলে মরিল, বাঁচিয়া রহিলাম কেবল আমি! সংসারে আমার 'আমার' বলিবার কেহ রহিল না!

*   *   *   *

বন্ধুবান্ধবের যত্নে ও সেবায় আমি মরিলাম না—সকলের অনুরোধে আমি বিবাহ করিলাম এবং ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিলাম। আমার স্বামীর পল্লী-ভবনেই আমি এখন বসবাস করি এবং তাঁহার আত্মীয়দিগের সদয় ব্যবহার ও সান্ত্বনা এই দুর্বিবহ শোকে আমার প্রাণে কতকটা শান্তি দিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

সাতান্ন সালের কথা।

(১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ)

আমরা এখন দুই একবার "পথের কথা" বন্ধ রাখিব। অনুসন্ধানে যাহা কিছু নূতন পাই, তাহাই "অর্চ্চনা"র পাঠকগণকে উপহার দিই। আজ "সাতান্ন সালের কথা" বলিব।

"সাতান্ন সাল"—কথা চলতি ভাবে ব্যবহার করিয়াছি। কথাটা সাতান্ন খৃষ্টাব্দ—সাল নয়। পলাশীর যুদ্ধের বৎসরের কথা। সাতান্ন খৃষ্টাব্দ ইতিহাসে গভীর রক্ত-রেখার দাগ রাখিয়া আপনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই অব্দে সেরাজের জীবলীলার অবসান, বাঙ্গলার নবাবী শাসনের লোপ, ইংরাজের বঙ্গাধিকার, মীরজাফরের নবাবী, ক্লাইভের ও ওয়াটসনের বঙ্গবিজয়-কীর্ত্তিলাভ, মীরণের পৈশাচিক কাণ্ড প্রভৃতি অনেক হৃদয়স্পর্শী ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। বঙ্গে মুসলমান রাজত্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ রাজত্বের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আজ যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকিয়া আমরা এত সুখভোগ করিতেছি, তাহার প্রথম বীজ-প্রতিষ্ঠা এই ১৭৫৭ সালে।

১৭৫৭ সালের পলাশীর রণাভিনয়ের পর কলিকাতার অবস্থা কিরূপ আমরা তাহারই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। যশের হিসাবে, লাভের হিসাবে, ভাগ্যের হিসাবে, এ বৎসর ইংরাজের পক্ষে অতি সুখময় হইলেও স্বাস্থ্যের হিসাবে বড়ই ভয়ানক। এই সময়ে কলিকাতায় সংক্রামক রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব। জ্বর, ওলাউঠা প্রভৃতি ভীষণ মূর্ত্তিতে কলিকাতায় লোকক্ষয় করিতেছিল। এই ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লবে 'যমরাজও স্বীয় করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কলিকাতায় নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। •

আইভ্‌স সাহেব সেকালের একজন ইংরাজ চিকিৎসক। তিনি ক্লাইব-সহচর স্বনামপ্রসিদ্ধ নৌসেনাপতি এড্‌মিরাল ওয়াটসনের "কেণ্ট" জাহাজে চিকিৎসক ছিলেন। আইভ্‌স সাহেব তাঁহার মন্তব্য পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন—৮ই ফেব্রুয়ারি (১৭৫৭) হইতে ৮ই আগষ্টের মধ্যে কেবলমাত্র ১১৫০ জন রোগী আরোগ্যলাভ করে। ইহাদের মধ্যে ৫৪ জনের "কর্ভি" রোগ, ৩০২ জনের পৈত্তিক জ্বর, ৫৬ জনের পিত্তশূল রোগ হইয়াছিল। ৫২ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সমাধিস্থ হয়। ৭ই আগষ্ট হইতে ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ৭১৭ জন রোগী পুনরায় কলিকাতার হাঁসপাতালে আসে। ইহাদের মধ্যে ১৪৭ জন ভীষণ ম্যালেরিয়া ও কলেরায় ভুগিতেছিল। এই সাত শতাধিক রোগীর মধ্যে ১০১ জন মরিয়া যায়।

পলাশী-বিজয়ী এড্‌মিরাল ওয়াটসনও এই ভীষণ সময়ে—ভীষণ রোগে শমনের অঙ্কশায়ী হয়েন। ক্লাইভ্‌ তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হইল দেখিয়া বড়ই শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। সকলে মিলিয়া, রাজসম্মানের সহিত—সেণ্ট জন গির্জ্জার মধ্যে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করেন। সেণ্ট জন গির্জ্জা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে। ইহাকে

পাথুরিয়া গির্জ্জা বলে। ইহা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে নির্ম্মিত হয়। শোভা-বাজারের রাজা নবকৃষ্ণ হেষ্টিংসকে এই গির্জ্জার জন্ম জমী দান করেন। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে হেষ্টিংসের কলিকাতায় বাসভবন ছিল। আজকাল যাহা Burn & Co.র আফিস, তাহাই হেষ্টিংসের আবাসবাটী ছিল। ইহার সম্মুখ ভাগটা পরিবর্ত্তিত ও নবসংস্কৃত হইলেও, ভিতরের অংশটা হেষ্টিংসের আমলে যেমন ছিল সেইরূপই আছে। আমরা পুরাতন কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারি, হেষ্টিংস বঙ্গের প্রথম গবর্ণর হইয়াও পদব্রজে এই গির্জ্জায় উপাসনা করিতে আসিতেন।

এই সেণ্ট জন গির্জ্জার মধ্যে কেবল যে নৌসেনাপতি ওয়াটসনই চির-নিদ্রায় নিদ্রিত, তাহা নহে। ইংরাজের এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ-সম্বন্ধে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশের সমাধি এইখানে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য—সার্জ্জন হামিলটান আর জব চার্ণক। সার্জ্জন হামিলটান, সম্রাট ফেরোকশিয়ারের পীড়ার শান্তি করিয়া স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখান এবং তাহার ফলে তাঁহার স্বজাতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য কয়েকটী বাণিজ্যস্বত্ব লাভ করেন (১৭১৫)। এই স্বত্ব-বলেই কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর নামক তিনটী গ্রাম ইংরাজের প্রথম দখলে আসে।' এই স্বত্ববলে, ইংরাজ এই তিনখানি গ্রামের "জমিদারী স্বত্ব"ও লাভ করেন। বলিতে গেলে—করসংগ্রাহক-রূপে, জমিদার রূপে, ভূস্বামী রূপে, ইহাই ইংরাজের প্রথম অধিকার। খালি কলিকাতা নহে, কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী স্থানও তাঁহারা তালুকভুক্ত করিয়া লয়েন। আজকালকার ছোট ছোট জমীদারেরা যেমন প্রজাকে জমী বিলি করেন, নায়েব গোমস্তা রাখিয়া খাজনা আদায় করেন, প্রজাদের দাখিলা দেন, জোত উচ্ছেদ করেন, ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও সেইরূপ কলিকাতার জমীদার হইলেন।

স্তর উইলিয়াম হ্যামিলটনের সমাধিস্থান হইতে, অনতিদূরে জব চার্ণকের সমাধি ও স্মৃতি-স্তম্ভ। প্রবাদ এই, কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক, এক হিন্দু রমণীকে বিবাহ করেন। তিনি আধা খ্রীষ্টান—আধা হিন্দু ছিলেন। তাঁহার হিন্দু স্ত্রীর দেহও এই সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার পার্শ্বেই সমাধিস্থ। চার্ণক প্রতিবৎসর তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুদিনে এই সমাধির উপর একটী করিয়া কুক্কুট বলি দিতেন।

যাহা হউক, ১৭৫৭ সালের সংক্রামক রোগে, অনেক ইংরাজ বাঙ্গলায় দেহ

রাখিয়াছিলেন। বহু চেষ্টার পর এই মহামারী কমিয়া আসে। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ একটী সাধারণ হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ইহাই বর্ত্তমান Presidency General Hospital-রূপে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

প্রতিশোধ।*

প্রখর মধ্যাহ্নকাল। চীনদেশের একটী বনপথ দিয়া একদল জাপানী অশ্বারোহী সৈন্ত দস্যুর অনুসন্ধানে ধীরে ধীরে গমন করিতেছিল এবং সেই দলের প্রথমে দুইজন অশ্বারোহী রক্ষী ছিল। রক্ষিদ্বয়ের অগ্রে একজন চীন-দেশীয় পথপ্রদর্শক পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। একজন রক্ষীর হাতে একগাছি অনতিদীর্ঘ রজ্জুর প্রান্তভাগ সেই চীনদেশীয় লোকটির দীর্ঘ বেণীর সহিত দৃঢ়রূপে বদ্ধ ছিল। পথপ্রদর্শক চীনা দৈর্ঘ্যে সাধারণ চীনবাসী অপেক্ষা কিছু বড় এবং দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট—বলবান্।

রক্ষীদের কিছু পশ্চাতে সৈন্তেরা আসিতেছিল। রক্ষীদের ও সৈন্তগণের ব্যবধান-পথে অশ্বারোহণে জাপানী সৈন্তাধ্যক্ষ ওহিও ছিলেন। তাঁহার হাতে শুধু একটা রিভলভার ছিল। তিনি ধীর-মন্থর-গতিতে রক্ষীদের অনুসরণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার দলের অন্যান্য সৈন্তগণ ঠিকভাবে আসিতেছে কি না তাহা মাঝে মাঝে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছিলেন।

কিছুদূর যাইয়া চীনা পথপ্রদর্শক বিনাবাক্যব্যয়ে একটা ছোট শুঁড়ি রাস্তায় বাঁকিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। সোজা রাস্তা ছাড়িয়া তাহাকে বাঁকিতে দেখিয়া রক্ষিদ্বয় ঘোড়ার লাগাম কসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল এবং যে ব্যক্তির হস্তে রজ্জু ছিল, সে সবলে রজ্জু আকর্ষণ করিল। অকস্মাৎ সজোরে কেশাকর্ষণে পথপ্রদর্শক বেচারা একেবারে মাটীতে পড়িয়া গেল।

রক্ষী বলিল, "এই, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্ ?"

---

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

কিছু না বলিয়া লোকটি চুপ করিয়া মাটিতে শুইয়া রহিল; যেখানে আঘাত লাগিয়াছিল একবার সেখানে হাত বুলাইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া শুধু হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল যে, সে যেদিকে যাইতেছে সেদিকেই তাহাদের পথ। তাহার চোখে নিরুদ্ধ ক্রোধের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, "কুকুরের বাচ্ছা! যদি একবার পালাতে পারি তবে কিরূপে বাঁচিস্ দেখ্‌ব!"

রক্ষী বলিল, "ব্যাটা বিড়বিড় করে বলে কি? কিছু শুনা যায় না।"

ইত্যবসরে অধ্যক্ষ ওহিও আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

রক্ষী বলিল "এ এই শুঁড়িপথ দিয়ে যেতে চায়।"

ওহিও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পকেট হইতে একখানা ম্যাপ বাহির করিলেন ও কম্পাসের সাহায্যে দিক নির্ণয় করিয়া কোন্‌দিকে এই পথ গিয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—

"ম্যাপে তো এই শুঁড়িপথ দাগ দেওয়া নাই। যে সকল পথে দাগ আছে সে পথে আমাদের যাইবার দরকার নাই।" পরে পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরাবর ঐ বড় রাস্তায় যাইতে আপত্তি কি?"

সে বলিল, "এ পথে বড় ঘুরিতে হইবে। হুজুর তো আমাকে সোজা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। এই শুঁড়িপথে যাইলে চারি মাইল পথ কম পড়িবে।"

"বড় রাস্তা কোন্ দিক দিয়া গিয়াছে?"

"অনেক ঘুরিয়া ঐদিকে" বলিয়া সে হাত ঘুরাইয়া রাস্তার দূরত্ব দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিল।

ওহিও কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধচিত্তে কি ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় ভাল করিয়া মানচিত্র দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে চীনবাসীকে আরও কয়েকবার নানা প্রশ্ন ও জেরা করিয়া কোন্ পথে যাওয়া উচিত তাহা রক্ষিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তখন সেই পথপ্রদর্শক তাঁহাদের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিশ্চিন্ত মনে মাটির উপর বসিয়াছিল। সে যেন নির্ব্বিকার—এ সব কথার সহিত তাহার যেন কোন সম্বন্ধই নাই! একদৃষ্টিতে ভাল করিয়া শুঁড়িপথটা দেখিয়া লইতেছিল এবং মনে মনে কি একটা মতলব আঁটিতেছিল, বস্ত্রা-ভ্যন্তরে তাহার হস্ত যেন কিসের সন্ধানে ফিরিতেছিল!

পরামর্শে ঠিক হইল যে শুঁড়িপথ দিয়াই যাইতে হইবে। কিন্তু ওহিও রক্ষীদিগকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া দিলেন।

যাহার হাতে রজ্জু ছিল, সে রজ্জুতে আর একবার টান দিয়া বলিল, "এই কুঁড়ে ব্যাটা, ওঠ্।"

ওহিও এরূপ অসদ্ব্যবহার ভালবাসিতেন না। তিনি কিছু বিরক্তিসহকারে রক্ষীকে বলিলেন, "ও কি হচ্ছে? ও রকম কোরো না।" পরে চীনবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় কি খুব লেগেছে?" সে ইতঃপূর্ব্বেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "না, এতে আর কি হ'বে।"

রক্ষিদ্বয় অগ্রসর হইয়া গেল, ওহিও সৈন্যদলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি অশ্বারোহণ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দূরে ২।৩ বার রিভলভারের শব্দ শুনিতে পাইলেন। শুঁড়িপথের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে রক্ষীদের একজন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মৃতবৎ ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং চীনাবাসী পথপ্রদর্শক ছুরি দিয়া রজ্জু কাটিয়া বনপথে ছুটিয়া পলাইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে সৈন্যগণ অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পলায়নপর চীনা পথপ্রদর্শকের পশ্চাতে ধাবমান হইল। ওহিও তাহাদের অগ্রে যাইতেছিলেন। সৈন্যগণ বনপথে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে যে যেদিকে ইচ্ছা ছুটিয়া চলিতেছিল। চীন পথপ্রদর্শক এই সকল পথ উত্তমরূপে চিনিত এবং বনপথ পরিক্রমণে বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। সে শীঘ্রই সৈন্যগণকে বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়া বনের ভিতর কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আর অধিক পশ্চাদ্ধাবন অনর্থক ভাবিয়া ওহিও ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণকে ফিরিবার জন্য সঙ্কেতধ্বনি করিলেন। কিন্তু কেহই ফিরিল না!

তিনি তখন অনন্যোপায় হইয়া বড় রাস্তায় যেখানে তাঁহাদের ঘোড়া ফেলিয়া আসিয়াছিলেন সেইদিকে ফিরিলেন। আসিবার সময় পথের দিকে তিনি লক্ষ্য করেন নাই—কেবল পলাতক চীনার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। কোন্ দিকে পথ তাহা একরূপ অনুমান করিয়া অন্যমনস্কভাবে তিনি ক্লান্তপদে ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন। পথের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। একটা লতা জড়াইয়া তাঁহার পদস্খলন হইল—তিনি সবেগে একখণ্ড প্রস্তরের উপর পড়িয়া গেলেন। অনবধানবশতঃ পতনটা গুরুতর হইয়াছিল—তিনি অতিশয় আঘাত পাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

যখন তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইল তখন তিনি দেখিলেন যে রাত্রি হইয়াছে। আকাশে নক্ষত্র দেখা দিয়াছে, তিনি তাহাদের দিকে চাহিয়া কোথায় আসিয়াছেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন। কিছুপরে পশ্চাদ্দিক হইতে হাসির কলধ্বনির সহিত চীনাভাষায় কথোপকথন শুনিতে পাইয়া তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল ;—তিনি বুঝিলেন তিনি কোথায়। একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার হাত-পা দৃঢ়রূপে বাঁধা। কে একজন বলিল "এখন জেগেছে"। তাঁহার উপর যে বিশেষভাবে পাহারা দেওয়া হইতেছে তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না।

কিছুক্ষণ পরে দুইজন লোক আসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল—কোন কথা বলিল না। এই দুইজন ছাড়া আর কেহ সেখানে আছে কি না তাহা তিনি জানিতেন না। তাই মনে করিলেন যে ইহাদিগকে মিষ্ট কথা বলিয়া বা নিজ দুঃখ জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের করুণালাভ করিয়া যদি কোনও প্রকারে রজ্জু খুলাইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পলাইতে পারিবেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "দড়িতে আমার বড় লাগিতেছে।"

লোক দুটি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে তাঁহার রজ্জু-বন্ধন খুলিয়া দিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একবার চারিদিকে চাহিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার পলায়নের ক্ষীণ আশাটুকু তিরোহিত হইল। অনতিদূরে একটা কাঠের অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছিল। তাহা বেষ্টন করিয়া প্রায় কুড়িজন লোক; কেহ ঘুমাইতেছিল কেহ দাঁড়াইয়াছিল, কেহ বা বসিয়া বসিয়া চণ্ডু খাইতেছিল; সকলেই সশস্ত্র। তিনি একবার পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন তাঁহার রিভলভারটি নাই! সেই দুইজন তাঁহাকে অগ্নির নিকট লইয়া আসিল। সকলে খুব সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার জন্য বসিবার স্থান ছাড়িয়া দিল। একজন বলিল, "অনুগ্রহ ক'রে এখানে বসুন।"

তিনি আগুনের নিকট বসিলেন। ইহার পর তাঁহার অদৃষ্টে কি আছে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একজন একখানা কলাপাতায় করিয়া তাঁহার জন্য ভাত লইয়া আসিল, বলিল—"এখন কিছু খাবেন কি? আমাদের কোন তরকারি নাই—শুধু ভাত।"

সারাদিন কিছু আহার হয় নাই। ওহিও ব্যঞ্জনহীন অন্নই অতি পরিতৃপ্তি-সহকারে ভোজন করিলেন। খাওয়া শেষ হইলে একজন একটা টিনের মগে করিয়া জল আনিয়া দিল। তিনি তাহা পান করিয়া অনেকটা সুস্থ হইলেন।

কিন্তু দস্যুগণ তাঁহার প্রতি এরূপ সদয় ব্যবহার কেন করিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, হয়ত ইহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। এই আশায় তাহাদের সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি দস্যু ?"

এই প্রশ্নে লোকটি যেন মজা পাইল। হাসিয়া বলিল "হাঁ মহাশয়, আমরা দস্যু।"

অন্য সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। 'দস্যু'-নামে অভিহিত হইতে তাহারা যেন বড় আমোদ অনুভব করে বলিয়া বোধ হইল।

"আমি কি তোমাদের বন্দী ?"

"হাঁ''। এবার আর কেহ হাসিল না।

"তবে আমাকে খেতে দিলে কেন ?"

"আপনার ক্ষিধে পেয়েছে ভেবে'—"

এই উত্তরে ওহিও একটু হাসিলেন। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য। তিনি এখন তাঁহার শত্রুদের হাতে। যদিও তাহারা বাহ্যিক সদয় ব্যবহার করিতেছে তথাপি তিনি যে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবেন সে আশা তাঁহার বড় ছিল না।

ওহিও জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে তোমরা কি করিবে ?"

"বো— যাহা আজ্ঞা করেন তাহাই করিব।"

"বো— কে ?"

"বোথা"।

বোথার নাম শুনিয়াই তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তিনি সেই দুর্দান্ত দস্যুদলপতির নৃশংস ও ভয়াবহ কাহিনী সকল ভালরূপেই জানিতেন। তাহার অমিত সাহস ও অমানুষিক নৃশংসতার বিষয় তিনি যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তাহার দয়া, ক্ষমা ও উদারতার কাহিনীও সেরূপ অনেক শুনিয়াছিলেন। ওহিও ভাবিলেন যে সর্দ্দার হয়ত তাঁহার উপর দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু আশা খুবই কম। বরং তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল যে ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে কোন না কোন প্রকারে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়।

ওহিওর মন এইরূপ বিষাদ চিন্তায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ একটা শব্দে তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। চাহিয়া দেখিলেন যে, যে সকল প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল তাহারা সকলে নতজানু হইয়া যুক্তকরে কাহাকে অভিবাদন করিতেছে। ইহার কারণ জানিবার জন্য ওহিও ভাল করিয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিলেন, দেখিলেন

অনতিদূরে একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে আর কেহ নয়—তাঁহাদের পলাতক পথপ্রদর্শক। কিন্তু এখন আর তাহার সেই সামান্য পরিচ্ছদ নাই। এখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ মহার্ঘ্য বসন ভূষণে আবৃত। সিল্কের ঢিলা পাজামা—সিল্কের পাগড়ী; গায়ে লম্বা আস্তেনযুক্ত লোমশ কোট। স্কন্ধদেশ হইতে রৌপ্যখচিত দীর্ঘ কুঠার ঝুলিতেছিল।

পলাতক পথপ্রদর্শককে দেখিয়া ওহিও ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "শেষে আমাদিগকে এইরূপ বিপদে ফেলিয়াছ!"

গম্ভীরভাবে উত্তর হইল "আমার লোকজন আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।"

"তুমি কে?"—অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই ওহিও অনুমান করিয়াছিলেন।

"আমি বোথা" বলিয়া দস্যুসর্দ্দার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার হাতে একখানা কাগজ ছিল—তাহাই নাড়িতে লাগিল। পরে বলিল;—"তোমাকে কি করিব আমি তাহাই ভাবিতেছি।" বলিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

আসন্ন বিপদে ওহিওর হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাঁহার মুখে আর কথা সরিতেছিল না। অতিকষ্টে অস্ফুটস্বরে বলিলেন "কি?"

"প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে তোমাকে প্রাণে মারিব না। যখন সেই রক্ষী আমার চুল ছিঁড়িয়া দিয়াছিল তখন তুমি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলে—সে তাই আর আমাকে কষ্ট দেয় নাই। আমি যেরূপ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছি সেইরূপ উপকারেরও পুরস্কার দিতে পারিতাম।"

"সেই রক্ষীকে আপনি কি করিয়াছেন?"

"তাহাকে হত্যা করিয়াছি—এবং তোমাকেও হত্যা করিব।"

"আমি আপনার বন্দী! বর্ব্বরেরাই বন্দীকে হত্যা করে।"

"তোমরা জাপানী—তোমরাও তো বন্দীকে হত্যা কর।"

স্বীয় জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে ওহিও একটু দৃঢ়ভাবে বলিলেন "কখনই না।"

"কি! কখনই না!—আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি। যদি নিজে না দেখিতাম তাহা হইলে হয়ত তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম। তিন দিন আগে আমি তোমাদের সৈন্যাবাসের নিকট ছিলাম। সেখানে আমি কি দেখিয়াছি তাহা কি জান?"

ওহিও জানিতেন। তিনি নিজে দেখেন নাই বটে কিন্তু দুর্গাভ্যন্তরে প্রত্যহ কি ভীষণ বর্ব্বরোচিত কাণ্ড সাধিত হইত তাহা তাঁহার অজ্ঞাত থাকিত না। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সর্দ্দার বলিতে লাগিল—"আমিই তোমাকে বলিতেছি। আমি দেখিয়াছি আমার স্বদেশবাসী কুড়িজন ভ্রাতা সারিবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিল। একে একে তাহাদিগকে দেওয়ালের নিকট দাঁড় করাইয়া সকলের সম্মুখে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিল।—"

"কিন্তু তাহারা তো ডাকাত, আমাদের শত্রুতা করিতেছিল।"

"তাহারা তোমাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছিল আর তোমরা কি আমাদের সহিত মিত্রতা করিতে আসিতেছিলে? তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে আমি কোন প্রভেদ দেখি না। তবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত খারাপ লোক থাকিতে পারে এবং তাহাদের দণ্ড হয়ত সমুচিত হইয়া থাকিতে পারে। কারণ আমি সকলকে চিনিতাম না। কিন্তু আমি জানি তাহাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিল যাহারা দেশভক্ত চীনবাসী। তোমরা যেরূপ আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছ তাহারাও সেরূপ তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।"

ওহিও বুঝিলেন তর্ক করিয়া কোন ফল হইবে না। বলিলেন,—"যদি আমাকে হত্যা করাই আপনার অভিপ্রায় তবে আমাকে পানাহার দিয়া বাঁচাইলেন কেন?"

ভয়ে ভক্তি আসিল! ওহিও এইবার 'তুমি' ছাড়িয়া, 'আপনি' ধরিলেন।

অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা দস্যুসর্দ্দার জানাইল যে, এই প্রশ্ন এখানে অবান্তর। সে কহিল—"জাপানীরাও ত তাহাদের বন্দীদিগকে খাইতে দেয়।—কিন্তু কেন আমি তোমার প্রাণদণ্ড করিতেছি তাহা তোমাকে জানান আবশ্যক, তাই বলিতেছি।"

এইখানে দস্যুসর্দ্দারের কণ্ঠ যেন জড়াইয়া আসিল, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"যাহাদিগকে তোমরা হত্যা করিয়াছ তাহাদের মধ্যে একজন অল্পবয়স্ক যুবক ছিল। সে তোমার চেয়ে অনেক ছোট। তুমি যাহা করিয়াছ —সেও তাহাই করিয়াছিল। সে তাহার সৈন্যগণের নেতা ছিল। তাহার আর কোনও দোষ ছিল না। সে নেতা ছিল—তাই তাহাকে হত্যা করিয়াছে।"

সর্দ্দার থামিল। পুনরায় সে যখন কথা কহিল তখন তাহার স্বর গভীর বিষাদপূর্ণ; কিন্তু বিষাদের সহিত আত্মগৌরবের ক্ষীণভাব জড়িত।

"আমি দেখিয়াছি নির্ভয় হৃদয়ে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া সে যুবক

দাঁড়াইয়াছিল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হাসিয়া হাসিয়া সঙ্গীগণের সহিত কথা কহিতেছিল।" সর্দ্দার আবার থামিল।

ওহিও বুঝিলেন জীবনের আর কোনও আশা নাই।

কিছু পরে সর্দ্দার আবার আরম্ভ করিল। তাহারা সেই যুবকের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছে আমিও তোমার প্রতি ঠিক সেইরূপ করিব। আমি যাহা যাহা করিব ঠিক করিয়াছি তাহা এই কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছি। তাহারা যাহাতে তোমাদের দণ্ডের কথা ভাল করিয়া জানিতে পারে তাহার জন্ম এই চিঠি তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিব। কাল সূর্য্যোদয়ের সময় তোমাকে একটা বৃক্ষের নিকট দাঁড়াইতে হইবে এবং আমার দশজন লোক তোমাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িবে। তাহাতে যদি তোমার মৃত্যু না হয় তাহা হইলে আমার কোন লোক তোমার নিকট গিয়া তোমার নিজের পিস্তল দিয়া তোমার মস্তকে গুলি করিয়া মারিবে। এই সব কথা এই চিঠিতে লিখিত আছে।

উৎকণ্ঠা সহকারে ওহিও জিজ্ঞাসা করিলেন "চিঠি কাহার ঠিকানায় যাইবে?"

"জেনারেল সাহেবের।"

শুনিবামাত্র ওহিও সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আর্ত্তস্বরে কহিলেন—

"না—ইহা পাঠা'বেন না। দোহাই, ইহা পাঠা'বেন না। আমাকে যেরূপ ভাবে ইচ্ছা হয়, যত নিষ্ঠুরভাবে ইচ্ছা হয় হত্যা করুন—ঐ পত্র সেখানে পাঠা'বেন না।"

মৃত্যু অনিবার্য্য দেখিয়াও এতক্ষণ পর্য্যন্ত ওহিও কোনরূপ ভীতি বা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। মরিতে হইলে বীরের মতই অকুতোভয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহার মনের সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি নিতান্ত অধৈর্য্য সহকারে আর একবার বলিলেন—"দোহাই, চিঠি সেখানে পাঠাইবেন না।"

সর্দ্দার ইহাতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দেখিতেছি, তুমি মরিতে কাতর কিংবা ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে ভীত নহ, কিন্তু জেনারেলের নিকট পত্র-প্রেরণ তাহা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক বোধ করিতেছ কেন?"

"এই চিঠি পাইলে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

"কেন?"

"কারণ তিনি আমার পিতা!"

মুহূর্ত্তের জন্ত সর্দ্দারের চক্ষু একথায় ক্রোধে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তারপর সে হাসিল—উচ্চৈঃস্বরে নির্দ্দয়ভাবে হাসিল।

"সে তোমার পিতা। তাই তুমি মনে কর যে তার কাছে এ চিঠি পাঠান উচিত নয়?"

"হাঁ। যদি আপনার একটুকুও দয়া থাকে তবে ঐরূপ ভয়ানক চিঠি পিতার নিকট পাঠাইবেন না। আপনার আর যাহা ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে করুন—পিতার নিকট উহা পাঠাইবেন না।"

"তোমার কি ইচ্ছা যে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব—আমি—?"

সর্দ্দারের স্বর কর্কশ, ক্রোধব্যঞ্জক; দৃষ্টি করুণাশূন্ত!

"তুমি কি জান, সেই বালক—সেই বীর যুবক কে—কাহাকে তাহারা নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছে?"

"না, আমি জানি না—জানি না।"

"সে আমার ছেলে।"

দস্যুসর্দ্দার কিছুক্ষণ অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল। তীব্র হৃদয়াবেগ যেন তাহার চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইতেছিল।

পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আমি যেমন নিদারুণ শোক পাইয়াছি—আর যেন কেহ তাহা পায় না।"

এই বলিয়া সর্দ্দার বনের দিকে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ওহিও শুনিলেন, বনপ্রান্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া সে তখনও বলিতেছে—"সে আমার ছেলে।"

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার।

বিষ্ণুসংহিতায় দণ্ডবিধি।

আধুনিক ইংরাজী দণ্ডবিধির প্রবঞ্চনা আইনের প্রায় অনুরূপ আইন প্রাচীন ভারতবর্ষের দণ্ডবিধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন জগতে আধুনিক জগতের মত অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রতারণা-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত কি না তাহা বলা সুকঠিন। আমার বোধ হয় আধুনিক সুসভ্য জীবনের

জটিলতার সহিত জটিল কার্য্যাবলীর দ্বারা অপরাধ করিবারও একটা সম্বন্ধ আছে। প্রতারণা অপরাধে দুষ্টবুদ্ধির যতটা বিকাশ দেখাইতে পারা যায়, এমন অপর কোনও অপরাধে দেখাইতে পারা যায় না। জাল ব্যবসা খুলিয়া আধুনিক জগতের লোক যেরূপে দেশ দেশান্তরে লোক ঠকাইতে পারে, প্রাচীন জগতে লোকে সেরূপ বিশাল ভাবে প্রতারণা করিবার অবসর পাইত না। প্রতারণা সম্বন্ধে মহামুনি মনুর বিধান নিম্নলিখিত রূপ —

উপধাভিশ্চ যঃ কশ্চিৎ পরদ্রব্যং হরেন্নরঃ।
সসহায় স হন্তব্যঃ প্রকাশং বিবিধৈর্বধৈঃ॥

যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রতারণাদি দ্বারা পরধন হরণ করে, রাজা তাহাকে এবং তাহার ঐ কার্য্যে সহকারীদিগকে বিবিধ উপায়ে শাস্তি দিবেন অথবা বধদণ্ড করিবেন। প্রতারণার দুই একটা প্রকার ভেদও মনুসংহিতায় নির্দ্দেশ হইয়াছে। কয়েক প্রকার প্রতারকের দণ্ডের ব্যবস্থা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহীতমূল্যং যঃ পণ্যং ক্রেতুর্নৈব প্রযচ্ছতি।
সোদয়ং তস্য দাপ্যোঽসৌ দিগ্‌লাভং বা দিগাগতে।

যে বণিক্ মূল্য গ্রহণ করিয়া, ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না করে, সে পরে ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধি সমেত প্রদান করিতে বাধ্য, এ নিয়ম স্বদেশীয় ক্রেতার পক্ষে। আর দেশান্তর সমাগত ক্রেতাকে তদ্দেশে বিক্রয় করিলে যে লাভ হয়, তৎসমেত দিতে বাধ্য।

বলা বাহুল্য, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার উপরোক্ত বিধান দেওয়ানী চুক্তিভঙ্গ ও ক্ষতি পূরণের আইনের সমতুল্য। তবে নিম্ন বর্ণিত প্রতারণার অপরাধটি আধুনিক ফৌজদারী আইনের প্রতারণার বর্ণনার মধ্যে পড়িতে পারে। যথা—

অন্যহস্তে চ বিক্রীতং দুষ্টং বা দুষ্টবদ্‌যদি,
বিক্রীণীতে দমস্তত্র মূল্যাৎ তু দ্বিগুণো ভবেৎ।

অন্যের নিকট বিক্রীত দ্রব্য বিক্রয় করিলে বা সদোষ দ্রব্যকে দোষহীন বলিয়া বিক্রয় করিলে, বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে।

অপরের বা সাধারণের অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কোনও ব্যক্তি কোনও সম্পত্তি নষ্ট করিলে বা কোনও সম্পত্তির অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহার উপকারিতার হ্রাস করিলে, ইংরাজি আইন মতে 'মিস্‌চিফ্' বা ক্ষতি করার অপরাধ করা হয়। দুষ্ট লোকে সেতুভঙ্গের দ্বারা সাধারণের প্রভূত অনিষ্ট করিতে

পারে, একজন ব্যক্তি অপরের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া বা তাহার চালের খড় টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বিব্রত করিতে পারে। লোকের গবাদি গৃহপালিত জন্তুর প্রাণহানি করিয়া বা তাহাদিগের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া, মন্দলোকে এই শ্রেণীর অপরাধ করিতে পারে।

হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র এই শ্রেণীর অপরাধের যথেষ্ট দণ্ডের বিধান করিয়াছে। মুদগরাদি দ্বারা কেহ পরের ভিত্তি অভিহত, বিদারিত, দ্বিধাকৃত এবং ভূমিশায়িত করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য মুনির ব্যবস্থানুসারে তাহাকে গৃহস্বামীর ক্ষতি পূরণ করিতে হইত এবং যথাক্রমে পঞ্চপণ, দশপণ, বিংশতিপণ, এবং পঞ্চবিংশতিপণ দণ্ড দিতে হইত। গবাদি পশু বধ কিম্বা তাহাদের অঙ্গচ্ছেদ করিলে কিরূপ দণ্ড হইত তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বিষ্ণুসংহিতার মতে

সীমাভেত্তারমুত্তম সাহসং দণ্ডয়িত্বা পুনঃ সীমাং লিঙ্গাঙ্কিতাং কারয়েৎ। *

সেতুভেদকের মহামুনি বিষ্ণু বধদণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেতু ভঙ্গ করিলে রাষ্ট্রের বহু লোকের অসুবিধা ও ক্ষতি হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার সেতু গঠন করিতে বহু অর্থব্যয় হয়।

মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

বনস্পতীনাং সর্ব্বেষামুপভোগো যথা যথা
তথা তথা দমো কার্য্যো হিংসায়ামিতি ধারণা।

হিংসাদ্বারা বনস্পতির হানি করিলে পত্রপুষ্পফলাদির উত্তমাধম বিবেচনায় রাজা ক্ষতিকারীর দণ্ড করিবেন। চর্ম্ম ও চর্ম্মের পাত্র কাষ্ঠময় ও মৃন্ময় ভাণ্ড

---

* ভ্রম বশতঃ পূর্ব্বে উত্তম সাহস, মধ্যম সাহস প্রভৃতি বাক্যগুলির অর্থ লিপিবদ্ধ করি নাই। এ বিষয়ে বিষ্ণুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায় অনূদিত করিয়া দিলাম।

"গবাক্ষ নির্গত সূর্য্যকিরণে যে ধূলিকণা দৃষ্ট হয় তাহার সংজ্ঞা বা নাম ত্রসরেণু। আট ত্রসরেণুতে এক লিক্ষা হয়। তিন লিক্ষায় এক রাজসর্ষপ। তিন রাজ সর্ষপে এক গৌরসর্ষপ। ছয় গৌরসর্ষপে এক যব। তিন যবে এক কৃষ্ণল। পাঁচ কৃষ্ণলে এক মাষ। বার মাষে এক অক্ষার্দ্ধ, এক অক্ষার্দ্ধ এবং চার মাষে এক সুবর্ণ। চারি সুবর্ণে এক নিষ্ক। সমপরিমাণে দুই কৃষ্ণলে এক রৌপ্যমাষক। ষোড়শ রৌপ্য মাষকে এক ধরণ। এক কর্ষ তাম্রের নাম কার্ষাপণ। সার্দ্ধ দ্বিশত পণের নাম প্রথম সাহস। পঞ্চশত পণের নাম মধ্যম সাহস। এবং সহস্র পণের নাম উত্তম সাহস।" মনুসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"পণানাং দ্বেশতে সার্দ্ধে প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃত।
মধ্যম পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রমেব চোত্তমঃ।"

এবং পুষ্প মূল ফল যদি কেহ ঈর্ষা বশতঃ নষ্ট করে তাহা হইলে রাজা তাহাকে ঐ বিনষ্ট দ্রব্যের মূল্যের পঞ্চগুণ অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন। শাবক-পশু বিনষ্ট হইলে দুইশতপণ দণ্ড হইবে এবং

পঞ্চাশত্ ভবেদ্দণ্ডঃ শুক্তেষু মৃগপক্ষিষু।

ইংরাজি আইনে যাহাকে অনধিকার প্রবেশ বলে ঠিক তাহার অনুরূপ আইন প্রাচীন ভারতে ছিল না। বলপ্রকাশ পূর্ব্বক প্রতিবাসীর জমি দখল করিয়া লইলে বা অপরের ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহার স্বামিত্ব স্বত্বের হানি করিলে অনধিকার প্রবেশ করা হয়। সেরূপ অপরাধ প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীয় ছিল। আধুনিক ব্যবস্থা অনুসারে এক ব্যক্তি অপরের গৃহে আপনার অঙ্গের কোনও অংশ বিনানুমতিতে প্রবেশ করাইয়া গৃহস্বামীর অবমাননা করিলে বা তাহার বিরক্তির সঞ্চার করিলে এই অপরাধ করা হয়। ইংরাজিতে একটী প্রবচন আছে যে, প্রত্যেক ইংরাজের গৃহ তাহার দুর্গ স্বরূপ। অস্মদ্দেশে এ ধারণা পূর্ব্বে আদৌ ছিল না। অপরাধ করিবার জন্য কেহ কাহারও গৃহে প্রবেশ করিলে অপরাধানুসারে দোষীকে শাস্তিলাভ করিতে হইত। এমন কি

গোচর্ম্মমাত্রাধিকাং ভুবমন্যস্যাধিকৃতাং তস্মাদনির্ব্বোঢ্যান্যস্য যঃ প্রযচ্ছেৎ স বধ্যঃ।

অন্যাধিকৃত গোচর্ম্ম মাত্রাধিক ভূমি ভূস্বামীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্যকে প্রদান করিলে বধদণ্ড হইতে পারে।

একোঽশ্বরান্ বহুৎপন্নং নরঃ সংবৎসরম্ ফলম্।
গোচর্ম্মমাত্রা সা ক্ষৌণীস্তোকা বা যদি বা বহুঃ॥

যে ভূমির উৎপন্ন ফল শস্যাদি একজন ব্যক্তির সম্বৎসরের ভোগ্য, সে ভূমি অল্পই হউক বা বিস্তৃতই হউক, তাহাকে গোচর্ম্মমাত্রা ভূমি বলা হইত। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও বিধান আছে

মর্য্যাদায়াঃ প্রভেদে তু সীমাতিক্রমণে তথা।
ক্ষেত্রস্য হরণে দণ্ডা অধমোত্তম মধ্যমাঃ॥

মর্য্যাদা প্রভেদে (অর্থাৎ ক্ষেত্রের অর্গল ভাঙ্গিয়া দিয়া) সীমা অতিক্রম করিয়া কর্ষণ করিলে এবং ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষেত্রাদি অপহরণ করিলে যথাক্রমে অধম সাহস, মধ্যম সাহস এবং উত্তম সাহস দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, অনধিকার প্রবেশের আইনের এ সকলগুলি গুরুতর অপরাধ। কেবলমাত্র বিশ্রাম-গৃহে বিনানুমতিতে প্রবেশ করিলে বা সাহেবের কর্ম্মস্থলে কর্ম্মানুসন্ধানে যাইলেই সেকালে লোককে দণ্ডনীয় হইতে হইত না। গৃহে

বলিয়া গৃহস্বামীকে অবমাননা করিয়াছে বলিয়া কত লোক শাস্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহার বর্ণনা সংস্কৃত পুরাণ ও সাহিত্যে আমরা বিস্তর পাঠ করিয়াছি।

"অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে"

নীতি ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলী সর্ব্বদাই আপামর সাধারণকে শিক্ষা দিতে যত্নবান হইতেন।

"সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ"

এ শিক্ষা কথাচ্ছলে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ কিশোর বয়স হইতে হিন্দুসন্তানের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বিলাতে সাধারণ ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া অপরাধ। গৃহস্থের বাটীতে বিনানুমতিতে ভিখারী প্রবেশ করিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। অস্মদ্দেশে যে গৃহস্থের বাটী হইতে ভিক্ষুক মুষ্টিভিক্ষায় বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়, সে গৃহস্থকে লোকে পাতকী বলে।

উপরে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা হইতে যে গুরুতর রকম অনধিকার প্রবেশ দ্বারা ভূমি কাড়িয়া লওয়ার অপরাধ বর্ণনা করিয়াছি তাহারও আবার মার্জ্জনা আছে। যদি পরহিতার্থ কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তাহা হইলে পরের জমিও অপহরণ করিতে পারা যায়।

ন নিষেধ্যোঽল্পবাধস্তু সেতুঃ কল্যাণকারকঃ
পরভূমিং হরন্ কূপঃ স্বল্পক্ষেত্রো বহূদকঃ।

কোন ব্যক্তি পরকীয় ভূমিতে সেতু বা কূপাদি জলাশয় করিয়া দিলে ভূস্বামীর যৎকিঞ্চিৎ জমি বিনষ্ট হইলেও তাহা নিষিদ্ধ নহে। কারণ কূপাদি জলাশয় সামান্যমাত্র স্থান অধিকার করে কিন্তু বহু জলপূর্ণ বলিয়া প্রভূত পক্ষে অনেক উপকার সাধন করে।

এ বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু জগতের ও আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের নীতির পার্থক্যের মূল কারণ এতদুভয় জাতির গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ধারণার পার্থক্য। হিন্দু গৃহস্থ কর্ত্তব্য পালনের জন্য লালায়িত, ইংরাজ আপামর সাধারণ আপনার স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য উদগ্রীব। আতিথ্য ধর্ম্মের ব্যত্যয় হইবে বলিয়া হিন্দু গৃহপ্রবেষ্টাকে মার্জ্জনা করিতে পরাঙ্মুখ নহে; ইংরাজ আপনার স্বামিত্বের ও স্বত্বের হানি হইবার আশঙ্কায় বিনানুমতিতে আগন্তুককে গৃহের ত্রিসীমায়

অন্তরালে রাখিতে সদাই কৃতচেষ্ট। এতদুভয় জাতির সামাজিকতার আদর্শ বিভিন্ন বলিয়া ব্যবহার শাস্ত্রের বিধানের পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের অষ্টাদশ অধ্যায়ে লেখা (দলিল) এবং প্রতিরূপ দ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত অপরাধ বর্ণিত হইয়াছে। ইংরাজ জাতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা বঙ্গদেশের শাসনভার পাইবার অব্যবহিত পরেই মহারাজা নন্দকুমারকে জাল করার অপরাধে ফাঁসি দিয়াছিলেন। তাহাতে বঙ্গীয় সমাজ ত্রস্ত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল বলিয়া ইংরাজী ইতিবৃত্তকারগণ বলিয়া থাকেন যে, জাল করা অপরাধটা ভারতবর্ষে মোটেই অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। তদানীন্তন কালের প্রসিদ্ধ ব্যবহারতত্ত্ববেদ্ অন্যতম শাসনকর্ত্তা লর্ড মেকলে জালিয়াতি বিদ্যাটা নিম্ন বঙ্গের চতুর অধিবাসীবৃন্দের একটা আত্মরক্ষার অস্ত্রের মধ্যে বর্ণনা করিয়া চিরদিনের জন্য ভারতবাসীর হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসিতে বাঙ্গালী স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সে বিস্ময় কিন্তু কূটলেখ্য বা জালিয়াতী অপরাধের লঘুত্ব জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় নাই। তাহারা স্তম্ভিত হইয়াছিল ব্রাহ্মণের বধদণ্ডে, সুবিচারের অভাবে। জালিয়াতি অপরাধে ইংলণ্ডের তদানীন্তন ব্যবহার মতে প্রাণবধ হইত। সুতরাং ইংরাজের চক্ষে শাস্তি ঠিকই হইয়াছিল। অস্মদ্দেশে সে সময় মুসলমানদিগের ঐরূপ অপরাধে অত গুরু দণ্ডের বিধান ছিল না। তাই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মহারাজের বধদণ্ডটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই।

পূর্ব্বে একুষ্টরসান অপরাধের উল্লেখ কল্পে আমরা লেখ্য প্রকরণ সম্বন্ধে হিন্দু আইনের বিধান পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। বিষ্ণুসংহিতায় দেখিতে পাই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের আইনের মত হিন্দু আইনও কূটলেখ্যকারীর বধদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছে। তবে ব্রাহ্মণের কোনও অপরাধে বধাজ্ঞা হইত না

কূটশাসনকর্ত্তৃংশ্চ রাজা হন্যাৎ। কূটলেখ্য কারাংশ্চ।

কূট শাসন শব্দের টীকাকারগণ দুই রকম অর্থ করেন। রাজ কর্ম্মচারী লোভাদি বশতঃ অযথা শাসন করিলে কূটশাসন করা হয়। কেহ বলেন, রাজদণ্ড তাম্র শাসনাদি জাল করার নাম কূটশাসন।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কারখানাজাত দ্রব্যে নাম স্বাক্ষরাদি (Trade mark) চিহ্ন রাখে। লোকে যে ব্যবসাদারের উপর বিশ্বাস করে তাহার দ্রব্য ক্রয়

করে। সুতরাং সকল দেশেই প্রতারকগণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীর দ্রব্যের প্রতিরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ক্রেতাগণকে প্রবঞ্চিত করে। এরূপে দ্রব্যের প্রতিরূপ বিক্রয় অপরাধের ব্যবস্থা বিষ্ণুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অপরাধে উত্তম সাহস দণ্ড হইত।

সাম্যমন্ত্র দীক্ষিত ইংরাজ জাতির মধ্যেও প্রভু ভৃত্যের একটা পার্থক্য আছে। কোনও ব্যক্তি ভৃত্যের মত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পরে বিপদের সময় প্রভুকে ছাড়িয়া পলাইলে, সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। আধুনিক সুসভ্য জগতে দাস-বিক্রয় প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে মনোমালিন্য বশতঃ একজন অপরকে ত্যাগ করিলে কোনও অনিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় ভৃত্য স্বেচ্ছামত কর্ম্মত্যাগ করিলে লোকের অসুবিধা ঘটিতে পারে। কেবল সেই সকল স্থলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন ভৃত্যের কর্ম্মত্যাগ অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছে। বাহক বা কুলি যদি চুক্তি দ্বারা কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়া মধ্যপথে পলায়ন করে, কোনও অসহায় ব্যক্তির কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইয়া কোনও ব্যক্তি যদি অকস্মাৎ তাহাকে বিপদে ফেলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে কিম্বা এক ব্যক্তি অপরের সহিত চুক্তি করিয়া যদি দেশান্তরে গিয়া চুক্তি ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে ঐরূপ ভৃত্যকে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ইংরাজী আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। শেষোক্ত বিধান ব্যবসায় বাণিজ্যের পুষ্টির জন্য হইয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি বৃহৎ সহরে কোনও কারিকর অগ্রিম কিছু টাকা লইয়া তিন বৎসরের ন্যূনকাল কাহারও নিকট কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইয়া শেষে কর্ম্ম না করিলে, আদালত কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া তাহাকে চুক্তি রক্ষা করিতে হয়।*

শেষোক্ত নিয়ম কেবল শিল্পীদিগের পক্ষে—গৃহভৃত্য বা অপর শ্রেণীর ভৃত্য এই আইনানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য নহে। অনেকের ধারণা এ সকল প্রথা দাস প্রথার অবশিষ্টাংশ। কিন্তু আমার বোধ হয় শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে এ আইন শুভকর।

প্রাচীন হিন্দু জাতির দণ্ডবিধিতেও এইরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ইংরাজের সাম্যভাবাপন্ন সমাজে এ বিধান আছে, তখন প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে এ বিধান থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু সে সমাজের বিধানের মধ্যে একটু সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভু-শ্রেণীর লোকেই

* ১৮৫৯ সালের ১৩ আইন।

আজকাল আইন সৃষ্টি করে। কোনও কোনও সহৃদয় মহাপুরুষ পরহিতার্থ দরিদ্রের দুঃখমোচনার্থ পার্লামেণ্ট সভায় নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদিগের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেন এবং স্বার্থান্ধ অর্থবানদিগের নিকট লাঞ্ছিত হন। কিন্তু ভৃত্য শ্রেণীর লোক ব্যবস্থাপক সভার স্থান পাইতে পারে না। হিন্দুদিগের জন্য যাঁহারা আইন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহারা এ পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পদের কোনও ধার ধারিতেন না, তপোবনের স্বচ্ছন্দজাত ফল মূল খাইয়া তাঁহারা সমাজের হিতের জন্য বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের রচিত প্রাচীন গার্হস্থ্য আইনে দেখি, ভৃত্য নির্দ্ধারিত কালের পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিয়া পলাইলেও দণ্ড ভোগ করিত, আবার তাহার ধনবান প্রভুও নির্দ্ধারিত কালের পূর্ব্বে তাহাকে তাড়াইয়া দিলে প্রভুকেও ফৌজদারী আদালতে দণ্ডভোগ করিতে হইত। আধুনিক আইনমতে ভৃত্য দেওয়ানী আদালতে প্রভুর উপর ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ব্বে কর্ম্মচ্যুত হইয়া অনশনে মৃতপ্রায় হইলেও প্রভুকে পুলিশকোর্টে টানিয়া আনিতে পারে না। এ বিষয়ে মহামুনি বিষ্ণুর আদেশ এইরূপ—

"ভৃতকশ্চাপূর্ণ কালে ভৃতিং ত্যজন সকলমেব মূল্যং দদ্যাৎ। রাজ্ঞে চ পণ শতং দদ্যাৎ।"

কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ভৃত্য কর্ম্মত্যাগ করিলে স্বামীকে সম্পূর্ণ মূল্য দিবে এবং রাজাকে এক শত পণ দণ্ড স্বরূপ দিবে। অপর পক্ষে—

"স্বামী চেদ্‌ভৃতকমপূর্ণকালে জহ্যাৎ তস্য সর্ব্বং মূল্যং দদ্যাৎ। পণশতঞ্চ রাজনি।"

স্বামী যদি অপূর্ণ কালে ভৃত্যকে পরিত্যাগ করে তাহার সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট কালের অবশিষ্টাংশের মূল্য দিবে এবং রাজার নিকট শতপণ দণ্ড দিবে।

ভৃত্যকে জোর করিয়া কার্য্য করাইলে তাহার মূল্য দিবার ব্যবস্থা যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় দেখিতে পাই। ভৃত্যের কার্য্যের দ্বারা যদি স্বামীর ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ উৎপন্ন হয়, সেই লাভের একাংশ ভৃত্য রাজ-সাহায্যে পাইবার অধিকারী।

বিংশ অধ্যায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধি বিবাহ সংক্রান্ত দোষের বর্ণনা করিয়াছে। এই অধ্যায়ে বহু বিবাহ দণ্ডনীয় হইয়াছে। হিন্দু, জৈন, মুসলমান, য়িহুদী প্রভৃতি জাতীয় পুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারে সুতরাং তাহারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিলেও এই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় না। ঐ সকল জাতীয় স্ত্রীলোক এককালে একাধিক পুরুষের সহিত পরিণীতা হইলে অপরাধী হয়। খৃষ্টান জাতীয় পুরুষ বা স্ত্রীলোক এককালে একাধিক বিবাহ করিতে পারে না।

হিন্দু পুরুষদিগের মধ্যে একাধিক বিবাহ করিবার পদ্ধতি আবহমান কাল

হইতে প্রচলিত। আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু সমাজে একাধিক বিবাহ অত্যন্ত বিরল। একাধিক বিবাহ-পদ্ধতিকে অনেকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, একাধিক বিবাহে পূর্ব্ব স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হয়। বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে পুরুষগণ দৈহিক বলের প্রাধান্য বশতঃ অনেকগুলি স্ত্রীলোককে আপনার কবলগত করিয়া রাখে। সভ্যতার উচ্চ সোপানে উঠিয়া হিন্দু সমাজ বহু বিবাহের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ নিন্দিত হইয়াছেন।

আমরা বহু বিবাহের পক্ষপাতী নহি। তবে প্রাচীন সমাজের ঐরূপ বিধান বর্ব্বরতা বা পুরুষজাতির স্বার্থপরতার পরিচায়ক, এ কথাও স্বীকার করিতে পারি না। হিন্দু সমাজ পুরুষ মাত্রকেই একাধিক বিবাহ করিতে অনুমতি প্রদান করে নাই। কেবল বিশেষ কারণ বশতঃ কোনও কোনও স্থলে বহু বিবাহ মার্জ্জনা করিয়াছে মাত্র। পরে যদি শাস্ত্রীয় বিধি না মানিয়া কুলীন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব কলির পিশাচ বিবাহটাকে বৃত্তি করিয়া উদরান্নের এবং ইন্দ্রিয় চরিতার্থের উপায়ে পরিণত করিয়া থাকে তজ্জন্য শাস্ত্র দোষী হইতে পারে না।

মহামুনি মনু বলিয়াছেন, স্ত্রী গর্ভ হইতে পুত্র জাত হয় বলিয়াই ভার্য্যাকে জায়া বলা হয়। তদানীন্তন কালে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের জন্য পুত্রোৎপাদন হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য পুত্রলাভ। সুতরাং পুত্র না জন্মিলে কেবলমাত্র স্ত্রীর অনুমতি লইয়া লোকে পুত্রার্থ দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিতে পারিত। এ বিষয়ে মনুসংহিতার আদেশ—

যা রোগিণী স্যাৎ তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ।

পীড়াগ্রস্থা অথচ পতিরতা ও পতিপ্রাণা এবং সুশীলা স্ত্রীর অনুমতি লইয়া পতি অন্য বিবাহ করিবে। কদাচ তাহার অবমাননা করিবে না। পুরুষ কিরূপ স্থলে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সে বিষয়ে এইরূপ বিধান দিয়াছেন,—

ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে
গর্ভভর্ত্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে।

মানস-ব্যভিচার করিলে স্ত্রীলোক প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। তবে ব্যভিচার দ্বারা যদি গর্ভ হয় কিম্বা স্ত্রীলোক ভ্রূণহত্যা, স্বামীহত্যা প্রভৃতি মহাপাতক করে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

বলা বাহুল্য, এই সকল মহাপাতক করিলে খৃষ্টান জগতেও স্ত্রীত্যাগ বিধেয়। এটুকু আত্মমর্য্যাদা সকল জাতিরই আছে।

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা।

স্ত্রীলোক সুরাপায়িনী, দীর্ঘরোগগ্রস্তা, ধূর্ত্তা, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী কেবল কন্যা প্রসবিনী অথবা পুরুষদ্বেষিণী হইলে তাহার স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে। অবশ্য এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করা আধুনিক নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার কোনও স্ত্রী থাকিতে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা অত্যধিক কঠোর বলিয়া বোধ হয় না। কন্যা প্রসবিনী স্ত্রীর কোনও অপরাধ নাই। কিন্তু পুত্রার্থ তাহার স্বামীকে হিন্দু শাস্ত্র বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়াছে।

দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলে প্রথমা স্ত্রীকে যাহাতে নিগৃহীত হইতে না হয়, তজ্জন্য যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বিধান করিয়াছেন,—

অধিবিন্না তু ভর্ত্তব্যা মহদেনোঽন্যথা ভবেৎ।

যে ব্যক্তি স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করে তাহাকে প্রথমা স্ত্রীকে পূর্ব্ববৎ ভরণপোষণ করিতে হইবে। নতুবা অত্যন্ত পাপ হইবে।

হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের বিবাহ সম্বন্ধীয় অপরাধের সমস্ত বিধানই অত্যন্ত সভ্যতার পরিচায়ক। এমন কি উৎকৃষ্টা কন্যা দেখাইয়া নিকৃষ্টা কন্যার সহিত বিবাহ দিলে কিম্বা কন্যার প্রকৃত দোষ গুণ উত্তমরূপে বর্ণনা না করিয়া বিবাহ দিলে, কন্যাকর্ত্তাকে দণ্ডনীয় হইতে হইত।

ভগবান মনু বলেন—

যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি
তস্য কুর্য্যান্নৃপো দণ্ডং স্বয়ং ষন্নবতিং পণান্।

দোষবিশিষ্টা কন্যার দোষ উল্লেখ না করিয়া উহাকে সম্প্রদান করিলে রাজা আপনি ছিয়ানব্বই পণ দণ্ডের বিধান করিবেন।

ব্যভিচারীর দণ্ড হিন্দুসমাজে বড় বিষম ছিল। যে সকল কার্য্যকে ব্যভিচার বলিয়া হিন্দুশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে, সে সকল কার্য্য পাশ্চাত্য সমাজে অনেকস্থলে মোটেই দোষের নহে। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি অনুসারে ব্যভিচার ঘটিলে পুরুষের শাস্তি হয়, স্ত্রীলোকের অপরাধ হয় না। বলা বাহুল্য প্রাচীন ব্যবহার পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছে। আর্য্যসমাজ পবিত্র রাখিবার জন্য মহামুনি মনু বলিয়াছেন—

পরদারাভিমর্ষেষু প্রবৃত্তান্ নৃনং মহীপতিঃ
উদ্বেগনকইরদ্ণ্ডৈশ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ।

পরদারসম্ভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্যদিগকে রাজা নানাবিধ উদ্বেগজনক নাসাকর্ণচ্ছেদন দণ্ডদ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। কারণ পরদার-সম্ভোগ হেতু লোকমধ্যে অধর্ম্মের সঞ্চার হয় এবং তাহা হইতে শেষে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

কিরূপ কুকর্ম্মকে ব্যভিচার বলা হইত তাহার বর্ণনা মনুসংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় অত্যন্ত বিশদরূপে পাওয়া যায়! এতদুভয় সংহিতায় এবং বিষ্ণু-সংহিতায় পরদারগমনাপরাধের শাস্তিও বর্ণিত হইয়াছে। মনু বলেন—

পরস্ত্রিয়ং যোঽভিবদেৎ তীর্থেঽরণ্যে বনেঽপি বা
নদীনাং বাপিসঙ্গমে স সংগ্রহণ মাপ্নুয়াৎ।

তীর্থে, অরণ্যে, নদীসঙ্গমে যে পরস্ত্রীর সহিত কথোপকথন করে তাহার সে দোষ স্ত্রীসংগ্রহরূপে গণ্য হইবে। অপিচ

উপচারক্রিয়া কেলিঃস্পর্শো ভূষণ বাসসাম
সহ খট্টাসনঞ্চৈব সর্ব্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্।

সুগন্ধি মাল্যাদি প্রেরণ, পরিহাস ও আলিঙ্গন, অলঙ্কারস্পর্শ বা বস্ত্রধারণ, এক খট্টায় শয়ন এবং একত্র ভোজন—এ সকল ব্যবহার স্ত্রীসংগ্রহণরূপে গণ্য হইবে। এই সকল পাপের জন্য বর্ণাদিভেদে ভগবান মনু নানারূপ শাস্তির বিধান করিয়াছেন। পরস্ত্রী সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিধি নট নর্ত্তক কিম্বা ভার্য্যোপজীবী নীচ লোকদিগের স্ত্রীসম্বন্ধে খাটিত না। কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ পাপ গোপনে করিলে ব্যভিচাররত ব্যক্তির কিঞ্চিৎ দণ্ড হইত।

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েৎ যা তু স্ত্রীজ্ঞাতিগুণদর্পিতা
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে।
পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নং তপ্ত আয়সে
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ।

যে স্ত্রীলোক আত্মীয়দিগের অবস্থায় দর্পিতা হইয়া অথবা আপনার সৌন্দর্য্যমোহে নিজপতি পরিত্যাগ করে তাহাকে বহুলোক-সমাজে লইয়া কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবে। আর সেই পাপাচারী জারপুরুষকে তপ্ত লৌহময় শয়নে শয়ান করাইয়া যাবৎ না পাপিষ্ঠ ভস্মীভূত হয় তদবধি অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে। ব্যবস্থা যে অতি ভীষণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয় প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর অপরাধকে এরূপ ভীষণ শাস্তি প্রদান করা হইত না। যাজ্ঞবল্ক্য

সংহিতায় দেখিতে পাই, ব্যভিচারের বর্ণনা প্রায় মনুসংহিতার মত হইলেও শাস্তির ব্যবস্থা অত কঠোর নহে।

পরস্ত্রীগমন যে মহাপাপ একথা হিন্দুর সাহিত্য, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। রাজকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মহামুনি বিষ্ণু বলিয়াছেন—

যস্য চৌরঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্
ন সাহসিক দণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোক ভাক্।

যাহার রাজ্যে চোর নাই, পরস্ত্রীগামী পুরুষ নাই, দুর্ব্বাক্যবাদী লোক নাই, স্বেরাদি সাহসিক বা দাঙ্গাবাজ লোক নাই, সে রাজা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

শোক সংবাদ।

বিগত ১৯শে শ্রাবণ ৭৯ বৎসর বয়সে পরম শ্রদ্ধাস্পদ তারিণীচরণ চন্দ্র মহাশয় আপনার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। "অর্চ্চনা"র সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চন্দ্র মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। আমরাই শোকার্ত্ত—এ শোকে 'আমাদের বন্ধুবর কৃষ্ণদাসকে সান্ত্বনা দিবার কথা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সেকালের বাঙ্গালী কিরূপ নিষ্ঠাবান, সরলপ্রকৃতি ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতেন, মাননীয় তারিণী বাবুকে দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইত। অতিথিসৎকার প্রথাটা এখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ সদ্গুণ সেকালের বাঙ্গালীর অভিজাতবর্গে কিরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল, স্বর্গীয় তারিণীবাবুর জীবনী আলোচনা করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। গৃহস্থ হিন্দুর সকল কার্য্যে ধর্ম্মই প্রধান সহায়। তাঁহার জীবনে এ সত্য প্রত্যহই অনুভূত হইত। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রাত্যহিক সংসারের কর্ত্তব্য যে পৃথক কার্য্য নহে, এই পরলোকগত মহাত্মা তাহা দেখাইয়াছেন। তাই তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা সকলকে মুগ্ধ করিত। সাত্ত্বিক জীবন যাপন করিতেন বলিয়া ৭৯ বৎসর বয়সেও মৃত্যুর দিন অবধি তিনি উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন। আমাদের যুগের যৌবনে জরাগ্রস্ত "উদীয়মান" যুবকদিগের সহিত তাঁহার মত সেকালের পুরুষদিগের তুলনা করিলে দেশের স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবনতির মাত্রাটা বুঝিতে পারা যায়।

পুত্র পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত তারিণীবাবু তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বের উদাহরণে তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ইহা ভাবিয়া তাঁহার শোকবিহ্বল পরিবার শান্তিলাভ করুন। তিনি আপন পুণ্যের ফলভোগ করিবার জন্য মরভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জন্য শোক করিয়া তাঁহাকে সেই দিব্যধামে বিব্রত করা অসঙ্গত।

রত্নাবলী ও বিষবৃক্ষ।

---

(২)

সাগরিকা ও কুন্দনন্দিনী।

সাগরিকা (রত্নাবলী) ও কুন্দনন্দিনী উভয়েই ভীরুস্বভাবা মুগ্ধা বালিকা। দুইজনেরই হৃদয়-ভরা ভালবাসা, কিন্তু তাহা প্রকাশের ভাষা জানিত না। দুইজনেই লজ্জায় যেন মরিয়া যায়।

বালিকা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা হইয়া আপনার দুঃখে আপনিই পুড়িয়া মরিত। ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়-গহ্বরের বিষম উত্তাপের মত তাহার সে অন্তর্দ্দাহকর সন্তাপ সে হৃদয়ে চাপিয়া রাখিত।

"সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম। প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া তাহা বিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত কুন্দের সে হৃদয়ে আঘাত করিত। বিবাহের অগ্রে বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোনও বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ আপনি সহ্য করিত।"

কুন্দ ভাবিত, "আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখন মরি না কেন?"

লজ্জাশীলা পরাধীনা সাগরিকাও প্রেমের নবোন্মেষের সময় দুর্লভজনানু-রাগিনী হইয়া অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ নৈরাশ্য স্মরণে মরণকেই একমাত্র শরণ বলিয়া মনে করিয়াছিল।*

সূর্য্যমুখীর পত্র পাইয়া নগেন্দ্রের ভগিনী কমলমণি ভ্রাতৃগৃহে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, সত্যই সংসারের বড় দুরবস্থা। সোণার সংসার ছারখার যায় দেখিয়া তিনি কুন্দকে স্থানান্তরিত করা সমীচীন মনে করিলেন। তা'ই কুন্দকে—কমল বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভালবাসি, আর তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না।"

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না।

কমল বলিলেন, "যাবে ?" কুন্দ ঘাড় নাড়িল—"যাব না।" কমলের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল।

তখন কমলমণি সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর মস্তক বক্ষে তুলিয়া লইয়া ধারণ করিলেন এবং সস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "কুন্দ, সত্য বলিবি ?"

কুন্দ বলিল "কি ?"

কমল বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা করিব ? আমি তোর দিদি—আমার কাছে লুকুস্‌নে—আমি কাহারও কাছে বলিব না।" * *

কুন্দ বলিলেন, "কি বল ?"

ক। তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস্—না ?

কুন্দ উত্তর দিল না, কমলমণির হৃদয় মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কুন্দ কমলের কথার উত্তর দিতে পারিল না—লজ্জায় ; আর কাঁদিতে লাগিল—নগেন্দ্রের গৃহ ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া।

সাগরিকা রাজার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছে, ইহা সখী সুসঙ্গতা জানিতে পারিলে, সাগরিকা লজ্জায় মুখখানি নত করিয়া ধীরে ধীরে কহিয়াছিল,—"সই, আর যেন কেহ একথা জানিতে না পারে, তাহা হইলে আমি লজ্জায় মরিয়া যাইব।"

হৃদয়েশ্বরকে নিরন্তর দেখিবার জন্য প্রণয়ের পূর্ব্বরাগে সাগরিকা ও কুন্দ দুইজনেই অতিমাত্র আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

কি উপায়ে প্রিয়তমকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইবে, এই ভাবনায় উভয়ে যেন পাগল হইল। যতবার দেখে, ততই দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে—সাধ আর মিটে না।

মদন-পূজার দিন রাজ্ঞীর আজ্ঞায় সে স্থান হইতে অপসৃতা হইয়া সাগরিকা কিছুদূর আসিয়া সকলের অলক্ষিতে রাজাকে দেখিয়া বলিয়াছিল,—"কি আশ্চর্য্য, যতই দেখি, ততই দেখিবার ইচ্ছা হয় !"

পূজা সমাপনান্তে রাজ্ঞী বাসবদত্তা সপরিবারে প্রমোদ-কানন হইতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তখন অগত্যা সেস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া সাগরিকা অতৃপ্ত-নয়নে রাজার প্রতি একবার সস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিল এবং

---

* "দুল্লহজণ অণুরাও লজ্জা গুরুঈ পরব্বসো অপ্পা।
পিঅসহি বিসমং পেম্মং মরণং সরণং ণু বরমেক্কং॥"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল,—"হায়! আমি হতভাগিনী, একবার নয়ন ভরিয়া ইহাকে দেখিতেও পারিলাম না!"

সাগরিকা অন্তঃপুরে থাকে; রাজা কিছু সর্ব্বদা অন্তঃপুরে যান না। কিন্তু সাগরিকা তাহা বুঝিবে কেন? সে রাজাকে অষ্টপ্রহর দেখিতে চায়।

প্রেমে আত্মহারা সাগরিকা একদিন একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছে,—"হৃদয় শান্ত হও। দুর্লভ বস্তুর কামনাপোষণে কেবল যাতনা লাভ ভিন্ন আর কি ফল আছে? যাহাকে দেখিলে বাধা বাড়ে ছাড়া কমে না, আবার তাহাকেই দেখিতে চাও, এ তোমার কেমন মূঢ়তা?—"

হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ-ভরে সে এইরূপ কত কি ভাবিল। ভীরুস্বভাবা সাগরিকা নয়নের সাধ মিটাইবার অন্য কিছু উপায় না দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অবশেষে চিত্রফলকে রাজার ছবি আঁকিতে লাগিল।

সাগরিকা তখন এতই অন্যমনস্ক যে, সখী সুসঙ্গতা আসিয়া পশ্চাৎ দিক্ হইতে আলেখ্য অবলোকন করিতেছে, পরন্তু সে কিছুই জানিতে পারিল না। চিত্রাঙ্কন সমাপ্ত করিয়া সাগরিকা একবার ছবিখানি দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চক্ষুর জলে অনবরত গণ্ডস্থল প্লাবিত হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন সে মুখ তুলিয়া চোখ মুছিবার সময় সহসা সখী সুসঙ্গতাকে দেখিতে পাইয়া অঞ্চল দিয়া ছবিখানি ঢাকিয়া ফেলিল এবং যেন কিছুই করে নাই, এমনই ভাবে হাসিয়া বলিল, "হঠাৎ সখী কি মনে করিয়া?" পরে সখীর হাত ধরিয়া কহিল, "সই, ব'স।"

সুসঙ্গতা পূর্ব্ব হইতেই সব দেখিয়াছিল। সে বসিয়াই ছবিখানি কাড়িয়া লইল এবং দেখিয়া বলিল, "সই, এ কা'র ছবি আঁকিয়াছ?" সাগরিকা লজ্জায় একটু থতমত খাইল, কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিল, "ভগবান্ অনঙ্গদেবের।"

"বাঃ তোমার কি নিপুণতা! কিন্তু ভাই, ছবিখানি খালি খালি দেখাইতেছে, আমি ইহার পাশে রতির ছবি আঁকিয়া দেই।" সুসঙ্গতা ইহা বলিয়া রতি আঁকিবার ছলে চিত্রিত মূর্ত্তির বামপার্শ্বে সাগরিকার চিত্র অঙ্কিত করিল। সাগরিকা দেখিয়া একটু ক্রোধের অভিনয় করিয়া বলিল, "সই, ইহাতে আমার ছবি আঁকিলে কেন?" সুসঙ্গতা উত্তর করিল, "সখি, অকারণ রাগ কর কেন? তুমি যেমন মদনের ছবি আঁকিয়াছ, আমিও তেমনই রতির ছবি আঁকিয়াছি।"

সাগরিকা তখন বুঝিয়া লইল, সখী সুসঙ্গতা সব জানিতে পারিয়াছে তখন লজ্জায় অপরাধিনীর ন্যায় কহিল, "সখি, আর যেন কেহ একথা জানিতে না পারে, তাহা হইলে আমি লজ্জায় মরিয়া যাইব"।*

প্রেমের ব্যাকুলতাময় মৃদু মধুর স্পর্শে বালিকা কুন্দনন্দিনীর হৃদয়-তল শৃঙ্খলারহিত উচ্ছ্বসিত অনন্ত চিন্তাস্রোতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কি করিলে নগেন্দ্রকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে, নগেন্দ্র তাহাকে ভালবাসেন কি না, ভালবাসেনতো, কেন ভালবাসেন—এইরূপ কত কি অসীম ভাবনা তাহার চিত্তে উদিত হইল। কুন্দ একদিন প্রদোষ সময়ে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছে,—

"* * * ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব—তা' হ'লে হবে ত? দেখিতে পাব—রোজ রোজ দেখিতে পাব—কাকে? কাকে, মুখে বলিতে পারিনে কি? আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারিনে কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি, ন—নগ—নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র! আলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি—হলেম কি? আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হ'য়ে যদি আমার সঙ্গে আমার হ'তো—দূর হউক! ডুবেই মরি। আচ্ছা যেন এখন ডুবিলাম, কাল ভেসে উঠ্‌বো—তবে সবাই শুন্‌বে, শুনে নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র! আবার বলি—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন? বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব—কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন—মরিতে পারিব কি? পারি—কিন্তু আজ না—একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি—তিনি আমায় ভালবাসেন। কমল কি কথাটী বল্‌তে বল্‌তে বলিল না? সে ঐ কথাই। আচ্ছা, সে কথা কি সত্য?—কিন্তু কমল জানিবে কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভালবাসেন? কিসে ভালবাসেন? কি দেখে ভালবাসেন, রূপ, না গুণ?"

---

* দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথমাংশের ভাবানুবাদ।

রাজা তাহাকে ভালবাসেন কি না, ইহা জানিবার জন্ত সাগরিকাও বড় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিল।

সাগরিকা ও সুসঙ্গতা উভয়ের অঙ্কিত সেই চিত্রখানি পাইয়া রাজা যখন নির্ণিমেষ-নয়নে দেখিতেছেন, তখন বসন্তক রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছবি দেখিয়া চক্ষুর তৃপ্তি হইতেছে কি, না ?"

রাজা ও বসন্তক উদ্যান-মধ্যস্থ কদলীগৃহে ছিলেন। সাগরিকা ও সুসঙ্গতা কদলীগৃহের বহিঃস্থিত বৃক্ষের অন্তরাল হইতে রাজার ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। বসন্তক যে-ই রাজাকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন, অমনই সাগরিকা প্রণয়-মিশ্রিত-ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল;—"না জানি এখন কি বলিবেন। সত্যই এ সময়ে আমি জীবন মরণের মধ্যস্থলে আছি।"

রাজা উত্তরে যাহা বলিলেন, সাগরিকা তাহা শুনিয়া প্রীত হইয়া আকুল হৃদয়কে বুঝাইল ;—"হৃদয়, শান্ত হও, আশ্বস্ত হও। সম্প্রতি তোমার মনোরথ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে।"

রাজার মুখে আশাতীত ভালবাসার কথা শুনিয়া আহ্লাদে সাগরিকার হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

প্রাণাধিকের অদর্শন-জন্ত অরুন্তুদ যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিলে প্রেম-বিহ্বলা সাগরিকা দিবারাত্র আকুল নয়নে দেখিবে বলিয়া রাজার আলেখ্য চিত্রণ করিয়াছিল।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে বালিকাস্বভাবা কুন্দনন্দিনীও নগেন্দ্রের ভাবী অদর্শন স্মরণ করিয়া আকুল-হৃদয়ে ভাবিয়াছিল,—

"* * * কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা' ত যেতে পারিব না ; দেখিতে পাব না যে। আমি যেতে পার্‌ব না—পার্‌ব না—পার্‌ব না।"

সরল-হৃদয়া মুগ্ধা কুন্দনন্দিনী মন প্রাণ হারাইয়া ফেলিয়া পাগলের মতন এইভাবে কত কি ভাবিল। কুন্দ এইরূপ অসীম—অনন্ত বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শেষে কাঁদিয়া ফেলিল।

"আমি কেন ম'লাম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন ? আমি এখনও মরিতেছি না কেন ? আমি এখনই মরিব। এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবর-সোপান অবতরণ আরম্ভ করিল। * * * এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শ করিল। বলিল, "কুন্দ!" কুন্দ দেখিল—সে অন্ধকারে দেখিবামাত্র চিনিল—নগেন্দ্র। কুন্দের সেদিন আর মরা হ'লো না।"

মরণা কুন্দনন্দিনী ডুবিয়া মরিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাড়িত-যন্ত্র-স্পর্শের ন্যায় নগেন্দ্রের অঙ্গুলিস্পর্শে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, সে যেন সকল ভুলিয়া গেল।

কুন্দনন্দিনী তাহার সেই সীমাশূন্য চিন্তাপ্রবাহ ও ডুবিয়া মরিতে যাইবার কথা—সমস্তই বিস্মৃতির অন্ধকারময় গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। সে সরোবরের সোপানশ্রেণী কেন অবতরণ করিতেছিল, তাহা ভুলিয়া গেল। আর "কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।" নগেন্দ্রকে দেখিয়া তাহার বুঝি বাঁচিবার সাধ হইল।

প্রাণাধিক বৎসরাজকে দেখিয়া মরণোদ্যতা সাগরিকার হৃদয়েও বাঁচিবার ইচ্ছা জাগরূক হইয়াছিল। সাগরিকা যখন বুঝিতে পারিল, সর্ব্ব বিষয়ে স্বতন্ত্রা রাজ্ঞী বাসবদত্তা, বৎসরাজের সহিত তাহার প্রণয়ের কথা জানিতে পারিয়াছেন, তখন সে প্রিয়তমের সহিত পুনর্ম্মিলনে একেবারে নিরাশ হইল। রাজ্ঞীর অব্যর্থ কোপের ভীষণ ফল, সে যেন মানস-নেত্রে অঙ্কিত দেখিল। যাহাকে নয়নের মণি করিয়া রাখিলেও তৃপ্তি হয় না, আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না—এই হৃদয়ভেদী কথা ভাবিতেও তাহার চোখে জল আসিল। সে তখন সকল দুঃখের অবসান হইবে ভাবিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সাগরিকা গলদেশে লতাপাশ পরিয়া অশোকতরুর তলে দাঁড়াইল। এমন সময়ে কে যেন ক্ষিপ্রহস্তে তাহার কণ্ঠ হইতে লতাপাশ উন্মোচন করিল। সে বলিল,—

"প্রিয়তমে, এ দুঃসাহস পরিত্যাগ কর।"

সাগরিকা দেখিয়া চিনিল—তাহারই প্রাণেশ্বর বৎসরাজ। তখন সে ভাবিতে লাগিল,—

"সত্যই ইঁহাকে দেখিয়া আবার আমার জীবনের অভিলাষ হইল। অথবা ইঁহার দর্শনে কৃতার্থ হইয়া সুখে জীবন পরিত্যাগ করি।"

অন্তিম সময়ে কুন্দও ঠিক এই মর্ম্মের কথাগুলিই বলিয়াছিল। সে যেদিন মরিবার জন্য সত্য সত্যই বিষপান করিয়াছিল, সেদিন নগেন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল আপনি উছলিয়া উঠিল। নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে কুন্দ ছিন্নবল্লীবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, "এ কি এ, কুন্দ! তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ কখন স্বামীর কথার উত্তর করিত না—আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল—বলিল, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ ?"

নগেন্দ্র তখন নিরুত্তর হইয়া, অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনই করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনই করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিনমাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

এই প্রীতিপূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া নগেন্দ্র জানুর উপর ললাট রক্ষা করিয়া নীরবে রহিলেন। তখন কুন্দ আবার কহিল—"কুন্দ আজি বড় মুখরা, সে আর ত স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না—কুন্দ কহিল, ছি! তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।"

নগেন্দ্রের কাতরোক্তির উত্তরে "কুন্দ বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায় মৃদুস্বরে দিব্য হাসি হাসিয়া কহিল, " * * * আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম, তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

কুন্দের এই হৃদয়বিদারক কথাগুলি—"এণং পেক্‌খিঅ পুণোবি মে জীবিদাহিলাসো সংবুত্তো" ঠিক ইহারই ভাষান্তর বলিয়া বোধ হয়।

চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর জীবনাঙ্ক এইখানেই শেষ হইল। তাহার সাধনা মিটিতেই—আশা না পুরিতেই সকল ফুরাইয়া গেল। প্রাণভরা ভালবাসা লইয়াই "নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল।" প্রথম উন্মেষের সময়েই কুন্দ-কুসুম শুকাইল।"

বৎসরাজ ও নগেন্দ্রনাথ।

বৎসরাজ ও নগেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনা-স্রোত অনেকাংশে একভাবে প্রবাহিত হইলেও উভয়ে ঠিক সমান চরিত্র নহে। বৎসরাজ যে অন্তরের সহিত সাগরিকাতে অনুরক্ত, তাহা রাজ্ঞী বাসবদত্তাকে জানিতে দিতে চাহেন নাই। রাজ্ঞী যেদিন একই চিত্রফলকে অঙ্কিত রাজা ও সাগরিকার ছবি দেখিয়া 'এ ছবি কে আঁকিল' জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রাজা বলিয়াছিলেন, বসন্তকের অনুরোধে আমার এ চিত্র আমিই আঁকিয়াছি। পরে বাসবদত্তা যখন পার্শ্বস্থ রমণীমূর্ত্তির

প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র, এই যে আর একখানি ছবি তোমার পাশে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাও কি বসন্তকের কলা-কৌশল ?"

রাজা তখন একটু ভয়-মিশ্রিত হাসি হাসিয়া অনায়াসে কহিয়া ফেলিলেন,—

"দেবি, অত আশঙ্কা করিতেছ কেন ? এই কন্যামূর্ত্তিটী নিজে নিজে কল্পনা করিয়াই আঁকিয়াছি, এরূপ মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই।"

বাসবদত্তার নিকটে রাজার দোষমার্জ্জনা প্রার্থনাও যেন একটু ছলনা-পূর্ণ। বাসবদত্তা গম্ভীর ভাবে তখন সে স্থান হইতে গমন করিতে উদ্যতা হইলে রাজা তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া কহিলেন,—

"প্রসীদেতি ব্রূয়ামিদমসতি কোপে ন ঘটতে
করিষ্যাম্যেবং নো পুনরিতি ভবেদভ্যুপগমঃ।
ন মে দোষোঽস্তীতি ত্বমিদমপি চ জ্ঞাস্যসি মৃষা
কিমেতস্মিন্ বক্তুং ক্ষমমিতি ন বেদ্মি প্রিয়তমে।"

"প্রিয়তমে, যখন তুমি রাগ কর নাই, তখন 'প্রসন্ন হও,' একথা বলা খাটে না। 'আর এমন কাজ করিব না' ইহা বলিলে দোষ স্বীকার করিয়াই লওয়া হয়। আর যদি বলি,'আমার অপরাধ নাই,' তাহা হইলে তুমি মিথ্যা কথা মনে করিবে ; সুতরাং এ সময়ে আমার যে কি বলা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজ্ঞীর প্রতি রাজার এইরূপ আচরণের কারণ আর কিছুই নহে—তিনি মনে মনে বাসবদত্তাকে ভয় করিতেন। বাসবদত্তা রাজার কথা না মানিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলে রাজা তাঁহার মান ভাঙ্গিবার জন্য পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

"বৎসরাজ পত্নী বাসবদত্তার মানাপনোদনের জন্য ছলনা-পূর্ণ শপথ করিতেন, কত রকম মিষ্ট কথা বলিতেন, অবশেষে উদার পদপল্লব মস্তকে পর্য্যন্ত ধারণ করিতেন।* কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ঠিক ইহার বিপরীত। 'নগেন্দ্র অন্যাসক্ত হইয়াছেন' এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কি বলিলেন ? কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া

* "সব্যাজৈঃ শপথৈঃ প্রিয়েণ বচসা চিত্তানুবৃত্ত্যাধিকং
বৈলক্ষ্যেণ পরেণ পাদপতনৈর্বাক্যৈঃ সখীনাং মুহুঃ।
প্রত্যাসত্তিমুপাগতা নহি তথা দেবী রুদত্যা যথা
প্রক্ষাল্যৈব তবৈব বাষ্পসলিলৈঃ কোপোঽপনীতঃ স্বয়ম্।

পড়িলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হত জীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র সেইরূপ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন।"

কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত হইয়া পড়িলে নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর নিকটে তাহা অকপটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—কিছুই গোপন করেন নাই। সূর্য্যমুখীর অশ্রুপ্লাবিত ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে আক্ষেপোক্তি শুনিয়া "নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া" বলিলেন, "সূর্য্যমুখি! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থই তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা, যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে— কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্তদমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা, আমার চিত্ত বশ হইল না।"

সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, যোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে থাক্—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে।—আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অশ্রাব্য!"

"না, তা নয়, সূর্য্যমুখি! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি, কেন না, অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না, কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমায় ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া দেশদেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই, আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি, সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব, নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।"

নগেন্দ্র তাঁহার স্বীয় অবস্থা পত্নীকে জানাইতে অণুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। তিনি অবরুদ্ধ হৃদয়ের কবাট খুলিয়া সমস্ত কথাই সূর্য্যমুখীকে বলিলেন।

আমরা দেখিতে পাই, কুন্দের প্রতি প্রণয়ের প্রথমোন্মেষে নগেন্দ্র একেবারে

আত্মহারা হইয়াছিলেন। কুন্দ যেদিন প্রদোষ-কালে উদ্যান-মধ্যস্থ সরোবরে ডুবিয়া মরিতে যাইতেছিল, সেইদিন নগেন্দ্র হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কত ভালবাসার কথা বলিয়াছিলেন।

"নগেন্দ্র বলিল, "তবে না কেন? বল বল—বল, আমার গৃহিণী হইবে কি, না?"

কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্রমুখে অপরিমিত প্রেমপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন।

ভগিনীপতি শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া পত্র লিখিলে, নগেন্দ্র তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন,—

"ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না—অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি? ঘৃণাস্পদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকীও নাই।"

কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেলে নগেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন,—

"কুন্দনন্দিনী। কুন্দ আমার, কুন্দ আমার স্ত্রী। কুন্দ! কুন্দ! কুন্দ! সে আমার। কাছে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছিলেন—ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিলেন না।"

ইহা কি সামান্য উন্মাদনার কথা! প্রেমের উন্মাদকরী সুধাধারা মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ না করিলে লোকে এই ভাবে পাগল হইতে পারে না।

বৎসরাজও নগেন্দ্রেরই ন্যায় সাগরিকার প্রেমে আত্মহারা। তিনি সাগরিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন,—

"প্রিয়ে সাগরিকে,

> শীতাংশুর্মুখমুৎপলে তব দৃশৌ পদ্মানুকারৌ করৌ
> রম্ভাগর্ভনিভং তবোরু যুগলং বাহূ মৃণালোপমৌ।
> ইত্যাহ্লাদকরাখিলাঙ্গি রভসান্নিঃশঙ্কমালিঙ্গ্য মা
> মঙ্গানি ত্বমনঙ্গতাপবিধুরাণ্যেহ্যেহি নির্ব্বাপয়॥"

এই এক শ্লোকেই বুঝিতে পারা যায় যে, সাগরিকার প্রেমে রাজা কত অধীর। সাগরিকার জন্য রাজার যে কত ব্যাকুলতা, তাহা নিম্নে লিখিত রাজা ও বিদূষক বসন্তকের উক্তির প্রত্যুক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।—

রাজা আনন্দের সহিত বসন্তককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বয়স্য, প্রিয়তমা সাগরিকার কুশল ত ?"

বসন্তক সাহঙ্কারে কহিলেন, "তুমি নিজেই কিছুক্ষণ পরে সাক্ষাতে জানিতে পারিবে।"

রাজা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বলিলেন, "প্রিয়তমার দর্শনলাভও ঘটিবে ?"

বসন্তক সগর্ব্বে বলিলেন, "ঘটিবে না কেন ? তোমার এই অমাত্য যে বুদ্ধি বৈভবে বৃহস্পতিকেও অতিক্রম করিয়াছে।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "বিচিত্র নহে। তোমাতে কি না সম্ভব হয় ? তবে এখন বৃত্তান্তটা বল। বিস্তারে শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।"

তখন বসন্তক রাজার কানে কানে মকরন্দোদ্যানে সাগরিকার অভিসারের কথা বলিলেন।

রাজা অতিমাত্র আহ্লাদে—"বয়স্য, এই তোমার পারিতোষিক" ইহা বলিয়া হস্ত হইতে বলয় খুলিয়া দিলেন।

তখন বিদূষক বসন্তক বলয় পরিধানপূর্ব্বক একবার আপনার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "তবে এক 'কাজ করা যাক্—এই বিশুদ্ধ সুবর্ণবলয়-মণ্ডিত হস্ত ব্রাহ্মণীকে গিয়া একবার দেখাইয়া আসি।"

রাজা বসন্তকের হাতে ধরিয়া বারণ করিয়া কহিলেন, "সখে, পরে দেখাইও। এখন দেখ, বেলা শেষ হইতে আর কত বাকী আছে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

বিষ্ণুসংহিতায় দণ্ডবিধি।

পরের চরিত্রে দোষারোপ করিবার জন্য নিন্দাবাদ করা এবং তাহার দ্বারা নিন্দিত ব্যক্তিকে ঘৃণিত করা ইংরাজি আইনে মানহানির অপরাধ। জনসমাজে লোকে হেয় হইতে পারে এমন ভাবে কুৎসা রটাইলে মানহানি করা হয়। এ নিয়মের কতকগুলা ব্যত্যয় আছে। সে সকল আইনের কূট তর্ক। মানহানি-কর কুৎসা রটনা করা ব্যতীত এক ব্যক্তি অপরকে সম্মুখে গালি দিলেও [illegible]

হয়। আমরা মানহানি ও গালিগালাজ সম্বন্ধে হিন্দু-ব্যবহার সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বিষ্ণুসংহিতায় বাক্‌পারুষ্য অপরাধের বর্ণনায় মানহানি ও দুর্ব্বাক্য বলায় নানাপ্রকার শাস্তির বিধান আছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বিধানও খুব বিশদ। মনুসংহিতাও এবিষয় বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এ সকল বিধান আলোচনা করিলে বোধ হয় হিন্দুদিগের মানহানির ও বাক্‌পারুষ্যের শাস্তির ব্যবস্থা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও সুসভ্য জাতির। বর্ণ হিসাবে শাস্তির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইতর বর্ণের ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীর লোককে গালি দিলে অধিক দণ্ডভোগ করিত। হিন্দুর সামাজিক জীবনের ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল।

"পরস্য পতনীয়াক্ষেপে কৃতেতুত্তম সাহসম্ উপপাতকযুক্তে মধ্যমম্।"

অর্থাৎ অপরের পাতিত্য ঘটিত নিন্দা বা তিরস্কার করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। উপপাতক ঘটিত তিরস্কার নিন্দাদি করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড। বিকৃ-তাঙ্গ ব্যক্তির বিকৃতাঙ্গ দোষ উল্লেখ করিয়া গালি দিলে দুই কার্ষাপণ দণ্ড। অন্ধকে অন্ধ বলিলে বা খঞ্জকে খঞ্জ বলিলে তাহাদিগকে ব্যথিত করা হয় সন্দেহ নাই। কোমল-হৃদয় হিন্দু আইনকর্ত্তা সেরূপ দুর্নীতি দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ বিধান করিয়াছিলেন।

হিন্দুমতে মানহানির অপরাধ কেবল ব্যক্তিগত নিন্দা করিলে হইত না। কাহারও জাতি লইয়া নিন্দা করিলে বা কোনও সম্প্রদায় লক্ষ্য করিয়া কুৎসা করিলে অথবা গ্রাম কি দেশের নিন্দা করিলেও দোষীকে দণ্ড পাইতে হইত।

গালি দেওয়ার অপরাধে নানারূপ শাস্তি হইত। সবর্ণকে গালি দিলে যে শাস্তি হইত, হীনবর্ণকে গালি দিলে শাস্তির মাত্রা তদপেক্ষা কম হইত। বিষ্ণুসংহিতায় একটি বিধান বড় শান্তিপূর্ণ সমাজের পরিচায়ক। তিনি বলেন—

"রুক্ষবাক্যাভিধানে চৈবমেব।"

অর্থাৎ রুক্ষ বাক্য বলিলে ঐরূপ দণ্ড হয়। যাহাতে সমাজে সম্পূর্ণরূপে ভ্রাতৃভাব বিরাজ করে, দেশের লোকে পরস্পর পরস্পরের নিন্দা অপবাদ না করে, পরস্পর পরস্পরকে রূঢ় বাক্য না বলে, এমন কি রুক্ষবাক্য দ্বারা একজন প্রজা অপর প্রজার হৃদয়ে অশান্তির সৃষ্টি না করে, আর্য্য ঋষিগণ সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ইহা যে শান্তিময় রাষ্ট্রের আদর্শ চিত্র, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনিও বাক্‌-পারুষ্য সম্বন্ধে ঐ সকল বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সত্যভাবেই হউক, অসত্যভাবেই হউক, আর শ্লেষভাবেই হউক, সমগুণ ও সবর্ণের ব্যক্তিকে ন্যূনাঙ্গ ন্যূনেন্দ্রিয় বা রোগী বলিয়া গালি দিলে সাড়ে তেরপণ দণ্ড। অপিচ

অভিগন্তাস্মি ভগিনীং মাতরং বা তবেতিচ
শপন্তং দাপয়েদ্রাজা পঞ্চবিংশতিকং দমম।

ভগ্নী বা মাতৃ উচ্চারণ করিয়া গালি দিলে রাজা অপরাধীকে পঞ্চবিংশতি পণ দণ্ড করিবেন।

মনুসংহিতায় বিধান আছে—

অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং ব্রূয়াদ্দ্বেষেণ মানবঃ
স শতং প্রাপ্নুয়াদ্দণ্ডং তস্যাদোষমদর্শয়ন।

যে ব্যক্তি দ্বেষ প্রযুক্ত কোন কন্যাকে কুমারী নহে এইরূপ বলিয়া অপবাদ করে, পরে সে কথা প্রমাণ করিতে না পারিলে রাজা তাহার একশত পণ দণ্ড করিবেন। মাতা, পিতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র অথবা গুরুকে গালি দিলেও লোকে দণ্ডনীয় হইত।

আমরা ভারতীয় দণ্ডবিধির সমস্ত বিধান হিন্দুশাস্ত্রের দণ্ডবিধির সহিত মিলাইয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে বিষ্ণুসংহিতায় কেবল বেগে শকট-চালনা অপরাধের কোনও বিধান নাই। মনুসংহিতায় কিন্তু সে বিষয়ে যথেষ্ট বিধান আছে। যথাস্থলে এবিষয় আলোচিত হয় নাই বলিয়া এক্ষণে তাহার আলোচনা করিয়া এই তুলনা সম্পূর্ণ করিব।

ভগবান মনু বলেন যান, সারথি এবং যানস্বামী দশটী স্থলে দণ্ডনীয় হয় না।

ছিন্ননাস্যে ভগ্নযুগে তির্য্যক্‌ প্রতিমুখাগতে
অক্ষভঙ্গে চ যানস্য চক্রভঙ্গে তথৈবচ।
ছেদনে চৈব যন্ত্রাণাং যোক্ত্রুরশ্ম্যোস্তথৈবচ
আক্রন্দে চাপ্যপেহীতি ন দণ্ডং মনুরব্রবীৎ।

(বলীবর্দ্দের) নাসালগ্ন রজ্জু ছিঁড়িয়া গেলে, রথাদির যুগকাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেলে, ভূমির উচ্চ নীচতায় চক্রের মধ্যস্থ কাষ্ঠ বা চক্র ভাঙ্গিয়া গেলে, যানের চর্ম্ম বন্ধন, পশুদিগের মুখবন্ধন-রজ্জু ও বলগা ছিন্ন হইলে এবং উচ্চৈঃস্বরে বারংবার সাবধান করিয়া দিলেও যদি যানদ্বারা কোনও জীবহত্যাদি-দোষ ঘটে, তবে

তাহাতে কাহারও দণ্ড নাই। ইহা মনু বলিয়াছেন। আধুনিক আইনও একরূপ, তাহা বোধ হয় পাঠকমাত্রেই জানেন। কিন্তু এক বিষয়ে যান সম্বন্ধীয় হিন্দু-ব্যবহার সুযুক্তিপূর্ণ। ইংরাজী আইনানুসারে বেগবান যানদ্বারা প্রাণিহিংসা হইলে কেবল সারথি ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হয়। যানস্বামী দেওয়ানী আদালতে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হয়। মনুসংহিতার মতে

যত্রাপবর্ত্ততে যুগ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকস্য তু
তত্র স্বামী ভবেদ্দণ্ড্যো হিংসায়াং দ্বিশতং দমম।

যেস্থলে সারথির দোষে রথ অপবর্ত্তিত হইয়া মানবদেহের বা সম্পত্তির ক্ষতি করে, সে স্থলে সারথি যদি অশিক্ষিত হয় তাহা হইলে অশিক্ষিত সারথি-নিয়োগ জন্য যানস্বামীর দুইশত পণ দণ্ড হইবে। বলা বাহুল্য, এ নিয়ম বড় মঙ্গলবিধায়ক ছিল। ধনীলোক নিজের বিলাসিতার জন্য অশিক্ষিত সারথি রাখিয়া গাড়ি চালাইতে পারিত না। অবশ্য যানস্বামী বিচার করিয়া সুনিপুণ সারথি রাখিয়া দিলে, তাহার অসাবধানতার জন্য চালক স্বয়ং দণ্ডনীয় হইত। অনিপুণ সারথি-চালিত গাড়ি চড়িলে আরোহীদিগের ও প্রত্যেকের দণ্ড হইত।

যুগ্যস্থাঃ প্রাজকোহনাপ্তে সর্ব্বে দণ্ড্যাঃ শতংশতম।

মনুষ্যের প্রাণহানি ঘটিলে সারথির চোর সম দণ্ড হইত। গো, গজ, উষ্ট্র ও অশ্বাদি বৃহৎ পশু নষ্ট হইলে উহার অর্দ্ধেক দণ্ড হইত। পশুশাবক বিনষ্ট হইলে দুইশত পণ এবং শুভ মৃগ পক্ষি বিনাশে পঞ্চাশপণ দণ্ড হইত। শুভ মৃগ পক্ষি অর্থে কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন—"মৃগেষু রুরু পৃষতাদিষু পক্ষিষু চ শুকহংসসারসাদিষু হতেষু পঞ্চাশৎপণো দণ্ডো ভবেৎ"। গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ প্রভৃতি মারিলে পাঁচ-মাষারূপা দণ্ড হইবে এবং শূকর ও কুক্কুর বিনষ্ট হইলে একমাষারূপা দণ্ড হইবে।

(৮)

আমরা প্রাচীন হিন্দুজাতির দণ্ডবিধি আধুনিক সভ্যজাতিদিগের এক উৎকৃষ্ট দণ্ডবিধির আইনের সহিত তুলনা করিয়াছি। দণ্ডবিধি হইতে রাষ্ট্রমধ্যে প্রচলিত নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সে হিসাবে দেখিয়াছি যে কোনও অংশে হিন্দুজাতির নীতিজ্ঞান আধুনিক সভ্য জাতিদিগের নীতিজ্ঞান হইতে হীন ছিল না। বরং কতকগুলি বিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য নৈতিক আদর্শ এখনও প্রাচীন ভারতের আদর্শে পঁহুছাইতে পারে নাই। আধুনিক জগতে দ্যূতক্রীড়া একেবারে নিষিদ্ধ নহে। ইংরাজ সাম্রাজ্যে লোকে প্রকাশ্যভাবে

সাধারণকে লইয়া বিনা অনুমতিতে জুয়া খেলিতে পারে না। লোকের আপন আলয়ে বা ক্লবে দ্যুত-ক্রীড়া নিষিদ্ধ নহে। জার্ম্মান সাম্রাজ্যে অধিক অর্থ লইয়া দ্যুত-ক্রীড়া করা নিষিদ্ধ। প্রাচীন ভারতে দ্যুত-ক্রীড়া ছিল না একথা বলিতে পারি না। ঋগ্বেদে অক্ষক্রীড়ার উল্লেখ আছে এবং মহাভারতে ও পুরাণে এবং মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থে দ্যুত-ক্রীড়ায় কুফলের উদাহরণ পাওয়া যায়। এ ব্যসন কিন্তু হিন্দুসমাজ হইতে বিসর্জ্জন করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্র প্রয়াস পাইয়াছে। পশু লইয়া আধুনিক ঘোড়দৌড় খেলায় অনুরূপ দ্যুতক্রীড়া প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল, সেরূপ ক্রীড়াকে সমাহ্বয় বলিত। মনুসংহিতায় দেখি

অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যুতমুচ্যতে
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয় সমাহ্বয়ঃ।

অপ্রাণী অর্থাৎ অক্ষশলাকাদি লইয়া যে খেলা তাহাকে দ্যুত বলে এবং প্রাণী অর্থাৎ অশ্ব, মেষ, কুক্কুট প্রভৃতি লইয়া ক্রীড়ার নাম সমাহ্বয়। এই দুই দোষ রাজ্যনাশক। "প্রকাশমেব তাস্কর্য্যং"—ইহারা প্রকাশ্য চৌর্য্য, সুতরাং ইহাদের নিবারণে নরপতি সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবেন। অতএব

প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা তন্নিষেবেত যো নরঃ
তস্য দণ্ডবিকল্পঃ স্যাদ্ যথেষ্টং নৃপতেস্তথা ॥

প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য ভাবে যে ব্যক্তি দ্যুতক্রীড়া করিবে নৃপতি তাহার যথেষ্ট দণ্ড করিবেন। কাহার কিরূপ দণ্ড হইবে মনুসংহিতা প্রভৃতিতে তাহারও বর্ণনা আছে। আধুনিক দ্যুতক্রীড়া ও সমাহ্বয় দ্বারা কত ব্যক্তি যে বিনষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এ ব্যসন যে অহিতকর তাহাও অনেকে স্বীকার করেন। অথচ আধুনিক পাশ্চাত্যের নীতি এখনও ইহা বন্ধ করিবার কোনও বিশেষ উপায় করে নাই।

ভারতীয় বিধানে সকল জীবজন্তুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। * বয়ঃজ্যেষ্ঠ বা পূজনীয় ব্যক্তিকে অবমানিত করিতে হিন্দুসমাজ অপরাধীকে দণ্ড দিত।

এক বিষয়ে কিন্তু হিন্দু ব্যবহার আধুনিক সাম্যমন্ত্রোপাসক জাতিদিগের পক্ষে

---

* রাজস্থানের ইতিহাসপ্রণেতা প্রসিদ্ধ টড্ সাহেব বলেন—"Manu legislated also for the protection of the brute creation and if the priest by chance kills a cat, a frog, a dog, a lizard, an owl or a crow, he must drink nothing but milk for three days and nights or walk four miles in the night. —*Rajasthan.*

হীন ও কলঙ্কময় বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। ব্রাহ্মণ জাতিকে প্রাচীন হিন্দু সমাজ সর্ব্বত্রই অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে। একই অপরাধ করিলে ব্রাহ্মণের এক প্রকার শাস্তি হইত, অপর জাতীয় ব্যক্তিদিগের বিভিন্ন প্রকার দণ্ড হইত। হীনবর্ণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অনেক অপরাধ করিলে কঠোর শাস্তি ভোগ করিত কিন্তু সমবর্ণের বা হীনবর্ণের বিরুদ্ধে সেই একই অপরাধ করিলে শাস্তির কঠোরতা কমিয়া যাইত। ব্রাহ্মণীর সহিত ব্যভিচার করিলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের যে দণ্ড হইত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রমণী বা বৈশ্য মহিলার সহিত সেই অপরাধ করিলে তাহার সে অপরাধ হইত না। বিষ্ণুসংহিতার এক স্থলে বিধান আছে—

"কামকারেণাস্পৃশ্যা ত্রৈবর্ণিকং স্পৃশন্ বধ্যঃ।"

অস্পৃশ্য জাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতিকে স্পর্শ করিলে সে বধ্য। বলা বাহুল্য, এরূপ বিধান আধুনিক কালে বড় কলঙ্কময় বলিয়া মনে হয়।

অনেক পাশ্চাত্য ইতিবৃত্তকার বলিয়াছেন যে হিন্দুদিগের দণ্ডবিধিতে দণ্ডের কঠোরতা কিছু বেশী। আমরা পূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহাদিগের সে সমালোচনা নির্ভুল নহে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে সামান্য চুরি অপরাধে বধদণ্ড হইত। সে হিসাবে দেখিতে গেলে হিন্দু-ব্যবস্থার শাস্ত্রোক্ত দণ্ড অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইবে। প্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিতের শিষ্য কমণ্ডক পণ্ডিত নীতিসার নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে অধিক কঠোর দণ্ডে প্রজা ভীত হয় এবং অতি লঘু দণ্ড দিলে তাহারা রাজাকে ভয় করে না। শাস্ত্রানুসারে সমাজানুমোদিত শাস্তিই বাঞ্ছনীয়। * দণ্ডের তারতম্য সম্বন্ধে ভগবান মনু বলিয়াছেন—

বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃপরম্।

প্রথমে বাক্যের দ্বারা দণ্ড করিবে তদনন্তর ধিক্কার দণ্ডের বিধান করিবে তাহাতেও না হইলে ধনদণ্ড, পরে শারীরিক দণ্ড দিবে। কোনও কোনও

---

* "Inflicting extraordinary heavy punishments a king frightens his subjects, and inflicting extraordinarily light ones he is not feared by them....Punishments countenanced by society and the *Shastras* ought only to be inflicted on the offender." শ্রীমন্মথনাথ দত্ত এম, এ, এম, আর, এ, এস মহোদয় অনূদিত Kamandakiya Nitisara p. 23-24.

অপরাধে হিন্দুশাস্ত্র অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে সকল দণ্ড কেবল চরম অবস্থায় প্রদত্ত হইত বলিয়া মনে হয়।

(৯)

পাশ্চাত্য প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে রোমকজাতির আইন-শাস্ত্রই সর্ব্বাধিক প্রশংসিত হইয়া থাকে। কিন্তু রোমান জাতির দণ্ডবিধির মোটেই প্রাচীন হিন্দুর দণ্ডবিধির সহিত তুলনা হইতে পারে না। ফলতঃ প্রাচীন রাজতন্ত্র রোমে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের বিশেষ পার্থক্য ছিল বলিয়াই বোধ হয় না।* তখন হত্যা হইলে নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গ হন্তার শোণিতে তাহাদের পরলোকগত আত্মীয়ের তর্পণ করিত, ব্যভিচার ঘটিলে রমণীর পিতা বা স্বামী অপরাধীকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ লইত। সারবিয়াস্ টুলিয়াস্ ভূপতির XII Tables নামক ব্যবহার সংগ্রহে (৩০২ খৃঃ পূঃ) দেওয়ানী আইনের সর্ব্ব প্রথমে "চৌর্য্য" বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন আংলো সেক্সন জাতির মধ্যে প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানুসারে তাহার জীবনের একটা মূল্য নির্দ্ধারিত করা হইত। তদনুসারে তাহার শারীরিক আঘাতের জন্যও দৈহিক ক্ষতির তারতম্যানুসারে অপরাধীর নিকট হইতে মূল্য আদায় করা হইত।†

প্রাচীন রোম ও এথেন্সে স্বর্গীয় আইন লঙ্ঘন করা অপরাধে কোন কোন অপরাধের শাস্তি হইত। ব্যবহারতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সার হেনরি মেন্ বলেন— রোমে খৃঃ পূর্ব্ব ১৪৯ সালে Lex Calpurnia de Repetundis নামক আইন জারি হইবার পর হইতে প্রকৃত ফৌজদারী ব্যবহারের সৃষ্টি হয়। পরে সম্রাট জাষ্টিনিয়ন এবং সম্রাট অগষ্টসের সময় রোমান দণ্ডবিধির প্রকৃত উন্নতি হয়।

প্রজাতন্ত্র রোমে কোনও অপরাধে বধদণ্ড হইত না। মেন্ সাহেব বলেন, রোমের আইন নির্ম্মাতাদিগের সহৃদয়তার জন্য রোমে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না তাহা নহে। রোমের ফৌজদারী বিচারালয় বা Quaestionesগণ Comitia

---

* "For anything like a clear line of demarcation between crimes, offences and civil injuries we look in vain in regal Rome."—*James Muirhead, L L D.*

† "Under Anglo Saxon law, a sum was placed on the life of every free man, according to his rank, and a corresponding sum on every wound that could be inflicted on his person, for nearly every injury that could be done to his civil rights, honour or peace." Kemble. Anglo-Saxons. 1. 177.

Tributa নামক ব্যবস্থাপক সভার অংশ মাত্র ছিল। উক্ত ব্যবস্থাপক সভা কিন্তু রোমান প্রজার প্রাণদণ্ড করিতে পারিত না। সে ক্ষমতা রোমে একমাত্র Comitia Centuriataর উপর ন্যস্ত ছিল। যখন ব্যবস্থাপক সভা স্বয়ং লোককে প্রাণে মারিতে পারিত না তখন সে কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের শাখা সমিতি বা ফৌজদারী বিচারালয় কোথা হইতে পাইবে ?

(১০)

পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক জাতির দণ্ডবিধি আইনের সহিত প্রাচীন ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের তুলনা করিবার স্থান বা সামর্থ্য আমাদিগের নাই। যাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন হিন্দু সমাজ রাষ্ট্রীয় নীতি বিষয়ে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল, অতি মহান আদর্শে সে সমাজ গঠিত হইয়াছিল এবং আর্য্যসমাজ আপামর সাধারণকে সুখে স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পথে রাখিতে যত্নবান ছিল। প্রজাদিগের মধ্যে বর্ণের পার্থক্য হিসাবে ব্যক্তিগত স্বত্বের পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় কালের ধ্বংসকারী গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য সকল শ্রেণী এক মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই।

সমাপ্ত।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

"অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে। যদি মানুষ হও ত' সকলে মিলে উঠে পড়ে লাগ। যত মাথা নীচু করে থাক্‌বে, ততই অত্যাচার বাড়্‌বে। একবার সাহস করে দাঁড়াও—দেখ হাতে হাতে ফল পাবে।"

ঝরিয়ার কয়লার খনির পার্শ্ববর্ত্তী ময়দানে এক বৃক্ষতলে কতকগুলি মজুর সমবেত হইয়াছিল। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া একজন বাঙ্গালী যুবক পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতেছিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বড় বড় খনির কাজ বন্ধ হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে

* ফরাসী হইতে।

কয়লার গুঁড়া মাখিয়া মজুরেরা দলে দলে ছোট কুঁড়ে ঘরগুলির দিকে চলিয়াছে। মজুরদের মধ্যে রমণীও আছে। ইহারা স্ত্রীপুরুষে পরিশ্রম করে।

কিন্তু অন্যান্য দিনের মত আজ আর মজুরদের স্ফূর্ত্তি নাই। সকলেই বিষন্ন মুখে চলিয়াছে। খনির ম্যানেজার সাহেব হুকুম দিয়াছেন এবার হইতে বেতন হ্রাস করিয়া দেওয়া হইবে। কয়লার দর নামিয়া গিয়াছে। এখন বেশী মজুরি দেওয়া অসম্ভব।

হায় হতভাগ্য শ্রমজীবীর দল! যে অর্থ এতদিন তাহারা সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর লাভ করিত, তাহাতে বহু ক্লেশে তাহাদের সংসার চলিত। এবার সম্মুখে অনাহার!

একজন মজুর বলিল "যা বল্‌ছেন ম'শায়, আর ত পারি না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। যা মজুরি পাই তাতে সন্ধ্যের পর দুটি ভাত রেঁধে খাই। সকালে বাসি ভাত চাট্টি খেয়ে কাজে ঢুকি। তাও এবার বন্ধ হল!"

বাঙ্গালী যুবক উত্তেজিত স্বরে বলিল "তোরা যে দল বেঁধে দাঁড়াতে সাহস করিস্‌ না। সকলে মিলে কাজ বন্ধ করে দে দেখি। দেখি কেমন ব্যাটারা জব্দ না হয়। বল্‌ যে আগেকার মত মজুরি না দিলে কেউ কাজ কর্‌ব না।"

পূরণচাঁদ একজন বৃদ্ধ মজুর। তাহার পিতা, পিতামহ এই খনির মজুরি করিয়াছে। এক চাপড়া কয়লা খসিয়া তাহার পিতার পা খোঁড়া হইয়া যাওয়াতে সে এখন কাজ ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া আছে। পূরণচাঁদ ও তাহার মেয়ে রঙ্গিলা কয়লার খনিতে কাজ করিয়া যা রোজগার করে তা'তে কায়ক্লেশে চলে। পূরণ-চাঁদের ছোট ছোট চারিটি ছেলে মেয়ে ও পরিবার। রঙ্গিলা ও পূরণচাঁদের রোজগারের উপর সকলের নির্ভর।

পূরণচাঁদ বলিল "তাই কর্‌ব। ধর্ম্মঘট কর্‌ব। যা বরাতে আছে হবে।"

বীরমল নামক একজন যুবা মজুর বলিল,—"হাঁ। ধর্ম্মঘট—ধর্ম্মঘট—আর সহ্য হয় না।" বীরমলের সহিত রঙ্গিলার বিবাহ-প্রস্তাব চলিতেছিল।

ততক্ষণে সেই বৃক্ষতলে দলে দলে অন্যান্য মজুরেরা জুটিতেছিল। বাঙ্গালী যুবক তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল "তোমরা কচ্ছ কি? সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মজুরি কর্‌ছ। যা রোজগার কর তাতে নিজেদের পেট ভরে না। ঘরে ছেলে মেয়েরা না খেয়ে মর্‌ছে। মাথার উপর পাতার কুঁড়ে তাও পড়' পড়'। আর তোমাদের খাটুনির ফলে কয়লা

বেচে মনিবেরা বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। ম্যানেজারের বাংলোর বাহার দেখ্‌ছ ত? কত টাকা লাভ হচ্ছে তা জান কি? এ লাভ তোমাদের রক্তে। তোমাদের রক্ত শুথিয়ে যাচ্ছে, তোমাদের হাড় দেখা যাচ্ছে, তার ফলে খনির কাজ তেজে চল্‌ছে, মনিব বড়লোক হচ্ছে। আজ কয়লার দর একটু কমেছে তাই তোমাদের উপর চাপ পড়্‌ছে। পাছে নিজেদের ক্ষতি স্বীকার কর্‌তে হয়। সকলে মিলে লাগ—সকলে মিলে লাগ—ধর্ম্মঘট কর। খনির কাজ করে হাত পা ভাঙ্‌লে দূর করে দিলে—নূতন মজুর ভর্ত্তি হল। তোমাদের প্রাণ প্রাণ নয়। তোমাদের বেঁচে থাকা না থাকা সমান। এতেও তোমাদের জ্ঞান হয় না? কাল থেকে সব কাজ বন্ধ করে দাও। দেখ ব্যাটারা জব্দ হয় কি না।"

রামকিশোর নামে একজন তরুণ মজুর এ প্রস্তাব সমর্থন করিল। সেও বীরমলের ন্যায় রঙ্গিলার প্রণয়প্রার্থী। পূরণচাঁদও উৎসাহ দিতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই প্রান্তরে সমবেত শ্রমজীবীবর্গ প্রতিজ্ঞা করিল যে তৎপরদিন কেহই কার্য্যে যোগ দিবে না। বাঙ্গালী যুবক নিজ কার্য্য সফল হইয়াছে বুঝিয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

(২)

কয়লার খনির ম্যানেজার বীটন সাহেব মহা ক্রুদ্ধ। হতভাগা মজুরগুলোর এত স্পর্দ্ধা, কাজ বন্ধ করিয়াছে! দেখা যাক্ ব্যাটারা কতদিন না খেয়ে থাকে। দিন আনে, দিন খায়—কয়দিনই বা বসিয়া খাইবে? ধার পাইবেই বা কোথায়?

পূরণচাঁদকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শ্রমজীবীরা কোলাহল করিতে করিতে অগ্রসর হইল। বীটন সাহেব চুরুট টানিতে টানিতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। পূরণচাঁদ সেলাম করিয়া নিজেদের কষ্টের কথা জানাইল। পূর্ব্বের বেতনেই একবেলা খাইত, এখনকার নির্দ্দিষ্ট বেতনে সপরিবারে অনাহারে মারা যাইবে। এই কথা জানাইয়া হুজুরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিল।

বীটন সাহেব সক্রোধে সকলকে দূর হইয়া যাইতে বলিলেন। এক পয়সাও অধিক মজুরি দেওয়া হইবে না, একথা ঘোষণা করিলেন।

বিষণ্ণবদনে শ্রমজীবীদল ধীরে ধীরে সে স্থল পরিত্যাগ করিল।

পূরণচাঁদ নিজ কুটীরে ফিরিয়া গেল। সেদিন রান্না হয় নাই। পূরণচাঁদের স্ত্রী চাউল ধার করিতে গিয়াছে। ছোট ছেলেটি ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতেছে। রঙ্গিলা তাহাকে ভুলাইবার জন্য এক পিত্তলনির্ম্মিত জলপাত্র বাজাইতেছে।

চারিবৎসরের একটি মেয়ে অনেকক্ষণ ক্ষুধায় কাঁদিয়া এক পার্শ্বে ঘুমাইতেছে। তিন বৎসর ও পাঁচবৎসর বয়সের দুইটি ছেলে ঘরের মধ্যে মারামারি করিতেছে। বিছানার উপর বসিয়া পূরণচাঁদের খঞ্জ পিতা বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতেছে।

পূরণচাঁদ গৃহে ঢুকিতেই ছেলেদুটি দৌড়াইয়া আসিল, বলিল—বাবা, খিদে পেয়েছে—খাবার দে। পূরণচাঁদ বুঝিল রান্না হয় নাই। হইবেই বা কোথা হইতে? তাহার পূর্ব্বদিন হইতে কাজ বন্ধ করিয়াছে। পুঁজিও কিছু নাই। পূরণচাঁদের চক্ষের সম্মুখে সকল পৃথিবী অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল।

পূরণচাঁদের পিতা কর্কশকণ্ঠে বলিল "ধর্ম্মঘট করা হয়েছে? কে এ বুদ্ধি দিলে তোকে? সাহেবদের সঙ্গে চালাকি? শুকিয়ে মর্‌বি—শুকিয়ে মর্‌বি! যা এইবেলা সাহেবের হাতে পায়ে ধরে কাজে লেগে যা—নইলে সর্ব্বনাশ হবে—সর্ব্বনাশ হবে।"

পূরণচাঁদ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ছেলে দুটি "বাবা—বাবা" বলিয়া সঙ্গে যাইতেছিল—পূরণচাঁদ তাহাদিগকে মারিতে গেল। ভয় পাইয়া তাহারা পলাইয়া গেল।

(৩)

বীরমল রামকিশোরকে বলিল—"দেখ্ তুই, খবরদার পূরণচাঁদের বাড়ী যাস্ নি। তুই ওদের কেন টাকা দিচ্ছিস্? তোর সঙ্গে রঙ্গিলার বে হবে মনে কচ্ছিস্। সাবধান—খুন করে ফেল্‌ব। আমি রঙ্গিলাকে বে কর্‌ব—যে বাধা দেবে—সে খুন হবে।"

রামকিশোর বলিল "বেশ—পারিস্ ত' খুন করিস্।"

বীরমল। তুই কেন টাকা দিস্? পাজী—বদ্‌মাস্—টাকা দিয়ে বশ করবার চেষ্টা কচ্ছিস্?

রাম। বেশ কচ্ছি। তোর কি? তোর পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই বলে কেউ পয়সা দিচ্ছে দেখ্‌লে হিংসে হয়, নয়?

বীর। কি—কি বল্লি? চুপ্ কর।

রাম। কেন চুপ্ কর্‌ব। আমি তোর খাই নাকি?

বীরমল ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া রামকিশোরের উপর লাফাইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময় পিছন হইতে কে বলিল "ওমা! এ কি হচ্ছে?" যে আসিল—সে রঙ্গিলা।

মুহূর্ত্তমধ্যে বীরমল প্রকৃতিস্থ হইল। রজিলা রামকিশোরকে বলিল "তোমার বাবা ডাক্‌ছে।" রামকিশোর বলিল "চল, যাচ্ছি।"

উভয়ে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বীরমল দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল "রামকিশোরকে খুন কর্‌বো"।

এমন সময় সেই বাঙ্গালী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল "কি হে, তোমরা নাকি আবার কাজে লাগ্‌বে শুনছি?"

বীরমল বলিল "আজ্ঞে না। প্রাণ থাক্‌তে নয়। তবে কতকগুলো মজুর খেপে গিয়েছে। তা'রা কাজে লাগ্‌তে চায়। কি কর্‌বে বলুন? খেতে পায় না। কতদিন সহ্য করে থাক্‌বে? মজুরদের ধার কে দেবে?"

বাঙ্গালী যুবকটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"আরে এখন কাজে লাগ্‌লে আর হ'ল কি? বরং আরও অত্যাচার বাড়্‌বে। যেটুকু ভয় কর্‌ত তাও আর করবে না। সকলকে বারণ করে দাও—খবরদার কেউ না যায়।"

বীরমল বলিল "আজ্ঞে অনেক বুঝিয়েছি। তা'রা শোনে না। কাল থেকেই তা'রা কাজে লাগ্‌বে। পূরণচাঁদই তাদের বুঝিয়েছে।"

বাঙ্গালী। এঁ্যা? পূরণচাঁদ? সেই ত ধর্ম্মঘটের সর্দ্দার! সেই আবার পেছিয়ে পড়েছে?

বীর। আজ্ঞে হাঁ। তার বড় কষ্ট। চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে।

বাঙ্গালী যুবক তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল—"দেখ্ সকলকে বারণ করিস্—কাল যে কাজে লাগ্‌বে তা'র সর্ব্বনাশ হবে।" যুবক চলিয়া গেল।

(৪)

বীরমল ভাবিতেছে—আজ কাজে যোগ দিবে কি না। সকালে পূরণচাঁদ, রজিলা, রামকিশোর এবং আরও ত্রিশজন মজুর খনিতে নামিয়াছে। কাজ চলিতেছে। বীরমলের মনে মহা আন্দোলন। সেই প্রতিজ্ঞা—ধর্ম্মঘটের কথা—কি করিয়া লঙ্ঘন করিবে? কিন্তু রজিলা ও রামকিশোর খনিতে নামিয়াছে। রজিলা ও রামকিশোরের কথা ভাবিতে ভাবিতে সে পাগল হইয়া উঠিল। সেও যাইবে—যেখানে রজিলা—সেও সেখানে।

কিন্তু খনির সম্মুখে ঘোর কোলাহল। যে সকল মজুর কাজে লাগিতে চায় না তাহারা, যাহারা কাজে যাইতে চায় তাহাদিগকে নিবারণ করিতেছে। কর্কশ কথা—গালাগালি, শেষে বলপ্রয়োগ—প্রহার পর্য্যন্ত করিতেছে। ম্যানেজার

বীটন সাহেব দেখিলেন মহা গোলযোগ। তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিসে সংবাদ দিলেন "কুলীরা ক্ষেপিয়াছে। অস্ত্রধারী পুলিস প্রয়োজন।" সাহেবের কথা—অল্পক্ষণ মধ্যেই বারজন গোরা বন্দুক স্কন্ধে শান্তিরক্ষার জন্য সমবেত হইল। বন্দুকের বাঁটের আঘাতে ভীড় সরাইতে লাগিল।

তখন মজুরদের মধ্যেও কোলাহল উপস্থিত হইল। "মারো! মারো!" শব্দ উত্থিত হইল। সকলের মধ্যে গাঁতি, কোদাল ও লাঠি। সমবেত জনতা তাহাই লইয়া গোরাদের আক্রমণ করিল। তৎক্ষণাৎ বন্দুকের শব্দে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইল। সাত আটজন মজুরের মৃতদেহ প্রান্তরে লুণ্ঠিত হইল।

তখন সকলেই পলায়ন করিল। ঝড়ে শুষ্ক পত্ররাজির ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই অন্তর্হিত হইল। কেবল বন্দুক স্কন্ধে গোরাগণ মৃতদেহ গুলির নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় বীরমল আসিল। বলিল "আমি কাজ করিতে যাইব।" বীটন সাহেব নিকটেই ছিলেন। বলিলেন "বহুৎ আচ্ছা।" উপর হইতে বীরমলকে খনির নিম্নে নামাইয়া দেওয়া হইল।

(৫)

খনির নিম্নে ঘোর অন্ধকার। চতুর্দ্দিকে স্তূপাকারে কয়লা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লণ্ঠন প্রজ্বলিত করিয়া মজুররা কাজ করিতেছে। বড় বড় কয়লার চাপ ভাঙিতেছে। সেইগুলি ঠেলাগাড়ীতে করিয়া খনির একপার্শ্বে লইয়া যাইতেছে। সেইখান হইতে সেগুলি উপরে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে।

রঙ্গিলা ঠেলাগাড়ি লইয়া ছুটিতেছে। রামকিশোর সেই গাড়ী বোঝাই করিয়া দিতেছে। একবার অবসর পাইয়া রামকিশোর বলিল "রঙ্গিলা, তোমার বাপ রাজী হয়েছেন। শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।"

রঙ্গিলা কথা কহিল না। একটু হাসিয়া কয়লাপূর্ণ ঠেলাগাড়ি লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

রামকিশোর সেই হাসিতে নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের চিত্র দেখিতে লাগিল।

বীরমল রামকিশোরকে খুঁজিতেছে। অনেক ঘুরিয়া শেষে রামকিশোরকে পাইল। বলিল "এই যে—তোর না হ'তেই কাজ কর্‌তে নেমেছিস্। হতভাগা কোথাকার। তোদের জন্য আজ কত খুন হয়েছে জানিস্? উপরে গোরা এসেছে। গুলি করে সব মেরে ফেল্‌ছে।"

রামকিশোর বলিল—"তাই বুঝি, ভয়ে পালিয়ে এসেছিস্—দূর হ—দূর হ।"

বীরমল রামকিশোরের গলা ধরিয়া প্রবলবেগে ঠেলিয়া দিল। রামকিশোরের মাথা সূচ্যগ্র কয়লার এক চাপে আহত হইল—সে নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া রহিল।

এই সময় ঠেলাগাড়ি লইয়া রঙ্গিলা সেখানে উপস্থিত হইল। রঙ্গিলাকে দেখিয়া বীরমল চমকিত হইল। রঙ্গিলা বলিল—"একি! একে খুন করেছ?" তখন সে চীৎকার করিয়া উঠিল "খুন—খুন।" চারিদিক হইতে শ্রমজীবিগণ ছুটিয়া আসিতে লাগিল। পূরণচাঁদ আসিয়া দেখিল—রামকিশোর নিহত। তখন সে বীরমলের গলা টিপিয়া ধরিল। অন্যান্য মজুররাও বীরমলকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বীরমল কথা কহিল না। স্তব্ধভাবে রঙ্গিলার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা এক তীব্র শব্দে খনি পূর্ণ হইয়া গেল। উপর হইতে আশঙ্কাসূচক ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইল। একজন দৌড়িয়া সংবাদ জানিতে গেল—পরমুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"উঠে পড়—উপরে উঠে পড়। খনি ভেসে যাচ্ছে—"

তখন সকলেই উপরে উঠিবার ঝোলান খাঁচার দিকে ছুটিল। সকলেই আগে যাইতে চায়। প্রায় পঁচিশজন উঠিল। সঙ্কেত দিতে খাঁচা উপরে উঠিয়া গেল।

বীরমল, রঙ্গিলা, পূরণচাঁদ এক খাঁচায় স্থান পায় নাই। আরও পাঁচজন মজুর উঠিতে পারে নাই। তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল—আবার খাঁচা নামিলে তাহারা উঠিবে।

মাথার উপর ঘোর জলকল্লোল শ্রুত হইল। একখণ্ড বৃহৎ কয়লার চাপ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার আঘাতে দুইজন শ্রমজীবী নিষ্পেষিত হইয়া গেল। খাঁচা নামিবার আর উপায় রহিল না।

জল—জল—চারিদিকে জল আসিতে লাগিল। বীরমল রঙ্গিলার হাত ধরিয়া ছুটিয়া চলিল। সঙ্কীর্ণ পথ—জলধারা ছুটিতেছে। বীরমল উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে উঠিতে লাগিল। সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিতে হইলে এক বৃহৎ কয়লার চাপের উপর উঠিতে হয়। খনির মধ্যে তাহাই সর্ব্বোচ্চ। বীরমল রঙ্গিলাকে তাহার উপর তুলিয়া দিল। রঙ্গিলা উঠিয়া তাহার উপর বসিল। তখন বীরমল উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দুই তিনবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না। শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় লম্ফপ্রদানে উঠিতে গেল। কিন্তু পদস্খলন হইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল।

(৬)

রঙ্গিলা একেলা সেই কয়লার স্তূপের উপর বসিয়া রহিল। চারিদিক হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। টপ্—টপ্—টপ্—নিম্নে জলরাশির উপর, উপর হইতে জল পড়িতেছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকার।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বীরমলের কোন সাড়াশব্দ নাই। জল নিম্নদেশ হইতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। ধীরে ধীরে জল উঠিতেছে। রঙ্গিলা বুঝিল ক্রমে ক্রমে সেখানেও জল উঠিবে। সেই স্থল জলপূর্ণ হইয়া গেলেই—নিশ্চিত মৃত্যু।

রঙ্গিলার পদতলে জলের উপর কে একজন আসিল। দুই তিনবার চেষ্টা করিয়া রঙ্গিলা যে কয়লার স্তূপে উঠিয়াছিল তাহার উপর উঠিয়া পড়িল। রঙ্গিলা বলিল—"কে? বীরমল?"

উত্তর হইল "না। তুমি কে?"

র। আমি রঙ্গিলা। তুমি কে?

উত্তর। আমি বাঙ্গালী।

রঙ্গিলা বুঝিল—যে বাঙ্গালী যুবক ধর্ম্মঘট করিতে মজুরদের উত্তেজিত করিয়াছিল সেই আসিয়াছে।. কিন্তু সে এখানে কিরূপে আসিল তাহা রঙ্গিলা বুঝিতে পারিল না। বলিল—"আপনি কিরূপে আসিলেন?"

উত্তরে হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। যুবক বলিল—"আমরা কখন কোথায় থাকি কিছু ঠিক আছে কি? আজ মজুরগুলো কাজ কর্‌তে নেমেছে—ধর্ম্মঘট সব রদ্ করেছে—তাই ব্যাটাদের জব্দ করে দিলুম। পাথর কেটে দিয়েছি। জল আটকাবার বাঁধন খুলে দিয়েছি। তাই খনি ভেসে গেছে। যে ব্যাটার খনি তাকেও আর জীবনে পয়সা রোজগার কর্‌তে হবে না।"

রঙ্গিলা বলিল "আপনি বাঁচ্‌বেন কি করে?"

যুবক হাসিল। বলিল "আমি প্রাণের আশা রেখে এ কাজে হাত দিই নাই; যাক্, এইখানটা সব চেয়ে উঁচু। ঐ যে ধাপের মত দেখ্‌ছ ঐখানটায় বোস। একজন লোক এইখানে বস্‌তে পারে। ওখানে বোধ হয় জল উঠ্‌বে না। ওপর থেকে লোকেরা খোঁজ কর্‌বে। এই লোহাটা নাও, দেয়ালে ঠুকে ঠুকে সঙ্কেত করো। ওপর থেকে খুঁজে এসে তোমাকে বাঁচাবে।"

রঙ্গিলা। আর আপনি?

যুবক। আমি চল্‌লুম। তুমি স্ত্রীলোক। তোমার প্রাণরক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। দুজনের এখানে স্থান নাই। তুমিই থাক।

রঙ্গিলা। যদি বাঁচি আপনার কোন সংবাদ কাহাকে দিব কি ?

যুবক। কিছু না। আমি এ সংসারের নই।

নিম্নে তখন বহুল জলরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। যুবক লম্ফ দিয়া সেই জলে পতিত হইল। একবার জল ছিটকাইয়া উঠিল। পরক্ষণে সব নিস্তব্ধ!

(৭)

জল উঠিতেছে। প্রথমে রঙ্গিলার পা ডুবিল। পরে হাঁটু অবধি জল উঠিল। ক্রমে কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। তবুও বিরাম নাই। জল বাড়িতেছে। ধীরে ধীরে জল বাড়িতেছে।

এই সময় রঙ্গিলার পায়ে কি ঠেকিল। সঙ্কোচে সে পা সরাইয়া লইল। আবার কিছুক্ষণ পরে সেইরূপ স্পর্শে রঙ্গিলা হাত দিয়া দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এ যে মৃতদেহ! বীরমলের মৃতদেহ! দুই হাতে তাহা দূরে ঠেলিয়া দিল। জলরাশিতে কল্লোল তুলিয়া তাহা সরিয়া গেল। আবার ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে আসিয়া রঙ্গিলার পদলগ্ন হইল।

কিছুতেই যায় না। সেইখানেই জলের গতি। যতবার সরাইয়া দাও, ততবারই ফিরিয়া আসে। অন্ধকার ভূগর্ভে, জল কলরবে রঙ্গিলা উন্মাদপ্রায় হইল। বাঙ্গালী যুবকের পরামর্শ মত-দেয়ালে আঘাত করিয়া সঙ্কেত করিতে লাগিল। কেহ তাহা শুনিল কি না কে জানে ?

জল বাড়িতে লাগিল। ধীরে—অতি ধীরে জল বাড়িতে লাগিল। সূর্য্য উঠিয়াছে। খনির মধ্য হইতে মজুরদের উদ্ধার করা হইয়াছে। রঙ্গিলার সংজ্ঞাশূন্য দেহ মাঠে শায়িত। পার্শ্বে পূরণচাঁদের মৃতদেহ। রামকিশোর বীরমলের মৃতদেহও একপার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যুবকের দেহ পাওয়া যায় নাই।

রঙ্গিলার মাতা তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। চতুর্দ্দিকে মজুরগণ দাঁড়াইয়া আছে। সকলের মুখে একটা গভীর ক্ষোভ ও প্রচ্ছন্ন রোষের চিহ্ন প্রকটিত। খনি অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

সবুজ ঘাসের উপর সূর্য্য কিরণ ঝকমক করিতেছে। পূরণচাঁদের ছোট ছেলে মেয়েগুলি চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পূরণচাঁদ সুনীল গগনের দিকে মুখ করিয়া পড়িয়া আছে। তাহার সকল কষ্ট ঘুচিয়াছে।

রঙ্গিলার দেহ নড়িয়া উঠিল। সকলে সাগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। রঙ্গিলা চক্ষু মেলিল—যেন কি বিভীষিকা নয়নের সম্মুখ হইতে দূর

করিতে চেষ্টা করিল। বলিল—"ওগো আর খনিতে যাব না! আমি আর খনিতে যাব না!"

সহসা তাহার দৃষ্টি মৃতদেহের উপর পতিত হইল। সে তাহার পিতার মৃতদেহের উপর লুটাইয়া পড়িল। দুইতিন জনে ধরিয়া যখন রজিলাকে তুলিল তখন সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

সেই ভয়াবহ ঘটনায় তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল।

সূর্য্য তখন হাসিতেছিল। দিগন্তে বৃক্ষরাজি রবিকরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মজুরদের ছেলেমেয়েগুলি ঘাসের উপর ছুটাছুটি করিতেছিল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

শ্রুতির ইতিহাস।

(প্রথম প্রস্তাব।)

অতি প্রাচীনকালে অমরাবতী যখন উত্তরোত্তর উন্নতির উচ্চ সোপান অতিক্রম করিতেছিল, নরলোকে মানবজাতি তখন পশুর মত নির্ভীক, নিরলস, নির্ব্বোধ ও নির্লজ্জ ছিল—সেই স্মরণাতীত কালে যে তিনজন মহামহিম মহাপুরুষ হিমালয় পর্ব্বতের স্বর্ণময় তুঙ্গশৃঙ্গে উপবিষ্ট থাকিয়া, এই নূতন মানবজাতির প্রতিষ্ঠাকল্পে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, সে তিনজনই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাজন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার একান্ত যত্নে ও অমানুষী শক্তিবলে মনুষ্যজাতি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছিল, তখন তাহারা শ্রুতিপরম্পরায় যাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি-কথা শ্রবণ করিয়া, একমাত্র উপাস্য ভাবিয়া, তাঁহাকেই উপাসনা করিত, তাঁর নাম সদাশিব। উপাস্য দেবতার সাধারণ উপাধি "ঠাকুর"। আমরা এখানে তাঁহাকে সদাশিব ঠাকুর বলিয়াই উল্লেখ করিব।

এই সদাশিব ঠাকুর কে, কার সন্তান, কোন কালে তাঁহার পিতা মাতা ছিলেন কি না, সে সংবাদ কেহ জানে না। পুরাণকর্ত্তারাও বুঝি সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছিলেন। তবে এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁহাকে যে বেশীদিন দৃষ্টিছাড়া রাখিতে পারিবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। আমাদের যদি ভূগর্ভদর্শন তৃতীয় নয়ন থাকিত, তবে নিশ্চয় বলিতে পারিতাম, ঐ

স্বরূপ অন্বেষণ কর! ঐ আবর্জ্জনা সরাইয়া দাও! ঐ দেখ, সেই তাম্রফলক, যার জন্ত এত ভাবিতেছ!! কিন্তু কি পরিতাপ! সে যে একেবারে অন্ধ!

বরাবর শুনিয়া আসিতেছি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর সদাশিব তিন সহোদর। তিনজনে খুব প্রণয় ছিল, চেহারা দেখিয়া ছোট বড় চেনা যাইত না, সেজন্য অনেকে যমজ বলিত। তবে যমজ যে কখনও তিনটী হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে কেহ তাহা জানিত না।

কাজের সময় তিনজনে একটুও মিল ছিল না। মতদ্বৈধ লইয়া, মাঝে মাঝে বিষম গোল বাধিত। তা' দেখিয়া লোকে যা' ভাবুক ভিতরে কিন্তু তিনটীতে একটী। এই একপ্রাণতার বাহিরে ব্রহ্মা যেন বেশী গম্ভীর। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তরঙ্গ উঠিত না; অত্যান্ত নিশ্চলতার ভিতর হইতে, সে রক্তবর্ণ মুখখানাকে নিতান্ত কুৎসিত দেখাইত। বস্তুতঃ সে মুখে একটুও কারিকুরি ছিল না; তার উপর দর্শন-বিজ্ঞানের জটিল চিন্তা ক্রমশ্য বিকৃত করিয়া রাখিত, বিষ্ণু ঠাকুর সেজন্ত ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন "পিতামহ"। দুষ্টামিতে তিনি যে পিতামহেরও প্রপিতামহ, সে কথা বলিবার কেহ ছিল না। তবে অবশ্য এটাও স্বীকার্য্য যে, তাঁর বুদ্ধিলতার গোড়াটা চিরদিন ঝরঝর করিত। তা'ও যে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর করকম্পিত সম্মার্জ্জনীর ক্ষিপ্রকারিতায়, তা' প্রায় সকলেই স্বীকার করিত, করিতেন না কেবল সেই ঠাকুরটী। ইহা ঠাকুরের জ্ঞানকৃত অপরাধ নহে; যেহেতু সে পুষ্পরসের মাদকতায় বাহ্যজ্ঞান থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না।

সদাশিবের স্বভাব যেন কেমন এক রকম। না আছে বিলাসবিভ্রম, না আছে সাধ্যমিলন! নিন্দা গায়ে লাগিত না, যশও দুয়ার খোলা পাইত না। আহার-নিদ্রা-ভয় ত্রিসীমায় প্রবেশ করিত না, মান-অপমানের ওজনও ঠিক থাকিত না। তবে রাগিলে রক্ষা ছিল না, পুরুষকার প্রবলবেগে আপন অস্তিত্ব প্রকাশ করিত, সে বেগে মেদিনী সহসা কাঁপিয়া উঠিত, সূর্য্যিঠাকুর মেঘের বুকে মুখ লুকাইত, চাঁদ সাগরের জলে ডুব দিয়া হাঁপাইয়া উঠিত। পাহাড়-পর্ব্বতগুলা সে বেগ সহ্য করিতে পারিত না; একদিকে তাহারাও যেমন হেলিয়া যাইত, আর একদিকে বিষ্ণুঠাকুরের অটল বুদ্ধিখানিও তেমনি নোয়াইয়া পড়িত। তিনি আশ্রয়-অন্বেষণে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর অঞ্চলে লুটাইয়া পড়িতেন।

সদাশিবের মন ছিল শিশুর মত সরল। বয়সে সমান হইলেও বিষ্ণুঠাকুর বয়োজ্যেষ্ঠের মত শাসন-পেষণের সবটুকু নিজের হাতে রাখিয়াছিলেন, আর ছোট ভাইটীর মত খাবার জিনিসগুলি যত্নপূর্ব্বক দিয়া আসিতেন। সেজন্য বিষ্ণুর দিকে শিবের একটু স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল।

তাঁর কিন্তু এমন একটা কুপিত দোষ ছিল, যা' কুলজবিকারের মত অসাধ্য। ছলে, বলে, কৌশলে কেহ কখন তাঁহাকে কাপড় পরাইতে পারিত না। বিজ্ঞেরা বলিতেন "সংস্কার!" মানুষই মরে, সংস্কার ত মরিবে না। সদাশিবের পূর্ব্বজীবনের মরণটা বড় সরলভাবে ঘটে নাই। হয়ত কাপড়ের ফাঁস গলায় টানিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল, 'নয়ত' কাপড় পায় জড়াইয়া জলে ডুবিয়া মরিয়াছিল ;—ঐ ভয়টা তাই মাথায় থাকিয়া গিয়াছে। বিষ্ণু তাহা মানিতেন না, খেড়ে ছেলের নগ্নসন্ন্যাস ঠাকুরের ভালও লাগিত না। তিনি অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেন, কিন্তু সে শরতের মেঘ, বর্ষণ করিত না। সদাশিবকে একটুও উত্তেজিত করিতে পারিলেন না; বস্ত্রবৈরাগ্য পূর্ব্বমত থাকিয়া গেল।

বিষ্ণু ঠাকুর অনেক তীব্রতাড়না, গুরুগঞ্জনা, চড়, কীল, মুষ্টিযোগেও কৃতকার্য্য হইলেন না। সদাশিবের নগ্নমূর্ত্তি ভগ্ন করিতে, যখন সকল অস্ত্রগুলি ভাঙ্গিয়া গেল, বিষ্ণু তখন একান্ত দুঃখে আর নিতান্ত অভিমানে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলা বিষধর সর্প ধরিয়া কোমরে জড়াইয়া দিলেন। তাহাতেও কিছু হইল না, সাপগুলাকে লইয়া আরও আমোদ বাড়িয়া গেল! বুকে, হাতে, গলায় জড়াইয়া শিবঠাকুর নাচিতে লাগিলেন, সে উদ্দাম নৃত্যে ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল। বিষ্ণু অবাক! অগত্যা ঘাট মানিয়া, ঘরে গিয়া খিল দিলেন। বিজ্ঞেরা বলিলেন, "বৃদ্ধস্য বচনং"—বাপু! যা' কর, আর যা' ভাব ভবী ভুলিবে না"।

গভীর নিশীথে যখন সকলে ঘুমাইত, সদাশিব তখন জাগিয়া থাকিতেন। পশু-পক্ষি-প্রাণিবৃন্দ কেহ কোথায় জাগিত না, মুখরিত ঝিল্লীরব থামিয়া যাইত, প্রকৃতি কর্ম্মক্লান্তি অপনয়ন করিবার মত একপ্রকার অসাড়তার অভিনয় করিতেন এবং নবোঢ়া নিদ্রিত পতির মুখের দিকে নির্ভয়ে চাহিয়া থাকিত, তখনও তিনি ধ্যানস্তিমিতলোচনে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে বসিয়া থাকিতেন। বিষ্ণু দৈবাৎ একদিন সে অবস্থা দেখিলেন; ভণ্ডামি ভাবিয়া ভারি রাগ হইল; ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়াও সাড়া পাইলেন না। সদাশিব বাহ্যজ্ঞান শূন্য

জড়বৎ নিশ্চেষ্ট রহিলেন। ঝাড়-ফুঁক-তন্ত্র-মন্ত্র যখন নিষ্ফল হইয়া গেল, বিষ্ণু তখন বিষম বিরক্ত হইয়া, লেপমুড়ি দিলেন।

তা' বলিয়া ত অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। রাগ করিলে কাজ পণ্ড! বিষ্ণুর বিরক্তি একটু কমিয়া কমিয়া গেল আর সদাশিব কি করেন, দেখিবার বাসনা প্রবলবেগে গজাইয়া উঠিল। একদিন লক্ষ্মীকে ফাঁকি দিয়া শিবের কাছে থাকিয়া গেলেন, এবং নিদ্রার ভাণ করিয়া, লেপের ফাঁক দিয়া দেখিলেন সে-ই রকম! সদাশিব শ্বেতপাথরের পুতুলটার মত বসিয়া আছেন, নড়ন-চড়ন নাই। সারারাত্রি সদাশিব ঘুমায় কি না, জাগিয়া দেখিবার সঙ্কল্প ঠিক ছিল, কিন্তু বিষ্ণু যে কখন ঘুমাইলেন, এখন তা' কিছুতেই মনে পড়িল না।

একদিন জোর করিয়া সারারাত্রি জাগিয়া দেখিলেন, সদাশিব একবারও ঘুমায় না। সেইদিন ভয়ানক চটিয়া কাল মুখখানাকে বিষম কাল করিয়া, ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া পারি, আজই উহাকে ঘুম পাড়াইব।

বিষ্ণু ভাবিলেন, এটা বিষম বিকারের সূত্রপাত। শরীরের সমস্ত বাতাস বিগ্‌ড়াইয়া তাবৎ রক্ত মাথায় তুলিতেছে; পিত্তও বিকৃত হইয়া বায়ুর সঙ্গে সন্ধি করিয়াছে, নিশ্চয় উন্মাদ হইবে। অতএব "বিষস্যবিষমৌষধম্" হেতু বিপরীত চিকিৎসা এখানে বন্ধ্যা; সুতরাং সিদ্ধি লইয়া আইস!

শত লোক ছুটিল, নিমিষে সিদ্ধির পর্ব্বত হইয়া গেল। লোক বশ করিতে বিষ্ণু ঠাকুরের যোড়া মিলিত না; অন্যে যেখানে তাড়া দিয়া সাড়া পাইত না, মিষ্ট কথায় মন পাইত না, টাকা দিয়া বশে আসিত না, মুষ্টিযোগে কি যষ্টিযোগেও ভয় পাইত না, কটাক্ষে তিনি সেখানে কার্য্যসিদ্ধি করিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রে স্বভাবতঃ তাঁহার তীব্র উৎসাহ ছিল, সুতরাং সকল কার্য্য হাল্‌কা হইয়া যাইত, সেজন্য বিষ্ণুর হাতে কোন কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিত না, অথচ অল্পসময়ে সুসম্পন্ন হইত। চক্ষের নিমিষে ঘড়া ঘড়া সিদ্ধির সরবৎ প্রস্তুত হইয়া গেল। সেই স্নিগ্ধ সরবৎ সদাশিবের জঠরক্ষেত্রে সমর বাধাইল, মাথার উপর দিয়া মন্দাকিনীর শীতল ধারা তরতর বেগে বহিয়া গেল, কিন্তু সব পণ্ড হইল, সদাশিব তেমনই রহিলেন। এইখানে যে মারাত্মক ভুল হইল, বিষ্ণু তাহা তলাইয়া দেখেন নাই। তিনি যদি মৌরি-মরিচ আর চিনি-দধি মিশাইয়া দিতেন, তবে হয়ত সংযোগসাধনায় নিদ্রাদেবী কৃপা করিতেন। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া, বেশী করিয়া ধুতুরার বীজ মিশাইলেন, তাহাতেই সব বিপরীত হইয়া গেল। "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্" শিবের ঘুম আরও চড়িয়া গেল, লাটের মধ্যে চক্ষু কয়টা

জবাফুলের মত লাল হইয়া রহিল। বিষ্ণু পরাজিত হইয়া প্রতিজ্ঞার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া, নির্ঘাত শাপ দিলেন, "আজ অবধি প্রতিজ্ঞা করিলেই ভঙ্গ হইবে"। পুঁথি পাঁজিতে লিখিত হইল "প্রতিজ্ঞা করা ভীষণ পাপ"। প্রতিজ্ঞার পরিণাম যে এমন হইবে কে তাহা জানিত! হায় প্রতিজ্ঞা, কুক্ষণে তুমি বিষ্ণুর কাঁধে ভর করিয়াছিলে!

তবুও বিষ্ণুঠাকুর ছাড়িবার পাত্র নহেন; শক্ত দেখিয়া পিছাইয়া যাওয়া, কোনকালে তাঁহার অভ্যাস ছিল না। ভাবিয়া দেখিলেন, প্রথম যৌবনে অনেকেই যোগসমাধি অভ্যাস করে, মাছ মাংস খায় না, পরোপকারের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে চায়। বড় ভাই বড় বৌএর কাছে বসিলে ডাল-পালা দিয়া সে কথা মায়ের কাণে তুলিয়া দেয়, আর আস্ফালন করিয়া বলে, আমি বিবাহ করিব না, যদিই বা করি দাদার মত হইব না। কিন্তু বিবাহের পর একেবারে পরিবর্ত্তন! দুদিন না যাইতেই রূপের ঢেউ লাগিয়া যোগসমাধি যৌবনসাগরে তলাইয়া যায়। তখন শুধু মাছ মাংসে কুলায় না, হাঁসের ডিম কাঁচা খাইয়া বুড়া বয়সের জন্য বাতের বীজ বপন করিয়া রাখে। পরোপকার পরের কথা, নিজের ঘরে মাতা-পিতা-ভাই-ভগিনী ভুলিয়া যায়। আস্ফালন-গর্জ্জন চুপি চুপি মুখ ঢাকিয়া আপাততঃ ঘরের কোণে বসিয়া থাকে। অতএব শিবের বিবাহ দিব, চট করিয়া এই ফন্দীটা বিষ্ণুর মাথায় জাগিয়া উঠিল। পরামর্শ করিতে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার কাছে ছুটিয়া গেলেন।

বিধাতাপুরুষটী যেমন দার্শনিক, তেমনই জ্যোতির্ব্বিদ্। ভূত-ভবিষ্যতের কথা ঠিক করিয়া সকলের কপালেই আঁচড় পাড়েন, কোনটা ফলে, কোনটা নাও ফলে! তবু তাঁর মত ভবিষ্যদ্বক্তা কেহ ছিল না। বিষ্ণুর কথা শুনিয়া ব্রহ্মার মুখখানা ভারি গম্ভীর হইল। দর্শনতত্ত্বের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন, প্রকৃতি নহিলে পুরুষকে জব্দ করিতে পারে না, দুষ্ট ঘোড়ার লাগাম ঐ রমণীটা। প্রকাশ্যে বলিলেন, তথাস্তু! দক্ষরাজার কন্যা সতীসুন্দরী রূপে গুণে সবার সেরা, শিবের কপালের লিখন, ঐ কন্যাই তাঁহার শুভাশুভ ফলের মাপকাটি হইবে; অতএব শুভস্য শীঘ্রম্।

পরামর্শ অন্তেই কার্য্যসিদ্ধি! অন্ততঃ নিজের প্রতি বিষ্ণুঠাকুরের এমনই স্থির বিশ্বাস ছিল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।

বিশ্বাসঘাতক।

যখন সিপাহী-বিদ্রোহের বহ্নি সারা ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল—চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ,ডাকাতি, খুন,পরস্বাপহরণ প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ঝান্সির অন্তর্গত প্রতাপগড় নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে সর্দ্দার গুরুদয়াল সিংহ একমাত্র পুত্রসহ বাস করিত। সে ইংরাজ বা সিপাহী কোন দলেই যোগদান করে নাই। সারাজীবন সৈন্যদলে যাপন করিয়া যথেষ্ট যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। তাহার মত বীর যোদ্ধা সে সময়ে খুব বিরল ছিল। তাহার অমিত তেজোদ্দীপ্ত বদনমণ্ডল, সুদীর্ঘ সুদৃঢ় দেহের গঠন, অকুতোসাহস, পরার্থপরতার জন্য সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাহার প্রধান দোষ ছিল যে কাহারও সহিত কোনরূপে শত্রুতা হইলে বা কোনও কারণে কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইলে সে তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া, তাহাকে প্রাণে না মারিয়া নিশ্চিন্ত হইত না, সেজন্য লোকে তাহাকে ভয়ও করিত! তাহার লোকবলও যথেষ্ট ছিল—কাহাকেও ভূমিদান করিয়া, কাহাকেও অন্নদান করিয়া বশীভূত করিয়াছিল। চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় তাহার চরিত্রে ক্রোধ-রিপুর প্রাবল্য থাকিলেও তাহার যশঃ দিগন্ত ব্যাপৃত ছিল।

একটী পুত্র ও একমাত্র কন্যা তাহাকে উপহার দিয়া তাহার পত্নী দশবৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিল। এই দশবৎসরই সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া নিজের পল্লী-ভবনে জীবনযাপন করিতেছে। কন্যাটীকে যথাসময়ে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছে—পুত্রটীর বয়স এখন বার বৎসর।

সর্দ্দার গুরুদয়াল যে গ্রামে কন্যার বিবাহ দিয়াছিল, সে গ্রামটী প্রতাপগড় হইতে একক্রোশ দূরে। সর্দ্দার মধ্যে মধ্যে সেই গ্রামে গিয়া কন্যাকে দেখিয়া আসিত। অর্দ্ধপথে ইংরাজের একটা সৈন্যাবাস ছিল। প্রত্যহ দলে দলে ইংরাজ এই স্থানে আত্মরক্ষার্থ আগমন করিত। চতুর্দ্দিকে অশান্তি, কখন কি বিপদ ঘটে,—এই বিবেচনায় সর্দ্দার একদিন বন্দুক ও ভোজালি লইয়া তাহার কন্যাকে দেখিতে যাইতেছে, এমন সময়ে তাহার পুত্র হরদয়াল আসিয়া পিতার সহিত যাইতে চাহিল। সর্দ্দার বালক পুত্রকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহারা উভয়ে যাইলে হয়ত কোন শত্রু আসিয়া বাড়ী লুণ্ঠন করিতে পারে; সেইজন্য তাহাকে বাটী

পাহারা দিতে হইবে। পুত্র পিতার আদেশক্রমে বাটীতে রহিল, পিতা কন্যা-সন্দর্শনে যাত্রা করিল।

হরদয়াল বহির্বাটীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একখানি খাটিয়া বিছাইয়া শুইয়া পড়িল, ঊর্দ্ধে নীলাকাশপানে চাহিয়া সে কত কথা ভাবিতে লাগিল—দেখিল একটা ময়ূর একটা সর্পকে চঞ্চুতে ধরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল, নিম্নে নামিল! বালক এইরূপে নিবিষ্ট মনে শুইয়া রহিয়াছে, এমন সময় বন্দুকের শব্দে সে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে, লক্ষ্য করিতে লাগিল। শত্রুর আগমন-আশঙ্কায় সে স্বীয় বন্দুকটী হাতের কাছে রাখিয়া একটী বৃক্ষের উপর উঠিয়া দেখিল, একজন ইংরাজ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার শ্বেতবসন রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে—তাহার গাত্রে একখানি কম্বল! তাহার খানিক পশ্চাতে কয়জন লোক ছুটিয়া আসিতেছে! বালক বৃক্ষ হইতে নামিয়া আবার স্বস্থানে আসিয়া বসিল!

ইংরাজটী একজন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী, নাম কাপ্তেন গ্রে। তিনি নিজে ছদ্মবেশে শত্রুর সন্ধানে ঘুরিতেছিলেন, এমন সময় শত্রুকবলে পতিত হন। তাঁহার ইচ্ছা কোনরূপে ছুটিয়া যদি সৈন্যাবাসে যাইতে পারেন। কিন্তু অতিরিক্ত শোণিতস্রাবে তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে ততদূর যাইবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। তিনি জানিতেন, নিকটেই সর্দ্দার শুকদয়ালের আবাস। তাঁহার বিশ্বাস, সেখানে কোনরূপে পৌঁছিতে পারিলে সে প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। এই আশায় তিনি একেবারে ছুটিয়া হরদয়ালের নিকট আসিলেন ও হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি সর্দ্দারের ছেলে?"

মধুরবচনে বালক উত্তর করিল,—"হাঁ সাহেব।"

"দেখ, আমার নাম কাপ্তেন গ্রে, শত্রুরা আমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে, আমাকে রক্ষা কর! কোনও গুপ্তস্থানে আমাকে লুকাইয়া রাখ—আমি তোমাদের শরণাগত!"

"পিতার বিনা আদেশে আপনাকে লুকাইয়া রাখিলে তিনি কি মনে করিবেন?"

"তিনি বলিবেন, তুমি উত্তম কার্য্য করিয়াছ।"

"যদি তা' না হয়?"

"দোহাই, শীঘ্র আমাকে লুকাইয়া ফেল, তা'রা এসে পড়ল বলে।"

"পিতার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

প্রাণের দায়ে ভয় দেখাইয়া গ্রে সাহেব বলিলেন—"কি, অপেক্ষা কর্‌ব? শীঘ্র আমাকে লুকাইয়া ফেল, নইলে তোমাকে হত্যা কর্‌ব!"

মৃদু হাসিয়া স্থিরভাবে বালক বলিল,—"আপনার বন্দুকে বারুদ নাই, কিসে আমায় মার্‌বেন?"

"আমার ভোজালি আছে!"

"আপনি আমার সঙ্গে ছুট্‌তে পার্‌বেন?" এই বলিয়া বালক এক লম্ফে সেস্থান হইতে ১০।১২ হাত দূরে পলায়ন করিল।

"তুমি নিশ্চয় সর্দ্দার গুরুদয়ালের পুত্র নহ—আমাকে বাটীর বাহিরে রেখে আস্‌বে?"

বালকের কঠিন হৃদয় এইবার দ্রব হইল, সে বলিল—"আপনাকে গোপন করে রাখ্‌লে আমায় কি দিবেন?" গ্রে সাহেব ত্রস্তে পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন যে বারুদ কিনিবার জন্য তাহাতে দুইটী টাকা আছে। তিনি ঐ টাকা দুটী ছুড়িয়া বালকের দিকে ফেলিয়া দিলেন। বালক টাকা গ্রহণ করিয়া "কোন ভয় নাই, এইদিকে আসুন" এই বলিয়া তাহাকে বহির্বাটীর একটা খড়ের স্তূপে বসাইয়া চতুর্দ্দিকে খড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিল এবং তন্মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য উপযুক্ত বায়ু গমনাগমনের ব্যবস্থাও করিয়া দিল। কিছুক্ষণের জন্য এই স্তূপে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল এ সন্দেহও সহজে কেহ করিতে না পারে এই নিমিত্ত প্রত্যুৎপন্নমতি বালক তৎপরে একটী বিড়াল ও কতকগুলি বিড়াল-শাবককে খড়ের স্তূপের উপর রাখিয়া দিল,— এবং কতকগুলি বালি আনিয়া গ্রে সাহেবের পদনিঃসৃত রক্তচিহ্নগুলি ঢাকিয়া দিয়া পুনরায় স্বীয় খাটিয়ার উপর শয়ন করিল।

(২)

হরদয়াল নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া আছে, এমন সময় লালা গোপীনাথের নেতৃত্বে কয়জন সৈন্য তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করিল। লালা গোপীনাথ সর্দ্দার গুরুদয়ালের জ্ঞাতি ভ্রাতা। সে আদর করিয়া হরদয়ালকে জিজ্ঞাসা করিল— "বাঃ তুমি ত খুব বড় হয়েছ—আচ্ছা বল্‌তে পার এ পথে কি কোন ইংরাজ গিয়াছে?" "আমি এখনও তো আপনার মত বড় হই নাই" এই বলিয়া হরদয়াল বালকজনসুলভ হাসিয়া উঠিল।

"আচ্ছা তুমিও সময়ে আমার মত বড় হবে, এখন বল দেখি একজন ইংরাজকে যেতে দেখেছ ?"

ঢোঁক গিলিয়া বালক বলিল "কি একজন ইংরাজকে যেতে দেখেছি কি না ?"

"হাঁ একজন ইংরাজ—সাদা পায়জামাপরা, গায়ে কম্বল—রাস্তায় টুপীটা ফেলে এসেছেল, এই দেখ আমার কাছে আছে—"

"একজন ইংরাজ—সাদা পায়জামাপরা, গায়ে কম্বল—রাস্তায় টুপীটা ফেলে এসেছেল—"

"হাঁ, আমার কথার উত্তর দাও, মিছা দেরী কোরো না।"

"তা আমি কি করে বল্‌ব, টুপী যখন আপনার কাছে রহিল, তখন কি করে চিন্‌ব ?"

এইবার লালা একটু রাগিয়া বলিল,—"চালাকি রাখ, সে নিশ্চয় এই পথে গেছে—"

"কে জানে !" অগ্রাহ্যভাবে বালক বলিল—"কে জানে !"

"আমি জানি তুমি তা'কে দেখেছ।"

"লোক যখন ঘুমায় তখন কে যাচ্ছে কে আস্‌ছে দেখা যায় নাকি !"

"পাজী। তুমি তখন ঘুমোও নি, নিশ্চয় বন্দুকের শব্দে তোমার ঘুম ভেঙেছিল !"

"আপনি কি মনে করেন আপনার বন্দুকে এরূপ ভীষণ শব্দ হয় ?"

"জাহান্নমে যাও—পাজী ছোকরা—তুমিই নিশ্চয় তাকে লুকিয়ে রেখেছ।" তারপর স্বীয় সঙ্গীদের সম্বোধন করিয়া কহিল—"তোমরা বাড়ীটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ—সে নিশ্চয় এইখানে কোথাও আছে, কেন না রক্তের দাগ এইখানে এসেই শেষ হয়েছে।"

"আচ্ছা, বাবার হুকুম না নিয়ে চোরের মত বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লে তিনি কি বল্‌বেন ?"

লালা বিষম রাগিয়াছিল, সে বালকের কর্ণমর্দ্দন করিয়া বলিল—"হতভাগা পাজী ছোঁড়া, জানিস তুই চড়ে তোর মুণ্ড ঘুরিয়ে দিতে পারি !"

হৃদয়লাল সদর্পে কহিল—"জানেন আমার বাপ সর্দ্দার গুরুদয়াল !" রোষভরে লালা বলিল,—"তোকে এখুনি হাত-পা বেঁধে জেলে নিয়ে গিয়ে পুর্‌ব, এখনও বল্‌ পাজী সে ইংরাজকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস !"

ঘড়িটা খুলিয়া লইয়া লালা বলিল,—"আচ্ছা হরদয়াল, তুমি ঘড়িটা নেবে ?"

বালকের লোভ-সম্বরণের দৃঢ়তা যেন ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল! অতি ক্ষুধায়, মুখের নিকট আহার্য্য লইয়া গিয়া ফিরাইয়া আনিলে যেরূপ কষ্ট হয়, বালকেরও ঠিক সেইরূপ হইল—তাহার চক্ষুর্দ্বয় যেন বলিল—"তুমি কি নিষ্ঠুর!" এবং প্রকাশ্যে বলিল—"আপনি কেন বিদ্রূপ কর্‌ছেন?"

"আমি শপথ করে বলছি, যে আমি ঠাট্টা করিনি—আমার সঙ্গীদের সাক্ষী করে বল্‌ছি যে আমি নিশ্চয়ই ঘড়িটা তোমায় দেব।" বালক ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করিয়া ঘড়িটি গ্রহণ করিল, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বারবার দেখিতে লাগিল। আহা ইহা কত সুন্দর! তাহার লোভ খুব বাড়িয়া গেল!

আনন্দে অধীর, বাহ্যজ্ঞানশূন্য বালক হরদয়াল তখন খড়ের স্তূপের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইল। চতুর লালা ইঙ্গিত বুঝিল! সে ঘড়িটা বালকের হস্তে দিয়া সানুচর সেইদিকে ধাবমান হইল। বালক ঘড়িটা পাইয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে খড়ের স্তূপের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

খড়ের স্তূপ সরাইতেই গ্রে সাহেব বাহির হইয়া পড়িলেন; তীরের মত ক্ষিপ্রগতিতে লালা তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার তোজালিটা হস্তগত করিয়া লইল এবং অনেক কষ্টে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

গ্রে সাহেব হরদয়ালের দিকে চাহিয়া ঘৃণার সহিত বলিলেন "—র পুত্র"। বালক তখন তাঁহার প্রদত্ত টাকা দু'টী তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিল। গ্রে সাহেব তাহা লক্ষ্যও করিলেন না। লালার মনে আনন্দ আর ধরে না—সে তখন বন্দীকে লইয়া যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল।

(৩)

সর্দ্দার গুরুদয়াল বাড়ী ফিরিতে পথ হইতে দেখিল, তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণে কতকগুলি সৈনিক গোলমাল করিতেছে। তাহার সন্দেহ হইল, তা'রা কি তাহাকে বন্দী করিতে আসিয়াছে? কেন সেত কখনও কোনও দোষ করে নাই। তার সুনাম ও সুযশে দেশ ব্যাপ্ত! তবে হইতে পারে সে বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই বলিয়া বিদ্রোহীরা তাহাকে ধরিতে বা তাহার বাটী লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছে। এই সব নানা চিন্তা করিতে করিতে সর্দ্দার বন্দুকটী ঠিক করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল এবং মৃদুগতিতে স্বীয় বাটী-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন স্থানে অবশেষে পৌঁছিল,—যেখান হইতে তাহার বাটীর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বেশ দেখা যায়। একটী বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়া সে স্থির স্থিরভাবে সিপাহীদের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সিপাহীদের একজন গুরুদয়ালকে হঠাৎ লক্ষ্য করিল এবং লালার কানে কানে বলিল,—"গুরুদয়াল আসিয়াছে।" লালার হৃদয়টা দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! যদি গ্রে সাহেব তাহার পরিচিত বন্ধু হয়—যদি সর্দ্দার গুরুদয়াল তাহাকে লইয়া যাইতে না দেয়, তাহা হইলে? তাহা হইলে কি হইবে? গুরুদয়াল ত একাই আমাদের ২।৪ জনকে ধরাশায়ী করিয়া দিবে! এইরূপ নানা চিন্তায় তাহার মনটা আলোড়িত হইল।—এ বিপদে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই দেখিয়া সে বন্দুকটী ঠিক ধরিয়া গুরুদয়ালকে দূর হইতে অভিবাদন করিল, এবং কম্পিতপদে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—"কি দাদা কেমন আছেন,—আমি আপনার খুল্লতাত পুত্র লালা গোপীনাথ!"

গুরুদয়াল বন্দুকটী উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিল—"এস এস ভাই, খবর কি?"

"আজ হায়রাণের কথা কেন বলেন, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে গ্রে সাহেবের সন্ধানে ফিরছিলুম। একে ধরতে পারলে ১০০৲ টাকা পারিতোষিক। লোকটা একলা ছাউনীতে যাচ্ছেল। লোকটা খুব ধড়ীবাজ এবং বীরও বটে!"

"কি—গ্রে সাহেবকে গ্রেপ্তার করেছ?"

"সে সিংহবিক্রমে আমাদের আক্রমণ করেছিল—আমার দলের দুইজনকে মেরে ফেলেছে, আর আমাদের সর্দ্দারকে জখম করেছে।—তার পর, আপনার বারবাড়ীর খড়ের গাদায় এমন লুকিয়েছিল যে, হরদয়ালের সাহায্য না পেলে তা'কে বা'র করতে পারতেম না।"

"হরদয়াল!"

"আজ্ঞে হাঁ, সেই ঐ খড়ের গাদায় গ্রে সাহেবকে লুকিয়ে রেখেছিল, প্রথমে ত ভাইপোটী আমাকে একেবারে ভাগিয়ে দিয়েছিল—আমি আমাদের অধ্যক্ষকে বলে তা'কে আর তোমাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করব—তোমাদের সাহায্য না পেলে আমরা অকৃতকার্য্য হতেম, একথাও বলব।"

খুব বিরক্তভাবে মুখ কুঞ্চিত করিয়া আপন মনে মৃদুস্বরে সর্দ্দার গুরুদয়াল বলিল,—"অধঃপাতে যাক্—"

তারপর যখন সকলে গ্রে সাহেবকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন গ্রে সাহেব সর্দ্দার গুরুদয়ালকে দেখিয়া তাহার বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"বিশ্বাসহন্তার নিবাস"! মৃত্যুকে শিয়রে ডাকিয়া তবে এই মহা অপমানকর কথা গুরুদয়ালকে কেহ বলিতে পারিত! অন্য সময় হইলে তৎক্ষণাৎ অপমানকারী গ্রে সাহেবকে মৃত্যু বরণ করিতে হইত, কিন্তু এখন পুত্রের কৃত অপরাধে সে লজ্জায় ও ঘৃণায় ম্রিয়মাণ!

পিতাকে আসিতে দেখিয়া হরদয়াল বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং তৃষ্ণার্ত্ত গ্রে সাহেবের জন্য কতকটা দুগ্ধ আনিয়া তাহাকে খাইতে অনুরোধ করিল। "আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা' নরাধম''—এই বলিয়া গ্রে সাহেব বজ্রনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; এবং তাহার বন্দীকারী প্রতিদ্বন্দ্বী সৈনিকদের একজনকে মিনতি করিয়া বলিল,—"ভাই একটু জল দাও।" যে সৈনিকদের সহিত মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রদত্ত জল গ্রে সাহেব সানন্দে পান করিলেন! এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"পিছনের বাঁধনটা খুলে যদি সামনে বেঁধে দাও তা' হলে আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারব।" লালার হুকুমে তাঁহার অনুরোধমত কার্য্য করা হইল।

(৪)

ক্রোধোদ্দীপ্তবদনে গুরুদয়াল গৃহে প্রবেশ করিল; তাহার নয়ন দেখিয়া বালক প্রমাদ গণিল! তারপর ধীরে ধীরে বজ্রগম্ভীরস্বরে সর্দ্দার গুরুদয়াল পুত্রকে কহিল—"তুমি প্রথমটা বেশ আরম্ভ করেছিলে!" এই স্বর শুনিয়া বালকের হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল! খুব না রাগিলে গুরুদয়াল এরূপ স্বরে কথা কহিত না।

"বাবা আমায় ক্ষমা করুন'' এই বলিয়া বালক তাহার পায়ে হাত দিতে ছুটিল—

"দূর হয়ে যা"—বিরক্তিসহকারে গুরুদয়াল বলিল, "দূর হয়ে যা' নরাধম"।

বালক নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"তোর গলায় যে ঘড়ি রয়েছে কোথায় পেলি?''

"লালাজি দিয়েছেন।"

গুরুদয়াল ঘড়িটী ছিনাইয়া লইয়া নিকটস্থ প্রস্তরখণ্ডে নিক্ষেপ করিল। আঘাতে উহা শতভাগে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল!

"তুই বংশের মধ্যে প্রথম বিশ্বাসঘাতক!''

বালক দুঃখে লজ্জায় নতশির হইয়া রহিল।

তার পর সর্দ্দার গুরুদয়াল বন্দুকটী স্কন্ধে লইয়া বলিল—"আমার সঙ্গে আয়''—বালক পশ্চাদগামী হইল। সর্দ্দার পুত্রকে বাটী হইতে খানিক দূরে লইয়া গেল এবং কহিল—"ঐ পর্ব্বতগাত্রে দাঁড়া।"

বালক যোড়করে দাঁড়াইল।

"তোর ইষ্টনাম জপ কর্।"

"বাবা—বাবা—আমাকে মেরে ফেলবেন না!''

"যা বলি শোন"—দৃঢ়, গম্ভীর, কর্কশকণ্ঠে গুরুদয়াল বলিল—"যা বলি শোন"—তাহার কর্কশ স্বর পল্লীপ্রান্ত প্রতিধ্বনিত করিল!

বালক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"শিগ্‌গির নে—"

করুণ নয়নে কাঁদকাঁদ স্বরে বালক আবার ক্ষমা চাহিল।

"শেষ হয়েছে?"

"বাবা দয়া কর! রক্ষা কর—আমি লালাজীকে বলে পায়ে ধরে গ্রে সাহেবকে ছাড়িয়ে আন্‌ব—" এই বলিতে বলিতে হরদয়াল পিতার পদস্পর্শ করিতে ছুটিল! তাহাকে আর আসিতে হইল না, বন্দুকের শব্দে স্বর মিশাইয়া সর্দ্দার গুরুদয়াল কর্কশকণ্ঠে কহিল—"ঈশ্বর তোকে মার্জ্জনা করুন।"

*
* *

তার পর? তার পর সর্দ্দার গুরুদয়াল মৃত পুত্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া নিজের বাটী-অভিমুখে কয়পদ অগ্রসর হইল, আবার ফিরিয়া আসিয়া মৃত পুত্রকে বুকে লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল—"এখন তোকে ক্ষমা কর্‌লেম"।*

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

মধু-মাইকেল।

(মৃত্যুদিন উপলক্ষে)

উদিলে আদিত্যরূপে সাহিত্য-আকাশে,
আনন্দিত গৌড়জন নূতন আলোকে;
নিশাশেষে পূর্ব্বাশায় ভানুর আভাসে
পুলকিত হয় যথা জগতের লোকে।
বঙ্গভাষা পুণ্যখনি পূর্ণ মণি জালে,
মায়ের আদেশে তুমি করিয়া খনন,
বিবিধ-রতন-রাজি কুড়াইয়া কালে,
তা' সবে পূজিলে পুণ্য মায়ের চরণ।
'সেই শ্রেষ্ঠ নরকুলে লোকে যারে নাই
ভুলে'—দিব্যকণ্ঠে যেই গাহিয়াছ গান,
সার্থকতা তার তোমারি জীবনে পাই
যদিও ভিক্ষুক বেশে করেছ প্রয়াণ।
কৃতজ্ঞতা-পাশ বাঁধি বাঙ্গালীর গলে
বাঙ্গালা পঙ্কজ রবি গেলে অস্তাচলে।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

* বিখ্যাত ফরাসী গল্পলেখক Prosper Merimeeএর "Traitor" নামক গল্পটী পৃথিবীর মধ্যে 'সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর কাহিনী' বলিয়া খ্যাত, সেই গল্পের ভাবাবলম্বনে ইহা লিখিত।

রত্নাবলী ও বিষবৃক্ষ।

(৩)

বৎসরাজ ও নগেন্দ্রনাথ।

কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের ঐরূপ দুর্দ্দমনীয় প্রেম যে রূপজমোহের প্রাবল্যে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সূর্য্যমুখী নিরুদ্দেশ হইলে নগেন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের লিখিত পত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তরে জানিতে পারা যায়।

হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র,—

"* * * আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম? ভালবাসিতাম বৈ কি—তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোখের ভালবাসা, নহিলে আজি পনের দিবস-মাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, "আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম?" ভালবাসিতাম কেন? এখনও ভালবাসি—কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল?"

হরদেব ঘোষালের উত্তর,—

"আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিতে না, এমত নহে—এখনও ভালবাস; কিন্তু সে যে কেবল চোখের ভালবাসা, ইহা যথার্থ বলিয়াছ। সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার গাঢ় স্নেহ—কেবল দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় তাহা আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিয়াছ। * * * কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান্ হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দ্দমনীয় হয় যে, অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কি না—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকাল স্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়। তোমার তাহাই বিবেচনা হইয়াছিল—এই মোহের প্রথম বলে সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার যে স্থায়ী প্রেম, তাহা তোমার চক্ষে অদৃশ্য হইয়াছিল।"

বৎসরাজও এইরূপ রূপজ মোহের আকর্ষণেই সাগরিকার জন্য পাগল হইয়াছিলেন। যে দিন সাগরিকার প্রতি রাজার হৃদয় অপরিমিত প্রেমপূর্ণ,

ইহা স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ করিয়াও, তজ্জন্য রাজাকে কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া, বাসবদত্তা অন্তর্বাষ্পাকুল-নয়নে স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গেলেন, সে দিন বৎসরাজ অনুতপ্ত হৃদয়ে রাজ্ঞীর নীরব অভিমানের বিষময় ফল কল্পনা করিয়া উপহাসপ্রিয় বিদূষক বসন্তককে কহিয়াছিলেন,—

"ধিক্ মূর্খ, কেন এরূপ বিদ্রূপ করিতেছ? তোমার জন্যই আমাদিগের এই অনর্থপাত ঘটিয়াছে। যেহেতু—

বাসবদত্তার সহিত প্রীতি, অনেক দিনের অপরিমিত প্রণয়ের ফলে সঞ্চারিত হইয়াছে। আজ মৎকৃত এই অকৃতপূর্ব্ব অপরাধ দেখিয়া অসহিষ্ণু প্রিয়া আমার নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। কেন না, প্রকৃষ্ট প্রেমের স্খলন নিতান্তই অসহনীয়।"

রাজা বাসবদত্তার নিকটে গুরুতর অপরাধ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যথার্থ প্রেমের স্খলন, বড়ই অসহনীয়। তা'ই তিনি রাজ্ঞীর বিষয় চিন্তা করিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দ্দম রূপজ মোহের ঘন স্পর্শে আবার সম্মুখে সাগরিকাকে দেখিয়াই বাসবদত্তার প্রতি রাজার স্থায়ী প্রেম অন্তর্হিত হইল। উদ্বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সাগরিকাকে যখন রাজা হৃদয়ের আবেগ-ভরে আলিঙ্গন করিলেন, তখন সাগরিকার মুখে—

"প্রিয়তম, আর এ মুখের ভালবাসা কেন? তোমার প্রাণাধিকা বাসবদত্তার কাছে আবার কেন নিজেকে অপরাধী করিতেছ?"

এইরূপ মর্ম্মভেদী কথা শুনিয়া রাজার রূপজ-মোহ-সম্ভূত অনির্ব্বচনীয় চিত্তবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। তা'ই তিনি অসঙ্কোচে—অনায়াসে কহিয়া ফেলিলেন,—

"অয়ি মিথ্যাবাদিনী ধ্বসি। কুতঃ
খাসোৎকম্পিনি কম্পিতং কুচযুগে মৌনে প্রিয়ং ভাষিতং
বক্ত্রে ইস্যাঃ কুটিলীকৃতভ্রূণি তথা যাতং ময়া পাদয়োঃ।
ইত্থং নঃ সহজাভিজাত্যজনিতা সেবৈব দেব্যাঃ পরং
প্রেমাবন্ধবিবর্দ্ধিতাধিকরসা প্রীতিস্তু যা সা ত্বয়ি॥"

নগেন্দ্রও রূপজমোহের অপ্রতিহত প্রাথমিক আঘাতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি অতি নির্লজ্জের ন্যায়—পাগলের ন্যায় নিজ ধর্ম্মপত্নীর নিকটে স্পষ্ট বলিলেন,—

"* * * বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ

নাই, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি তোমার কাছে থাকিয়া তোমার ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া দেশদেশান্তরে ফিরিব। * * *"

সূর্য্যমুখীর অভাবে রূপজ মোহের আবরণ অপসৃত হইলে নগেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সূর্য্যমুখীকে কত ভালবাসিতেন। তাই নগেন্দ্র যে দিন মধুপুর হইতে শুনিয়া আসিলেন, সূর্য্যমুখী গৃহদাহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে দিন নিজেকে সূর্য্যমুখীর মৃত্যুর হেতু মনে করিয়া ভাবিয়াছিলেন,—

"* * * সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার—সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী *। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরকালের পুণ্য। আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

উচ্চ প্রেমিকের নয়নে জগতের সকল বস্তুই এইরূপ প্রণয়িনীময়। যথার্থ প্রেমিক গাহে,—

"যে দিকে ফিরাই আঁখি, শুধু সেই ছায়া দেখি"।

---

* বাল্মীকি-রামায়ণে আমরা এই ভাবের একটি কবিতা দেখিতে পাই। কৈকেয়ী রামের বনবাস প্রার্থনা করিলে রাজা দশরথ প্রিয় পুত্রা কৌশল্যার সম্বন্ধে কহিয়াছিলেন,—

"যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীব চ সখীব চ।
ভার্য্যাবদ্ ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি ॥৬৮-৬৯॥"

অযোধ্যাকাণ্ড, ১২শ সর্গ।

এই শ্লোকের "রামায়ণতিলক" নামক প্রাচীন টীকা এইরূপ :—

"যদা যদা চ যতো যতস্তেত্যর্থঃ। দাসীবদ্ রতিব্যবহারে সখীবদ্ রহস্তকথনে ভার্য্যাবদ্ধর্ম্মাচরণে ভগিনীবদ্ধিতাশংসনে মাতৃবদ্ ভোজনদানে উপতিষ্ঠতি সেবতে। কেচিত্তু, দাসীবদ্ গৃহকার্য্যকরণে সখীবৎ ক্রীড়ায়াং ভার্য্যাবদ্ভুক্ত এব ভগিনীবৎ জ্ঞানযোগানুষ্ঠানে মাতৃবৎ তত্ত্বকথনে ইত্যাহুঃ।"

"রঘুবংশে"র অষ্টম সর্গেও এই মর্ম্মের একটি কবিতা দৃষ্ট হয়,—

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥"

সুসঙ্গতা ও কমলমণি।

বৎসরাজের সংসারে একমাত্র সুসঙ্গতাই সাগরিকার দুর্দ্দমনীয় হৃদয়-বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া তাহার দুঃখে দুঃখিনী হইয়াছিল। নদীর কূলপ্লাবী তরঙ্গাঘাতের ন্যায় উচ্ছলিত প্রেমের আবেগময় স্পর্শে সাগরিকার অন্তস্তল আকুল হইয়া উঠিলে সুসঙ্গতাই সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর ভাষায় কহিয়াছিল,—

"প্রিয়সখি সাগরিকে, উতলা হইও না, শান্ত হও।"

নগেন্দ্রনাথের পরিজনগণের মধ্যেও একমাত্র কমলমণিই কুন্দের অন্তঃকরণের অনন্ত যন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া—ভালবাসার প্রাণস্পর্শী ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া একদিন তাহার দুঃখে কাঁদিয়াছিল।

কমল একদিন সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর মস্তক বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস্—না?"

"কুন্দ উত্তর দিল না, কমলমণির, হৃদয় মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।"

"* * * কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দ-নন্দিনী অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিক্যার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল।"

"ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষুঃ মুছাইয়া কহিল, "কুন্দ!"

বর্ণনা।

"বিষবৃক্ষে" সূর্য্যমুখীর সৌন্দর্য্য এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

"কুন্দ দেখিল যে, সূর্য্যমুখী আকাশ-পটে দৃষ্টা নারীর ন্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা। তাঁহার চক্ষুঃ সুন্দর বটে, কিন্তু কুন্দ যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এ সে চক্ষু নহে। সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিম-পল্লব রেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণতারা-সনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎ স্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্য্যমুখীর অবয়বও সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা খর্ব্বাকৃতি, সূর্য্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিত লতার ন্যায় সৌন্দর্য্যভরে দুলিতেছে।"

"রত্নাবলী"র রাজা বাসবদত্তাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

"প্রত্যগ্রমজ্জনবিশেষবিবিক্তকান্তিঃ
কৌসুম্ভরাগরুচিরস্ফুরদংশুকান্তা।
বিভ্রাজসে মকরকেতনমর্চ্চয়ন্তী
বালপ্রবালবিটপিপ্রভবা লতেব॥"

সূর্য্যমুখী ও বাসবদত্তা দুইজনেই কমনীয় লতার সহিত উপমিতা হইয়াছেন।

"বিষবৃক্ষে"র নগেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ্ হরদেব ঘোষালকে পত্র লিখিবার সময় কুন্দনন্দিনীর বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

"— এই কুন্দের সরলতা চমৎকার, সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তায় বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে; আবার বারণ করিলেও ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। কমল তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখা-পড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোনও কথাই বুঝে না। বলিলে, বৃহৎ, নীল, দুইটী চক্ষু—চক্ষু দুইটী শরতের পদ্মের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটী চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছু বলে না —আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই; আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার মতি-স্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছকয় চুল পাকাইয়া ব্যস্ত করিবার পরওয়ানা হাসিল করিয়াছ; কিন্তু যদি তোমাকে সেই দুইটী চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতিস্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটী যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার একরকম দেখিলাম না, আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোক নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়; অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই।"

"রত্নাবলী"র নায়ক বৎসরাজ সাগরিকার চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কৃচ্ছ্রাদূরুযুগং ব্যতীত্য সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে
মধ্যেঽস্যাস্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিস্পন্দতামাগতা।
মদ্দৃষ্টিস্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌ স্তনৌ
সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে॥"

শেষে সুসঙ্গতা সাগরিকাকে রাজ-সকাশে লইয়া আসিলে তাহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন,—

"এরূপ কন্যারত্ন মনুষ্যলোকে দেখা যায় না।"

রাজা বলিলেন,—"বয়স্য, আমারও তাহাই মনে হইতেছে।"

কুন্দ ও সাগরিকা দুইজনের চক্ষুই স্বচ্ছ জলে ভাসমান বলিয়া নায়কের মুখে বর্ণিত হইয়াছে।

নগেন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"যেন এ পৃথিবীর সে চোক নয়। * * * এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই।"

বৎসরাজও বয়স্য বসন্তকের মুখে—"মনুষ্যলোকে এরূপ কন্যারত্ন দেখা যায় না" ইহা শুনিয়া বলিলেন, "বয়স্য, আমারও তাহাই মনে হইতেছে।"

কুন্দ ও সাগরিকা উভয়েই নায়কের চক্ষে পৃথিবীর অপূর্ব্ব সম্পদ্।

সাগরিকা বৎসরাজকে দেখিয়া মনে মনে বলিয়াছিল,—

"ইহাঁকে দেখিয়া কি জানি কেন এক পা'ও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না; তা' হ'লে এখন করিই বা কি!"

নগেন্দ্রনাথকে প্রথমে দেখিয়া কুন্দ কি করিয়াছিল?—"আসিতে আসিতে দূর হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার পর আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিমূঢ়ের ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।" *

উভয়েই নায়ককে দেখিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথের এক পুষ্পোদ্যান ছিল। গ্রন্থকার এই ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"উদ্যানটী ঘন বৃক্ষলতাগুল্মরাজিপরিবৃত। বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে প্রস্তর-রচিত সুন্দর পথ; স্থানে স্থানে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতবর্ণ বহু কুসুম রাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। তদুপরি প্রভাতমধুলুব্ধ মক্ষিকা সকল দলে দলে ভ্রমিতেছে, বসিতেছে,উড়িতেছে, গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে এবং মনুষ্যের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে পালে ঝুঁকিতেছে। বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষ-ফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরস পান করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বর সম্মিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাতবায়ুর মন্দ-হিল্লোলে পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখা সকল দুলিতেছে না, কেন না, তাহারা নম্র নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কাল বর্ণ লুকাইয়া গলাবাজিতে সকলকে জিতিতেছেন।

"উদ্যান-মধ্যস্থলে একটি শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত লতামণ্ডপ, তাহা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ লতা, পুষ্প ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ধারে মৃত্তিকা-ধারে রোপিত সপুষ্প গুল্মসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।"

বৎসরাজের মকরন্দোদ্যানের বর্ণনা বসন্তক এই ভাবে করিয়াছেন ;—

"ভো মহারাজ, প্রেক্ষস্ব প্রেক্ষস্ব। এতত্তুমলয়মারুতান্দোলিত মুকুলায়মান-সহকারমঞ্জরীরেণুপটলপ্রতিরদ্ধপটবিতানং মত্তমধুকরনিকরমুক্তঝঙ্কারমিলিতমধুকর কোকিলালাপসঙ্গীতসুখাবহং ত্বাগমনদর্শিতাদরমিব মকরন্দোদ্যানং লক্ষ্যতে।"

ভোঃ, এতৎ খলু নিপতন্মত্তমধুকরবকুলকুসুমামোদবাসিতদিঙ্মুখং মসৃণ-মরকতমণিশিলাকুট্টিম সুখায়মান চরণসঞ্চারসূচিতং তমেব মাধবী লতামণ্ডপং সম্প্রাপ্তৌ স্বঃ॥" *

বকুল প্রভৃতি বৃক্ষরাজিপরিবৃত দুইজনেরই উদ্যান, ভ্রমরের মৃদু মধুর গুঞ্জন ও কোকিলের শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতালাপে মুখরিত। উদ্যান-মধ্যস্থলে দুইজনেরই মহামূল্য প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর লতামণ্ডপ বিরাজমান।

নগেন্দ্রনাথের "পুষ্পোদ্যান-পরে নীল মেঘতুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা।" (৭ম পরিচ্ছেদ)

বৎসরাজেরও পুষ্পোদ্যান-সমীপে বিস্তৃত দীর্ঘিকা ছিল।

চিত্রাঙ্কনের দিন সাগরিকা, প্রিয়সখী সুসঙ্গতার কাছে হৃদয়ের অসহনীয় সন্তাপ জানাইল। সুসঙ্গতা সখীকে শান্ত করিবার জন্য কহিল,—

"সখি, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। আমি এই দীর্ঘিকা হইতে পদ্মপত্র ও মৃণাল লইয়া শীঘ্রই আসিতেছি।"

এই বলিয়া পদ্মপত্র ও মৃণাল আনিয়া সুসঙ্গতা সাগরিকার হৃদয়ে অর্পণ করিল।

নগেন্দ্রের "বাটীর বাহিরে আস্তাবল, হাতীশালা, কুকুরের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি ছিল।" (৭ম পরিচ্ছেদ)

"রত্নাবলী"তে বর্ণিত হইয়াছে যে, অশ্বশালা হইতে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া একটা দুষ্ট বানর, বৎসরাজের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিল †।

* এখানে প্রাকৃতের সংস্কৃতানুবাদ প্রদত্ত হইল।

† "কণ্ঠে কৃত্বাবশেষং কনকময়মধঃ শৃঙ্খলাদাম কর্ষন্
ক্রান্ত্বা দ্বারাণি হেলাচলচরণরণৎকিঙ্কিণী চক্রবালঃ।
দত্তাতঙ্কোঽঙ্গনানামনুসৃতসরণিঃ সম্ভ্রমাদশ্বপালৈঃ
প্রভ্রষ্টোঽয়ং প্লবঙ্গঃ প্রবিশতি নৃপতের্মন্দিরং মন্দুরায়াঃ।"

বৎসরাজের পশুশালায় যে নানাবিধ পশু বর্ত্তমান ছিল, এইরূপ বর্ণনায় ছলতঃ তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

সুতরাং "রত্নাবলী" ও "বিষবৃক্ষে"র বর্ণনীয় বিষয়ও অনেকাংশেই প্রায় তুল্য।

উপসংহার।

"রত্নাবলী" নাটিকা ও "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের সর্ব্বাংশের তুলনায় সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে; উভয় গ্রন্থের কোন্ কোন্ চরিত্রে, কোন্ কোন্ অংশে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যথাশক্তি তাহা দেখানই ইহার উদ্দেশ্য।

সে কালের কাব্য নাটক প্রাচ্যভাবে অনুপ্রাণিত বলিয়া "রত্নাবলী" নাটিকায় পুরাতন যুগের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। আর আধুনিক সময়ের সাহিত্যাকাশ প্রতীচ্যালোকে উদ্ভাসিত, তাই "বিষবৃক্ষে"র সহিত "রত্নাবলী"র ভাবের এবং রচনা-প্রণালীর কিছু কিছু বৈষম্য দেখা যায়। সে কালে ভাব প্রকাশই ছিল কাব্যের সৌন্দর্য্য, আর একালে ভাব যত অন্তর্নিহিত থাকে, ততই কাব্যের উৎকর্ষ স্বীকৃত হয়। এই জন্যই উভয়ে তুল্যাবস্থ হইলেও "বিষবৃক্ষে"র নগেন্দ্র কুন্দকে বলিলেন,—

"তবে না কেন? বল বল—বল, আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না?"

আর বৎসরাজ সাগরিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন,—

প্রিয়ে সাগরিকে!

রভসাশ্লিষ্টমালিঙ্গ্য মা
মঙ্গানি স্মরনঙ্গতাপবিধুরাণ্যেহ্যেহি নির্ব্বাপয়।"

সার ওয়াল্টার স্কটের প্রণীত "আইভান্‌হো" নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের অনুকরণে বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী" রচিত হইয়াছে, এইরূপ একটা কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, বঙ্কিম বাবু "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিবার পূর্ব্বে "আইভান্‌হো" পড়েন নাই, ইহা তিনি নিজ মুখেই অনেক স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। যাউক, সে সম্বন্ধে সত্যাসত্য নিরূপণের প্রয়াস এ প্রবন্ধে অনাবশ্যক।

"বিষবৃক্ষে"র রচনা-সময়ে যে বঙ্কিমবাবুর "রত্নাবলী" পড়া ছিল, অথবা তাহার উপাখ্যানাংশ জানা ছিল, ইহা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে। কেন না, তিনি "বিষবৃক্ষে"র চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন,—

"কয়খানি চিত্র কক্ষ প্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতী নহে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। * * * আর একখানি চিত্রে সাগরিকাবেশে রত্নাবলী, পরিষ্কার নক্ষত্রালোকে বালতমালতলে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন। তমালশাখা হইতে একটী উজ্জ্বল পুষ্পময় লতা বিলম্বিত হইয়াছে, রত্নাবলী এক হস্তে লতার অগ্রভাগ লইয়া গলদেশে পরাইতেছেন, আর এক হস্তে চক্ষের জল মুছিতেছেন, লতাপুষ্প সকল তাঁহার কেশদামের উপর অপূর্ব্ব শোভা করিয়া রহিয়াছে।"

কোনও অঙ্কিত চিত্র অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমবাবু গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এ কথা বলা যায় না। পরমপূজনীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, সে কালে পৌরাণিক বা কাব্য নাটকের চিত্র-অঙ্কন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। নানাবিধ বিলাতী চিত্রেই প্রায়শঃ ধনীদিগের কক্ষপ্রাচীর সুশোভিত থাকিত। বঙ্কিমবাবুর "বিষবৃক্ষে" এইরূপ চিত্রবর্ণনের পর হইতেই শিবদুর্গা, রামসীতা, অর্জ্জুন সুভদ্রা, দুষ্মন্ত শকুন্তলা, অভিমন্যু উত্তরা প্রভৃতি দেশীয় চিত্রাঙ্কনের বহুল প্রচলন হইয়াছে।

"রত্নাবলী" পড়া ছিল বলিয়াই যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহারই সম্পূর্ণ অনুকরণে "বিষবৃক্ষ" প্রণয়ন করিয়াছেন, এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যেহেতু, প্রাচীন গ্রন্থবিশেষ পড়া থাকিলেও নবীন গ্রন্থকারের অজ্ঞাতসারে তাঁহার রচনায়, পূর্ব্বতন গ্রন্থের ছায়াপাত হইতে পারে।

অথবা আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র যদি আমাদের দেশীয় একখানি সংস্কৃত নাটিকা হইতে সার সঙ্কলন পূর্ব্বক "বিষবৃক্ষে"র ন্যায় মনোমদ কবিত্বপূর্ণ উপন্যাস রচনা করিয়া বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহার অপ্রশংসার কথা নহে, পক্ষান্তরে সংস্কৃত সাহিত্যানুরক্তিরই পরিচয়।

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

বারাণসী।

ভ্রম-সংশোধন।—২৫১ পৃষ্ঠার ১৩ পংক্তির পরে "যেদিন পুরাঙ্গনা অন্তঃপুরে পৌরস্ত্রী-বর্গের মধ্যে হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া উপস্থিত হয়, সেদিনকার সে স্থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—"সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিলেন না।" এই অংশটুকু সংযোজিত হইবে। ২৫৮ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তিতে "কুন্দকে" স্থানে "পত্নীকে" হইবে। ২৭০ পৃষ্ঠার পাদটীকা ২৮৯ পৃষ্ঠায় বসিবে। ২৬৩ পৃষ্ঠার ১৯ পংক্তিতে "সাধনা" স্থলে "সাধ না" হইবে।

অবহেলা।

(১)

বাল্যসখী সুকেশিনী নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া প্রফুল্লমনে ঈষদ্-গর্ব্বমিশ্রিত মৃদুহাস্যে যখন মৃণালিনীদের বাটী আসিয়া বলিল "সই! আমরা মরাজল দেখ্‌তে যাচ্ছি, তুইও যাবি?" তখন প্রশান্তবদন মৃণালিনীর হৃদয় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণে সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার পুরাতন টিনের বাক্সটীর মধ্যে এমন একখানি বস্ত্র নাই কিম্বা এমন একখানি অলঙ্কারও অবশিষ্ট নাই যদ্দ্বারা সে কোন মতে আজ তাহার বাল্যসখীর সঙ্গিনী হইতে পারে। যাহা হউক পলকে সে ভাবনা দূর করিয়া সহাস্য বদনে বাল্যসখীকে যথারীতি আদর আপ্যায়িত করিয়া এবং স্বামীর অসুস্থতার অজুহাতে সুকেশিনীকে বিদায় দান করিল। গৃহমধ্যস্থ স্বামী প্রিয়গোপালের ব্যাপারটী আদ্যোপান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব হয় নাই। তারপর পত্নী মৃণালিনী যখন গৌরবর্ণ সুকোমল হস্তে নিবিষ্ট মনে কলতলায় একখানি সুদগ্ধ কটাহ পরিষ্কার করণে নিযুক্তা হইল তখন প্রিয়গোপাল জীর্ণ তক্তপোষে মলিন শয্যার উপর শুইয়া ভগ্নকবাট জানালার ভিতর দিয়া এক মনে তাহাকে দেখিতে লাগিল। প্রিয়গোপালের মনের ভিতর একটা তুমুল ঝড় উঠিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল। সে অশান্ত মনে দারিদ্র্যের রূপ ও অনুভূতি অনুধাবন করিতেছিল। প্রিয়গোপাল ভাবিতেছিল "হে দারিদ্র্য! তোমার কি অপার মহিমা! তুমি আশ্রয় করিলে কিশোরীকে বাল্যসঙ্গিনীর সহিত আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিতে বিরত হইতে হয়। নির্জ্জন মধ্যাহ্নে সোণার প্রতিমাকে হাতে কালি মাখিয়া কটাহ মার্জ্জনে নিযুক্তা হইতে হয়, আর তাহার অসমর্থ পতিটীকে বসিয়া বসিয়া তোমার অপরূপ রূপ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করিয়া হতভম্ব হইতে হয়। এইরূপ নানা ভাবনার পর প্রিয়গোপাল স্থির সিদ্ধান্ত করিল যেমন করিয়াই হউক এই দারিদ্র্য-দেবীর প্রতিষ্ঠান-ভূমি তাহার গৃহ হইতে উদবাস্ত করিতেই হইবে। হায়! পণ করা মানুষের পক্ষে যত সহজ, কার্য্য করা যদি তদ্রূপ হইত! কিরূপে যে সে এই প্রতিজ্ঞাটী পূর্ণ করিতে পারে তাহা প্রিয়গোপালের মস্তিষ্কে আদৌ ছিল না। অবশেষে

সে ব্যাকুল অন্তঃকরণে উত্তরীয়খানি স্কন্ধে ফেলিয়া দুর্গানাম স্মরণপূর্ব্বক বাটী হইতে বাহির হইল।

(২)

অবসন্ন হৃদয় প্রিয়গোপাল অনেকক্ষণ এ রাস্তা ও রাস্তা করিয়া অবশেষে বাটী ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় বন্ধু ব্রজনাথের সহিত দেখা হইল। ব্রজনাথ জিজ্ঞাসা করিল "কিহে প্রিয়গোপাল তোমাকে যে আর চিনিতেই পারা যায় না, তুমি এরূপ হইয়াছ কেন?" অতি কষ্টে হাসিয়া প্রিয়গোপাল উত্তর করিল "আর ভাই সামান্য একটী 'টিউসনি' করিয়া কোন মতে দিন যাত্রা নির্ব্বাহ করি, আর বাকি সময় বেকার বসিয়া নানারূপ চিন্তায় এরূপ হইয়া পড়িতেছি। "তুমি এত ব্যস্ত হইয়া কোথায় যাইতেছ?" "জাননা আজ যে Viceroy's Cup! আমার ভাই দেরী হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা কইতে পারলুম না কিছু মনে করো না। ভাল কথা মনে হল, তোমার তো এখন কোন কাজ নেই, আমার সঙ্গে যেতে পারবে? হয়তো তোমাকে বেকার না হয়ে থাকবার একটা উপায় দেখাতে পারবো।" ব্যগ্রভাবে প্রিয়গোপাল কহিল, "আমার আর কার্জ কি ব্রজ? চল তোমার সঙ্গে যাই, আর যদি বেকার হয়ে না বসে থাকতে হয় এরূপ একটা উপায় দেখিয়ে দিতে পার তা' হ'লে আর তোমাকে কি বলবো ভাই তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করবে।" রাস্তায় যাইতে যাইতে ব্রজনাথ প্রিয়গোপালকে Race এর বিষয় মহা আগ্রহসহকারে বর্ণনা করিতে লাগিল। এ বিষয় সম্যক অনভিজ্ঞ প্রিয়গোপাল তেমন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না তত্রাচ বন্ধুর আগ্রহ দেখিয়া 'বটে' 'হাঁ' প্রভৃতি কথায় মাত্রা দিতে দিতে Race Course এর নিকট উপস্থিত হইল। ব্রজনাথ প্রিয়গোপালের হইয়া ২।১ বার বাজী খেলিল। ভাগ্যক্রমে প্রথম দিনেই প্রিয়গোপাল বন্ধুর অনুগ্রহে খেলায় কিছু লাভ করিল!

(৩)

এরূপ ভাবে টাকাগুলি লাভ করিয়া প্রিয়গোপালের মনের খানিকটা অংশ ব্যথিত হইলেও আনন্দের ভাগটী বেশী হইয়া তাহা চাপা দিয়াছিল। প্রিয়গোপাল বন্ধুকে বারবার ধন্যবাদ দিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল। ব্রজনাথ তাহাকে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে প্রতিশ্রুত হইল এবং বলিয়া দিল যদিও ভাগ্য তাহার প্রতি ২।১ বার অপ্রসন্ন হয় তবে যেন সে নিরুৎসাহ না হইয়া পড়ে। স্বীয় উদাহরণ প্রকটিত করিয়া সে তাঁহাকে

নীতিমত বুঝাইয়া দিল যে পরিণামে শুভ অবশ্যম্ভাবী। গৃহে ফিরিবার পথে প্রিয়গোপাল মৃণালিনীর জন্য একখানি বস্ত্র খরিদ করিয়া লইল। সে ভাবিতে লাগিল যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, যদি কোন মতে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারি তবে এবার মৃণালিনীর কষ্ট দূর করিব। না জানি সে আমার এই উপার্জ্জনের বিষয় অবগত হইলে কত আনন্দিতা হইবে। মনের এক অংশ হইতে কে যেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা এরূপ ভাবে উপার্জ্জনের চেষ্টা করা কি অন্যায় হইতেছে?" পরক্ষণে প্রিয়গোপাল ভাবিল "কেন, অন্যায় কিসে? ইহা তো চুরি করা নহে, মাত্র অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করা, তবে কেন দুশ্চিন্তা করিয়া মনে অশান্তি আনয়ন করি। ছিঃ, এ দুর্ব্বলতা মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে।" এইরূপ ভাবে নানা বিষয় তোলাপাড়া করিতে করিতে প্রিয়গোপাল অবশেষে গৃহে উপস্থিত হইল। প্রত্যহই প্রিয়গোপাল নানারূপ চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া বিষাদ অবনত মলিন ও শুষ্কমুখে বাটী ফিরিত ও মৃণালিনী তাহার মুখপানে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিত। আজ প্রিয়গোপালের 'হাসিমুখ' দেখিয়া মৃণালিনীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল "হে ঠাকুর, আজ যেন একটী সুখবর শুনিতে পাই।" স্বামী উপার্জ্জনের একটী উপায় করিতে সমর্থ হইয়াছে জানিয়া মৃণালিনী আনন্দে অধীরা হইয়া উঠিল। তাহার পর যখন প্রিয়গোপাল তাহার প্রথম উপার্জ্জনের অর্থ হইতে ক্রীত বস্ত্রখানি মৃণালিনীকে দিল তখন তাহার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন দুটী আনন্দ-সলিলে ছল ছল করিয়া উঠিল। প্রথমেই যে তাহার কথা মনে করিয়াছেন এই আত্মপ্রসাদ মৃণালিনীর হৃদয়তট হইতে সবেগে উছলিয়া উঠিতেছিল, আর সে যতই এ কথা ভাবিতেছিল ততই তৃপ্তি-সাগরে নিমজ্জিতা হইতেছিল।

(৪)

প্রিয়গোপাল একবার ভাবিয়াছিল টাকাগুলি মৃণালিনীকে দিই কিন্তু পরক্ষণেই সেই টাকা হইতেই পরদিন পুনরায় উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে এই কথা মনে হইল। সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামী ও স্ত্রীতে নানারূপ সুখ ও আনন্দের কল্পনা করিতে করিতে জাগিয়াছিল। তারপর প্রভাতে যখন প্রিয়গোপালের নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন প্রথমেই "আজ খেলায় কি হইবে" এই চিন্তা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। বেলা যত বেশী হইতে লাগিল চিন্তা ও অশান্তি তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। অন্যান্য দিনের ন্যায় মৃণালি-

নীর সহিত মনের সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিতেছিল না। মৃণালিনী যে ইহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই তাহা নহে। এজন্য তাহার মনের অন্তরতম অভ্যন্তরে স্বাচ্ছন্দ্যের একটু অভাব বোধ করিলেও সে তাহা মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিল। মৃণালিনী ভাবিল উনি নূতন কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন, এ সময়ে ঐ চিন্তাতেই তাঁহাকে অন্যমনা রাখিয়াছে। সে একটা নব উৎসাহ আনিয়া গৃহাদি পরিষ্কার ছিন্ন শয্যা প্রভৃতির সংস্কার-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। অন্যান্য দিন প্রিয়-গোপাল জাগ্রত হইয়া মৃণালিনীর সহিত পরামর্শ করিত, পয়সা হইলে তাহাকে কিরূপভাবে সাজাইতে হইবে আর মৃণালিনী অলঙ্কার সাজসজ্জা প্রভৃতি হউক বা না হউক সে বিষয়ে ততটা মাথা না ঘামাইয়া স্বামীর এই আবেগপূর্ণ সস্নেহ বচনে ত্রিদিবের সুখ উপভোগ করিতে করিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিত। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রিয়গোপাল বলিত—"মিনু, কবে আমার এমন সময় হইবে যখন তোমাকে এত প্রত্যূষে উঠিয়া দাসীবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিব। তাহার এই সব কথা শুনিতে শুনিতে আনন্দ উদ্বেলিত হৃদয়ে মৃণালিনী মৃদুহাস্য করিয়া গৃহকার্য্যে চলিয়া যাইত। আজ প্রিয়গোপাল তাহাকে এ সব কোন কথাই বলিতে পারিল না কেবল Race Course,খেলা ও টাকা প্রভৃতি তাহার মস্তিষ্ক তোলপাড় করিতে লাগিল।

(৫)

ইহার পর প্রত্যহই প্রিয়গোপাল উদ্বিগ্ন মনে Race দেখিতে যাইত। কোন দিন কিছু হারিয়া আসিত আবার কোন দিন বা কিছু লাভ করিয়া গৃহে ফিরিত। বস্তুতঃ খেলার ভাবনা তাহার মনের একমাত্র আশ্রয় হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুইটা সাংসারিক কথা ভিন্ন আর সমস্তই খেলার কথা কহিত। মৃণালিনী তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিলেও কোন গতিকে "হুঁ" "হাঁ" দিয়া যাইত এবং এ বিষয়টী বুঝিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত বটে কিন্তু সে তাহার চিরভ্যস্ত আদরগুলি না পাইয়া হাঁপাইয়া উঠিত। সে স্বামীর নিকট পূর্ব্বের মতন স্নেহের কথাগুলি পাইবার জন্য নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিত। দমন করিবার প্রয়াস সে আকাঙ্ক্ষা যেন দ্বিগুণ করিয়া মৃণালিনীর সমস্ত দেহ আলোড়িত করিয়া দিত। সে বার বার নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিত "উনি এখন নানারূপ চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন উঁহাকে আমার কথা মনে পড়াইবার জন্য এত অন্যায় আকাঙ্ক্ষা হইতেছে কেন! ছিঃ ছিঃ আমি বড় হীনা। উঁহার

চরণের রেণুকণা আমি ! দেবোপম হৃদয়ে অনুগ্রহ করিয়া আমার কথাই এতদিন ভাবিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই কি তাহা আমার চিরদিনের প্রাপ্য বলিয়াই ঠিক করিতে হইবে। আমার এ দুঃসাহস কেন ?" কিন্তু এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই তাহার নয়নে অশ্রুরাশি উছলিয়া উঠিত। দিনে দিনে মৃণালিনীর সদাপ্রফুল্ল আনন বিষাদ মলিন হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রিয়গোপালের মানস-পটে মৃণালিনীর স্মৃতি অপসারিত হইয়া কেবল একমাত্র খেলার উন্মাদনা একাধিপত্য করিতে লাগিল আর তাহাদের দরিদ্র সংসারের শান্তি যেন ঐশ্বর্য্য-দেবীর এরূপ আরাধনায় ভীতা হইয়া পলায়নতৎপরা হইল।

(৬)

সে বৎসর কলিকাতাতে প্লেগের প্রকোপ খুব হইয়াছিল। মৃত্যু সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছিল। মৃণালিনীর শরীর সকাল হইতে একটু অসুস্থ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু যতক্ষণ চাপিতে পারা যায় তাহার পূর্ব্বে অসুস্থতার কথা স্বামীর গোচর করা তাহার স্বভাব ছিল না। প্রিয়গোপাল পূর্ব্বদিন খেলাতে অনেক টাকা জিতিয়া আসিয়াছিল এবং পরদিন কিরূপ ভাবে টাকা লাগাইতে হইবে এ সব বিষয় বন্ধুবর ব্রজনাথের সহিত পরামর্শ করিতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহির বাটীতে কাটাইয়াছিল। মৃণালিনীর অসুস্থতা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, অবশেষে সে শয্যাগ্রহণ করিল। প্রিয়গোপাল খুব প্রত্যুষেই উঠিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। বাটী ফিরিয়া দেখিল Race courseএ যাইবার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে, সে ব্যস্তভাবে কাপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে যাইয়া দেখিল তাহার আহার্য্যাদি ঢাকা রহিয়াছে। দাসী বলিল "মা ঠাকুরাণীর জ্বর হইয়াছে তিনি ঘরে শুইয়াছেন। প্রিয়গোপাল চিন্তিত হইয়া ভাবিল, দিন বড়ই খারাপ হইয়াছে, জ্বর বলিয়া দেরি করিলে চলিবে না, এখনই ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু আহার করিতে খেলার চিন্তা তাহাকে এত বিভোর করিয়া তুলিল যে সে মৃণালিনীকে একবার দেখিয়া যাইবার কথা পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া গেল। মৃণালিনীর জ্বর খুব বেশী হইলেও তখনও জ্ঞান ছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে সে স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল। জ্বরের যাতনায় তাহার সমস্ত শরীর আলোড়িত হইলেও তাহার মন আদৌ সেদিকে ছিল না, সমগ্র মন তাহার স্বামীর উদ্দেশে ছুটিয়াছিল, তাহার দুইটী কথা শুনিবার জন্য আকুল হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল তাহার স্বামীর হস্ত কি শীতল। তিনি একবার আদর করিয়া তাহার শরীরে হস্ত বুলাইলে বুঝি সব যাতনার অবসান হইবে। তাহার

পর যখন দাসীর মুখে শুনিল তিনি আহারাদি করিয়া কার্য্যে বাহির হইয়া গিয়াছেন তখন তাহার হৃদয়ে প্রচণ্ড নিরাশার আঘাত লাগিল। জ্বরের প্রকোপ যেন দ্বিগুণ হইয়া তাহাকে অজ্ঞান-অভিভূতা করিয়া দিল।

(৭)

সেদিন ব্রজনাথ ও প্রিয়গোপাল 'মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার' পণ করিয়া খেলিতে গিয়াছিল। দশ বিশ টাকার খেলা ধরিয়া দশ বিশ টাকা জিতিয়া আসায় আর তাহাদের পরিতৃপ্তি হইতেছিল না। আজ তাহারা মতলব আঁটিয়া গিয়াছিল যে হয় আমীর নয় ফকির হইয়া গৃহে ফিরিবে। বিশ্বের আর কোন কথাই তাহাদের মনে ছিল না, কেবল খেলার কথাই তাহাদের মনে জাগিতেছিল। ভাগ্যলক্ষ্মীও আজ তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্না। তাহারা যে বাজী ধরিতেছিল তাহাতেই জিত। সমস্ত দিন কুহকবলে অবিশ্রান্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া যখন খেলা শেষ হইল তখন তাহাদের উদ্দাম উত্তেজনার স্রোতে যেন বিরাম পড়িল। মহা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহারা গৃহাভিমুখে ফিরিল। যতক্ষণ পথে ব্রজনাথ নিকটে ছিল ততক্ষণ প্রিয়গোপাল আবার পরদিনের খেলার খসড়া আঁটিতেই তন্ময় ছিল। তাহার পর বাটীর নিকট যখন সে ট্রাম হইতে অবতীর্ণ হইল তখন প্রিয়গোপাল দেখিল জনকয়েক ব্যক্তি একটী মৃতদেহ "বল হরি হরি বোল" রবে সন্ধ্যার স্তব্ধতা ভীতিব্যঞ্জক ভাবে ভেদ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়গোপালের মনে পড়িল আজ সে যে মৃণালিনীর জ্বর জানিয়া আসিয়াছে। তাহার অন্তঃকরণের নিভৃত প্রদেশ শিহরিয়া উঠিল। প্রিয়গোপাল এখন ভাবিল, ছিঃ ছিঃ সে করিয়াছে কি? তাহার জ্বর জানিয়াও সে একবার দেখিয়া আসিবারও অবসর পায় নাই। জিতের কতক টাকা পকেটে ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছিল। এক্ষণে তাহার শব্দ যেন প্রিয়গোপালের কর্ণ বিদ্ধ করিতে লাগিল, সে ব্যাকুলভাবে গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

(৮)

বাটীর ভিতর যাইয়া প্রিয়গোপাল দেখিল দাসী বিষণ্ণ বদনে মৃণালিনীর গৃহের দরজায় বসিয়া আছে। বাবুকে দেখিবামাত্র সে জানাইল বৌঠাকুরাণীর জ্বর বেশী হইয়াছে, আদৌ হুঁস নাই, আজ সে খেতে যেতে পারে নাই, তাঁর আসার অপেক্ষা করিতেছিল। মৃণালিনীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া প্রিয়গোপাল দেখিল যে, যে অমঙ্গল তাঁহার প্রাণে এইমাত্র জাগিয়াছিল তাহাই ঘটিতে বসিয়াছে।

মৃণালিনীর বিন্দুমাত্র চেতনা নাই। রোগের যাতনায় সে কেবল বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছে। স্বীয় অপরাধের কথা ভাবিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। চকিতে অতীত কয়মাসের স্মৃতি তাহার মানস-পটে উদিত হইল। শয্যাপরি রোগকাতরা মৃণালিনীর কালিমামণ্ডিত বদন মণ্ডলে সে আপনার একাধারে আর্থিক উন্মাদনা ও কর্ত্তব্যহীনতার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল। দুই চারিবার 'মৃণালিনি! মৃণালিনি!' বলিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিল। কোন উত্তর না পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় ডাক্তারের উদ্দেশে ছুটিয়া গেল।

সেদিন সমস্ত রাত্রি অনশনে প্রিয়গোপাল মুমূর্ষু পত্নীর পরিচর্য্যা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই সে তাহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিল না। ঊষার প্রথম আলোকচ্ছটা আগমনেই মৃণালিনীর প্রাণপাখী ধরা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শোকস্তম্ভিত প্রিয়গোপালের নয়নপথে অশ্রুবিন্দু উছলিয়া উঠিয়াও তাহার প্রাণের অব্যক্ত যাতনার কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারিল না। তাহার যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয় হা হা করিয়া কেবলি বলিতে লাগিল, হায়! যদি সকালে চেষ্টা করিতাম তবে বোধ হয় মৃণালিনীকে বাঁচাইতে পারিতাম! সেদিন সন্ধ্যার সময় সে যতগুলি অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহা সমস্তই দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া আসিয়াছিল। পরদিন যখন ব্রজনাথ আসিয়া তাহাকে ডাকিল তখন প্রিয়-গোপাল তাহাকে বলিল, যে তাহার খেলার সাধ শেষ হইয়াছে!

শ্রীউমাচরণ ধর।

কবিজীবনী ও কাব্য

(গিরিশচন্দ্র।)

কাব্য একহিসাবে কবির আত্ম-প্রকাশ। কাব্য-সাগরে জাল ফেলিয়া দেখিলে কবি-জীবনের অনেক রহস্য আহরণ করিতে পারা যায়; তবে একথা সত্য যে, সকল শ্রেণীর কাব্যেই কিছু কবি-হৃদয়ের ছায়া সমভাবে পড়ে না। কাব্যের রূপগত বিভিন্নতা হেতু কবির আত্ম-প্রকাশের অপেক্ষাকৃত তারতম্য ঘটিয়া থাকে। গীতিকাব্যে কবির মানসপট যেরূপভাবে ও গভীর

প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, নাট্যকাব্যে কবি-হৃদয়ের ছবি সেরূপভাবে এবং ততটা প্রতিফলিত হয় না,—হইতে পারে না, হইবার সুযোগও নাই। কিন্তু তাই বলিয়া নাট্যকাব্যে নাট্যকারের হৃদয়ের ছায়া যে একেবারেই পড়ে না,— তাহা নহে। তাহাতেও নাট্যকবির হৃদয়ের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে ছবি কিছু আব্ছায়া রকমের! ভাল ভাল নাট্যকাব্যের মধ্যেও কবির আত্ম-প্রকৃতি সংমিশ্রিত হইয়া আছে। কিন্তু তাহা এমনই নিবিড়ভাবে সংমিশ্রিত যে, সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে তাহা পৃথক করিয়া দেখা যায় না।

বাহিরের মানবপ্রকৃতি এবং কবির আত্ম-প্রকৃতি, এই দুই গুচ্ছ বিনাইয়াই সমুদায় কাব্য-বেণী রচিত হইয়া থাকে। এক কবির কাব্যের সহিত অপর কবির কাব্যের যে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণই হইতেছে,—কবির আত্ম-প্রকৃতি। যিনি কাব্য-রচয়িতা, তিনি জাতীয় চরিত্রের অধীন, সামাজিকতার অধীন এবং আত্ম-স্বভাবের অধীন। এই তিনটী জিনিষই প্রত্যেক কবির কাব্যে অল্প বিস্তর পরিব্যক্ত হইবেই হইবে। ইহার মধ্যে কোন একটীকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া একপদও অগ্রসর হইবার সাধ্য কবির নাই। এমন কি, কবিসৃষ্ট চরিত্রাবলীও কবি-স্বভাবের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। স্বভাবের এমনই প্রবল প্রতাপ! সেই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্যাসদেব, শ্রীমদ্ভাগবতকার ও জয়দেব, এই কয়জনের হস্তেই একই শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই জন্যই কালিদাসের দুষ্মন্ত, শকুন্তলা এবং মহাভারতের দুষ্মন্ত, শকুন্তলা ঠিক এক ছাঁচের গঠিত নহে। সেই জন্যই উত্তরচরিতের রামচন্দ্র রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে বিভিন্ন হইয়াছে, দেখা যায়। তাই বলিয়া কালিদাসের দুষ্মন্ত যে হুবহু কালিদাসের চরিত্র এবং ভবভূতির রামচন্দ্র যে অবিকল ভবভূতির চরিত্র, এমন কথা যেন কেহ স্বপ্নেও মনে স্থান না দেন। তথাপি একথা স্বীকার্য্য যে, ঐ দুষ্মন্তের মধ্যে কালিদাসের কিছু-না-কিছু অংশ এবং উত্তরচরিতের রামের মধ্যে ভবভূতির কিছু-না-কিছু অংশ আছেই আছে। নহিলে উহাদের আকার আর একপ্রকার হইত।

এইখানে হয়ত কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, তাহা হইলে কবিসৃষ্ট মন্দ চরিত্র গুলিতেও কি কবি-স্বভাবের ছায়া আছে, বুঝিতে হইবে? হাঁ! তাহাই বুঝিতে হইবে! কি ভাল কি মন্দ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকল চরিত্রের ভিতরেই কবিকে একটু-না-একটু পাওয়া যাইবেই! কবিও ত মানুষ,—সৃষ্ট জীব বটে!

রক্ত মাংসের দেহ লইয়া, রক্ত মাংসের জবরদস্তির হস্ত হইতে তাঁহারও নিষ্কৃতি নাই। তবে কথা হইতেছে এই যে, সকল চরিত্রের মধ্যেই কবির প্রতিবিম্ব সমানভাবে পড়ে না। সেক্সপীয়রকে 'লীয়র' চরিত্রে যতখানি পাওয়া যায়, হয়ত 'ইয়াগো' চরিত্রে ততটা তাঁহাকে নাও পাওয়া যাইতে পারে। আবার 'ডনজুয়ানে' বায়রণ চরিত্র যতটা বুঝা যায়, তাঁহার সৃষ্ট অন্য চরিত্রে হয়ত তাঁহাকে ততটা বুঝা যায় না। মানব মনোবৃত্তির প্রায় একই মাল মসলা লইয়া Richard III. এবং রমেশ এই দুইটী নিষ্ঠুর চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এই উভয় চরিত্রেরই কাব্যগত স্বাদ কত বিভিন্ন! এই স্বাদ বিভিন্ন হইবার প্রধান কারণ—কবির আত্ম-প্রকৃতি।

এইস্থলে আর একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে, 'যিনি প্রতিভাশালী, সহানুভূতি যাঁহার কল্পনায় আজ্ঞাকারিণী', তাঁহার চরিত্রের সহিত তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাদির আবার সম্বন্ধাসম্বন্ধ কি? কথাটা আংশিক সত্য বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। "কল্পনার বলে কবি সহানুভূতিকে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিতে পারেন" * বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সেই কল্পিত আদর্শে কবির আত্ম-প্রকৃতি যদি রাসায়নিক সংযোগের মত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা জীবন্ত হইবে; নতুবা নহে। কল্পনা বল, আর সহানুভূতিই বল, এ সমস্ত মানব-প্রকৃতিরই এক একটী অঙ্গ বিশেষ। যাঁহার যেমন স্বভাব, তাঁহার ধ্যান-ধারণাতেও সেই স্বভাবের কিছু-না-কিছু ছাপ পড়িবেই পড়িবে। সেইজন্যই মনে হয়, সেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' কালিদাসের কল্পনা-রাজ্যে কিছুতেই আবির্ভাব হওয়া সম্ভবপর নহে। আবার কালিদাসের গৌরী কিম্বা শকুন্তলা সেক্সপীয়রের মানস-সরোবরে কিছুতেই ফুটিতে পারে না। কবিদ্বয়ের আত্ম-প্রকৃতিই এই সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়!

যাহা হউক, একথা কিন্তু ঠিক যে, কবিসৃষ্ট চরিত্র হইতে কবি চরিত্রের রহস্য বুঝা যত কঠিন ব্যাপার, কবির সমগ্র কাব্য-প্রকৃতি হইতে উহা বুঝিয়া উঠা তত কঠিন ব্যাপার নহে। কবির ব্যক্তিগত রুচি, প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতা এ সমস্তই কাব্যের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া থাকে। সংসারের কিসে তাঁহার অনুরাগ, কিসে বিরাগ, কিসে তাঁহার বিশ্বাস, কিসে অবিশ্বাস, কিসে তাঁহার শ্রদ্ধা, কিসে অশ্রদ্ধা—এ সমস্তই কবির জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক,

* বঙ্কিমচন্দ্র।

কাব্য মধ্যে ব্যক্ত বা বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের জীবন ও কাব্য দ্বারা কথাটা এইবারে কিছু বিশদ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি।

গিরিশচন্দ্রের অন্তর-প্রকৃতি বর্ণনা করিতে যাইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি বলিয়াছিলেন যে, "তিনি জ্ঞানী, অন্তরে যোগী, ক্ষেপা মায়ের ক্ষেপা ছেলে ছিলেন।" গিরিশচন্দ্রের অন্তর-প্রকৃতির এমন অপূর্ব্ব প্রতিকৃতি মহারাজা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? কোথা হইতে কেমন করিয়া তিনি গিরিশ-জীবনের এই সংক্ষিপ্ত অথচ এমন প্রকৃত রহস্য আহরণ করিয়া আনিলেন?—গিরিশ-রচিত নাট্যাবলী হইতে। মহারাজাধিরাজ নিজেও একথা একপ্রকার স্বীকার করিয়াই বলিয়াছেন,—"গিরিশ বাবুর চৈতন্যলীলাদি পাঠ করিলেই তাঁহার মানস-পটের প্রকৃত চিত্র দেখিতে পাইবেন।" বাস্তবিক, তাঁহার নাট্য মধ্যে ধর্ম্মের যে ভাব-মন্দাকিনী বহিয়া যাইতেছে দেখা যায়, তাহা কখনই কৃত্রিমতার উৎস হইতে পারে না। এই কাব্য-স্রোত, যে গিরিগুহা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, সে উৎপত্তি-স্থল খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে—তাহা গিরিশের ধর্ম্ম-প্রাণ হৃদয়। ধর্ম্মপ্রাণ জাতির জন্য নাটক লিখিতে হইলে যে সেই জাতির মর্ম্মাশ্রয় করিয়া উহা লিখিতে হইবে, শুধু এইরূপ মনে করিয়াই তিনি জোর জবরদস্তি করিয়া শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সকল স্বীয় নাট্যসূত্রে গাঁথিয়া যান্ নাই। তাঁহার অন্তর-প্রকৃতি তাঁহাকে ঐরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। যে হৃদয় কখনও ভগবদ্ভক্তির রস আস্বাদন করে নাই, যে হৃদয় নাস্তিকতার তীব্র দংশন কখনও সহ্য করে নাই, যে হৃদয় রামকৃষ্ণদেবের মত গুরুর প্রভাব কোনকালে অনুভব করে নাই,—তাহার কল্পনা যতই প্রখরা হউক না কেন,—সে কখনই চৈতন্য, বুদ্ধ, কালাপাহাড়, শঙ্করাচার্য্য, ফকিরচাঁদ, চিন্তামণি, প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি লোক-বুদ্ধির গোচর করিয়া দিতে পারে না। সেইজন্যই মনে হয়, তাঁহার নসীরাম, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি চরিত্র এক একটী জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। নহিলে বোধ করি, সেগুলি কেবলমাত্র প্রবন্ধ হইয়া থাকিত।

গিরিশের অন্তর-প্রকৃতির সহিত তাঁহার কাব্য-প্রকৃতির যে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ—গিরিশের জীবন। যে দুই একটা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত তাঁহার জীবনকে ধর্ম্মময় করিয়া তুলিয়াছিল, সেই ঘাত-প্রতিঘাতের দুই একটা ছবি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে তাঁহার কাব্য-প্রকৃতি কোন্ আঘাতের ফল! সেই জীবনচিত্রের সহিত তাঁহার নাট্যকাব্যের যে যোগ আছে, তাহা জানিয়া

রাখাও কর্ত্তব্য। তাহা জানা থাকিলে, তাঁহার জীবন এবং কাব্যের গৌরব বেশী করিয়া উপলব্ধি হয়।

"শৈশবকালে গিরিশচন্দ্র তাঁহার খুল্লপিতামহীর নিকট রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। সেই সব গল্প শুনিতে শুনিতে শিশু-হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় রসে আপ্লুত হইত। একদিন পিতামহী কহিলেন,—'কৃষ্ণ ব্রজপুরী ছাড়িয়া মথুরায় গেলেন।' বালক গিরিশচন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আবার আসিলেন?' পিতামহী কহিলেন,—'না'। বালক গিরিশচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আর আসিলেন না?' আবার উত্তর—'না'। তিনবার এইরূপ নির্দ্দয় উত্তর শুনিয়া গিরিশচন্দ্রের কোমল প্রাণে বড় আঘাত লাগিল,—বালক কাঁদিয়া পলাইল, তিনদিন আর গল্প শুনিতে আসিল না।" * গিরিশের এই জীবন-মুকুলেই আমরা তাঁহার সহানুভূতি-প্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া থাকি। সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয়ই ভাব বিকাশের একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। শিশুকাল হইতেই গিরিশ-হৃদয়ে ভাবস্ফুরণের আমরা নিদর্শন পাই।

গিরিশচন্দ্রের বাল্য-জীবনের আর একটী গল্প আছে। সে কাহিনী কবির কাব্যের সহিত একাত্মভাবে জড়িত। সে ঘটনাটিও তাঁহার কাব্য-প্রকৃতির একদিকের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেছে।

একদা বালক-গিরিশচন্দ্র পিতার সহিত জলবিহারে বাহির হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে দেখা গেল যে, নৌকাখানি সছিদ্র—ধীরে ধীরে উহা জলমগ্ন হইতেছে। প্রাণভয়ে ভীত বালক-গিরিশ তখন পিতার হাত দুইখানি জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু দৈবক্রমে সে যাত্রায় নৌকা রক্ষা পাইল। এই ঘটনার পর গিরিশের পিতা পুত্রকে বলিলেন,—"আমার হাত ধরিয়াছিলি কেন? আমি ডুবিলে ত তোকে ছুড়ে ফেলে দিতাম। বিপদের সময় আর কখনও মানুষের হাত ধরিস্ না, মানুষে কিছু করিতে পারে না। যাঁহার হাত ধরিলে রক্ষা পাওয়া যায়, তাঁহারই হাত ধরিস্।" পিতার এই উপদেশ-মন্ত্র বালক-হৃদয়ে যেন পাষাণে অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন যে, 'জীবনে আর কখনও আমি পরের হাত ধরি নাই।' শুধু যে তাঁহার আত্মপ্রকৃতিতেই এই ঘটনা রেখাপাত করিয়াছিল, তাহা নহে। ভগবানে ঐ আত্মনির্ভরতার ছায়া তাঁহার সমগ্র কাব্য-প্রকৃতির সহিতও ওতঃপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে।

---

* গিরিশ-গীতাবলী—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

আবার, আর একটী কাহিনী আছে, তাহা গিরিশের যুবা বয়সের ঘটনা। তাঁহার জীবন-ইতিবৃত্তের মধ্যে এই ঘটনাটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারণ, ইহার আঘাতে তাঁহার বাস্তব-জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল এবং সেই আঘাতেরই ফল—কালাপাহাড়, শঙ্করাচার্য্য, নসীরাম ও চিন্তামণি প্রভৃতি চরিত্রাবলী।

যৌবনে গিরিশচন্দ্র প্রায়ই আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে যোগদান করিতেন। একদিন কেশবচন্দ্রের বাটীতে আদি ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতাদি লইয়া আলোচনা হইতেছিল। ঐ আলোচনার সময় পূর্ব্ববর্ত্তীর এক প্রচারকের বক্তৃতা লইয়া কেশবচন্দ্র একটু রঙ্গ রহস্য করিয়াছিলেন। এই ব্যঙ্গ গিরিশের হৃদয়ে শেলসম আঘাত করিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, 'ইঁহাদের ভ্রাতৃভাব কেবল একটা কথার কথামাত্র।' সেই দিন হইতে তিনি ব্রাহ্মদিগের দল পরিত্যাগ করেন। সে সময় বঙ্গের এক ঘোর ধর্ম্ম-বিপ্লবের দিন। সনাতন ধর্ম্মে অনাস্থা,—চতুর্দ্দিকে নব নব মত উত্থিত ; কি সত্য—কি মিথ্যা স্থির করিতে না পারিয়া, যুবক গিরিশচন্দ্র নাস্তিক হইয়া উঠেন। তিনি মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—যদি ঈশ্বর থাকেন এবং ধর্ম্ম যদি মানবজীবনের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হয়, তাহা হইলে জীবন-ধারণের অতি প্রয়োজনীয় জল বায়ু ও আলোক যেমন যথেষ্ট রহিয়াছে, ধর্ম্ম তদপেক্ষা সুলভলভ্য হইত। তাহাই হইল। একদিন যথাসময়ে রামকৃষ্ণদেব থিয়াটারে 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখিতে আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে পদাশ্রয় দিলেন। গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন যে হাঁ, ধর্ম্ম সত্য সত্যই সুলভ প্রাপ্য। নহিলে ধর্ম্ম লইয়া থিয়াটারে তাঁহার অঙ্কে কে উপস্থিত হইল? পরমহংসদেবের কৃপাকটাক্ষে গিরিশের হৃদয় হইতে সমস্ত সন্দেহের মেঘ একেবারে উড়িয়া গেল। গিরিশের 'কালাপাহাড়' নাটকে গিরিশ-জীবনের এই কাহিনী বিশেষরূপ জড়িত হইয়া আছে। এই কথা গিরিশচন্দ্রকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনিও তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। বারান্তরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গিরিশচন্দ্র শুধু কবি ছিলেন না। তিনি কবি ও কর্ম্মবীর উভয়ই ছিলেন। তাঁহার জীবনই একপ্রকার নাটক—ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। তাঁহার জীবন হইতে আরও এমন অনেক তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, যাহার সহিত তাঁহার কাব্যের একটা গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ আছে। বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত ঘটনা এখানে আর লিপিবদ্ধ করিলাম না।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

ঋণ-পরিশোধ।

(১)

চিররুগ্ন কাঙ্গালীচরণের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী ও শিশু-পুত্রকে এক প্রকার পথে বসিতে হইল। কাঙ্গালী কখন কিছু রোজগার করে নাই, ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য করিতেও পারে নাই। বেচারী উৎকট ব্যাধি বুকে করিয়া যতদিন পারিয়াছিল বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা বহন করিয়াছিল,—মরণের সঙ্গে যথেষ্টই যুঝিয়াছিল! মৃত্যু কিন্তু গ্রাস করিবেই, তাই সে তাহাকে লইয়া কিছুদিন রঙ্গ করিয়া পরে স্নেহভরে বুকে তুলিয়া লইল! কাঙ্গালী বোধ হয় সেই সময় মনে মনে বলিয়াছিল, 'মরণ রে তুঁহু মোর শ্যাম সমান!'

এই বিপদের পর কাঙ্গালীর বিধবা পত্নী তদীয় শ্বশুরবংশীয় জ্ঞাতিদের আশ্রয়েই রহিলেন। কারণ পিতৃকুলে তাঁহার কেহই ছিল না। কাঙ্গালীর যে দুই চারি বিঘা জমি ছিল, তাহারই আয়ে তাঁহার হাত খরচটা এক প্রকার চলিয়া যাইত। দিন তো চলিয়া যায়—সুখেই হোক আর দুঃখেই হোক! কিন্তু, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কি মানুষ থাকিতে পারে! পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি কিছু অধীরা হইলেন।

(২)

ব্রজমাধব কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসা করিতেন। কলিকাতায় তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি—চিকিৎসায় সূক্ষ্মদৃষ্টি হেতু তাঁহার মস্তকে যথেষ্ট পরিমাণেই অর্থ-বৃষ্টি হইত। কিন্তু, সে অর্থের তিনি সদ্ব্যয় করিতে জানিতেন। তদীয় গ্রামস্থ দুঃস্থ পরিবারকে গোপনে কিছু কিছু দান করিতেন। কাঙ্গালীচরণ জ্ঞাতি-সম্পর্কে ব্রজমাধবের খুল্লতাত। আজ ব্রজমাধবই তাঁহার অনাথ পুত্রটির ভবিষ্যতের সহায় স্বরূপ হইলেন। ব্রজমাধব কাঙ্গালীর বংশধরকে সযত্নে কলিকাতায় আনিয়া তাহার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আশা,—ভবিষ্যতে সে একদিন 'মানুষ' হইয়া যদি স্বীয় জননীর দুঃখমোচন করিতে পারে। বালক ভূপালচন্দ্র পল্লীগ্রাম হইতে সহসা কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু, বিচক্ষণ চিকিৎসক-অভিভাবকের সামান্য মুষ্টিযোগে তাহার হুঁস্ হইতে অধিক বিলম্ব ঘটে নাই। ভূপালচন্দ্র পিতার

স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেও ব্যাধির উত্তরাধিকারী হয় নাই। এ হিসাবে বিধাতা তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। ভূপালের লেখা পড়ার প্রতি দিন দিন বেশ যত্ন হইতে লাগিল। অন্ততঃ পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য তাহার উৎসাহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে চলিল। লেখা পড়া শিখিয়া হৃদয়বান হইবার বা মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল কিনা জানি না, তবে সে সকল চিন্তা বা শিক্ষা করিবার অবসর বড় একটা সে পায় নাই। যাহা হউক, আয়াস স্বীকার করিয়া সে একটা পাশ করিয়াছিল—পুরস্কারস্বরূপ হাজার টাকা ও সালঙ্কারা এক বধূও অচিরাৎ উপহার পাইল। এমন সুখের দিনে, পুত্রের এমন গৌরবে মাতার নয়ন-প্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল; পুত্র ও পুত্রবধূর শিরশ্চুম্বন করিয়া তাহাদিগকে ঘরে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু, ভুলিয়া গেলেন ব্রজমাধবের প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে! অবশ্য ব্রজমাধব তাহার ভিখারী নহেন! হায়! কর্তব্য-জ্ঞান জিনিষটা সংসারে এতই দুষ্প্রাপ্য!

(৩)

অনাথার সন্তান ভূপাল একটা পাশ করিয়া সবে 'মানুষ' হইয়াছে—বিবাহ-বাণিজ্যে তাহারও কিনা মূল্য হয় সহস্র মুদ্রা! এমন অঘটন ব্যাপার কি সকলের সহ্য হয়! যাহার হয় হো'ক—তাহার এক জ্ঞাতি ভগিনী হরিমণির যে হয় নাই, ইহা আমরা বিশেষ রূপেই সম্বাদ পাইয়াছি। প্রমাণ—ভূপালের পিতার ৫০০৲ টাকার ঋণ দর্শাইয়া সুদসমেত ৭০০৲ টাকার দাবীতে নালিশ করণ ও পরে তাহার বাস্তভিটাটি নিলামে ডাকিয়া লইবার নিমিত্ত বিধিমত আয়োজন। হরমণি বিধবা, তদীয় পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী—ক্ষুদ্র জমিদারনি।

এই আকস্মিক বিপদে ভূপাল ও তাহার মাতা প্রমাদ গণিল। এতকাল পরে কি তাহাদিগকে সত্য সত্যই পথে বসিতে হইবে! এক জ্ঞাতি ভ্রাতার অপরিসীম দয়ায় তাহাদের জীবন লাভ, আর অপর এক জ্ঞাতি ভগিনীর নির্ম্মম অত্যাচারে আজ তাহারা প্রাণহীন, গৃহহীন হইতে চলিল! ভূপালের মাতা সেই জমিদারনি হরমণির দ্বারস্থ হইলেন। অনেক অনুনয় বিনয়, অনেক কাঁদাকাটি চলিল; কিন্তু হরমণি টলিলেন না। তিনি বিধবা হইলে কি হয়—তাঁহার যে একমাত্র কন্যা ও জামাতা লইয়াই সংসার! তাহাদিগের স্বার্থে, তিনি নহিলে কে দৃষ্টি রাখিবে!

হরমণি বলিলেন, "আমি একটি পয়সাও ছাড়িব না, ছাড়িতে পারি না। তোমরা গৃহহীন হইবে, তা আমি কি করিব? কেন, তোমাদের তো ব্রজমাধব

আছে—তাহার কাছে যাও। আমার জামাতা কর্ম্মচ্যুত হইয়া ঘরে বসিয়া আছে, সে এইবার আমার বিষয়কর্ম্ম দেখিবে। তাহারই কাছারি বাড়ীর জন্য তোমার ভিটা আমার প্রয়োজন। অন্যের মত আমার ভিতরে এক. মুখে আর, তা' নয়, জানিও। আর, আমি তো কিছু অমনি লইতেছি না—আমার প্রাপ্য আমি ছাড়িব কেন!"

ভূপালের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিলেন। ভূপাল সকল কথা শুনিয়া বলিল, "মা, কাঁদিও না। হর দিদির পায়ে ধরিয়া আমি বলিলে, তিনি কখনই এমন সর্ব্বনাশ করিতে পারিবেন না। হাজার হোক তিনি স্ত্রীলোক, তাঁহারও সন্তান আছে। আমার রোদনে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগিবে!"

সাশ্রুনয়নে ভূপাল হরমণির পায়ে ধরিয়া ভিটাটি ভিক্ষা চাহিলে, হরমণি ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত ফণা বিস্তার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জ্যাঠা ছেলে, কেঁদে জিত্‌বে! যার খাবার সংস্থান নেই,—তার আবার বিয়ে করা কেন! ও সব আমি শুনিনা—আমার টাকা চাই। কেন? বউএর তো এক গা গহনা—তাই বেচে আমার টাকা হয় না? সে হাজার টাকায় অপরের দেনা শোধ হ'ল, আর আমার বেলা বুঝি পায়ে ধরা! আরে গেল যা—লজ্জা করে না!"

ভূপাল ক্ষোভে, লজ্জায় ও ঘৃণায় গৃহে ফিরিল। মাতা পুত্রে অনেক পরামর্শ হইল। বধূর অলঙ্কার বিক্রয়—অসম্ভব! প্রাণ যায়, তাহা হইবে না। কাল যাহাদের সহিত কুটুম্বিতা হইয়াছে, তাহাদের কাছে এত হীনতা প্রকাশ করা যাইতেই পারে না। তবে উপায়! মাতা বলিলেন, "আমাদের আর কে আছে! ব্রজমাধব!" ভূপাল নত মস্তকে মৌন হইয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল, কি জানি ব্রজদা'ও টাকা দিয়া যদি পরে এমনি ভাবে গ্রাস করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে তাঁহার মুখ হইতে রক্ষা করে সাধ্য কার! কিন্তু তিনি কি তাহা পারিবেন! যাই হোক, উপস্থিত, সত্যই তিনি ব্যতীত আর কি উপায় আছে! অন্নভিক্ষা—আবার অর্থভিক্ষা, এত লাঞ্ছনাও অদৃষ্টে ছিল—হা ভগবান!

(৪)

ব্রজমাধব হাসিয়া বলিলেন, "তার আর ভাবনা কি! কাঁদচিস্ কেন! আমি থাক্‌তে তোর বাড়ী নিলেমে উঠবে! পাগল আর কি! যা, এই সাতশ' টাকা নিয়ে আমার উকীলের হাতে দিয়ে আমার নাম করে বলবি, যেন কোর্টে জমা

করে দেয়। তোর আর কিছু কোর্ত্তে হবে না, সেই সব কর্ব্বে। তুই এখানে শিগ্ গির ফিরে আসবি—নাহ'লে পড়ার লোকসান হবে।"

ভূপাল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইল বটে, কিন্তু ব্রজমাধবের অপরিসীম দয়ায় ও স্নেহে সে যেন কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। সংসারে এমন ভাবের পরোপকার যে নিঃস্বার্থ-ভাবে হইতে পারে, ইহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পরোপকারী ব্রজমাধবের প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে ভূপাল এবং তাহার মাতা নিরতিশয় সংশয়ের চোখে স্বার্থের যেন একটা সূক্ষ্ম অথচ সুপরিস্ফুট রেখা দেখিতে পাইল। ব্রজমাধবের অকাতর দান,—না গ্রহণ করিলেও চলে না, অথচ ভূপাল আজ কতকটা দাঁড়াইতে শিখিয়াই তাঁহার উপকার গ্রহণ করিতে যেন ইতস্ততঃ করিতে থাকে! কিন্তু, ভূপালের প্রবল চিন্তা আপনার স্বার্থের প্রতি, কাজেই নিরুপায় হইয়া তাঁহার কাছে আরো কিছুদিন থাকিয়া তাহাকে লেখা পড়া করিতে হইল।

(৫)

"চিরদিন কভু সমান না যায়!" ব্রজমাধবের দিন দিন স্বাস্থ্যের হানি ঘটিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে কিছুদিনের জন্য স্বদেশে ফিরিলেন,—উদ্দেশ্য একটু বিশ্রামের চেষ্টা ও একমাত্র নাবালক পুত্র ও কনিষ্ঠ সহোদরের ভবিষ্যতের জন্য একটা সুব্যবস্থা করা। এতদিন তো তিনি আপনার সংসারের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই—যাহা উপার্জ্জন হইত, তাহার অধিকাংশই পরোপকারে ও দানে ব্যয়িত হইত। আজ শরীরের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার সে দিকে দৃষ্টি পড়িল।

তাঁহার অবর্ত্তমানে যদি কোন দিন পুত্র ও ভ্রাতার অসদ্ভাব ঘটে, এই আশঙ্কায় পৈত্রিক ভদ্রাসন ভাগ না করিয়া তিনি তাহারই নিকট আর এক বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। গ্রামে আর এক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইল। গ্রামের জনসাধারণ তাঁহার সম্মুখে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও বহুদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল এবং তাহাদের মধ্যে জন কয়েক ঈর্ষাপরবশ হইয়া গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিল, কোন্ উপায়ে ব্রজমাধবের এত আধিপত্য খর্ব্ব করিতে পারা যায়? বলা বাহুল্য, এই পরামর্শ-কারীদের মধ্যে হরমণি প্রধানা। আর ভূপালের মাতা আজ তাহারি সহিত সখ্যতায় আবদ্ধা। কালের কুটিল গতি!

(৬)

বি-এ পাশ ভূপালচন্দ্র এখন একশত টাকা বেতনের কর্ম্মচারী। লাহোরে কর্ম্ম করেন, অবশ্য সহধর্ম্মিণীও সঙ্গে বিরাজ করিয়া থাকেন। মাতা ভদ্রাসন রক্ষা করিবার নিমিত্ত দেশেই বাস করিতেছেন। ব্রজমাধবের এ নূতন বাড়ীর সম্বাদ লাহোরে পৌছিয়াছিল। ভূপাল মাতার পত্রে অবগত হইল যে, "ব্রজমাধব অর্থ মদমত্ত হইয়া পুড়া, জেঠী সম্পর্কীয়াদের আর গ্রাহ্য করে না। আমাদের বিনা অনুমতিতে তাহার অট্টালিকা আমাদেরই চারি হস্ত পরিমিত স্থান গ্রাস করিয়াছে। গ্রামের যাবতীয় লোক, এমন কি তোমার হরদিদি অবধি ছি-ছি করিতেছে। আমরা দরিদ্র বলিয়াই কি এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিব?" পত্র পাঠ করিয়া ভূপালের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই তো হইল!

ভূপালচন্দ্র তিন মাসের ছুটী লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

(৭)

সেদিন বৈকালে গ্রামস্থ হিন্দু ও মুসলমান কৃষক প্রজাগণ ব্রজমাধবকে ঘেরিয়া তাঁহার নব অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে নানারূপ প্রশংসাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। এমন বাটী যে কলিকাতা ব্যতীত অন্য কোনও পল্লীগ্রামে বড় একটা নাই, তাহাই একযোগে বলিতেছিল। এমন সময় প্যাণ্ট্ কোট ও হ্যাট পরিহিত ভূপাল অগ্নিশর্ম্মা রূপে সেখানে আসিয়া অতি রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "একি ব্রজ দা! একবৎসর দেশে নাই বলিয়া কি এই অত্যাচার করিতে হয়!"

ব্রজমাধব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, ভাবিয়া পাইলেন না, এ কথার অর্থ কি? ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "সে কি হে—কি অত্যাচার!"

"কি অত্যাচার! জানেন না! ওসব জবরদস্তি চল্‌বে না! আপনার এ বাড়ীর অর্দ্ধেক জমি আমার। কাহার অনুমতিতে আপনি ইহা গ্রাস করেন?"

"সে কি, এ যে আমার ঠাঁই।"

"প্রমাণ? আমার বলিলেই কি আমার হইবে, দলিল আছে?"

"না।"

ভূপাল তখন দুই চারিটা ইংরাজি বুকনি ছাড়িয়া বলিল, "কোর্টে যেতে চাহেন, আমি তাহাতে সম্মত। কিন্তু, জানিবেন এ বাড়ী আপনাকে

ভাঙ্গিতেই হইবে। আমি দরিদ্র হইলেও, এ অত্যাচার সহ্য করিব না—ইহাতে দেশত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার।" ভূপাল উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে বাটী চলিয়া গেল।

নির্ব্বিরোধী ব্রজমাধব সকলের সম্মুখে এরূপে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া কিয়ৎকাল নত মস্তকে রহিয়া পরে মিস্ত্রি ডাকাইলেন এবং তদ্দণ্ডেই বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, গ্রামের সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে,—তাঁহার অদৃষ্টচক্রের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার দেহের অস্থিস্বরূপ সেই অট্টালিকার এক একখানি ইষ্টক যখন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল, তখন তিনি সে দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না। চোখের জলে বুক ভাসাইয়া গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে বলিলেন, "কি কঠিন সংসার! যাহাকে হাতে ধরিয়া হাঁটিতে শিখাইলাম, সেই আজ হাঁটিতে শিখিয়াই আমারি বুকে পদাঘাত করিল! ভূপাল! তোমায় মানুষ করার উপযুক্ত ফল পাইলাম!"

* * * * *

ব্রজমাধবের ভগ্ন-স্বাস্থ্য সেই বাটী ভূমিশায়ী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। তিনি সে আঘাত আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে প্রলাপে তিনি বলিয়াছিলেন, "পেয়েছি—পেয়েছি ভূপাল, তুমি সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ করিয়াছ। আমি কিছু বলিব না—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!"

* * * * *

শুনিয়াছি, ব্রজমাধবের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্র সেই ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপে বসিয়া সাশ্রুনয়নে বলিয়াছিল—"পিতা! পিতা! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!"

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

ঘুঘুর বাসা।

"কোন্ ষ্টেসন ?"

চোখ মুছিতে মুছিতে রমণীটী অলস শিথিল ভাবে আপন শয্যায় উঠিয়া বসিয়া পার্শ্বের বেঞ্চে শায়িত সঙ্গীটীকে জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ ষ্টেসন ?

বাবুটি শশব্যস্ত ভাবে উঠিয়া গাড়ির গবাক্ষ দিয়া বাহিরে তাকাইয়া বলিল— আসানসোল।

রমণী বলিল—'আসানসোল! বৰ্দ্ধমান পার হয়ে গেছি বোধ হয়।'

যুবক একটু হাসিয়া বলিল—অনেকক্ষণ।

বুঝিলাম রমণীটী পূর্ব্বে এ পথে আসে নাই। একটী সেকেণ্ড ক্লাস প্রকোষ্ঠে আমরা তিনজন মাত্র আরোহী ছিলাম। তিনজনের তিনটী বেঞ্চি রিজার্ভ ছিল। উপরের 'বাঙ্ক' দুইটাতেও দুইখানা রিজার্ভ কার্ড ছিল। কিন্তু যাত্রীরা আসিয়া পহুঁছায় নাই। আমি প্রথমটা অপর গাড়িতে যাইতে পারিলে আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতাম। কিন্তু এখন এমন অবস্থা হইয়াছিল যে অপর গাড়িতে যাইতে হইলে আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইত। কারণ—কারণ শুনিবেন? কারণ আমি ঠিক প্রেমে না পড়িলেও প্রেমনদীর একেবারে কূলে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আর একটু পরেই প্রেমনদীর স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইবে এরূপ আশঙ্কা করিতেছিলাম। মধুপুর অবধি যাইতে না যাইতেই যে আমার তাদৃশ ভাবান্তর হইবে তাহাও বেশ বোধগম্য হইতেছিল।

'আমার চরিত্র আপনারা কেন ওরূপ ঘৃণিত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না। সে রমণীটীকে যদি সে অবস্থায় দেখিতেন আপনাদেরও কালীপাহাড়ী পার হইবার পূর্ব্বেই যে আমার মত ভাবান্তর উপস্থিত হইত তাহা আমি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া একরকম হলফ করিতে পারি। রমণী যুবতী— যেমন তেমন যুবতী নয়, তাহার দেহে যৌবনের বন্যা বেশ কানায় কানায় উঠিয়া তরঙ্গায়িত হইয়াছে। মুখখানি ঢলঢলে লাবণ্যভরা অথচ চোখের কোলে একটু বিষাদের ভাব। পদদ্বয়ে চর্ম্ম-পাদুকা, নির্ভীক অথচ সলজ্জ ভাব, কথাবার্ত্তার মাধুরী, চালচলন, ভঙ্গী সমস্তই গৃহস্থ রমণীর মত। সুতরাং অনুমান করিলাম ইনি ব্রাহ্মিকা। কি নাম তাহা বুঝা যায় নাই,কাজেই বিচার করিতে লাগিলাম তাঁহার নাম সেখাত্ত নলিনী,স্বর্ণপ্রভা, ধন্যোৎলাবণ্যময়ী না কেবলমাত্র কুমুদিনী,হেমাঙ্গিনী

বা শরৎশশী। এ প্রকার ললনার নাম অবলা, সরলা বা তরলা হইতে পারে না। তাহার পর সমস্যা হইল বাবুটী ইঁহার কে ? তাহার চসমিত চক্ষুর প্রেমপূর্ণ কাতর দৃষ্টি ভ্রাতার হইতে পারে না। অথচ সে যেরূপ সশ্রদ্ধ ভাবে অথচ পার্থক্য রাখিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল তাহাতে তাহাকে তাহার বিবাহিত স্বামী বলিয়াও মনে হইতেছিল না। সে রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী 'কোর্টসিপ'-রত বলিয়া মনে হইল। যুবতী যেমন সুন্দরী, পুরুষটীও তেমনি সুন্দর। তাহার উপর সেটা আশ্বিন মাসের দেবী পক্ষের ষষ্ঠী। ঘন নীল আকাশের চাঁদ অকাতরে মাঠের উপর কৌমুদী ধারা ঢালিয়া দিতেছিল। স্থানটা ট্রেণের ভিতর। এ সকল কারণে হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার না হওয়া পাপ। প্রেম জন্মিলে নৈতিক অধঃপতন হয়—বলিলে মিথ্যা কথা কওয়া হয়।

শুধু তাহাই নহে। অবস্থাগুলা এত গুরুতর যে আমি সে যুগ্ম সহযাত্রীর কেবল একটী মাত্রকে ভালবাসিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। মদনদেবের ফুল-ধনু-বিদারিত হৃদয়ের রন্ধ্র দিয়া যুবক যুবতী উভয়কেই ভিতরে প্রবেশলাভ করিতে দেখিয়া অগত্যা দুইজনকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কাহারও কিছু অনিষ্ট হইলে আমার হৃদয় শেলবিদ্ধ হইবে তাহা বলিয়া যেন প্রাণের ভিতর কে ঢোল বাজাইয়া ঢেঁড়া পিটিতে লাগিল। কল্পনার স্রোত মনকে যখন এমন স্থলে লইয়া গেল যেখানে দেখিলাম এতদুভয় ব্যক্তির বিচ্ছেদের চিত্র, ইহারা একজন অপরকে স্নেহের গণ্ডীর বাহির করিয়া দিয়াছে, তখন হৃদয়ে এক গভীর বেদনার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলাম। অন্য মনে পেয়ালাস্থ উষ্ণ চা মুখে ধরিয়া রসনা পুড়াইয়া ফেলিলে, যেমন তীব্র বেদনা অনুভূত হয় সেইরূপ বেদনা হৃদপিণ্ডকে অকস্মাৎ আলোড়ন করিয়া উঠিতেছিল। কেবল মনে মনে ভাবিতে-ছিলাম ইহারা পরস্পরের প্রেমে সুখী হউক, যুবকটীর চক্ষু হইতে ঐ কাতর প্রতীক্ষার ভাবটা অপসারিত হউক, ললনার চক্ষু হইতে ক্ষীণ বেদনার স্মৃতিটা বিলুপ্ত হউক। প্রেমান্ধ হইয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বেগবান বাষ্পীয়যানে নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

(২)

"কপোত কপোতী যথা
উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধে নীড় থাকে সুখে—"

সেইরূপ প্রভাতে উঠিয়া এই যুবক যুবতী সেই বেগবান বাষ্পীয় পোতের প্রকোষ্ঠে বেশ একটু নীড় বাঁধিয়া লইল। ছোট ছোট রূপার থালা বাহির

করিয়া রমণীটী সেগুলি সন্দেশ, রসগোল্লা, পেস্তা, বাদাম, আঙ্গুর প্রভৃতিতে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। বাবুটী কেলনারের খানসামার নিকট হইতে দুই পেয়ালা চা খরিদ করিল। একখানা বেঞ্চের উপর মালতী শুভ্র একখণ্ড ড্যামাক্ বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপর সব খাদ্যাদি রাখিয়া তাহারা একত্র প্রীতিভোজ করিতে বসিল। আমি দুইখানা নীরস বিস্কুট চা-সংযোগে সরস করিয়া ভোজন করিতে করিতে এক একবার প্রেমবিহ্বল নেত্রে সেই সহযাত্রীদ্বয়কে দেখিতে লাগিলাম, আবার ক্ষণে ক্ষণে পশ্চাতে চাহিয়া গয়ার পাহাড় রাশির চারি-ধারের শোভা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

সোন নদীর পুলের কাছে আসিয়া আমার একটা বিষয়ের কৌতূহল চরিতার্থ হইল। যুবক টাইম টেবিলের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে চুরুট মুখে করিয়া বলিল—বিণু এইবার আমরা সোনব্রীজের ওপর দিয়ে যাব।

বুঝিলাম রমণীর নাম বীণাপাণি। বীণাপাণি সোন ব্রীজে উঠিবার চিন্তায় বিশেষ উৎফুল্ল হইল বলিয়া বোধ হইল না। সে শয্যাদি সংস্করণে ব্যস্ত ছিল। তাহার সেই প্রভাতালোক দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যেন তাহার চক্ষের বদ্ধমূল বিষাদ ও উৎকণ্ঠার ভাবটা কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে।

যুবকটী মোগলসরাই ষ্টেশনে নামিয়া আমার সহিত কেল্নারের হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে বসিলেন। দুইজন বাঙ্গালী প্রায় পাঁচশত মাইল একত্র ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার সহিত রমণীটী না থাকিলে এতক্ষণে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ্য জন্মিত। সুতরাং প্লাটফরমের কিয়দ্দূর গিয়াই বাবুটী তাহার সেই তৃপ্তিপূর্ণ মুখখানি ঈষৎ স্মিত করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কতদূর যাবেন ?

তাঁহাকে বলিলাম—আমি মথুরা, বৃন্দাবন ও দিল্লি হইয়া হরিদ্বার যাইব।

"সে কি ? এতদূর যাবেন। তাজ দেখবেন না ?"

আমি বলিলাম—তাজ আমি দু'বার দেখেছি। আগ্রায় আর যাব না। আপনারা কতদূর যাবেন ?

"আমরা আজ রাত্রে আগ্রায় যাব' তার পর বোধ হয় বৃন্দাবন দর্শন ক'রে দিল্লি যাব।"

'বৃন্দাবন দর্শন' করিবেন শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। একি বুজরুকি বাবা! ভণ্ডামি-অভিনয়ে ব্রাহ্মরা দেখিলাম একের নম্বর। আরও কথাবার্ত্তায় জানিলাম ভদ্রলোকের নাম অম্বিকানাথ সেন।

রাত্রে আমাকে বিরহপঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া আমার ভালবাসার পাত্র পাত্রী অমিয় বীণাপাণি তুণ্ডলায় নামিয়া গেল। একটী দীর্ঘ শ্মশ্রু বদনা হস্তে মুসলমান ও একটী পীত পাগড়ি-মণ্ডিত-শির মাড়োয়ারী প্রায় সতেরটা মোট লইয়া তাহাদের পরিত্যাক্ত স্থল তুইটি অধিকার করিয়া বসিল। গমনোদ্যত ইঞ্জিনের প্রথম বাষ্পোদ্গমের সহিত আমার হৃদয়োত্থিত একটী উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস মিশাইয়া তণ্ডুলা ষ্টেসন ছাড়িলাম। তখন চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছিল, চারিধারের পুঞ্জীকৃত অন্ধকার রাশি এবং মিঞা সাহেবের দাড়ির জটীলতার মধ্যে দৃষ্টি চালাইতে চালাইতে চলিলাম। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে কে যেন বলিতে লাগিল—তাজের সৌন্দর্য্যটা বার বার তিনবার অন্ততঃ দেখা উচিত।

(৩)

ক্ষীণসলিলা বেগবতী যমুনা প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলীর শক্তি-পরীক্ষা করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। বৃন্দাবনের উচ্চ সৌধমালার ক্রোড়ে যমুনার শোভা মোটেই চিত্তরঞ্জক হইতেছিল না। পরপারের ময়দানের ক্রোড়ে বরং যমুনা একটু সুন্দরী বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু যমুনার নামের সহিত যে সৌন্দর্য্য মিশ্রিত ছিল, সে সৌন্দর্য্যের কোন নিদর্শনই এই বিংশশতাব্দীর যমুনার অঙ্গে প্রতিভাত নহে। উষালোকে অপরপারে শায়িত দশ বারোটা ভীমদর্শন কুম্ভীর দেখা যাইতেছিল সম্মুখে জলের মধ্যে একরাশ কূর্ম্ম হুড়াহুড়ি করিতেছিল। প্রায় আমার নিকট হইতে পাঁচ ছয় হাত দূরে একটা বানরী আমার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া আমার মুখের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য কুঁ কুঁ করিয়া শব্দ করিতেছিল। যতদূর দৃষ্টি চলিতেছিল কোথাও জনমানবের চিহ্ন ছিল না। কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানের সহিত বৃন্দাবনের এই পার্থক্য। বৃন্দাবনে লোকের ভিড় নাই।

আমি যে ঘাটে বসিয়াছিলাম তাহাকে অপর ঘাট হইতে পৃথক করিয়া একটি প্রায় পাঁচ ফুট প্রশস্ত প্রাচীর বিদ্যমান ছিল। লোকে স্নানের পর সেই প্রাচীরের উপর বসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিত। আমি ঘাটের সিঁড়িতে অন্যমনে বসিয়াছিলাম। অকস্মাৎ প্রাচীরের অপর দিক হইতে সুন্দর বামা কণ্ঠে মৃদুস্বরে গীত সঙ্গীতের ঝঙ্কার কর্ণে প্রবেশ করিল—

"মণি কোথা পাওয়া যায় সই ফণির শিরে হাত না দিলে—"

নিধুবাবুর সেই চিরপরিচিত গান। তাহার উপর ভৈরবী সুর—যমুনার বক্ষে

ভাসিয়া আসিয়া প্রাণটাকে বড় উত্তেজিত করিল। আমি দুই চারি সোপান উঠিয়া শুনিতে লাগিলাম—

"পিরীতি কি হয় লো সখি পরের কথায় ভয় করিলে
মণি কোথা পাওয়া যায় সই ফণির শিরে হাত না দিলে।
পোড়া লোকে কত বলে
কত কথা কত ছলে
প্রেম সুখে হয় সে সুখী কলঙ্কে ভূষণ করিলে।"

কি মধুর কণ্ঠ! কি উন্মাদক ঝঙ্কার! তাহার উপর নিধুর কথা। আমি ধীরে ধীরে প্রাচীরের উপর উঠিলাম। সর্ব্বনাশ! গায়িকা বীণাপাণি! আর তাহার পদনিম্নে সিঁড়ির উপর অর্দ্ধশায়িত শ্রোতা অমিয়নাথ। বীণাপাণির সে বেশ নাই। সে আজ সামান্য হিন্দু বাঙ্গালী গৃহস্থ কন্যার মত সজ্জিতা। তাহার নিটোল অলক্ত রঞ্জিত পদদ্বয়ের শোভা কি মনোরম। অমিয়নাথের নগ্ন গাত্র যেন মাখন-নির্ম্মিত। তাহার কান্ত মসৃণ বপু প্রকৃতই রমণীমোহন। আমি বিস্মিতভাবে তাহাদিগকে দেখিয়াই আবার লুকাইলাম।

"গীত-অবশেষে নিশ্বসিল কবি বল কি গায়িবু আর
হৃদয়ের গান ফুটিল না ভাষে বাজিল না হৃদি-তার।"

এস্থলে কিন্তু বোধ হইল বীণাপাণির মরমের কথা তাহার সংগীতের সহিত ফুটিয়া বাহির হইল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অতি কাতর দৃষ্টিতে অমিয়নাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—সত্যি বীণু পরের কথায় ভয় করতে গেলে প্রেম হয় না।

'বীণু' তাহার চির-বিষাদ-মলিন অপাঙ্গে একটু হাসিয়া বলিল—মোটেই না।

সে কটাক্ষ-আয়ুধ নীরবে সহ্য করা যুবক অমিয়ের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিয়া কাতরভাবে বলিল—তবে কেন বিলম্ব বীণু? আমি তো পরের কথায় ভয় না ক'রে তোমায় নিয়ে চ'লে এসেছি। এখনও তুমি ধরা দিচ্ছ না কেন? সত্যি বীণু আরতো অপেক্ষা করতে পারি না।

বীণাপাণির নলিনসুন্দর মুখখানি একটু গাম্ভীর্য্যের ভাব ধারণ করিল। সে বলিল—"অমিয়! তুমি জমিদার, দেশের রাজা। আমি দরিদ্রের ঘরের বাল বিধবা, আমাদের দেশের সমাজে ঘৃণিতা। তোমাকে বিয়ে করব বলেই তো তোমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু তোমাকে পরীক্ষা না ক'রে—"

"আর কি পরীক্ষা করবে বীণাপাণি? তোমার জন্তে তো সকলকে ছেড়ে

এসেছি। দেশে নিশ্চয়ই রাষ্ট্র হয়েছে যে, আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়েছি। তোমার মা আমার মুণ্ডপাত করছে, আমার শত্রুপক্ষ কর্ম্মচারীর দল—"

সহসা মুখভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া একটু ব্যঙ্গ করিয়া যুবতী গাহিল—

"আমি চাহি না তার ভালবাসা, সে ভাল থাকে এই চাই,
ভালবাসে আরও ভাল না বাসিলে ক্ষতি নাই।"

প্রেমোন্মত্ত যুবক হৃদয়ের আবেগটা একটু শুধরাইয়া লইয়া বলিল—"সত্য কথা বীণু। তুমি অপেক্ষা করতে বল, আজন্মকাল অপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু—"

রমণী কঠোরভাবে বলিল—"দেশে ফিরে গেলে বিয়ে হ'বে। তখন তোমার পরীক্ষা সম্পূর্ণ হ'বে।"

তাহাদের ঘাটে দুইটা মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোক স্নান করিতে আসিল। সঙ্গে একটা পাণ্ডা নানারূপ মধুর বচনে তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতেছিল। সুতরাং প্রণয়ীযুগলের চমক ভাঙ্গিল। তাহারা উঠিল। আমি ধীরে ধীরে আমার ঘাটে আসিয়া কচ্ছপের দলকে ছোলা ভাজা খাওয়াইতে বসিলাম। ঘাটের উপর দিয়া তাহারা কেশীঘাটের নৌকার পুলের দিকে চলিয়া গেল।

(৪)

কয়দিন ধরিয়া বৃন্দাবনে ঘুরিলাম। বাঙ্গালীর প্রধান তীর্থ গোবিন্দজীর মন্দিরে সন্ধ্যার পর বাঙ্গালা ভাষায় গীত হরি সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতাম। গোপীজি, মদনমোহন, বঙ্কুবিহারী প্রভৃতির মন্দিরে মাঝে মাঝে অমিয়নাথের সাক্ষাৎ পাইতাম। একদিন গয়ালিয়রের ঠাকুরবাড়ীর প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তীর নিকট একটি পাণ্ডার সহিত বীণাপাণিকে দেখিতে পাইলাম। সে আমার দিকে বেশ সরল দৃষ্টিতে তাকাইল। কোনরূপ ঘোমটা দিবার চেষ্টা করিল না। আমি প্রশ্রয় পাইয়া পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাবু কোথা?' পাণ্ডাজি প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বেই বীণাপাণি বীণাকণ্ঠে বলিল—তিনি বাসায় আছেন।

কেন বলিতে পারি না, সমস্ত শরীরটা স্পন্দিত হইয়া উঠিল। আমি "ওঃ" বলিয়া লোই বাজারের দিকে চলিয়া গেলাম।

বৃন্দাবনের লালাবাবুর কুঞ্জ নামক মন্দির খুব বিশাল। এখানে অনেক দেব-প্রতিমা আছে। একটা সুন্দর বাগান আছে এবং সাত মহাল বাটীর মধ্যের প্রাঙ্গণে একটা খুব উচ্চ আগাগোড়া স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ আছে। একদিন দেখি অমিয় ও বীণাপাণি উভয়ে সেই স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে

দেখিবামাত্র নমস্কার করিয়া অমিয়নাথ বলিল—কি মশায়, সোণার তালগাছ দেখছেন?

আমি হাসিয়া বলিলাম—হ্যাঁ। পূর্ব্বে সোণার পাথর বাটি শুনেছিলুম, এখন সোণার তালগাছ দেখলাম।

উঁহারা উভয়েই একটু হাসিল। আমি বলিলাম—আচ্ছা কোন্ দেবালয়ে বেশী শিল্প কাজ আছে ব'লে বোধ হয়?

অমিয় বলিল—কেন? জয়পুর রাজার নূতন ঠাকুর বাটীটি। কেমন সূক্ষ্ম কাজ দেখেছেন।

বীণাপাণি হাসিয়া বলিল—সাহজীর মন্দিরই সকলের চেয়ে ভাল। আহা কেমন সুন্দর শ্বেত পাথরের স্তম্ভগুলি! দেওয়ালে কেমন জড়োয়া কাজ!

ঠিক আমার সহিত কথা না কহিলেও অমিয়নাথের সাক্ষাতে বীণাপাণিকে এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে শুনিয়া আমি একটু বিস্মিত হইলাম। অমিয়নাথ কিন্তু ইহাতে কিছু দোষ দেখিল না। আমিও কথাবার্ত্তায় যোগ দিলাম।

তাহার দুইদিন পরে বীণাপাণিকে একাকিনী পাণ্ডার সহিত সাহজীর মন্দিরে দেখিয়া সাহস করিয়া বলিলাম—আপনার কথাই ঠিক। এ মন্দিরটী বৃন্দাবনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বীণাপাণি পরিচিতের মত উত্তর দিল। তাহাকে অমিয়নাথের পরিণীতা স্ত্রী জানিলে অবশ্য তাহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিতাম না। দুই একটী কথার পর যুবতী বলিল—আপনি দিল্লি যাবেন?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল—আমরা যে বাসায় থাকিব দিল্লিতে আপনিও সে বাসায় থাকিবেন?

আমার মুখ শুকাইতে ছিল। আমি একটী মাত্র কথা দ্বারা সম্মতিসূচক উত্তর দিলাম।

সে বলিল—দিল্লিতে বিজয়নাথ মজুমদার বলিয়া একটী ভদ্রলোক থাকেন। কোথায় থাকেন, কি করেন তা' জানি না। আপনি কোনও বাঙ্গালীর নিকট হইতে সন্ধান লইয়া গোপনে আমাকে তাঁহার ঠিকানা জানাবেন?

বলা বাহুল্য, সুবোধ বালকের মত তখন তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। রহস্যটা কিছু বুঝিলাম না। আমার মুখের ভাব দেখিয়া বীণাপাণি বলিলেন—তিনি আমার আত্মীয়। কলহ ক'রে বাড়ি ছেড়েছেন। এতদূর যদি এলাম তবে একবার সন্ধান ক'রে দেখি না।

এ সময়ে, বিশেষতঃ সে মধুর স্বরে অবিশ্বাস করিবার কিছু ছিল না।

(৫)

দিল্লিতে গিয়া প্রসিদ্ধ ডাক্তার সেনের ঔষধালয় হইতে বিজয়নাথের সন্ধান পাইয়াছিলাম। সে পোষ্ট অফিসের সহিত কলিকাতা হইতে দিল্লিতে বদলি হইয়াছিল। বিজয় দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ, তবে মুখে বিষাদের ভাব। তাহাকে খুঁজিয়া পাইয়াছি শুনিয়া যুবতীর মুখে যেরূপ একটা অধীরতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহাতে একটা বিশেষত্ব ছিল। আমার বোধ হয় এই সংবাদে তাহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা ঈষৎ কম্পিত হইয়াছিল। এ সংবাদের প্রথম ঘোরটা কাটিয়া গেলে বীণাপাণি আমার হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিল—আপনার ঋণ আমি জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। আপনাকে এই পত্রখানি তাহার হস্তে দিয়া উত্তর আনিতে হইবে।

আমি তাহাতেও সম্মত হইলাম। ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি, তাহা তখন একবারও ভাবিলাম না। পত্রে কি লেখা থাকিতে পারে, এই যুবক যুবতীর মধ্যে কি গুপ্ত সম্বন্ধ আছে, তখনও তাহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলাম না। আমি তখন স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। দেখিতেছিলাম কোন্ কূলে গিয়া উঠি। পত্রের ভিতর যে বিশেষ একটা কিছু গুরুতর সংবাদ লিখিত ছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যুবক বিজয়নাথ পত্র পাঠ করিয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। সে একবার আমার দিকে চাহিল, বারংবার পত্র পাঠ করিল, দুই একবার ঘরের বাহিরে গিয়া বারান্দায় পায়চারি করিল, শেষে আমাকে বলিল—"বলিবেন, কাল সকালে ৮টার সময় ফিরোজসার কোটলায়।"

ভারবাহী বলদের মত সংবাদ বহিয়া আনিয়া গোপনে বীণাপাণিকে দিলাম। সুধা বহিয়া আনিলাম কি গরল বহিয়া আনিলাম, তাহা কিন্তু বুঝিলাম না।

(৬)

সাজাহানাবাদ দিল্লীর ঠিক বাহিরেই পাঠান ভূপতি ফিরোজসাহের দুর্গের ভগ্নস্তূপ অবস্থিত। ইহাকে 'ফিরোজসাহের কোটলা' বলে। স্থানটি খুব নির্জ্জন। কেবল কতকগুলা ভগ্নস্তূপ কালের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে মাত্র। সেই ভগ্ন অট্টালিকা স্তূপের উপর হইতে অদূরে ক্রীড়াশীলা যমুনার শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। হুমায়ুনের সমাধি প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ অট্টালিকাও সেস্থল হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার সন্নিকটেই ইন্দ্রপ্রস্থ। ফিরোজসাহের কোটলার উপর দাঁড়াইলে ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষেরও কতকটা

নয়নগোচর হয়। যেদিন পত্র বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম তাহার পরদিন প্রভাতে বীণাপাণির অনুরোধে কোটলার উপর বেড়াইতে আসিয়াছিলাম।

আজ বীণাপাণির মুখে একটা প্রতীক্ষার ভাব। তাহার বক্ষের নিকট কর্ণ লইয়া গেলে একটা দুরু-দুরু শব্দ শুনা যাইত। সে অন্যমনস্ক হইয়া সকলই দেখিতেছিল অথচ কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। ধনী অমিয়নাথ কিন্তু তাহার এই ভাবটা আদৌ ধরিতে পারে নাই বলিয়া বোধ হইল। আমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে রমণী বিজয়ের জন্য উৎসুক হইয়াছিল।

আটটা বাজিয়া গেল। কোটলার নিম্নের পথ দিয়া একটা রাসভচালক কতকগুলা পশ্চিমে সাদা গাধা লইয়া গেল। সেই ধ্বংসরাশির উপর একটা প্রস্তর স্তম্ভ আছে। লোকে বলে উহা অশোকের স্তম্ভ। তাহার উপর একটা ময়ূর উড়িয়া আসিয়া বসিল। আমরা ময়ূরটার দিকে তাকাইলাম। হঠাৎ অমিয় বলিল—কিহে বিজয়! তুমি কোথা থেকে?

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম, বিজয়। বীণাপাণির গণ্ডযুগল একবার লাল হইতেছিল আবার পরক্ষণেই রক্তহীন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। তাহার নিম্নোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল এবং তাহার সর্ব্বশরীরের মধ্য দিয়া যেন একটা তাড়িৎ প্রবাহ বহিয়া যাইতেছিল। যুবক বিজয়নাথেরও তাদৃশ অবস্থা।

তাহাদিগের মিলনের প্রথম আবেগ কাটিয়া গেলে রমণী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বিজয়ের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"বিজয়, বহুকষ্টে এসেছি। আর তোমায় ছাড়ব না।"

আমি একবার অমিয়নাথের দিকে চাহিলাম। ভূত দেখিলে মানুষের যেরূপ চেহারা হইতে পারে, তাহার সেইরূপ চেহারা হইয়াছিল।

বিজয় একবার অমিয়নাথের দিকে তাকাইয়া সুন্দরীকে বলিল—"তোমার সংবাদ আমি রাখি, দেশ থেকে খবর পেয়েছি তোমার বিধবা বিবাহ হ'বে। কার সঙ্গে? অমিয়বাবু কি তোমার ভাবী স্বামী?"

তাহার পর বীণাকণ্ঠে যুবতী বলিতে লাগিল—"বিজয়, আমার স্বামী কে? যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল তাহাকে তো বিবাহ রাত্রে দেখিয়াছিলাম মাত্র। ধীরে ধীরে যেমন শৈশব ছাড়িয়া যৌবনের পথে অগ্রসর হ'লাম তোমার মূর্ত্তি বেশ দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'ল। তুমি আমায় গান শেখালে, লেখাপড়া শেখালে, প্রেম শেখালে, তোমাকেই স্বামী ব'লে জানলাম।

তোমার মা বাপ জান্‌তে পেরে তোমার বিবাহ দিলেন, আমার মাতা আমাকে নিগৃহীত করলেন। সে কথাটা গ্রামের কেউ জান্‌লে না। জমিদারের পুত্র অমিয়ও না।"

তাহারা উভয়ে একবার ভ্রুকুটি করিয়া অমিয়নাথের দিকে চাহিল। রমণী বলিতে লাগিল—"তুমি স্ত্রী নিয়ে কল্‌কাতায় চলে এলে। পরে শুনলাম দিল্লি এসেছ। আমিও জীবনপট থেকে তোমার প্রতিমূর্ত্তি মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এ তিনবৎসর কি ভুগেছি, বিজয়, অন্তর্য্যামী জানেন।"

বিজয় চোখে হাত দিল। বোধ হয় কাঁদিতেছিল। অশোকস্তম্ভের উপরের ময়ূরটা কেকারব করিল। বিজয় ক্ষীণ অস্পষ্টস্বরে বলিল—"আমিও কি ভুগিনি? এসব কথা এখানে কেন?"

রমণী বলিল—"কেন? পাপীর নিকট তার পাপের কাহিনী বল্‌লে পাপীর শাস্তি হয়। দেশের জমিদারের মৃত্যু হ'ল। অমিয়নাথ দেশের রাজা হ'লেন। সুতরাং গৃহস্থ প্রজার বিধবা কন্যার উপর তো তাঁহার অধিকার ছিলই। কি উপায়ে তিনি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলেন তা' আর শুনে কাজ নেই। প্রথম প্রথম মনে হ'ত হতভাগাকে মিষ্ট কথায় কাছে এনে বুকে ছুরি মারি!"

অমিয়নাথ বসিয়া পড়িল। রমণী এত ঘৃণা গোপনে পোষণ করিয়া কিরূপে কয়দিন অমিয়নাথের সহিত একত্র বাস করিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিল না। বেশ অভিনেত্রী! রমণী বলিল—"একটা দুশ্চরিত্রা রমণীকে দিয়ে সে আমায় চিঠি পাঠাতে লাগলো, মাঝে মাঝে ভয় দেখাতে লাগ্‌লো। আমি চিঠির জবাব দিতাম না। শেষে ছ' মাস পূর্ব্বে শুনলাম তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হ'য়েছে।"

বিজয় কোন কথা বলিল না। সে কেবল মাঝে মাঝে অমিয়নাথের প্রতি চাহিতেছিল। বীণাপাণি বলিল—"আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। ভাবিলাম এখন তোমার চরণে আশ্রয় লইতে কোন পাপ নাই। ভগবানের চক্ষে তুমি আমার স্বামী। তাই দুর্ব্বৃত্ত অমিয়নাথের সহিত ভালবাসার ভান করিয়া তাহার নিকট থেকে শপথ করিয়ে নিলাম যে সে আমাকে বিধবা মতে বিবাহ করবে। আপাততঃ তার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ করব। সে আমাকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করবে না।"

অমিয়নাথের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। বীণা হাসিয়া বলিল—

"অমিয় আমায় প্রেম সাজাইল, অলঙ্কার দিল। আমিও প্রেমের ভান করিলাম, তাহাকে গান শুনালাম, তাহাকে কত আশা দিলাম। কিন্তু বেশ বুঝিতাম তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। আমি তাই এই জিনিষ সর্ব্বদা কাছে রাখতাম।"

যুবতী হাসিয়া একটা বিষের পুরিয়া বাহির করিল। শেষে গম্ভীরভাবে বলিল—"বিজয়! যা' চেষ্টা করবার করলাম। ঘৃণা হয় আমায় আশ্রয় দিও না, এই বিষ আমায় আশ্রয় দেবে।"

এবার বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। বিজয় অশ্রুমোচন করিতে করিতে যুবতীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিল। অমিয় উঠিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল —বীণা!

বীণা হাসিয়া বলিল—"অমিয় তোমার অনুগ্রহে রত্ন পেলাম। তোমার সোণার খাঁচা আমার স্থান নয়। চল বিজয়, আমরা 'ঘুঘুর বাসা' নির্ম্মাণ ক'রে স্বর্গ-সুখ ভোগ করিগে।

একে একে অলঙ্কারাদি খুলিয়া রাখিয়া বিজয়ের হাত ধরিয়া রমণী নামিয়া গেল। অমিয়নাথ কোন কথা কহিল না! একদৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। আমি বেগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে অপর রাস্তা দিয়া সরিয়া পড়িলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কোথায় আমার ছেলে।

১

তুমি মাঝি?—সাগর থেকে এলে?
আমার ছেলে, কোথায় আমার ছেলে?
"তোমার ছেলে? কি নাম বাছা তার?
কোন্ নায়ের সে ছিল চড়ন্‌দার?"

২

আমার 'সমীর' সাগর গেছে চলে,—
কোন্ নায়েতে যাইনিত সে বলে'
তুমি যখন সাগর থেকে এলে—
জানলা কে 'সমীর'?—আমার ছেলে।
এ নগরে চেনেনাক তারে,—
এমন কেহ নাইক পারাপারে।

৩

সাগর থেকে তুমি ফিরে এলে,—
কোথায় 'সমীর' কোথায় আমার ছেলে?
তুমি যদি চেননা বাছারে—
মাঝি তুমি—বলবে কে তোমারে?
মিছে তোমার দাঁড় বওয়া আর হাল্;
মিছে তোমার দড়াদড়ি ও পাল;
তীরের মতন নৌকা ছোটায় 'সমীর'—
"আস্তে বল—হ'য়োনা অধীর।"

আস্তে কেন বল্‌তে বলছ মাঝি ?
বাছা আমার সকল কাজের কাজী।
তাহার খ্যাতি রাষ্ট্র সহর ময়,
শুনে আমার বুক যে দশহাত হয়!
তার কথা কি আস্তে বলা চলে ?—
"ডুবেছে তার নৌকা খানি জলে।"

৫

যাক্‌গে নৌকা কি হয়েছে তায় ?—
আমার বাছা 'সমীর' সে কোথায় ?
মাঝি, তারে কোথায় দেখে এলে ?
কোথায় 'সমীর' কোথায় আমার ছেলে ?
"নৌকাভরা যাত্রা ছিল যারা,—
দেখ্‌তে দেখ্‌তে তলিয়ে গেল তারা।"

৬

কি ফল মাঝি তাদের কথা তুলে ?
আমার বাছা কোথায়—বল খুলে।
মায়ের প্রাণ আর সইবে কতক্ষণ—
বাছা আমার বুক-জুড়ান ধন!
আমার বাছা—আমার বাছা মাঝি,
'সমীর' 'সমীর' কোথায় কোথায় আজি

শ্রীরসময় লাহা।

কবিতা-চতুষ্টয়।*

বিশ্ব-সঙ্গীত।

(রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে)

ওগো আমার চিত্তহরণ, মনোমুগ্ধ নিত্যবরণ!
এসেছি আজ দ্বারে!
তোমার ঐ বিজন বিপুল কোলে, বিশ্ব তোমার দোলে,—
আমায় রেখো ঘিরে!
মর্ম্মরিয়া চিত্ত মম, আজি বিশ্ব পানে ধায়!
অজানা দেশের চেনা-কথা মর্ম্মে গেয়ে যায়!
কতকালের স্মৃতি ওগো, ঐ মেঘের আড়াল দিয়া,
আজি মৃদুস্পর্শে, জাগে হর্ষে, চিত্ত পুলকিয়া!
খেয়া-পারের কত কথা, নিত্য জাগায় কাণে!
নেচে উঠে হঠেক পুলক, তালে তালে প্রাণে!

ওগো আমার হৃদি-হরণ, মুগ্ধকারী রাঙা চরণ!
রাঙিয়ে যাও হিয়ে!
তোমার শ্যাম-স্নিগ্ধ কালোছায়া,
ঘনানন্দ, দয়া, মায়া,
বহুক হৃদি ছেয়ে!
মর্ম্মকোষের গন্ধ ছুটে—তব নয়ন পাতে!
উচ্ছ্বসিয়া উঠ্‌ছে গীতি, জ্যোৎস্না পুলক রাতে!
খেয়ার নেয়ে, ত্বরা তরী, দাও গো ছেড়ে দাও!
চিত্ত-দোলা দুলিয়ে আজি ধাও গো ওগো ধাও!
ক্রমে ঘনিয়ে আসে মেঘ,—আর কোরোনা দেরী
সময় হ'লো যেতে হবে—আকাশ কোণে হেরি!

* কবিতা কয়টীতে বুঝিবার কিছু নাই। কারণ এ যে কেবল গন্ধ!" ইতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ।

মিলনে।

(ব াল কবির অনুকরণে)

ঝাপটে ঝটিকা বহে,
জীবন মরণ সহে,
তবুও আসিবে তুমি—সম্মুখে আবার।
কত কথা জাগে প্রাণে,
মর্ম্মে মর্ম্মে হাহা হানে,
কি বলিব প্রিয়ে তুমি—সর্ব্বস্ব আমার।
যুগ যুগান্তর ধ'রে,
ধরি দুই করে করে,
বেসেছি হৃদয়ে ভাল এই অপরাধ !

সাজা দিবে তারি তরে,
'চির ব্রহ্মচর্য্য করে',
এ কেমন দণ্ড প্রিয়ে,—একি পরমাদ!
বহিছে তুমুল ঝড়,
বজ্র ডাকে কড়্ কড়্,
আমি কেন মিছে করি স্বপন-রচনা ;
শুনিবে না কোন কথা,
বুঝিবে না মর্ম্মব্যথা,
প্রিয়া মোর নাই হেথা—'জীবন ছলনা' !

স্মৃতি।

(দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণে)

আজি কুহমিত স্বপ্নচ্ছায়া,
খেলে যাচ্ছে—চারি ধার।
কি ভঙ্গিমা,কি জড়িমা,আহা কিবা—চমৎকার !
দেখ্‌তে দাও প্রাণ ভরে, ত্যক্ত আমায়
কোরো না !
একটা যেন স্বর্গ থেকে নেচে আস্‌ছে মূর্চ্ছনা।
এ সুষুপ্তি জাগরণে, বহুক জোরে দীর্ঘশ্বাস !
কিছুক্ষণ ছেড়ে দাও, এরি মধ্যে করি বাস।
দুর্গাদাসের বজ্র মুষ্টি, সূর্পনখার গর্ভপাত,
সাজাহানের দীপ্ত রশ্মি, দুর্য্যোধনের আত্মসাৎ,
কলকণ্ঠে জাগে চিত্তে, বসে বসে দেখি সব।
সূর্য্য ঘুচ্ছে' জগৎ ঘিরে,—শিরায় শিরায়
অনুভব !
একটা গীতি, একটা গন্ধ, একটা মহামহিমা,
জাগিয়ে দিচ্চে মনের মধ্যে তীব্র, গাঢ় গরিমা !
একটু হাসি, একটু কাঁদি, ছেড়ে দেরে ছেড়ে দে
উঠুক বন্যা প্রবল বেগে, ভাসিয়ে দেরে
ভাসিয়ে দে !

একটি শিশুর প্রতি।

(দেবেন্দ্রনাথের অনুকরণে)

আয় আয় ওরে শিশু, মেরীর বালক যিশু,
আদরের সোহাগের তুই !
ওই তব দিব্য কান্তি, কোথা লাগে 'পূরকান্তি' !
ঠিক যেন জলে ধোয়া জুঁই !
হেরি তোরে চিত্তচোর, পড়ে মনে কৃষ্ণে মোর,
আহা ! সেই শ্যাম নটবরে !
আয় আয় কোল-ভরা, নয়ন-কাজল তোরা,
দেখি তোরে, দেখি প্রাণভরে !

রাব্‌ড়ীর সর তুই, গোলাপী-গাণ্ডেরী তুই,
কবি-চিত্ত মুগ্ধ উহা ঢেকে' !
কি আর বলিব তোকে, তোর ওই রূপ দেখে,
চিত্ত মম ফুটি-ফাটা সুখে !
যবে আহা ! তোরে হেরি,গোপিনীরে মনে করি
বস্ত্র-চোরা ধন তুই মোর !—
দুধে ক্ষীরখণ্ড সম, হৃদয় হইল মম,
নয়নেতে বহে যায় লোর !

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

পরলোক-বাদ।*

(দার্শনিক-মীমাংসা।)

জড়-বিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে পরলোক-তত্ত্বের বা পরলোকবাদের মীমাংসার প্রয়াস ব্যর্থ, এবং অনেক সময়ে বাতুলতা বলিয়াই বিবেচিত হইবে। ইন্দ্রিয়-জন্য অনুভূতি বা যাহাকে সাধারণতঃ আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞান বা বহিরিন্দ্রিয়জ-জ্ঞান (Perception) বলিয়া থাকি, তাহা পরলোক সম্বন্ধে সম্ভাবিত নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, তাহা কদাপি ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেনা। জড়-দেহের অবসানে, জড়রূপী সূক্ষ্মদেহের দর্শন যদি নিত্য-প্রত্যক্ষই হইত বা সকলের ভাগ্যেই ঘটিত, তবে আর এ আলোচনার প্রয়োজন থাকিত না। পরন্তু তথা-কথিত সূক্ষ্মদেহের দর্শন অনেক সময়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রান্তি-মূলক ও কল্পনা-বিজৃম্ভিত (Illusion) মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে।

প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হইতেই অনুমানের উৎপত্তি, অথবা অনুমান সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ-মূলক। সুতরাং, জড় ও মনোবিজ্ঞানানুমোদিত এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানরূপী দ্বিবিধ পন্থাই, পরলোক-তত্ত্বরূপী চরম সত্য নির্ণয়-পক্ষে অনবলম্বনীয়। তজ্জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"—অর্থাৎ, তর্কের দ্বারা কখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, অথবা চরম সত্য নির্ণীত হয় না।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"।

তবে উপায়? অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রকারেরা এই সমস্ত তত্ত্ব বা চরম সত্য-নির্ণয়ে (Eternal verities or ultimate realities) আপ্ত বা ঋষি-বাক্যকেই একমাত্র উপায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রদীপ্ত যুগে অনেকেই আপ্ত বা ঋষি-বাক্যে ততদূর শ্রদ্ধাবান্ নহেন। শ্রুতি-বাক্য ও উপপত্তি দ্বারা মনন করিতে হইবে।

* গত ২১এ বৈশাখ, "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-বরিশাল শাখা"র অন্যতম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতি বাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।"

আপ্ত বাক্য ও যুক্তিদ্বারা মনন করিতে হইবে। এই যুক্তি কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান নহে। যাহাকে সাধারণ ভাষায় অন্তর্দ্দৃষ্টি বা দার্শনিকের ভাষায় "আত্ম-জ্ঞান" তাহাই যুক্তি।

প্রবন্ধান্তরে পরলোক-বাদ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের, জড়-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ভেদ হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিলে, তর্ক-মার্গে শূন্য-বাদে ও সংশয়-বাদে (Nihilism or Agnosticism'এ) উপনীত হওয়া অনিবার্য্য। পারমার্থিক জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় আত্ম-দর্শন। পরলোক-তত্ত্ব একটি বিশেষ পারমার্থিক তত্ত্ব। আর যদি আমাদের এই পরমার্থ-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই না থাকিত, তবে আর নিত্য-প্রত্যক্ষ মৃত্যুর পরে কি ঘটে, এ প্রশ্ন কখনও আলোচনার বিষয় হইত না। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"—এই নাস্তিক্য-বুদ্ধিই ঐ প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান বলিয়া বিবেচিত হইত। পরলোক-বাদ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব-প্রবন্ধ অনেকেই নাস্তিকতা-প্রতিপাদক বলিয়া মনে করিয়াছেন, এবং করিবার কারণও ছিল। সে প্রবন্ধে বিরোধসমন্বয়ের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। পারমার্থিক তত্ত্ব-নির্ণয়ে, জড় ও মনোবিজ্ঞানের অক্ষমতা প্রদর্শনই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। গীতার কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক :—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ,
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

আত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত ক্ষয়-বৃদ্ধিহীন, অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীরের বিনাশে, আত্মার বিনাশ হয় না।

অন্যত্র—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।

ইহাকে শস্ত্র দ্বারা ছেদন করা যায় না। অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। জল ইহাকে ক্লেদন করিতে পারে না। বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইহার ছেদন, দাহন, ক্লেদন, শোষণ কিছুই নাই। আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে প্রবৃত্ত হইলে, আত্মীয় ও স্বজনবর্গের নিধন অনিবার্য্য, ইহা মনে করিয়া বীরকুলাগ্রগণ্য অর্জ্জুন, যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, মৃত্যু ও আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যানে, উদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল। দেখা যউক, এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বন করিয়া আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে আমাদের সংশয়ের নিরসন করিতে পারি কিনা।

পরিদৃশ্যমান জগতের ও জাগতিক ঘটনানিচয়ের অন্তরালে বা পশ্চাতে, যে এক নিত্য সত্তা বিরাজ করিতেছে (The reality behind phenomenon or the noumenal world behind phenomenal or emperical) তাহা স্বীকার না করিলে সর্ব্বতোভাবে মায়া বা শূন্যবাদে উপনীত হইতে হয়, এবং ইহাই দার্শনিক নাস্তিকতা। পরলোকে বা মৃত্যুর পরপারে আমরা কাহার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য ব্যাকুল? যাহা চঞ্চল, যাহা ক্ষণ-স্থায়ী, যাহা ইন্দ্রিয়-জন্য তাহাকেই কি অনন্তকাল স্থায়ী করিতে চাই? তাহাতেই কি আমাদের পরলোক-জিজ্ঞাসার তৃপ্তি হইবে? পূর্ব্ব-লোকের আলোচনা না করিয়া আমরা পর-লোকের আলোচনা কি প্রকারে করিতে পারি? মৃত্যুর পরে মানবাত্মার কি দশা ঘটে, এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে 'জন্মের' পূর্ব্বে মানবাত্মার কি অবস্থা ছিল, ইহা জিজ্ঞাসা করা কি অন্যায়? আর যে 'আত্মা'র আলোচনা করিতেছি তাহারই বা স্বরূপ কি? ইহা নির্ণয় না করিয়া ভবিষ্যতে কি অতীত কালে ইহার কি অবস্থা হইবে, তাহা আলোচনা করা নিষ্ফল। গীতার ভাষায়—"অব্যক্তাদিনীভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।" ভূতসমূহ আদিতে অব্যক্ত, শেষেও অব্যক্ত, কেবল মধ্যে ব্যক্ত; সুতরাং তজ্জন্য শোক কেন? এই বলিয়া সমস্ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার শেষ করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু, তাহা অসম্ভব। "If you philosophise you philosophise; if you don't philosophise, you philosophise,—at any rate you must philosophise." অন্তরঙ্গ ছাড়িয়া বহিরঙ্গে, সার ছাড়িয়া অসারে, নিত্য ছাড়িয়া অনিত্যে, আমরা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারি না।

অপরদিকে জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা কি কেবল পরিদৃশ্যমান্ জগতেই নিবদ্ধ? জড়-বিজ্ঞান কি কেবল প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত? না — প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অন্তরালস্থ কোন পারমার্থিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাও বিজ্ঞানানুমোদিত? রসায়ন-বিজ্ঞানের কথাই ধরুন্। পরমাণুবাদটা কি? পরমাণু কি কখনও আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে? পরমাণু কি কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? যদি না-ই করিয়া থাকেন তবে পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কেন, আর এই কল্পিত পরমাণুবাদের উপরে সমস্ত রসায়ন-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইল কেন? যতই সংযোগ ও বিয়োগ, আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করি না কেন, পরমাণুরূপ সূক্ষ্ম পদার্থ কখনও আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে নাই। ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ অনুভূতিই যদি একমাত্র জ্ঞানের উপায় বা দ্বার হইত, তবে আর বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? বহিরিন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে জ্ঞান বলিতে হয় বলুন, ইহা কখনও বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিজ্ঞান নহে। এই অর্থে মানব সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞান-বাদী। পারমার্থিক তত্ত্ব-চিন্তাই মানবের বিশেষত্ব; এবং পরলোক-জিজ্ঞাসাও সেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারই একাংশ। অনিত্যের অন্তরালে যে নিত্য পদার্থ, পরিবর্ত্তনশীলের পশ্চাতে যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, দৃশ্যের অন্তরালে যাহা অদৃশ্য, আমরা তাঁহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত। মৃত্যু-রূপ যবনিকার অন্তরালে কোন্ অমৃত বিরাজমান? আমার 'আমিত্ব' কোথায়? বার্দ্ধক্য ও বাল্যের মধ্যে যে সমস্ত মানসিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি বা শারীর ক্রিয়া সম্পন্ন করি—কেবল তাহাই কি 'আমি' বা আমার 'আত্মা', না, তদতিরিক্ত কিছু ও আমার এই 'আমিত্ব' বা আত্মা?

যদি সাধারণ ভাবে সেই অতিরিক্ত কিছুর প্রমাণ চান, তবে সম্মোহনের (Hypnotic or mesmeric) অবস্থার কথাই স্মরণ করুন। কত অভাবনীয় শক্তির উন্মেষ দেখিতে পাইবেন! নখচ্ছেদ্যা কোমল লতিকার ন্যায় দুর্ব্বলা রমণীকে উন্মাদনার অবস্থায় (Hysteric condition'এ) কখন কখনও মত্ত মাতঙ্গের অপেক্ষাও বলশালিনী দেখিতে পাইবেন। সেই প্রকার অবস্থায় বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত কত কথাই স্মৃতি-পথে জাগরূক হয়; কাষ্ঠ-লোষ্ট্রসম কঠোর প্রাণেও কত কবিতা-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, কত মূক বাচাল হয়, কত পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। অপর দিকে দেখুন, অসভ্য নাগা, গারো, সাঁওতাল, ভীল্, হটেণ্টট্, জুলু প্রভৃতিরাও মনুষ্য; আবার, কালিদাস ও ভবভূতি, শঙ্কর ও জৈমিনি, আর্য্যভট্ট ও খনা, সেক্সপীয়র ও মিল্টন, স্পেন্সার

ও ডারউইন, ফেরাডে ও কেল্‌ভিন্‌, হিগেল্‌ ও কাণ্ট, ভিক্টরহুগো ও গেটেও মনুষ্য। ইহা দ্বারা কি সপ্রমাণ হইতেছে? ইহা দ্বারা কি মানবাত্মার অপরিমেয়, অনির্ব্বচনীয় অসীম শক্তি ও ক্ষমতা সূচিত হইতেছে না? ইহা দ্বারা কি সাব্যস্ত করা যায় না যে, যে 'আমিত্ব' আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ ও অনুভব করি, তাহার পশ্চাতে এক বিশাল, অননুভূত, অপ্রত্যক্ষ 'আমি' রহিয়াছে? পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাকেই The Great Unconscious 'বিশাল অননুভবনীয় আত্মা' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য সংশয়বাদী ও বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক হাক্সেলি, তাঁহার এক বক্তৃতায় (Romannes lecture) এতৎসম্বন্ধে প্রাচ্য দর্শনের সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন,—

"The earlier forms of Indian philosophy, agreed with those prevalent in our own times in supposing the existence of a permanent reality or "*Substance*" beneath the shifting series of phenomena whether of matter or of mind. The Substance of the Cosmos was *Brahaman*, that of the individual man "*Atman*" and the latter was separated from the former only, if I may so speak, by its phenomenal envelope, by the casing of sensations, thoughts and desires, pleasures and pains, which make up the illusive phantasmagoria of life."

তিনি বলিয়াছেন,—"এই পরিবর্ত্তনশীল ও অনিত্য জড় ও মনোরাজ্যের দৃশ্য ঘটনাবলীর পশ্চাতে এক যে অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য পদার্থ আছে এতৎসম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমানের যুগের সিদ্ধান্ত ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ এক। এই বিশ্বের মূলে 'ব্রহ্ম' পদার্থ, এবং আমাদের এই ব্যক্তিত্বের মূলে 'আত্মন্'। এই ব্রহ্ম পদার্থ ও আত্মার অথবা এই জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিভেদ সর্ব্বতোভাবে মায়িক, অর্থাৎ—সুখ ও দুঃখ, তৃষ্ণা ও কামনা প্রভৃতি উপাধি-জন্য"। "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ", অন্যত্র—"অজমব্যয়ং আত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে, ন পরমার্থতঃ, তস্মান্ন পরমার্থ সৎ দ্বৈতম্"।

অধ্যাপক হক্সেলি ভগবান্ শঙ্করের এই অদ্বৈত মত লক্ষ্য করিয়াই উল্লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। পরোক্ষ ভাবে ভিন্ন, বিশেষ ভাবে দ্বৈতাদ্বৈত মতের আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; কেবল অনিত্যের অন্তরালে যে নিত্য পদার্থ বিরাজমান, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন দেশীয় বিবুধমণ্ডলীর মত ও সিদ্ধান্তের প্রদর্শনই আচার্য্য হক্সেলির বাক্যোদ্ধারের উদ্দেশ্য।

যদি স্থূলভাবে দেখা যায় তবে পরিবর্ত্তন ও অনিত্যতা ব্যতীত আর কিছুই আমাদের লক্ষীভূত হয় না। শৈশবের 'আমি', বাল্যের 'আমি' নই; যুবা 'আমি', প্রৌঢ় 'আমি' নই; এবং বৃদ্ধ 'আমি' কিছুতেই শিশু, যুবা বা প্রৌঢ় 'আমি' নই। একথা যে কেবল দেহ সম্বন্ধেই প্রযুজ্য তাহা মনে করিবেন না। যাঁহারা বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি (Photos) রক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, দেহের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। বাল্যের আকৃতি ও বৃদ্ধের প্রতিকৃতিতে কত পার্থক্য,--একই ব্যক্তির ছবি বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। মনের কথাই ধরুন্—কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! জীবনের নানা ভাগ কেন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই মানবমনের যে কত পরিবর্ত্তন হয় তাহাইবা কত বিস্ময়কর! এই মুহূর্ত্তে আপনি স্নেহ ও দয়ায় পরিপূর্ণ, পর মুহূর্ত্তেই আপনি হিংসা-বিদ্বেষের প্রতিমূর্ত্তি। কখনও আপনি দেব-ভাবানুপ্রাণিত, কখনও আপনি অসুর-ভাবে পরিপূর্ণ। আপনি ইহার কোন্‌টি? অবিরাম স্রোত; কিন্তু, কিসের স্রোত তাহা লক্ষ্য করিবার সুযোগ, সময় ও সুবিধা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতেছে না। তবে কি স্মৃতিই 'আমি'? না, স্মৃতিও ত আমার!

কবি গিরীশচন্দ্রের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়:—

"জুড়াইতে চাই,—কোথায় জুড়াই?
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই!
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কি খেলায় আমি খেলিবা কেন?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন!
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর?
অধীর, অধীর, যেমতি সমীর,
অবিরাম-গতি নিয়ত ধাই।

আবার—

"জানিনা কেবা, এসেছি কোথায়,
কেনবা এসেছি, কেবা নিয়ে যায়?
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারি দিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই!

পুনরপি—

"কি কাজে এসেছি, কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হল!
প্রবাহের বারি বহিতে কি পারি?
যাই যাই কোথা? কূল কি নাই!
করহে চেতন কে আছে চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন।

এই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সার্ব্বজনীনতা সম্বন্ধে স্পেন্সারও সাক্ষ্য দিতেছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয় প্রদর্শনোপলক্ষ্যে তিনি বলিয়াছেন,—

"Common sense asserts the existence of a reality; objective science proves that this reality can not be what we think it; subjective science shews why we can not think of it, as it is, and yet are compelled to think of it as existing etc etc. We are obliged to regard every phenomenon as a manifestation of Some Power by which we are acted upon etc etc."

অর্থাৎ:—সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি যে, এক নিত্য সত্তা বিরাজ করিতেছে! আমরা যাহা মনন করি সেই সত্তা যে তাহা নয় এবং তদাতিরিক্ত কিছু,—জড় বিজ্ঞান তাহাই প্রতিপাদন করে; আর মনোবিজ্ঞান সেই সত্তার পূর্ণস্বরূপ আমরা কেন ধারণা করিতে পারি না, অথবা তাহার অস্তিত্বে কেন বিশ্বাস করিতে বাধ্য তাহাই বলিয়া দেন। যে শক্তি সর্ব্বদা আমাদের উপর ক্রিয়া করে, পরিদৃশ্যমান্ ও অনুভবনীয় প্রত্যেক ঘটনাই যে সেই শক্তির বিকাশ ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য।

আমাদের সমস্ত মানসিক ব্যাপার বা মনন-ক্রিয়া এক স্রোতস্বিনীর সহিত উপমিত হইতে পারে; আর যে 'খাতে' সেই চির-চঞ্চলা, নিয়ত-গতিশীলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা তাহাকে আমরা 'আত্মা' বলিতে পারি। সেই নিত্য সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন:—

"অজোঽনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

সেই আত্মা জন্ম-রহিত, নিত্য, ক্ষয়-রহিত; পুরাতন শরীর ধ্বংস হইলেও আত্মা ধ্বংস প্রাপ্ত হন না। কারণ মৃত্যুই বা কি? পরিবর্ত্তন,—একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তন বৈ ত নয়! কোনও পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন,—

"There is no Death,
What seems so is transition."

মৃত্যু নাই, যাহা মৃত্যু বলিয়া বোধ হয়, তাহা একটা পরিবর্ত্তন বৈ আর কিছু নয়। আমি এস্থলে জন্মান্তরবাদের বা গীতোক্ত—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

প্রভৃতি মতের সমর্থন বা খণ্ডন করিতেছি না। পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তনই যাহার প্রকৃতি, মৃত্যুরূপ ভীষণ পরিবর্ত্তনে তাহার ধ্বংসের আশঙ্কা কোথায়? আমাদের এই যে, 'ব্যবহারিক আমিত্ব' বা Phenomenal or Emperical Ego তাহা ত কতগুলি ক্ষণিক অনুভূতি ও পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। A mere flow of sensations, emotions, volitions and thought: বেদনা, কামনা, চিন্তা ও ভাবের প্রবাহ। জড়-দেহ কি?—অস্থি, উপাস্থি, মজ্জা,মেদ, মাংস ইত্যাদি। এই সমস্তই, পদার্থ-বিজ্ঞানের মতে,—প্রাথমিক, Primordial—অণু পরমাণুরই রাসায়নিক সমবায়। অর্থাৎ, মূল পদার্থ সেই এক 'পরমাণু'। বেশ কথা। আর এই বেদনা, চিন্তা, কামনা ইত্যাদির মূলে কি? জড়বাদীরা সমস্তই জড়-পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগোৎপন্ন মনে করেন, এবং বার্কলি প্রমুখ দার্শনিকেরা সমস্তই মানসিক বা Ideal বলিয়া থাকেন। উভয় শ্রেণীর দার্শনিকেরাই এদিকে অদ্বৈতবাদী, অর্থাৎ—তাঁহাদের মতে, হয় সমস্তই জড়, না হয় সমস্তই আত্মা। কিন্তু, আমরা এই জড় ও অজড়ের বিভেদের উপরেই আমাদের পরলোক-জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করিয়াছি। দেহের ধ্বংসশীলতা সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি নাই, কিন্তু জড়াতিরিক্ত 'আমিত্বে'র বিনাশ স্বীকার করিতে অনেকেই প্রস্তুত নহেন। জড়-বিজ্ঞানের মতে—যদি জড়ই অবিনশ্বর হয়, তবে কি আমাদের 'আত্মা' নশ্বর?

পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্পেন্সার এই কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সত্য—'অবিসম্বাদিত' বলিয়াছেন।—(The indestructibility of matter) জড়-পদার্থের অথবা পদার্থে অবিনশ্বরত্ব; (The continuity of motion) গতির নিত্যতা বা চির-প্রবাহ; (The persistence of force) শক্তির চির-স্থায়িত্ব।

জড়ের ধ্বংস নাই, গতির শেষ নাই, শক্তির সীমা নাই। তবে কি শেষ

আছে 'আত্মা'র ? যদি 'আত্মা' জড়েরই পরিণাম হয়, তাহা হইলেও ত এই মতে আত্মার ধ্বংস বা বিনাশ সাব্যস্ত হয় না !

আমাদের কোনো বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি অসম্ভব।

যাহা আমাদের নিকট সাধারণতঃ অদৃশ্য, তাহাও অবস্থা বিশেষে দৃশ্য হয়, যাহা অশ্রাব্য তাহাও শ্রাব্য হয়, যাহা অস্পৃশ্য তাহাও স্পৃশ্য হয়। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি বলে, 'অদৃশ্য আলোক'ও আমাদের নয়নের গোচরীভূত করিয়াছেন, অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দও আমাদের শ্রবণের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। তাঁহার কৌশলে অস্বচ্ছ পদার্থও স্বচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, দ্রব্যের অশব্দ স্পন্দনও শ্রুতি-যোগ্য শব্দে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা ও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অসারতা বিশেষ ভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, অদৃশ্য জগতের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিব কেন ?

এস্থলে অধ্যাপক টেইট্ ও ষ্টুয়ার্টের 'অদৃশ্য জগৎ ও পরকাল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা' "The future universe or physical speculations on a future state" নামধেয় গ্রন্থের সামান্য একটি অংশ উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। সেই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"In fine, we do not hesitate to assert that the visible universe cannot comprehend the whole works of God, because it had its beginning in time, and will also come to an end. Perhaps, indeed, it forms only an infinitesimal portion of that stupendous whole which is alone entitled to be called the universe."

অর্থাৎ, "শেষ কথা এই যে, ভগবানের সৃষ্টি, সম্যক্ দৃশ্য জগতে নিবদ্ধ হইতে পারে না ; কেন না, এই পরিদৃশ্যমান জগতের আরম্ভ আছে, সুতরাং ইহার শেষও হইবে। হয়ত এই দৃশ্য জগৎ সেই বিশাল সমগ্রতা—যাহাকে আমরা বিশ্ব বলিয়া থাকি—তাহারই সামান্য অংশ মাত্র।" যাহার সম্যক্ ধারণা হয় না তাহাই যদি অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় হয় (The unknown & the unknowable) তবে আমাদের কোনও পদার্থের বা বিষয়ের জ্ঞানই হইতে পারে না। পরলোকের ও আত্মার সম্যক্ ধারণা না হইলেও, তাহার পরমার্থিক জ্ঞান আমাদের নিশ্চয় আছে। যাহার সম্যক্ ধারণা হয় তাহাও জ্ঞান, যাহার আভাসও চিদাকাশে সামান্য ভাবে প্রতিবিম্বিত হয় তাহাও জ্ঞান। (Both comprehension &

apprehension come under the category of knowledge) আত্মা সম্বন্ধেও মহর্ষি বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

"আভাস এবচ

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ,"

অর্থাৎ, জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে আত্মার সেইরূপ প্রতিবিম্ব হয়।

আত্মা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনের মতেই স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ। ভগবান শঙ্করের নিম্নোদ্ধৃত বাক্য লক্ষ্য করুন।—"অতএব ন প্রমাণাপেক্ষা। অসিদ্ধস্য হি বস্তুনঃ পরিচ্ছিত্তিঃ প্রমাণাপেক্ষা চ নত্বাত্মনঃ। আত্মনশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষা সিদ্ধিঃ কস্য প্রমাতৃত্বং স্যাৎ, যস্য প্রমাতৃত্বং স এব আত্মা নিশ্চীয়তে।" ইহার সহিত ডেকার্টের সুপ্রসিদ্ধ *"Cogito Ergo Sum"* সূত্রের তুলনা করিলেই আমার এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন,—

জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তি লজ্জায়ৈ কেবলং যথা
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥
অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদোঽবিষয়ত্বতঃ।
স্বস্মিন্নপি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদাত্র কো ভবেৎ॥

অর্থাৎ—

"আমার জিহ্বা আছে কিনা, এই বাক্য প্রয়োগ যেমন লজ্জার কারণ হয়, বোধ-স্বরূপ 'আত্মা কি' তাহা আমার বোধগম্য হইতেছে না, ইহাও তদ্রূপ। আত্মার অস্তিত্ব বিবাদের বিষয় হইতে পারে না। যদি আপনার অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ বা তর্ক উপস্থিত হয়, তবে সেস্থলে প্রতিবাদী বা উত্তরদাতা কে হইবে?"

সেই স্বতঃসিদ্ধ আত্মাই অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। ইহাই অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইহার আবার বিনাশ কি? ইহার আবার ইহকাল ও পরকাল কি? ইহার পক্ষে আবার ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানবিভেদ কি? ইহা দেশ ও কালের অতীত। এই 'আত্মার' পরকালের জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কারণ কি? যাহা কালাতীত, তৎসম্বন্ধে কালবিভাগের—অর্থাৎ, ইহার পূর্ব্ব ও পরকালের প্রস্তাবনার আবশ্যক কি? প্রকৃত প্রস্তাবে দেহাবসানে আমাদের 'আত্মা'র বা আত্মিক জীবনের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য আমরা ব্যস্ত নই। আমরা চাই যে, আমাদের এই "কামক্রোধাদি রিপু-সংকুল, সুখ ও দুঃখ-সমাকুল, আশা-নিরাশা-সন্তাড়িত, স্নেহ-সিঞ্চিত, শোক-বিদগ্ধ ও পাপ-পরিপূর্ণ" এই 'ব্যক্তিত্ব' এ দেহাবসানেও রহিয়া যায়। এই আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে পরিহরণীয়া।

বাস্তবিক এই জীবন-রক্ষার প্রবৃত্তিই যে আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শনবিরোধী পরলোক-বাদের প্রণোদিকা, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। নচেৎ, দুঃখ-নিবৃত্তি, সুখলাভ ও স্বরূপাবাপ্তিই (Self-realisation) যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে আর এই দুঃখের আগার নাম-রূপ ইত্যাদি উপাধি রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হই কেন ?

আত্ম-জ্ঞান লাভেই পরলোক-জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি।

অনাত্ম ও অনাত্মীয় পদার্থে'আমি', 'আমার' এই অভিমানই দুঃখের নিদান। জ্ঞানালোকে এই মিথ্যাভিমান দূরীকৃত হইলে দুঃখ-বীজ দগ্ধীভূত হয়,এবং আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে।

আত্মানাত্মবিবেকের উন্মেষ ব্যতিরেকে এই পরলোক-জিজ্ঞাসার মীমাংসা কদাপি সম্ভাবিত নহে। 'আমি' পূর্ব্বেও ছিলাম, এখনও আছি, এবং পরেও থাকিব। কবি বলিয়াছেন:—

"Our birth is but a sleep and a forgetting.
The soul that rises with us, our life's star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar ;
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home."

(*Wordsworth's "Imitations of immortality from recollections of early childhood,"*)—

কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অনমুকরণীয় উদ্ধৃত কাব্যাংশের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যাহাকে 'জন্ম' বলি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'বিস্মৃতি'ও 'সুষুপ্তি'। আমাদের 'আত্মা'—জীবনাকাশের নক্ষত্র, বহু দূরদেশ হইতে আগত ; কিন্তু, নগ্ন ভাবে ও তাহার পূর্ব্ব ভাব সমস্ত বিস্মৃত-ভাবে উদয় হন্ না। ব্রহ্ম পদার্থে, যাহাতে আমাদের প্রকৃত অবস্থান, তাহা হইতে আমরা উজ্জ্বল মেঘমালার ন্যায় উদিত হই। কবিবর কল্পনা-নেত্রে যে বিশ্ব-বিমোহন সত্য দর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহারই দার্শনিক আলোচনা করিতেছি।

আমরা যে আত্মার 'অবিনশ্বরত্ব' বা দেহাবসানে পরলোকে অবস্থান প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহা 'জীব'; এবং এই জীব সর্ব্বতোভাবে উপাধি-তন্ত্র। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে আত্মা বলিয়া অনুভব করি তাহা প্রকৃত আত্মা নয়, তাহা উপাধি (দেহাদি) বশতঃ স্বরূপ-আত্মার প্রতিবিম্ব বা ছায়া মাত্র।

শঙ্করাচার্য্য 'দেহ যোগাৎ বা সোঽপি' সূত্রের ভাষ্যে এই কথাটি অতি প্রাঞ্জল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"কস্মাৎ পুনর্জীব পরমাত্মাংশ এব সংতিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি? সোঽপি তু জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভাবো দেহযোগাৎ দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি-বিষয়বেদনাদি যোগাদ্ ভবতি। অস্তি চাত্র চোপমা। যথা চাগ্নের্দহন প্রকাশন সংপন্নস্যাপি অরণিগতস্য দহনপ্রকাশনে তিরোহিতে ভবতো যথা বা ভস্মাচ্ছন্নস্য। অতোঽনন্য এবেশ্বরাজ্জীবঃ সন্ দেহযোগাদ্ তিরোহিত জ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি, তৎপুনস্তিরোহিতং সৎপরমেশ্বরম অভিধ্যায়তো যতমানস্য জন্তোঃ বিধুতধ্বান্তস্য তিমির তিরস্কৃতেব দৃক্‌শক্তিরৌষধ বীর্য্যাদ্ ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্যচিৎ আবির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্ব্বেষাং জন্তূনাং। কুতঃ। ততোহি ঈশ্বরাদ্ধেতরস্য জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। ঈশ্বর-স্বরূপাপরিজ্ঞানাদ্ বন্ধ স্তত্‌স্বরূপ পরিজ্ঞানাৎ তু মোক্ষঃ।"

অর্থাৎ—জীব যখন ব্রহ্মের অংশ তখন তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত হয় কেন? উত্তর—দেহ-সম্বন্ধ বশতঃ; দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত ও যেমন কাষ্ঠগত বা ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির দহন ও প্রকাশ করিবার শক্তির তিরো-ভাব হয় তদ্রূপ। অতএব, জীব ঈশ্বর হইতে অন্য না হইলেও দেহ-যোগবশতঃ অনীশ্বর হন্। যেমন তিমিররোগগ্রস্ত, নষ্টদৃষ্টি ব্যক্তির ঔষধের গুণে দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়া আসে, আপনা হইতে আসে না, সেই প্রকার তিরোহিতশক্তি জীব, ব্রহ্মের অভিধ্যানে যত্নশীল হইয়া তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে আপন নষ্ট-ঐশ্বর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হয়। কারণ, ঈশ্বর হইতেই জীবের বন্ধমোক্ষ। ঈশ্বরের স্বরূপের অজ্ঞানে বন্ধ এবং ঈশ্বর স্বরূপের জ্ঞানে মোক্ষ।

আত্মা সম্বন্ধে, আমার মতে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দর্শনেরই এই চরম সিদ্ধান্ত। তাই, পূর্ব্ব পরলোক-বাদ প্রবন্ধে "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" সূত্রের উল্লেখ করিয়া শেষ করিয়াছিলাম। এই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাতেই পরলোক-জিজ্ঞাসার পরিণতি,—ইহাতেই সেই জিজ্ঞাসার সমাধান্।

আত্ম-জ্ঞান লাভ হইলেই ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদয় হয়। তখন আর এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির চিরস্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, এবং পরলোক-জিজ্ঞাসার মীমাংসা হয়। এই দেহাদি উপাধি-পরতন্ত্র হইয়াও আমরা—সময়ে সময়ে যখন প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়—ভক্তিযোগে, কর্ম্মযোগে বা জ্ঞানযোগেই হৌক্,— সেই অদৃশ্য রাজ্যের বংশী-ধ্বনি শুনিতে পাই।

আমরা এই মরজগতে অবস্থান করিয়াও এবং সেই অকূল, অনন্ত সমুদ্রের সৈকতে, শিশুর ন্যায় ক্রীড়াপরায়ণ হইয়াও সময়ে সময়ে সেই মহাম্বুধির দর্শন লাভ করি; এবং দূরে—বহুদূরে সেই অম্বুরাশির গুরু-গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে

পাই। অথচ আমরা সর্ব্বদাই ধ্বংস, ক্ষয় ও বিনাশের লীলা দেখিয়া কখন কখনও আত্মবিস্মৃত হই ! তাই কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিতেছেন,—

"But for these obstinate questionings
Of Sense and outward things,
Fallings from us, vanishings ;
&c. &c.
Hence in a season of calm weather,
Though inland far we be,
Our soul have sight of that immortal sea
Which brought us hither ;
Can in a moment travel thither,
And see the children sport upon the shore,
And hear the mighty waters rolling evermore."

উদ্ধৃত শ্লোকাংশ ভাষান্তরিত করিবার অক্ষমতা প্রযুক্তই ইংরেজী-অনভিজ্ঞ শ্রোতা ও পাঠকবর্গের জন্য উহার অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলাম না। অথচ উদ্ধারের লোভও সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

যাহা অদৃশ্য তাহাই নিত্য। আর যাহা দৃশ্য তাহাই ক্ষণিক।

"The things which are seen are temporal, but the things which are not seen are Eternal !" এইত জীবন-প্রহেলিকা। এই দুরূহ প্রহেলিকার সমাধানেই আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। যদি কৃতকার্য্য না-ও হই, তথাপি—

"স্নাতংতেন সমস্ততীর্থসলিলে সর্ব্বাপি দত্তাবনিঃ
*　　*　　*
যস্য ব্রহ্ম বিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ।"

পরিশেষে, ক্ষুদ্র-বুদ্ধি আমি, পঞ্চদশীকারের নিম্নোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া এই দুরূহ প্রশ্নের সমালোচনা হইতে নিরস্ত হইলাম।

"ব্রহ্মজ্ঞঃ পরমাপ্নোতি, শোকংতরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধানন্দী ভবতি নান্যথা।"

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত।

পতিতা।*

আজ দুদিন ধরিয়া বাদল নামিয়াছে—বৃষ্টির আর বিরাম নাই।

কি ঘোরাল আকাশ—কি একঘেয়ে দিন! শচীশচন্দ্র বিরক্ত হইয়া আলবোলার রূপা বাঁধানো নল ফেলিয়া দিলেন এবং খোলা জানলার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। কলিকাতার রাস্তায় তখন বাণ ডাকিয়াছে—লোকজন খুব কম। মাঝে মাঝে দু'একজন লোক দেখা যাইতেছে; তাঁহাদের কাপড় হাঁটুর উপরে তোলা, পাকানো চাদরখানি কোমরে বাঁধা এবং জুতাজোড়া বগলের কাছে সন্তর্পণের সহিত কাগজে জড়ানো। সে বিবর্ণ মুখ দেখিয়া চিনিতে দেরি হয় না; তাঁ'রা কেরাণী!

হঠাৎ শচীশচন্দ্রের নজরে চেনা মুখ পড়িল। তাঁহার অপ্রসন্ন মুখ পুল-কোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আগন্তুক যখন ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল, শচীশচন্দ্র তখন বলিল "কিহে বিপিনকৃষ্ণ! একেবারে যে ডুমুরের ফুলটি হয়ে উঠেছ—দেখা পাওয়া ভার!"

বিপিনকৃষ্ণ, রুমাল দিয়া ভিজা পা মুছিতে মুছিতে হেঁটমুখে বলিল "আর দাদা! জলচর না হলে ত' তোমার বাড়ীতে এসে ওঠা যাবে না,—রাস্তার রকমটা ত' দেখছ!"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া শচীশচন্দ্র অর্দ্ধস্বগতঃ ভাবে বলিল "এমন বাদ্‌লার বাজার—সব মাটি!"

মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বিপিনকৃষ্ণ কহিল—"ঠিক বলেচ গুড্ চ্যাপ্—মাটি, সব মাটি! তা' বলে ভায়া, হাল ছেড়ে দিয়ে বস না।"

শচীশচন্দ্র সাগ্রহে বলিয়া উঠিল "কেন, কেন! কোন নতুন খবর আছে নাকি?"

"আন্‌কোরা নতুন। তবে ধোপে টিঁকলে হয়"—বলিয়া বিপিনকৃষ্ণ, একটা সুদীর্ঘ 'আঃ' উচ্চারণ করিয়া বসিয়া পড়িল। এবং আল্‌বোলার নলটা টানিয়া লইয়া মহা উৎসাহের সহিত ঘন ঘন ধূম উদগীরণ করিতে লাগিল।

* গল্পটির আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ সত্য।

শচীশচন্দ্রের মন বিলম্ব মানিতেছিল না। তিনি জিজ্ঞাসমান নেত্রে বিপিনকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া বলিল, "বল না হে! তোমার তামাক খাওয়া আর শেষ হয় না যে! ঘরটা বেলুন ক'রে উড়িয়ে দেবে নাকি?"

এতবড় খবরটা যে এক কথায় ফাঁসিয়া যাইবে,—বিপিনকৃষ্ণের সেরূপ ইচ্ছা নয়। বলিল, "দাঁড়াও দাদা! শরীরটা আগে গরম ক'রে নেওয়া দরকার!"

শচীশচন্দ্র বিরক্ত হইয়া চক্ষু মুদিলেন। বিপিনকৃষ্ণ কুটিলকটাক্ষে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ইলিশ মাছটা ভারি সস্তা হয়েছে হে!"

শচীশচন্দ্র বলিল, "চুলোয় যাক্ ইলিশ মাছ! আমার ত' আর সে জন্যে ঘুম হচ্চে না!"

আলস্যভরে একটা হাই তুলিয়া, তিনবার তুড়ি দিয়া, বিপিনকৃষ্ণ কহিল, "তোমার ওখানকার খবর কি?"

মুখ বিকৃত করিয়া শচীশচন্দ্র বলিল, "ছাই আর পাঁশ! এখন তুমি তোমার কথাগুলো বল্‌বে কি বল্‌বে না?"

বিপিনকৃষ্ণ এমনি জোরে হঠাৎ হাঁচিয়া উঠিলেন—যে দেওয়ালের উপর হইতে টিক্‌টিকিটা পর্য্যন্ত পলাইয়া গেল। তাহার পর কহিল, "বোল্‌বো দাদা বোল্‌বো! বল্‌বার জন্যই ত', এই জলকাদা ভেঙ্গে এতদূর এসেছি।"

শচীশচন্দ্র তাকিয়ার উপরে বক্ষস্থাপন করিয়া বলিল, "তবে বল!"

বিপিনকৃষ্ণ আলবোলার নলটা রাখিয়া দিয়া বলিল,—"হাঁ—ভাল কথা! ফুটবল ম্যাচের খবর কিছু শুনেছ?"

"বেশ ভাই! তুমি তা'হলে এখানে ব'সে বিশ্রাম করো—আমি বাড়ীর ভেতরে চল্লুম।" বলিয়া শচীশচন্দ্র ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিপিনকৃষ্ণ বুঝিল, আর নয়—বেশী টানে দড়া ছিঁড়িয়া যাইবে, তাড়াতাড়ি শচীশচন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"আহা হা! তুমি ত' ভারি ব্যস্তবাগীশ দেখ্‌ছি হে! আচ্ছা শোনো তবে!"

শচীশচন্দ্র বিপিনকৃষ্ণের সম্মুখে 'আসনপিঁড়ি' হইয়া বসিল। বিপিনকৃষ্ণ ধীরে ধীরে বলিলেন,—"একেবারে পরী! মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী হার মেনে যায় বাবা!—"

ব্যগ্রভাবে শচীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে?"

বিপিনকৃষ্ণ হাসিয়া বলিল—

কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহল পশি ॥

শচীশচন্দ্র বলিল,—"কোথায় দেখ্‌লে তাকে ?"

বিপিনকৃষ্ণ গায়িল,

"থির বিজুরি, বদন গৌরী,
পেখনু ঘাটের কূলে।
আড় নয়নে, ঈষৎ হাসিয়া,
আকুল করিল মোরে" ॥

শচীশচন্দ্র কিছু রাগিয়া বলিল,—"তুমি ত বড় জ্বালালে দেখ্‌ছি। হয় ভণিতা ছাড়,—নয় কিছু বোলো না।"

উচ্চ হাস্ত করিয়া বিপিনকৃষ্ণ কহিল, "গঙ্গাস্নান কর্‌তে গিয়ে দেখেছি দাদা ! যেমনি দেখা,—অমনি পিছু নেওয়া। তাহার পর পরিচয়। তাহার পর সম্মতি। তাহার পর, এখানে আগমন।"

"নাম কি ?"

"কুমুদিনী।"

"বয়স ?"

"গেলেই দেখ্‌তে পাবে। তবে,—"

"তবে কি ?"

উত্তরে, বিপিনকৃষ্ণ দুই অঙ্গুলীতে কল্পিত অখণ্ড গোলাকারের একটী আওয়াজ বাজাইবার ভঙ্গী করিল। শচীশচন্দ্র বলিল,—"মনের মত হ'লে টাকার জন্তে ভাবনা নেই। তা' হ'লে কবে যাব ?"

"আজকেই—এখনি।"

খ

পরলোকগত পিতা, এক ধনীর কন্যার সহিত শচীশচন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু গর্ব্বিতা ও মুখরা সরোজিনীকে পাইয়া শচীশচন্দ্র কিছুমাত্র সুখী হয় নাই। স্বামী স্ত্রীতে প্রত্যহই বিবাদ বাধিত। অবশেষে একদিনের বিবাদ কিছু গুরুতর হইয়া উঠিল। শচীশচন্দ্র সেইদিনই দেশত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিল। সে আজ বার বৎসরের কথা। এই দীর্ঘকালের ভিতরে শচীশচন্দ্র একবারও আপনার দেশে যায় নাই বা সরোজিনীর কোন সংবাদ লয় নাই। সে পিত্রালয়ে গিয়াছে ভাবিয়া শচীশচন্দ্র নিশ্চিন্ত আছে।

৭

জলে কাপড় জামা ভিজাইয়া ও কাদায় সুবিচিত্র হইয়া শচীশচন্দ্র এবং বিপিনকৃষ্ণ কুমুদিনীর বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

দরজার উপরে হাত রাখিয়া সেখানে একটী যুবতী দাঁড়াইয়াছিল। শচীশচন্দ্র ও বিপিনকৃষ্ণকে দেখিয়া সে সহাস্যে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল।

শচীশচন্দ্র বুঝিল, এই কুমুদিনী। সুন্দরী বটে!

কুমুদিনীর চঞ্চল নয়নের লীলামোহন মধুমধুর দৃষ্টি, শচীশচন্দ্রের সৌন্দর্য্য-তন্ময় মুখের উপরে আসিয়া সহসা স্থির হইল,—ক্ষণিকের নিমিত্ত। তাহার পর সে বলিল "ভিতরে এসে বসুন,—আপনাদের দেখা পেয়েছি, এ আমার সৌভাগ্য।"

প্রশংসমান চক্ষুতে শচীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া, তাহার গা টিপিয়া বিপিনকৃষ্ণ জনান্তিকে কহিল, "দেখেছ একবার! আদব-কায়দাটা কি রকম দোরস্ত!"

শচীশচন্দ্র কোনও উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতরে গিয়া বসিয়া পড়িল। এবং কুমুদিনীর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল। কিন্তু সে চোখে কি তীব্র জ্বালা! সে কি ক্ষুধিত দৃষ্টি!

একটু চঞ্চল হইয়া, শচীশচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। কুমুদিনী হাসিয়া বলিল, "কড়িকাঠের দিকে চেয়ে কি আমার রংয়ের উপমা খুঁজচেন?" অপ্রস্তুত হইয়া শচীশচন্দ্র বলিল,—"না, না—সে কি কথা! আপনি—আপনি—।"

"আপনি—কি?"

"আপনি একটী ডানাকাটা পরী।" বলিয়া বিপিনকৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তাহার পর সহসা হাসি থামাইয়া বলিল, "ডানাকাটা, তাই রক্ষে!"

"কেন?"

"উড়ে পালাতে পার্ব্বেন না।"

একটু হাসিয়া, কুমুদিনী শচীশচন্দ্রের আরও কাছে আসিয়া বসিল। তাহার কেশের সুগন্ধ শচীশচন্দ্রের নাসায় আসিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

বিপিনকৃষ্ণ বলিল, "একখানা গান শুনতে পাই না?"

"আমি গান জানি না।"

"ব্যস্! আপনার কথাগুলিই এক একখানা গান—জানি না বললে ছাড়ি কৈ!"

"আমি কীর্ত্তন শিখ্ছি, যদি ভাল লাগে, তাহ'লে গাইতে পারি।"

"কীর্ত্তন? সে ত আরো ভালো—বেশ—বেশ।" কুমুদিনী শচীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া গান ধরিল :—

"সই! কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙিনা দিয়া!
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়।
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ, যেমতি করিছে,
সেমতি হউক সে!"

সে কি গান! তার মূর্চ্ছনায়-মূর্চ্ছনায়, তানে-লয়ে, অনুলোমে-বিলোমে, প্রক্ষেপে-বিক্ষেপে, যেন নারী-হৃদয়ের কথনাতীত বেদনা ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে! কে যেন কাহাকে চায়, তবু সে ত' ধরা দেয় না! যেন কোন বিরহী-হৃদয় দেবশূন্য পূজাগৃহে হাহাকারে ফাটিয়া মরিতেছে, কিন্তু দেবতা নাই—দেবতা নাই!

শচীশচন্দ্র, মুগ্ধ হইয়া, ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সমগ্র চিত্ত যেন একাগ্র হইয়া কুমুদিনীকে চাহিতেছে আর,আর,—যেন তিনি বৈ কুমুদিনীর অন্য কেহ নাই—যেন, তিনি তার সুদূর অতীতের, তার বর্ত্তমানের, তার ভবিষ্যতের, তার চিরকালের—তার জন্ম-জন্মান্তরের!

তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "বিপিন, আমার—আমার, না—শরীরটা কেমন কর্‌ছে, আজ আমি চল্লুম—তুমি বস!"

কুমুদিনী, গান থামাইয়া একবার তাঁহার দিকে চাহিল। এবং তখনই ভিন্ন সুরে গীত ধরিল—

"সকলি আমার দোষ, হে বন্ধু!
সকলি আমার দোষ।

না জানিয়া যদি, কৈরাছি পিরীতি
কাহারে কহিব দোষ ?
সুধার সাগর সমুখে দেখিয়া
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইব এতেক দুখে।"

শচীশচন্দ্র আর দাঁড়াইল না। কুমুদিনী তখনই ছুটিয়া জানালার কাছে গেল। দেখিল, শচীশচন্দ্র একান্ত মনে চলিয়া যাইতেছে, তাহার মাথা বুকের উপরে ঝুকিয়া পড়িয়াছে।

বিপিনকৃষ্ণ, সহসা বন্ধুর এরূপ ভাবান্তরের কোন কারণ বুঝিতে পারিল না। সে কুমুদিনীর দিকে চাহিয়া বলিল "ইস্, এর মধ্যে এত ব্যথা! বলি রূপসী, এত আদক্ কায়দা শিখ্লে কোথেকে? শচীশ গেল ত তোমার কি ?"

কুমুদিনী ফিরিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল "চুপ্। উনি গেলেন ত, আপনিও যান না!"

"এত শীঘ্র যাব—বল কি ? আমি বাবা এখন বদ্দিনাথের শিব—এখান থেকে এক চুলও নড়চি না।"

"তবে থাকুন, আমি অন্য ঘরে চল্লুম।" কুমুদিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল—কিন্তু বিপিনকৃষ্ণ বাধা দিল। পদাহতা সর্পিণীর মত কুমুদিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল। উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—"বেয়ারা!"

বিপিনকৃষ্ণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অদৃশ্য হইল।

ঘ

কুমুদিনী স্বপ্ন দেখিল—জাগরণে স্বপ্ন!

সেই অতীত। সেই বালিকা বয়স। বাপের আদর, মায়ের স্নেহ, সখীদের ভালবাসা! যৌবনের আতপ্ত লালসা তখনও উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে নাই—প্রাণের অনিরুদ্ধ সরলতা তখনও কুটীলতার পরিণত হয় নাই—আপনাকে সকল দিকে ছড়াইয়া দিয়া তখন সে ক্ষুদ্র বনবিহগীর মত নাচিয়া বেড়াইত।

তারপর,—সেই দিন! তাহার চতুর্দ্দিকে শুদ্ধান্ত পৌতিনিগণের অনাহত শঙ্খনাদ বাজিয়া উঠিল—কাহার মঙ্গলহস্ত তাহার সিঁথীতে সিন্দুরের রক্তরাঙা উজ্জ্বলতা অর্পণ করিল। সেই আলোকাজ্জ্বলা যামিনী! কোথা হইতে এক অজানা লোক আসিয়া চির আপনের মত তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন এবং

সেই সঙ্গে বাতাস আসিয়া ফুলের গন্ধ ছড়াইয়া দিল, জ্যোৎস্না আসিয়া তাহার সম্মুখে স্বর্গের প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। সে স্মৃতি কি প্রীতিময়ী! তারপর! এক মুহূর্ত্তে কঠিন সংসার তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল—আশেপাশে নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নিপ্রবাহে সে নিজেই ইন্ধন-সংযোগ করিয়াছিল এবং সেই অগ্নিমধ্যে সে নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল! তথাপি, বুকে দগ্ধ যাতনা চাপিয়া, সে দিনের পর দিন নিত্য নূতনের অসহনীয় আলিঙ্গনে আপনাকে সমর্পণ করিতে লাগিল।

ওগো! আর যে পারি না! এ রূপের দীপ নিবাইয়া দাও গো—কঙ্কালের বাঁধন খুলিয়া দাও!

কুমুদিনী কাঁদিতে লাগিল। তাহার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত গৃহ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—তাহার বেদনাবিদীর্ণ বক্ষঃ যেন আপনার মাঝে আপনি ফাটিয়া মরিতে চাহিল।

সহসা দর্পণের দিকে তাহার চক্ষুঃ পড়িল—এ কার ছায়া? কুমুদিনী ফিরিয়া বসিল। দেখিল, সম্মুখে শচীশচন্দ্র—নিষ্পলক দৃষ্টি—সে দৃষ্টি যেন তাহারই উপরে স্তম্ভিত হইয়া আছে।

উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল—কতক্ষণের জন্য, কেহ তাহা বুঝিল না। তাহার পর, শচীশচন্দ্র কথা কহিল। গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "কুমুদিনী, কে?"

বজ্রনাদ কি ইহার অপেক্ষা ভীষণ? কুমুদিনী আর থাকিতে পারিল না—দুই বাহু বিস্তার করিয়া, সে শচীশচন্দ্রের দুই পদ আপনার বুকের উপরে আঁকড়িয়া ধরিল এবং উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

শচীশচন্দ্র, আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কুমুদিনী, তুমি কে?"

"ওগো আমি তোমার স্ত্রী—ওগো আমাকে তুমি মেরে ফেল—আজ তোমার পায়ের তলায় আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হোক্।" শরবিদ্ধ মৃগীর মত কুমুদিনী কক্ষতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

শচীশচন্দ্রের চোখের সামনে সমস্ত জগৎ পিছিয়া গেল—কাঁপিতে কাঁপিতে সে দুহাতে দুই 'রগ' চাপিয়া 'উবু' হইয়া বসিয়া পড়িল—কি মলিন তার মুখ—সে মুখ যেন মৃতের।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, শচীশচন্দ্র স্নেহপেলব স্বরে ডাকিল "কুমুদিনী!" মুরলীমূর্চ্ছনামুগ্ধা সর্পীর মত কুমুদিনী মুখ তুলিল। তাহার চক্ষু মুদ্রিত।

"কুমুদিনী,—না,—সরোজিনী!"

"ডাক, ডাক, ডাক,—আবার ডাক, ঐ নাম ধরে আবার ডাক।"

"সরোজিনী, তোমার এ দশা তোমার দোষে নয়—আমারই স্বেচ্ছাকৃত!"

শচীশচন্দ্র, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

পদশব্দে চমকিয়া কুমুদিনী নেত্র মেলিল এবং ব্যগ্রাকুল, কাতরকণ্ঠে বলিল "দয়া ক'রে যদি দেখা দিলে, তবে আবার কোথা যাও?"

"আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য।"

কুমুদিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া, পাগলিনীর মত শচীশচন্দ্রকে ধরিতে গেল কিন্তু তদ্দণ্ডে বস্ত্রজড়িত পদে পড়িয়া গেল। আবার যখন উঠিল, শচীশচন্দ্র তখন গৃহমধ্যে নাই।

৬

পরদিন প্রভাতে চা পান করিতে করিতে বিপিনকৃষ্ণ দৈনিক সংবাদপত্রে পাঠ করিল—

"—নং অপার চিৎপুর রোডে, কুমুদিনী নামে এক বারবনিতা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে।"

বিপিনকৃষ্ণের হাত হইতে চায়ের পেয়ালা পড়িয়া গেল—আগ্রহাতিশয়ে সে লাফাইয়া উঠিল। তাহার পর কাগজখানা হাতে করিয়া শচীশচন্দ্রের কাছে ছুটিল। কিন্তু সেখানে গিয়া সবিস্ময়ে শুনিল, কাল রাত্রিকাল হইতে শচীশচন্দ্র বাড়ীতে আসেন নাই।

বিপিনকৃষ্ণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। আপন মনে বলিল "হা অদৃষ্ট! বেটী কি মর্ব্বার সময় পেলে না আর! ছোঁড়াটাকে দিব্যি বাগিয়ে-ছিলাম। কিন্তু গেল কোথায়? নতুন বাসার খোঁজে? না।—তবে?—"

বিপিনকৃষ্ণের এই "তবে"র সমস্যা ইহজীবনে আর পূরণ হয় নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

কোম্পানী বাহাদুরের পুরাতন সেরেস্তা।*

(ফোর্ট উইলিয়মে কোম্পানীর প্রথম আমল)

কোম্পানীর অর্থাভাব।

সহসা অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ায় ও অর্থ সংগ্রহের অন্য উপায় না থাকায়, একটী মন্ত্রণা-সভার অধিবেশনে স্থির হয়—"কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর মধ্যে যে একশত মন তাম্র মজুত আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলা হউক।" এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। এই একশত মণ তাম্র ২৪৲ মণ হিসাবে বিক্রয় করা হয়।

কোম্পানীর নূতন খরিদা, সুতানুটী, কলিকাতা প্রভৃতি জমিদারীর আয় ব্যয়।

(১৭০৩ খৃঃ অব্দ।)

আয়—		ব্যয়—	
খাড়ী ভাড়া আদায়	৩২৭৷৶১০	গত মাসের তহবিলের জের	৩১৪৷১৫
২০৭৷৶১০ সিক্কা টাকার বাঁটা,		চাকরদিগের বেতন খাতে—	
শতকরা ১০৲ হি	২০৸৫	কোতোয়াল ইঃ—	৪৲
ঐ ১৲ টাকার বাঁটা	৴১০	৪ জন রাইটার	১৮৷০
ঐ ২২৲ " "	১৸৵০	১৫ জন পিয়ন	৩১৲
খাজনা বাবতে আদায়—		১০ জন পাইক	১৫॥০
ঋণ আদায় বাবত	৭৴০	৪ জন গোমস্তা (খাজনা আদায় জন্য)	৬৷০
জরিমানা	৪৲	ঢেঁড়াওয়ালা	১৸০
গোয়াদার খোরাকী	৷৴০	হালালখোর (?)	৸০
বিবাহের দান আদায়	১৸০	সেরেস্তার জন্য কাগজ খরিদ	৷৴০
সেলামী	১॥০	লিখিবার কালি	৴০
জ্বালানী কাঠের শুল্ক	১॥০		
দ্রব্যাদির উপর শুল্ক	২৪৸৶১০		

---

* Diary and Consultation Book of the London Company's Council at Fort William in Bengal. (From Decr. 1703 to Nov. 1704) and Bengal Public Consultations.

নূতন জমিদারী কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের আয় ব্যয়।

(১) কলিকাতা।

মাহ অক্টোবর, ১৭০৩ খৃঃ অব্দ।

(পলাশী যুদ্ধের ৫৪ বৎসর আগের কথা)

জমা—		খরচ—	
জমী ও বাড়ীর খাজনা		শিকদারের বেতন	
খাতে আদায়	২০৩৸/১৫	(১ জন)	৪৲
বাঁটা আদায়	২০।৶/১৫	তিনজন মোড়লের বেতন	৩৲
বিবাহের শুল্ক	৭৲	পাটওয়ারি	২৲
কর্জ্জ আদায়	২৷৶০	পেয়াদার	
সেলামী	২২৲	বেতন (১০ জন)	১০৲
জরিমানা	২৲	কাছারি বাড়ীর চাল	
বাঁটা	।৶০	মেরামত ইং	১৸/১৫
(অন্য বাবতে)		সেরেস্তা বাঁধিবার কাপড় খরিদ	।০
ফল বিক্রয় খাতে	।১৫	কলিকাতা-গ্রামের মধ্যে কাঁচা রাস্তা	
কলিকাতার নূতন বাজারের		গুলির মেরামত খরচা	১।৶০
গুদাম ভাড়া	২৲	দুইজন মোড়লকে শিরোপা	
বিক্রেয় দ্রব্যের উপর;তোলা	১।৶/১৫	বকশিশের বাবত	২/০
কয়ালের মেহনত আনা	১৲		
বাঁটা	।/১০		
ঘাট শুল্ক আদায়	২০৲		
বাঁটা	২৲		

কোম্পানীর নব-অর্জ্জিত জমীদারী কলিকাতা হইতে ১৭০৩ সালের অক্টোবর মাসে—যে আয় ব্যয় হইয়াছিল, উপরে তাহার একটী তালিকা দিলাম। ইহা হইতে পাঠক তখনকার কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের তালিকা পাইবেন। তখন মহাজনের মত কোম্পানী সাধারণ লোককে টাকা কর্জ্জ দিতেন ও পরিশেষে তাহা মায় সুদ আদায় করিতেন। আজকালকার ছোটখাট জমিদারেরা বা পত্তনিদারেরা যে ভাবে জমী জমা প্রজাবিলি করেন, বা বাড়ী ভাড়া দেন তখন কোম্পানী সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই নব অর্জ্জিত গ্রামত্রয়ের জমিগুলি, সেই ভাবেই প্রজাবিলি করিতেন। এই সমস্ত বিলি করা জমীর

খাজনা আদায়ের জন্য, শিকদার, মোড়ল, পাটওয়ার, গোমস্তা, পেয়াদা প্রভৃতির বন্দোবস্ত ছিল। বাজারে মাল পরীক্ষা ও ওজনের জন্য 'কয়াল' নিযুক্ত ছিল। জমীবিলির সময় বা বাড়ী ভাড়া দিবার সময়, কোম্পানী সেলামী পাইতেন। কোম্পানীর খাস উদ্যানে যে সমস্ত ফল জন্মিত, তাহা তাঁহারা বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইতেন। কলিকাতা গ্রামে তখন বাজার ছিল। সুতানুটীতে হাট ছিল। অবশ্য এ বাজার ও হাট বর্ত্তমান চেতলার হাট বা নূতনবাজারের মত ছিল না। চারিদিকে আশেপাশে বন জঙ্গল। স্থানে স্থানে ভূমি পরিস্কৃত, এক এক স্থানে লোকের বাস। আর সেই গণ্ডগ্রামের সীমার মধ্যে, কয়েকখানি চালাঘর। এই হাটের মালিক কোম্পানী-বাহাদুর। এই হাটের চালা ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহারা ঘরামী ডাকিয়া মেরামত করিয়া দিতেন। হাটুরিয়াদের নিকট তোলা আদায় হইত। কথায় বলে "হাটের-মোড়ল"। তখন কোম্পানী বাহাদুরের হাটে, মোড়ল, শিকদার, পাইক, পেয়াদা সবই ছিল। ভাগীরথীর ও তাহার শাখা সমূহের ও কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী খাল প্রভৃতিতে যে সকল নৌকা বা ডিঙ্গি যাতায়াত করিত, তাহার উপর ঘাটশুল্ক আদায় হইত।* এতদ্ভিন্ন এই তিনখানি গ্রামের মধ্যে যে সকল বিবাহক্রিয়াদি সম্পন্ন হইত, তাহার জন্যও জমীদার কোম্পানী বাহাদুর কিছু পাইতেন। তখন কলিকাতায় শেঠ বসাকদিগের আধিপত্য। কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণের পূর্ব্বপুরুষ, ভুবনেশ্বরের বংশধরদের কয়েকজন গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন। গোবিন্দপুর, সুতানুটী ও কলিকাতা তখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এ জঙ্গল কাটিয়া নগর বসাইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। এমন কি, ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলেও আমরা শুনিতে পাই, যে "ওয়ারেন হেষ্টিংস্ হাতীর উপর চড়িয়া বর্ত্তমান বির্জ্জিতলার নিকটস্থ জঙ্গলে বন্য-বরাহ শিকার করিতেন।" কলিকাতার প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসের পর, যখন গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই সময়ে কলিকাতার বনজঙ্গল আংশিকভাবে পরিস্কৃত হয়। কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাদের নবার্জ্জিত গ্রামত্রয়ের গাছপালা কাটাইয়া অধিবাসীদের নিকট বিক্রয় করিতেন।

কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই এই দুইশত বৎসরে হইয়াছে! এখন সরকার বাহাদুরের দপ্তরখানার কর্ম্মচারীদের জন্য প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায়, 'ষ্ট্যাম্প ও

---

* কলিকাতার পুরাতন ম্যাপে এরূপ অনেক ছোটখাট খালের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। "গোবিন্দপুর ক্রীক্" হইতে বর্ত্তমান "ক্রীক্‌রো" রাস্তার নামকরণ হইয়াছে।

ষ্টেসনারি ডিপার্টমেণ্ট' হইয়াছে। কত লক্ষ লক্ষ টাকার কাগজ, কলম, দোয়াত ইত্যাদি সেরেস্তার সরঞ্জাম তাহাতে মজুত। মোটা বেতনে কত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এই বিভাগ পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত, কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের পুরাতন সেরেস্তা হইতে আমরা দেখিতে পাই—"সেরেস্তার জন্য কাগজ খরিদ ছয় আনা, লিখিবার কালী খরিদ দুই আনা।"

সামান্য গৃহস্থের মত, কোম্পানী বাহাদুরকে সেই অতীতকালে জনমজুর এবং ঘরামী নিযুক্ত করিয়া, ভাঙ্গা ঘরের চাল ছাওয়াইতে হইত। তখন পাতার ঘরে কাছারী বসিত। ১৭০৩ সালের অক্টোবর মাসের সেরেস্তায় দেখা যায়, যে কাছারী বাড়ীর চাল মেরামতের জন্য কোম্পানী বাহাদুরকে ১॥/১৫ খরচ করিতে হইয়াছিল।

সেকালে কোম্পানীর সেরেস্তা অনেকটা বর্ত্তমানকালের জমীদারী সেরেস্তার ধরণে ছিল। বর্ত্তমানে অনেক জমীদার, তালুকদার, পত্তনিদারের দপ্তরখানায় যেমন পাটনাই-খেরো বাঁধা দফ্তর দেখিতে পাওয়া যায়, সেকালে—কোম্পানী বাহাদুরের সেরেস্তা সেইভাবেই রক্ষিত হইত। কারণ পূর্ব্বলিখিত হিসাবের একস্থানে স্পষ্ট লিখিত আছে—"সেরেস্তা বাঁধিবার কাপড় খরিদ—চারি আনা।"

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

কবিতা-কুঞ্জ।

মেঘ।

(১)

কোন্ চির-বিরহীর মরমের তলে
করুণ ব্যথায়, মেঘ! লভেছ জীবন?
কোন্ চির-বিরহীর আঁখিভরা জলে
ওই বরবপু তব হয়েছে গঠন?
কোন্ চির-বিরহীর দুঃখে হা হুতাশে
হে মেঘ! ভাসিয়া তুমি উঠিলে আকাশে!

(২)

হেরিলে ও মূরতি, শুনিলে তোমার
গুরু গুরু গরজন প্রাবৃট্-উদয়ে,
বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে স্মৃতি-পারাবার,
আকুলতা বেড়ে উঠে নিরাশ-হৃদয়ে!
কে যেন আপন ছিল, সে যেন গো নাই,
কি যেন গো হারায়েছি, খুঁজিয়া না পাই!

(৩)

কা'রে খুঁজিতেছি? তারে খুঁজিয়া না পাই
চারিদিকে পাতি পাতি করি' অন্বেষণ,—
কেহ বলে, সেই জন আছে সব ঠাঁই,
কেহ বলে, তা'র দেখা পা'বনা কখন,
কেহ বলে, সেত নাই,—সব শূন্যাকার,—
কেহ বলে, সেই জন অন্তরে আমার;

(৪)

মনে হয়, বসে আছে তব অন্তরালে,—
তোমার গভীর মন্দ্র তা'র কণ্ঠস্বর,
সে'জন আমার লাগি প্রেম-অশ্রু ঢালে
যবে তব ধারা ছুটে অবনী-উপর,
নয়নের জ্যোতি তার বিদ্যুৎ তোমার,
সমীরের সন্ সন্ বুঝি নিঃশ্বাস তাহার।

(৫)

তুমি মেঘ! ভেসে ভেসে আসিছ ধরায়,
তোমার মাঝারে তা'র পাই দরশন।
বিরহ-অনলে মোর হৃদি পুড়ে যায়,
মিলনের শান্তিবারি করিছ সেচন!
অধীর হৃদয়ে মোর দিতেছ অভয়
তোমারি হৃদয়ে মোর মিশিছে হৃদয়!

শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষাল।

সুদর্শন।

(Charles Mackey লিখিত Tubalcaine নামক কবিতার ছায়া লইয়া।)

ধরণীর বাল্যকালে ছিল একজন—
সুদৃঢ় শরীর বীর, নাম সুদর্শন।
ব্যবসায় কর্ম্মকার, মুদ্গর আঘাতে তার
ছুটিত স্ফুলিঙ্গ-মালা লোহিত বরণ।
রবির উদয় অস্ত—জাঁতা হর্ম্মী লয়ে ব্যস্ত,
বাজিত উত্তপ্ত লৌহ করি ঠন ঠন।

২

পরশু বল্লম আর তীর তরবার
অনলে তাতায়ে গঠে অতি তীক্ষ্ণ ধার।
আনন্দে সে গায় গান, "সাবাস্ সে বলবান
আমার এ অস্ত্রগুলা হাতে যবে যার।
এ মেদিনী, ধন, ধান্য, বীর কীর্ত্তি মহামান্য,
সিংহাসন, রাজদণ্ড পাবে অধিকার।"

৩

গর্জ্জিত অনল-পাশে বসিয়া যখন,
শাণিত ইস্পাতে অস্ত্র করিত গঠন,
কত লোক সেথা আসি, দেখিত আনন্দে ভাসি
তাহার হাতের কাজ অতি সুচিকণ।
ধনুক শাম্বক যত শূল শেল নানা মত
বাখানিত বলি কত উৎসাহ বচন।

৪

"সাবাস্ তোমারে বলি ওহে সুদর্শন।
বাহবা এ অস্ত্রগুলা সুদৃঢ় কেমন,
এ তোমার কি কৌশল পাইলাম নব বল
এবে আমাদের আর আঁটে কোন্ জন?"
দলে দলে লোক আসি, লয়ে গেল অস্ত্ররাশি
বিনিময়ে ধন রত্ন দিল অগণন।

৫

কিন্তু হায়! দিবা নাহি হ'তে অবসান,
ব্যথিল তাহার চিত্ত, পর্য্যাকুল প্রাণ;
দেখিল সে সবিস্ময়ে, তাহারি আয়ুধ ল'য়ে
বেধে গেছে মারা মারি, দম্ভ অভিমান।
পরিহরি দয়াধর্ম্ম-বর্জ্জিত নির্ম্মম কর্ম্ম,
রুধিরে পঙ্কিল প্রায় হোলো ধরা খান্।

৬

তপ্ত রক্তে সিক্ত কর কত ভাই ভাই।
কাটা মুণ্ড ছড়া ছড়ি সংখ্যা তার নাই।
ম্রিয়মাণ শিল্পী তায়—"একি পরিণাম হায়!
কি গঠিনু! কি সাজানু! কি শিখনু ছাই।
আমারি প্রমাদ তরে, এ বিবাদ ঘরে ঘরে,
জগতের পাপ-স্রোত বেড়ে গেল ভাই।"

সে অবধি কত দিন একা সুদর্শন
গালে হাত দিয়া বসে ভাবে মনে মন।
অনুতপ্ত চিত্ত তার ছোঁয়না হাতুড়ি আর
হাপোরে অনল-শিখা করে না জ্বালন ;
কর্ম্মে আর নাহি মন সদা থাকে উচাটন,
মরিচা ধরিছে লৌহে নাহিক যতন।

৮

ভেবে ভেবে অবশেষে কিছু দিন পরে
প্রফুল্ল বদন তার ; কহে হর্ষ ভরে—
"একি মোর ভ্রান্ত দৃষ্টি, ইস্পাত হয়নি সৃষ্টি
কেবল আয়ুধ পুঞ্জ গঠনের তরে।"
কৃষি শিল্প যন্ত্র কত বিরচিল নানা মত
সৃজিল লাঙ্গল-ফলা সুনিপুণ করে।

৯

এ দিকে লোকেরা দেখি বিষময় ফল
গলে গলে আলিঙ্গন, ছাড়িয়া কোন্দল।
অসি বর্ম্ম দিল খুলে, নাগ দণ্ডে রাখে তুলে
সানন্দ অন্তরে আসি ধরিল লাঙ্গল।
জীবের মঙ্গল তরে, নানাবিধ শ্রম করে
ফলে ফুলে সুশোভিত হোলো ধরাতল।

১০

হরিষে গাহিল পুনঃ যত লোক জন।
"ধন্য তোর গুণপণা, ধন্য সুদর্শন।
তোর গুণে বসুমতী, হইয়াছে ফলবতী,
মানব-সমাজ আজ শান্তি-নিকেতন।
দুর্জ্জনের উৎপীড়নে, রক্ষিতে দুর্ব্বল জনে
কাজে লাগিবেক অস্ত্র, বিপদ যখন।"

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য।

আশ্বিনের 'অর্ঘ্যে' প্রকাশিত পূজনীয় পাঁচকড়ি বাবুর "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে যে সকল কথার উদয় হইয়াছে, তাহাই এইখানে নিবেদন করিতেছি। গুরুর নিকটে শিক্ষার্থী যেরূপ তর্কচ্ছলে তাহার সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইবার চেষ্টা পায়, আমিও সেই ভাবেই তাঁহার সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উদ্দেশ্য—মীমাংসা।

পাঁচকড়ি বাবুর আলোচ্য প্রবন্ধের মূলকথা এই যে, 'ইংরাজী শিখিয়া যে সাহিত্য বাঙ্গালী এখন রচনা করিতেছে, তাহা খাঁটি জিনিষ নহে ;—অতএব ইংরেজী-নবীশের এই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য টেকসহিও নহে।'

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য কেন যে খাঁটি জিনিষ নহে, কেন যে টেকসহি নহে, তাহার কারণও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিতেছেন যে, "আধুনিক ইংরেজী-সভ্যতা-জনিত ইংরেজী শিক্ষাজাত বাঙ্গালা সাহিত্য অনুচিকীর্ষার সাহিত্য, প্রতিযোগিতার সাহিত্য মাত্র। উহার সহিত বাঙ্গালীর প্রকৃতির তেমন

সম্বন্ধ নাই ; উহার ভাষা ও ভাব বাঙ্গালীর সমাজে তেমন প্রচলিত নহে। উহা ইংরেজের সহিত পাল্লা দিবার মানসে রচিত হইয়াছে ; উহা ইংরেজী এবং ইউরোপীয় ভাবকে বাঙ্গালা দেশে আনিবার পয়ঃপ্রণালী মাত্র।"

ব্যাধি এবং তাহার নিদান উভয়ই শুনিলাম, কিন্তু রোগ-নির্ণয় (Diagnosis) ঠিক হইয়াছে বলিয়া মন মানিতে চাহিতেছে না। আমাদের মনের যুক্তি-তর্ক যে শুধু ঐ মতে সায় দিতে বারণ করিতেছে, তাহা নহে। ইতিপূর্ব্বে লেখক মহাশয় নিজে একদিন ঐ মতের ঠিক উল্টা মত যে সকল সুদৃঢ় যুক্তি-তর্কের ভিত্তির উপর গাঁথিয়াছিলেন, তাহাকে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারে, এমন পরাক্রম এ প্রবন্ধের দেখিতে পাইলাম না। টলাইতে না পারিবার কারণ, এইবারে দেখাইতেছি।

পূজনীয় পাঁচকড়ি বাবু সম্প্রতি কোন এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "সমাজ সাহিত্যের আধার ; সমাজ-ক্ষেত্রেই সাহিত্যের চাষ হইয়া থাকে। প্রত্যেক যুগের ভাব এই সাহিত্যের বীজ।...কবি ও ভাবুক অসামাজিক সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারেন না। অশুচিকীর্ষার বশে অসামাজিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইলে, সে সাহিত্য টবের ফুলের মতন অধিকদিন টিকে না।"—

এই উক্তিতে যে সার সত্য নিহিত আছে, তাহা সমীচীন সমালোচক ও পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এ কথায় কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না : অন্ততঃ আমাদের ত নাই। তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, আধুনিক বঙ্গীয়সমাজ কি বঙ্কিমাদি কর্ত্তৃক সৃষ্ট সাহিত্যের আধার নহে ? হারাণে পরাণে লেখকগণের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু বঙ্কিম, গিরিশ প্রভৃতির সৃষ্ট সাহিত্য কি বঙ্গীয় সমাজের রুচিবিরুদ্ধ ? সে সাহিত্য দ্বারা সমাজের কি কোন ভাবপুষ্টি ঘটে নাই ? যদি এ অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকে অশু-চিকীর্ষার সাহিত্য বা অসামাজিক সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আধুনিক বঙ্গসাহিত্য যে 'অশুচিকীর্ষার বশে অসামাজিক সাহিত্য রূপে সৃষ্ট হইয়াছে', এ সিদ্ধান্তের প্রমাণ কি ?

বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজেরই মিক্‌শ্চার। মুসলমানের রাজত্বে হিন্দুর সহিত মুসলমানের শুধু কর আদায় করিবারই সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু তথাপি সে সংঘর্ষে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে ও হিন্দু সাহিত্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। আর ইংরাজ আজ কেবল কর লইয়াই সন্তুষ্ট নহে ; সে এই দেড়শত বৎসর কাল ধরিয়া ক্রমাগত আমাদের গুরুগিরি করিয়া আসিতেছে।

মুসলমান শুধু রাজা ছিল, গুরু হইবার স্পর্দ্ধা কখনও করে নাই। কিন্তু ইংরাজ আমাদের রাজা ও গুরু উভয়ই। "আধুনিক সময়ে ইংরেজের শিক্ষা যাহারা পায় নাই, তাহারাও পাশ্চাত্যভাব প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে। ইংরেজের আইন আদালত, ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য, ইংরেজের আমদানী-রপ্তানী, ইংরেজের শাসন-সংরক্ষণ, সকলই আমাদের চিন্তাকে, আমাদের ভাবকে, আমাদের আদর্শকে, আমাদের সামাজিক গঠনকে প্রতিদিন বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে।" সুতরাং এ অবস্থায় বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রাচ্য ভাব-বৈভবের সহিত প্রতীচ্য ভাব-সম্পদের সম্মিলন অনিবার্য্য বলিয়াই বিশ্বাস করি।

এরূপ বিশ্বাস করিবার আরও বিশেষ হেতু আছে। হেতু এই যে,— পাঁচকড়ি বাবু স্বয়ং একদিন নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন, বিলাতী সভ্যতার সংঘর্ষে বঙ্গসাহিত্যে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে,তাহা কখনই অনুকরণের নিয়মে হইতে পারে না। সে পরিবর্ত্তন স্বভাবের ইচ্ছায় বা প্রয়োজনের নিয়মেই হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'নবীনচন্দ্র ও জাতীয় অভ্যুত্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "সমাজ-দেহে জীবনীশক্তি বর্ত্তমান থাকিলে, উহাতে বাহিরের একটা নূতন বলের সঞ্চার হইলে, সে সমাজ-দেহ যতই কেন মুমূর্ষু হউক না, উহা কিছু কালের জন্য আবার সজীব হইয়া উঠে। প্রথমে ইস্‌লাম ধর্ম্মের ও মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া ভারতের হিন্দুসমাজের ও সাহিত্যের বিপ্লব ঘটে। সেই বিপ্লবের ফলে একপক্ষে গোরক্ষনাথ, রামানন্দ, নানক ও শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজসংস্কারক রূপে অবতীর্ণ হন। অন্য পক্ষে, সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস, বিহারী দাস প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণ আর্য্যাবর্ত্তে, আর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরায়, গোবিন্দরায়, জয়ানন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কবিগণ মিথিলায় ও বঙ্গে আবির্ভূত হন।......সাদী, হাফেজ, ফের্দোষী, ওমর খায়াম প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের কাব্য ও গাথা নূতন ভাব ও নূতন তত্ত্ব হিন্দুর সম্মুখে আনিয়া দিল। হিন্দুর ভাব বিপ্লবও ঘটিল। এই বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমাজের মনীষিগণ ইস্‌লাম-শক্তির সহিত একটা আপোষ করিতে উদ্যত হইলেন। গোরক্ষনাথ জাতি নির্ব্বিশেষে শৈব ধর্ম্মের প্রচার করিলেন। রামানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে এই হিসাবে সর্ব্বজাতির সেব্য করিতে চাহিলেন। গুরু নানক ব্যবহার-ধর্ম্ম বা moralityকে ভক্তিতে ডুবাইয়া সন্ন্যাসের সহিত মিশাইয়া, ইসলাম ও হিন্দুর আপোষে শিখধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন।

শেষে বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য শুদ্ধ হরিভক্তি প্রবাহের প্রভাবে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এক নবীন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন।"

"এইভাবে ইস্‌লামের সহিত হিন্দুদের কতকটা আপোষ হইল। হিন্দু সমাজে কতকটা সামঞ্জস্যের ভাব দেখা দিল। পক্ষান্তরে, সাহিত্যেও এইরূপ বিপ্লব ঘটিল। এই ভাবেই তাহারও সামঞ্জস্য হইয়াছিল।"

"এই জাতীয় নবোন্মেষের সময় যেমন ধর্ম্মে হিন্দু ও মুসলমানের বিশ্বাস সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল, তেমনিই সাহিত্যেও হিন্দু ও মুসলমান রুচির সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল। ভক্তি যেমন ধর্ম্মপক্ষে সমঞ্জসীকরণের উপাদান ছিল তেমনই রূপজমোহ, লালসা ও ভক্তিজন্য আত্মদান সাহিত্যের ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। সাহিত্যে ইস্‌লাম রুচি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে এই রুচির বিকট বিকাশ হইয়াছে। কবিকঙ্কনের কাঁচলীর বর্ণনা, আর কবি শ্যামদাসের শ্রীমতীর কাঁচলীর বর্ণনা ভাবে ও ভাষায় প্রায় একরূপ, এ বর্ণনা ইস্‌লাম রুচিজাত। এমন ভাবে নারীর আভরণের বর্ণনা হিন্দুর পুরাতন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। হিন্দুর সমাজদেহের এই যে অভ্যুত্থান, ইহাকে ইংরাজীতে Islamic Renaissance বলা যাইতে পারে।"

যে ভাবে একদিন বঙ্গ সাহিত্যে ইস্‌লাম-রুচি প্রবেশ করিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই স্বভাবের নিয়মে যে আজ বঙ্গ সাহিত্যে বিলাতী রুচি প্রবেশ করিতেছে, এ কথা এইবার আমরা পাঁচকড়ি বাবুর উক্তির দ্বারাই আবার বুঝাইয়া বলিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, "ইংরেজের অভ্যুদয় প্রথমে বাঙ্গালা দেশেই হয়। বাঙ্গালীই প্রথমে ইংরেজের সভ্যতায় ও বিদ্যার পরিচয় পান। সে পরিচয়ে বাঙ্গালী একটা নূতন সামগ্রী পাইল, উহা European individualism—উচ্চ নীচ নাই। ফরাসীদের নিকট হইতে ধার করিয়া Liberty, Fraternity ও Equality, এই তিন মহামন্ত্র ইংরেজ বাঙ্গালীকে শিখাইলেন। হিন্দুসমাজে এই নবীন শিক্ষার প্রভাবে একটা বিপ্লব ঘটিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সহিত আপোষ করিয়া সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গড়িলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষাপ্রণালীর সাহায্যে দেশীয় ছাঁচে পাশ্চাত্য ভাব ও কথা এদেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিলেন। পাশ্চাত্য হিসাবে তিনিই প্রায় সমাজসংস্কারক হইলেন। পক্ষান্তরে, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র একদিকে, আর বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব অন্যদিকে, সাহিত্যের পথে স্বদেশীয় আবরণে এদেশে পাশ্চাত্য ভাবতত্ত্বের আমদানী

করিলেন। ইঁহারাই আধুনিক Indo European Renaissanceএর প্রচারক ও প্রবর্ত্তক স্বরূপ।"

"ইস্‌লাম ধর্ম্মের সংঘর্ষের জন্ত পূর্ব্বে যে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, তাহাতে ভাব প্রবাহ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বা বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সংবর্দ্ধণে ও ইংরেজের অধিকার বিস্তার হেতু যে বিপ্লব এখন ঘটিয়াছে, তাহাতে ভাব প্রবাহ বাঙ্গালা হইতে যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে যাইতেছে। কাশীর হিন্দুস্থানী কবি হরিশ্চন্দ্র প্রথমে হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের কবিতা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নাটক, নভেল ও কাব্যগ্রন্থ সকল হিন্দীতে ভাষান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। কাল মাহাত্ম্যে ভাবের উজান গতি হইয়াছে।"

"এই সঙ্গে বলা ভাল যে, ইস্‌লাম সভ্যতার জন্য যে বিকৃত রুচি আমাদের সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল, তাহার অনেকটা অপনোদন হইয়াছে। হিন্দুর সহজ বুদ্ধি অতীন্দ্রিয় বাদ-প্রসারিণী বা Transcendental। তাই সুরদাস ও চণ্ডীদাস প্রেমটাকে ভগবানের পারিজাতহারে পরিণত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের ইংরেজী-নবীশ বাঙ্গালী কবিগণ ব্রাউনিং ও গেটের লেখায় উহারই সম্যক পরিচয় পাইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকারান্তরে সেই সকলের আমদানী করিতেছেন। ইহার ফলে রুচি অনেকটা পরিশুদ্ধ হইয়াছে।"

পূজ্যপাদ পাঁচকড়ি বাবুর উপরি-উক্ত যুক্তিপূর্ণ উক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা কি এখন জোর করিয়া বলিতে পারি না যে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের জীবনী-শক্তি আছে বলিয়াই উহা বিলাতী সভ্যতার সংবর্ষণে একভাবে না থাকিয়া রূপান্তরিত হইতে বাধ্য হইয়াছে? বাস্তবিক, ইহাই ত বাঙ্গালীর কৃতিত্ব, ইহাই ত বাঙ্গালীর গৌরব। সজীব প্রকৃতির ধর্ম্মই হইতেছে কালানুযায়ী হওয়া; কারণ, অন্যথায় তাহার মরণ। যে জিনিষটার কোনও পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহার অস্তিত্ব সজীব প্রকৃতির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। বিলাতী ভাবের সংঘাতে বঙ্গসাহিত্য যদি রূপান্তরিত না হইয়া সাবেক জিনিষেরই পুনরাবৃত্তি করিত, তাহা হইলে এ সাহিত্যকে মৃত বা কৃত্রিম বলিতাম। সেই-জন্যই বোধ করি, বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব সমালোচনায় এই ধরণের কথা বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালীর খাঁটি বাঙ্গালা পদ্য এখন আর হইতে পারে না, হইয়া কাজও নাই। দেশ পুনরায় অবনতির পথে না গেলে সেরূপ পদ্য হইবার আর সম্ভাবনা নাই।"

আলোচ্য প্রবন্ধের আর এক স্থলে আছে যে, "ইঁহাদের (বঙ্কিম প্রভৃতির) কাব্য-সুধার আস্বাদ ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী গ্রহণ করিতে পারে, সাধারণ বাঙ্গালী এখনও সেই রসে বঞ্চিত। কারণ সাধারণ বাঙ্গালীর ত সে অভাব বোধ নাই। তাহাদের কাব্য-তৃষ্ণা চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র মিটাইয়া দিয়াছেন।"

'সমাজের নিম্নস্তরের' কথা বলিতে পারি না ; কিন্তু ভদ্র সমাজে বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি এক্ষণে 'আলমারির সর্ব্বোচ্চ কক্ষের কেতাব ; —সেকেলে রচনার একটা আদর্শমাত্র।' ভদ্রসমাজে যাহারা ইংরেজী শিক্ষিত নহে,—বঙ্কিম, গিরিশ প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহাদেরও আনন্দোপভোগ করিতে দেখিয়াছি ; কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের সহিত তাহারা বড় একটা পরিচয় রাখে না।

বঙ্গসাহিত্য এখন প্রতিদিনই অতি দূর বিস্তৃত হইতেছে। যদিও সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান নহে, তথাপি বঙ্কিমের কালের সহিত বর্ত্তমান কালের বঙ্গ সাহিত্যের বিস্তর প্রভেদ হইয়াছে। তখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল। এখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা গণিয়া উঠা যায় না। "এখন সুলভ সংবাদ পত্র প্রকাণ্ড জাল নিক্ষেপ করিয়া দূরদূরান্তর হইতে অগণ্য পাঠক সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, এবং নব নব রঙ্গশালা নানা উপায়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করিয়া সাহিত্যপণ্যকে নানাদলের চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিতেছে।" এখন অজ্ পাড়াগাঁয়েতেও চাষাভূষার ছেলে এক্টর হইতেছে। তাহারা বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল ও সরলা পাঠ করিয়া তৃপ্তিবোধ করে। রুচির বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়াই এখন আর কেহ বড় একটা ঈশ্বর গুপ্ত স্পর্শ করে না, কবিকঙ্কণের অবস্থাও কতকটা তদ্রূপ। 'বিদ্যাসুন্দরে' আদিরসের 'বিকট বিকাশ' আছে বলিয়াই মালিনী মাসী আজিও চেঙ্গড়া ভুলাইয়া খাইতেছে ; নতুবা ইহার দশাও শোচনীয় হইত। চিরকাল কাহারই "কালিদিন" থাকে না।

সমাজের নিম্নস্তর অবধি 'মেঘনাদবধকাব্য' বা 'কুরুক্ষেত্র' অধীত হয় না বলিয়া যে উহাকে মেকী জিনিষ বলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। উচ্চ কলা-কৌশল সমন্বিত কাব্যাদির অদৃষ্টে সর্ব্বদেশেই প্রায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। মার্জ্জিত রুচি, অনুশীলিত চিত্ত না হইলে, উহার রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না। বিলাতেই কি সর্ব্বসাধারণে ব্রাউনিঙ্ বা সেলী বুঝিতে পারে ? কিন্তু কে উহাকে মেকী জিনিষ বলিয়া উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে সাহস করিবে ?

একদল দুর্ব্বৃত্ত যে এখনকার ভাষার উপর অত্যাচার করিতেছে, পাঁচকড়ি বাবুর একথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। তবে আমাদের আশ্বাসের কথা এই যে, সকল জিনিষেরই গঠন অবস্থায় এইরূপ অত্যাচার অনাচার ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহারই মধ্য দিয়া কালের কশাঘাতে যেটা বিকৃতি, সেটার সংশোধন হইয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার এখনও গঠন-অবস্থা চলিতেছে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিগত আশ্বিন মাসে সুপ্রসিদ্ধ 'অর্ঘ্য' পত্রে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে তাঁহার স্বাভাবিক তরল সরস সুখপাঠ্য ভাষায় যে সকল মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমাদের স্নেহভাজন শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ রায়, পাঁচকড়িবাবুর নিজের কথাতেই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। অবশ্য লেখকমাত্রেই মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, সুতরাং লেখকবিশেষের যে মতটা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক, সেই মতই তাঁহার চিন্তা ও বহুদর্শিতার ফলজাত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। লোকে প্রৌঢ়াবস্থায় বা বার্দ্ধক্যে অনেক সময় আপনার যৌবনের মতের অসারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারে, আবার ভীমরথী ধরিলেও মানুষের মত-পরিবর্ত্তন হয়। শ্রদ্ধাভাজন পাঁচকড়িবাবুর চিন্তাশক্তির নিয়ামবত্তা-সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই। তাই মনে হয় তাঁহার 'অর্ঘ্যে' প্রকাশিত অভিনব মতামতই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার আধুনিক মতামত, তাহা তাঁহার আজীবন বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য সেবার ফল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে তাঁহার নিজের স্থান অতি উচ্চ, যাহাদিগকে তিনি ইংরেজীনবীশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তিনি সে দলের একজন নায়ক। তাই তাঁহার মুখে যখন শুনি—"তোমাদের ইংরেজীনবীশের এই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য টেঁকসহিত নহে" তখন আমরা বড়ই বিস্মিত হই। এ নৈরাশ্যসূচক ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য কি?

তাঁহার সিদ্ধান্তের গোটাকতক কারণও পাঁচকড়িবাবু দিয়াছেন। প্রাচীন কবিদিগের পদাবলী, কাব্যরচনা বাঙ্গালীর 'মেদমজ্জার সহিত মিশ্রিত, বাঙ্গালীর রুচি-প্রবৃত্তি-নির্দ্ধারণে সমর্থ'। তাই বাঙ্গালায় রামপ্রসাদের গান, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কীর্ত্তনে আজিও আপামর-সাধারণ বাঙ্গালী জাতির হৃদয়তন্ত্রী মধুর ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠে। কৃত্তিবাস,কাশীরাম দাসের

গ্রন্থ অদ্যাপি ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইংরেজীনবীশ সাহিত্যিকের গ্রন্থাপেক্ষা অধিক বিক্রীত হয়। পুস্তকের বিক্রয়াধিক্যই যে গ্রন্থের উৎকর্ষের প্রমাণ নহে, তাহা তাঁহার মত বিচক্ষণ সাহিত্যসেবীকে বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা। সে হিসাবে বটতলার সকল গ্রন্থই আমাদের মুষ্টিমেয় সদ্‌গ্রন্থাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বিলাতের রেনল্ডের উপন্যাস বা একপেনী মূল্যের ডিটেকটিভের গল্প পুস্তকগুলি জন্ মরলে, মারী করেলী প্রভৃতি আধুনিক এবং সেক্সপীয়র, মিলটন প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদিগের রচনা অপেক্ষা মূল্যবান। বহুল প্রচার যদি মেদমজ্জার সহিত মিশ্রণের প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল পেনী রাবিশ ইংরাজজাতির মেদমজ্জার সহিত মিশ্রিত। কিন্তু আমরা জানি ইংরাজ-চরিত্রগঠনসম্বন্ধে তাহাদের কোনই সার্থকতা নাই।

ভারতচন্দ্র বা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি বা জ্ঞানদাস, কৃত্তিবাস বা কাশীরাম যে বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। তাঁহাদের মনীষা চিরকালই বাঙ্গালী জাতিকে বিমুগ্ধ করুক, ইহা সকলেই কামনা করে। কবি হিসাবে যেমন তাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, বাঙ্গালা ভাষার, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের, বাঙ্গালী হৃদয়ের উন্মেষণের ইতিহাস বুঝিবার পক্ষেও তাঁহাদের রচনা তেমনি অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু কেবল তাঁহাদেরই ছাঁচে, তাঁহাদের অঙ্কিত গণ্ডীর মধ্যে, বাঙ্গালীর সাহিত্যকে আবদ্ধ রাখিবার পরামর্শ, পাঁচকড়িবাবুর ন্যায় প্রতিভাবান্ লেখক-প্রদত্ত হইলেও, মোটেই সারবান বা যুক্তিযুক্ত নহে। ঐ সকল প্রাচীন লেখকের ভাব আধুনিক বাঙ্গালী জাতির অস্থিমজ্জায় গ্রথিত এ কথাটা কেবল অলীক নহে ইহা অবিবেচকের উক্তি। ঐ সকল কবি একদিকে ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন অপরদিকে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবি ধর্ম্মের নামে কতকটা অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিয়া, কতকটা দুর্নীতির অবতারণা করিয়া এতদিন ধরিয়া বাঙ্গালী পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছেন। এই ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল-বর্ণিত ভাব কয়টা বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জার সামগ্রী হইয়াছে? কয়টা বাঙ্গালীর মানসনেত্রে নিশিদিন কেবল এই চিত্র প্রতিফলিত হয়?

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম ভভম্ভম সিঙ্গা ঘোর বাজে
লটাপট জটাজুট সঙ্ঘট্ট গঙ্গা
ছলচ্ছল্ টলটল্ কলকল তরঙ্গা।"

ভূতনাথ ভৈরবা, ভৈরবী, মহাকালী, তাল, বেতাল, ত্রিশূলী, ভামিনী, যোগিনী লইয়া দক্ষযজ্ঞ নাশ করিতেছেন,

প্রেত ভাগ সানুরাগ ঝম্পঝম্প ঝাঁপিছে
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে।

এ বর্ণনা পড়িয়াও বাঙ্গালী ইহা অস্থিমজ্জার সামগ্রী করিয়া লয় না কিম্বা ইহা তাহার অস্থিমজ্জায় মিশান চিরন্তন ভাবের প্রতিধ্বনিও করে না। যদি তাঁহার রচনা পড়িয়া বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহ বহিত—

শিবনাম লয়ে মুখে তরিব সকল দুঃখে
দমন করিব সুখে শমনে।

তাহা হইলে কি দিবারাত্র পাঁচকড়িবাবুর মত বক্তাগণকে চীৎকার করিয়া বলিতে হইত—"বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রাণ হও, বঙ্গবাসী হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব ঘুচাইও না।" কৃত্তিবাস বা কাশীরাম যদি ইংরেজীনবীশেতর বাঙ্গালীর প্রাণে প্রাণে মিশিত বা তাহাদের হৃদয়-কন্দ-লুক্কায়িত ভাবরাজির নির্দ্দেশ করিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দশা হইবে কেন? রামায়ণ-মহাভারতে সত্যের যেরূপ উচ্চাসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কৃত্তিবাস কাশীরামদাস বাঙ্গালীর গুরু হইলে কি সত্য-কথনের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে ইংরাজ শাসনকর্ত্তা জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নিত্য বাঙ্গালীকে বক্তৃতা শুনিতে হইত? তাহা হইলে ইংরেজীনবীশকে বাঙ্গালা-নবীশ নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইত, তাহা হইলে বাঙ্গালী জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, রাম, লক্ষ্মণ তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করে না, তাঁহারা বটতলা-ওয়ালাদের অন্নমুষ্টি সংগ্রহ করিয়া দেন মাত্র। চণ্ডীদাসের প্রেম বাঙ্গালীর কোথা? চণ্ডীদাসের আত্মসমর্পণ, তাঁহার প্রেমের জয়গান, তাঁহার ভক্তির প্রাবল্য যে দিন বাঙ্গালীর মেদমজ্জায় মিশ্রিত হইবে, যেদিন আরাধ্যকে লক্ষ্য করিয়া হাজারে একটা বাঙ্গালীর প্রাণের ভিতর হইতে ধ্বনি উঠিবে—

তোমারি চরণে আমারি পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁদি।

সেদিন বাঙ্গালীর কলঙ্ক ঘুচিবে, সেদিন বাঙ্গালী জগতের নেতৃত্ব লাভ করিবে।

একদিকে যেমন প্রাচীন কবিদিগের শ্রেষ্ঠ কবিতা আপামর-সাধারণ ইংরাজী-শিক্ষা-বর্জ্জিত বাঙ্গালী-হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিতে পারে নাই, অপরদিকে তেমনি প্রাচীন কবিদিগের অশ্লীলতাগুলা বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় প্রথিত হইয়াছে বলিলে বাঙ্গালী জাতির অবমাননা করা হয়। বিদ্যাসুন্দরের গন্ধবর্ণিত

কল্পিত চরিত্রগুলি যেন কোনও দিন বাঙ্গালীর চরিত্রগঠনে সহায়তা না করে। নগরে পল্লীগ্রামে কোনও স্থলের বাঙ্গালীকে তো ব্যভিচারীকে অথবা সুন্দরের মত গুপ্তপ্রণয়ীকে এবং মালিনীর মত দূতিকাকে মার্জ্জনা করিতে দেখি নাই। বিদ্যা ও সুন্দরের অবৈধ মিলন- (?) বর্ণনা পড়িয়া কেবল ইংরেজীনবীশ নাসিকা কুঞ্চন করে না। বাঙ্গালা দেশে এমন কোনও সমাজ নাই, কোনও প্রকারের 'নবীশে'র সমিতি নাই যেখানে পিতা পুত্র জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বা বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠ একত্র বসিয়া সমস্ত বিদ্যাসুন্দর বা রসমঞ্জরী পড়িতে পারে। ইংরাজীনবীশ তথা শুধু বাঙ্গালাবাগীশ সকলকেই কৃত্রিম ভাবে হউক অকৃত্রিম ভাবে হউক, একবার নাসিকা কুঞ্চন করিতেই হইবে। ইংরাজীনবীশকে তিনি বলিয়াছেন "তোমরা যাহা যোগাইতেছ সমাজ তাহা চাহে না।" তিনি কি সত্যসত্যই বলিতে চান যে তাঁহার সমাজ বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী চাহে ? গত বৎসরের 'অর্চ্চনা'য় কবীন্দ্র জয়দেবের আলোচনায় আমরা চণ্ডীদাস,বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের রচনা হইতে অনেক অশ্লীল শ্লোক বাছিয়া দিয়াছিলাম। সে সকলের পুনরাবৃত্তির স্থান আপাততঃ আমাদের নাই। বাস্তবিক কি আমাদের সমাজের অভাব—ঐরূপ সম্ভোগলালসা, ঐরূপ ভক্তির নামে শরীরের নিম্নবৃত্তির ভোগাভিলাষ ?

আরও একটা কথা। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের বাঙ্গালা সমাজ এখনকার বাঙ্গালীর সমাজ নহে। তখনকার ভাব-ভাবনা, অভাব-অভিযোগ, বাসনা-উদ্দীপনা অপর শ্রেণীর ছিল। সেকালের জীবনের সহিত আধুনিক সংগ্রামরত জীবনের তুলনা হইতে পারে না। আধুনিক জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে বাঙ্গালী-চরিত্রে কেবল বৈষ্ণব কবির নিস্তেজ প্রেমের মসলা চালিলে চলে না। এখনকার জীবনসংগ্রামের সকল অস্ত্র, সকল হাতিয়ার ইউরোপ আমেরিকায় পুঞ্জীভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের মারণ উচাটন বশীকরণের মন্ত্রসকল ম্লেচ্ছভাষায় রচিত, ম্লেচ্ছগুরুবক্ত্রগম্য। প্রকৃতি সুন্দরীকে জয় করিয়া প্রেমাবিষ্ট করিতে হইলে সেই মন্ত্র চাই ; সেই বশীকরণ-মন্ত্রে ক্ষণপ্রভা দামিনীসুন্দরী আলাউদ্দিনের প্রদীপ-আহূত জিনির মত মানুষের সেবা করে। এখনকার দিনে যদি দেশীয় সাহিত্য, বিজ্ঞানের পুষ্টিসাধন করিবার সময় পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শকে বর্জ্জন করি, তাহা হইলে আমরা চিরকাল 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই অবস্থান করিব। লেখক বলেন, 'সমাজের অভাব-অভিযোগের কথা শুনিয়া এবং বুঝিয়া মাল সরবরাহ কর না।' কথাটা

সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সমাজের অভাব-অভিযোগ—প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এক ভাবের প্রেমের কবিতায় নহে, অভাব উচ্চ আদর্শের প্রকৃত শিক্ষাপ্রদ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের, কাব্যের ও ইতিহাসের। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু ইংরাজী ছাঁচে সাহিত্য গড়িয়া বাঙ্গালীর অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করেন নাই, বা এ সাহিত্য প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ জগৎকে দুই চারিদিন শোভান্বিত করিয়া ম্লান হইয়া আবর্জনায় পরিণত হইবে, সে সন্দেহ ভিত্তিহীন। অপর জাতির সাহিত্যের তুলনায় বাঙ্গালা সাহিত্য সামান্যই উন্নতি করিয়াছে; এ সাহিত্য সর্ব্বদিকস্পর্শী নহে, ইহাতে বৈচিত্র্য নাই; ইহাতে বিশেষ মৌলিকতার বিকাশ নাই। কিন্তু এতদিন যে বঙ্গসাহিত্য পথহারা পথিকের মত ভুল পথে চলিয়া আসিতেছে, একথা প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবীর নিকট শুনিলে মনে হয়, তাঁহার 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে'র বাজেয়াপ্তি হওয়ায় শোকে সান্ত্বনা পাইবার জন্য পাঁচকড়িবাবু মনকে আঁখি ঠারিয়া এ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি মনে মনে বলিতেছেন —"সে গ্রন্থও তো ইংরেজীনবীশের গ্রন্থ ছিল। যাক্ বাছা মরিয়াছে ভালই হইয়াছে, যেহেতু ইংরেজিনবীশের সকল রচনাই ব্যর্থ রচনা।" আমরা কিন্তু বলিব—"সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" বাঁচিয়া থাকিলে সাহিত্যের সম্পদ বাড়িত। এখন 'উমা' বাঁচিয়া থাক, 'আইনী আকবরী' অক্ষত শরীরে বাঙ্গালীর পুস্তকাগারের শোভা সম্পাদন করুক। তবে নায়কের 'শনিবারের পালা' ধ্বংস হইলেও ক্ষতি নাই।'

তিনি বলিয়াছেন 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য ইংরাজির সহিত পাল্লা দিবার জন্য লিখিত'। কথাটা উপহাসচ্ছলে লিখিত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। মিল্টনের তেজোজ্জ্বল চিত্ররাজিতে উদ্দীপিত হইয়া তাঁহার জাতীয় মহাগ্রন্থ-বর্ণিত নায়ক-নায়িকা লইয়া কাব্য রচনা করিবার সাধ স্বভাবকবি মাইকেলের প্রাণে জন্মিয়া থাকা অসম্ভব নহে। তাহা বলিয়া বাস্তবিক মিল্টনের সহিত মাইকেল প্রতিযোগিতা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন—এ ধারণা যুক্তিতর্কের বাহিরে। এক দেশের সাহিত্য অপর দেশের সাহিত্যকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রোমক সাহিত্যে গ্রীক প্রভাব, আধুনিক ইংরাজি ও ফরাসী প্রভৃতি বিশাল সাহিত্যক্ষেত্রে রোমক ও গ্রীক প্রভাব, এমন কি ইংরাজি-বিজ্ঞান গ্রন্থে ফরাসী প্রভাব, দর্শন গ্রন্থে জার্ম্মান প্রভাব বিশ্ববিদিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরাজী প্রভাব মারাত্মক নহে। চুরি বিদ্যা কদর্য্য; কিন্তু

অনুকরণে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। যে শিশু অনুকরণ করিয়া পা ফেলিতে পারে না, জিহ্বা নাড়িতে পারে না, সে খঞ্জ এবং মূক হয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যকে আধুনিক রাস্তা ছাড়িয়া একটা নূতন রাস্তা আবিষ্কার করিয়া সেই পথে গুটি গুটি পা ফেলিতে পরামর্শ দিবার পাঁচকড়ি বাবু অপর একটী কারণ দর্শাইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র—বঙ্কিমচন্দ্র—প্রবর্ত্তিত ভাষা "বিচারালয়ে চলে না, ব্যবসায়ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর কাজে চলে না, গৃহপ্রাঙ্গণে নারী সমাজে চলে না, এমন কি ইংরাজীনবীশ বন্ধুবান্ধবের কাছেও চলে না।" আমরা তো এমন কোনও ভাষা জানি না যাহা সাহিত্যে ও সমাজে সমভাবে প্রচলিত। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতনবীশ বন্ধুবান্ধবদের সহিত কথা কহিবার সময় আর কে বলিত

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ
শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসার।

—কুমারসম্ভব, ৩য় সর্গ ৩৬ শ্লোক।

পাঁচকড়িবাবু কি কল্পনা করিতে পারেন যে সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞ কোন নায়ক—নাট্যশালায় নহে—নিজ গৃহে মনোময়ী স্ত্রীকে বলিতেছে—

সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম
দেহি মুখকমলমধুপানম। (গীতগোবিন্দ)

তিনি তো হিন্দীভাষায় সুপণ্ডিত। কোন হিন্দুস্থানী বন্ধুকে কথা কহিয়া সাধারণ কথোপকথনের সময় বলিতে শুনিয়াছেন—

"তুম গুণগ্রাহী উর কদরদান হী জো তুম নে বাতেঁ কহা দুরস্ত হৈ। সূর্য্যসেভী তুমহারে তেজকি ধীপ কি আলা অধিক হৈ। পরন্ত এক্কা ত পর্ব্বত না কর। (সিংহাসনবত্রীসি)।

ফার্সিতেই বা কে সাধারণ কথোপকথনে এই ভাষা ব্যবহার করে?

ইয়ার দারী কি ওয়াক্তে জাদনে তু
হামা খান্দান বুলন্দ ও তু গিরিয়াঁ।
পস্ চনা নাজি কি ওয়াক্তে মরদনে তু
হামা গিরিয়াঁ। বুলন্দ ও তু খান্দান।—হাফিজ।

এইরূপে পাশ্চাত্য দেশেরও প্রত্যেক ভাষা কথায় ও পুস্তকে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। ইংরাজেরও পুস্তকের ভাষা বিচারালয়ে বক্তৃতায় যেভাবে চলে, বাঙ্গালীরও আধুনিক ভাষা বিচারালয়ে সেইভাবে চলিতে পারে এবং চলে। যেখানে উচ্চ ভাবের উদ্রেক করিতে হইবে সেখানে ভাষাও উচ্চ অঙ্গের হওয়া

আবশ্যক। স্বদেশী আন্দোলনের সময় পাঁচকড়ি বাবু অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে সময় কি তিনি বলিতেন—"ভাই সব, খুড়োলুসে কুপোকাৎ হয়ো না। লাজ মান তেয়াগিয়ে জ্ঞানের দেউটী লয়ে, মা মা ব'লে ডাক উভরায়।" অট্ট অট্টহাস মুখে হও আগুয়ান। দেহ ধনুকে টঙ্কার।"

"নাগপাশ বাণ জুড়ে ধনুকের গুণে
ইংরাজের সাথে যুদ্ধ পাঁচকড়ি ভণে।"

তখন তাঁহাকে সেই ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই কথা কহিতে হইয়াছিল এবং সেই ভাষাই আপামর সাধারণ বুঝিয়াছিল। সেদিনকার গিরিশচন্দ্র-শোকসভায় তিনি এবং বাগ্মীবর সুরেশচন্দ্র পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়, মেধাবী বিপিনচন্দ্র কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন? কৃত্তিবাসী ভাষায় না বিদ্যাসাগরী ভাষায়? বিচারালয়ে ইংরাজি-অনভিজ্ঞ জুরীদিগের নিকট আমরা তো সাহিত্যের ভাষাতেই সওয়ালজবাব করিয়া থাকি এবং ফলও প্রাপ্ত হই।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর কার্য্যে আমাদের বাঙ্গালাও চলে না, John Stuart Mill কিম্বা Marshallএর অর্থনীতির ইংরাজিও চলে না। ইংরাজি ভাষায় দোকানে গিয়া কোন সাহেব দর সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিবার সময় Johnson এর বা Burke বা Macaulayর ভাষার স্রোত ছুটাইলে সে মাল খরিদ করিয়া গৃহে ফিরিতে পারে না। বোধ হয় Bedlam যাইতে হয়। ইংরাজী নারীসমাজেও পুস্তকের ভাষা চলে না। কথিত ও লিখিত ভাষার পার্থক্য চিরকালই বর্ত্তমান থাকিবে।

আধুনিক পুস্তকের বাঙ্গালা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তাহা কেহই বলে না। তাহা বলিয়া তাহা যে 'স্বেচ্ছাচারের ভাষা' সে কথাও আমরা স্বীকার করি না। সাধারণতঃ শব্দসম্পদের জন্য এ ভাষা সংস্কৃত ভাষার উপর নির্ভর করে। তখন সংস্কৃতের ব্যাকরণই বাঙ্গালার শব্দযোজনার ব্যাকরণ। সংস্কৃত ভাষার শব্দ ভাণ্ডার অসীম। একই ভাবপ্রকাশক বহু শব্দ পাওয়া যায়। তাহারই মধ্য হইতে কতকগুলা কথা একই অর্থে বাঙ্গালার নিজস্ব হইতেছে।

এইরূপ ভাষার অপর একটা বিশেষত্ব আছে। ইহা দ্বারা ভাষার প্রাদেশিকতা বিনষ্ট হয়। যদি গ্রাম্য ভাষা লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য জন্মিবে না—জন্মিবে চাটগেঁয়ে সাহিত্য, ঢাকাই সাহিত্য, বর্দ্ধমেনে বাঙ্গালা আর কলকেতিয়া বাঙ্গালা। ভাষার প্রাদেশিকতা বিনষ্ট করিতে

হইলে সমগ্র বাঙ্গালীজাতির বোধগম্য ভাষা আবশ্যক। দেশমধ্যে শিক্ষার প্রসারের সহিত লোকে গ্রন্থব্যবহার্য্য মার্জ্জিত ভাষায় কথা কহিতে শিক্ষা করে। যখন ভারতচন্দ্র বা চণ্ডীদাস আপনাপন রচনা প্রকাশিত করিয়াছিলেন তখন তাঁহারাও আপনাপন সময়ের 'ঘোরো কথা'র পদ রচনা করেন নাই।

কনক চম্পকদাম মুদ্রা দক্ষ করে
আশীর্ব্বাদ বরাভরযুক্ত সব্যে ধরে
যে গুণে বিভব নাম হ'য়েছে অভয়া
নিজ গুণে কৃপা করি কর মোরে দয়া।

এ ভাষা সংস্কৃত ভাঙ্গা ; অশিক্ষিত লোকের অবোধ্য। কাশীরাম দাসের ভাষাও সংস্কৃতে ভরা। অশিক্ষিত লোকে যেমন বিষবৃক্ষের গল্পাংশ বুঝিতে পারে, তেমনি মহাভারতের গল্পও বুঝিতে পারে। নিম্নলিখিত শ্লোকের প্রত্যেক কথার অর্থবোধ কি সকল বাঙ্গালী করিতে পারে ?

করি কৃতাঞ্জলি পার্থ মহাবলি
কহেন রাজার আগে।
আজ্ঞা কর রায় করিব উপায়
রাজসূয় যজ্ঞ ভাগে।
অতুল কার্ম্মুক গাণ্ডীব ধনুক
অক্ষয় তুণ যুগল
রথ কপিধ্বজ দেব দত্তাযুজ
চারু তুরঙ্গম বল।—সভাপর্ব্ব।

কৃত্তিবাসের ভাষা খুব সরল এবং তাঁহার শব্দমালা বাঙ্গালীর ঘরের। তবে তাঁহার রচনায়ও 'খেদারিয়া' 'আগুয়ান' 'গাদি গাদি' 'পাথালে' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। উপরিউদ্ধৃত ভারতচন্দ্রের বা কাশীরাম দাসের ভাষা যে বুঝিতে পারে সে 'বিধবা বিবাহ' 'কাদম্বরী' বা 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ভাষাও বুঝিতে পারে।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের হিন্দুদিগের ভাষা আজকাল সংস্কৃতশব্দবহুল হইতেছে। ইহাতে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণ অল্প আয়াসেই পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিবে। পাঁচকড়িবাবুর মত অপর সম্পাদকও দক্ষতার সহিত এক-কালে একখানি বাঙ্গলা, একখানি হিন্দী ও একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র পরিচালনা করিতে পারিবেন।

এই সকল কারণে আমাদের মনে হয় শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়িবাবুর আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য-সম্বন্ধে অভিনব মতামত যুক্তিতর্কবিরোধী হইয়াছে।

সংস্কৃত নাটকের কথা।

নাট্যকলার উদ্ভব ও বিকাশ প্রত্যেক দেশের সভ্যতার পরিচায়ক। সকল দেশের সাহিত্যের প্রথম শুর কাব্য। আগে পদ্য তাহার পর গদ্য সকল সাহিত্যে বিকসিত হইয়াছে। ভারতে প্রথমে ছন্দে বেদগান, পরে বেদব্যাখ্যায় গদ্যের বিকাশ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে এই প্রাচীন গদ্যের পরিচয়। গ্রীসের আদিম সাহিত্যে এপিক্ (Epic Poetry) বা মহাকাব্য। হোমারের ইলিয়দ ও ওডিসি প্রাচীন সাহিত্যিক স্তরের নিদর্শন। ইংলণ্ডেও বিওউল্ ফ্ (Beowulf) এংগ্লো-স্যাক্সন সাহিত্যে প্রাচীনতম স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও এইরূপ। আগে পদ্য তাহার পর গদ্য।

সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সহিত সকল দেশেই নাট্যকলা অল্পাধিক পরিমাণে উন্নতিলাভ করিয়াছে। তবে কোথাও হয়ত নাট্যকলা সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়া অগণিত সুলিখিত নাটকের সৃষ্টি করিয়া রঙ্গালয়ের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, কোথাও বা কেবল কোন ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে দেব বা মানবের চরিত্র মানবে অভিনয় করিতেছে। প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ বর্ত্তমান কালের প্রায় সকল দেশেই দেখা যায়। বহুবিধ যন্ত্রে সজ্জিত, সুশিক্ষিত নট পরিপূর্ণ রঙ্গালয়গুলি ও বিখ্যাত নাট্যকারগণের নাটকাবলী এই শ্রেণীর উদাহরণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ মহরমের উৎসব। পারস্যে হাসেন হোসেনের করুণ কাহিনী মহরমের সময় জনগণ সমক্ষে প্রকটিত হয়। ইহা সুগঠিত নাটক নহে। কিন্তু নাটকের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী, পরিচ্ছদ প্রভৃতি ইহাতে ব্যবহৃত হয়। [A Persian Passion Play সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য] ইহাতে দৃশ্যপটের ব্যবহার নাই।

আমাদের দেশের যাত্রাও নাট্যকলার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। হাবভাব, পরিচ্ছদ, কথোপকথন, সঙ্গীত প্রভৃতি নাট্যের সকল অঙ্গই আছে, অভাব কেবল দৃশ্যপটের। বিশেষত্বের মধ্যে জুড়ী বা বালকগণের মিলিত গান বা সমবেত সঙ্গীত।

কোন ইউরোপীয় সমালোচক (Julius Eggeling) বলিয়াছেন, ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি উৎসব হইতে। রাসলীলা প্রভৃতি উৎসবে নরনারী বিবিধ

পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া দেবতার লীলা অভিনয় করে। রামলীলা ইহার আর এক দৃষ্টান্ত। ইহাতেও সেই রামায়ণের অভিনয়। সুসংবদ্ধ কথোপকথন বা সঙ্গীত নাই বটে, কিন্তু পরিচ্ছদে, ভাবভঙ্গীতে, মুকোষ-পরিহিত রাক্ষসগণ, কৃত্রিম লাঙ্গুলভূষিত বানরগণ, উজ্জ্বল বেশে সজ্জিত রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি সেই চিরন্তন কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়।

উৎসব হইতে নাট্যের উৎপত্তি বিচিত্র নহে। অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ প্রাচীন গ্রীসে ঋতু-পরিবর্ত্তনে উৎসববিশেষ অনুষ্ঠিত হইত। যখন শীত ঋতু প্রায় অবসান, বসন্তের সমাগম সূচিত হইতে থাকে, তখন গ্রীসে মহোৎসব। দায়োনিসাস্ দেবের উৎসব। এই উৎসব হইতেই গ্রীসীয় ট্রাজিডি ও কমেডির উদ্ভব। [মল্লিখিত "নাট্য ও অভিনয়" দ্রষ্টব্য। মানসী, ভাদ্র, আশ্বিন] ইংলণ্ডে মে মাসের প্রারম্ভে জনগণ প্রমোদনৃত্যে রত হয়। বসন্তের রাণীর অনুচরগণ মধুর বাদ্য বাজাইয়া অগ্রসর হয়, শীতঋতুর সেবকগণ কর্কশ বাদ্যে কর্ণ বধির করে। ভারতেও বসন্তোৎসব চির প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত রত্নাবলী নাটিকায় প্রাচীন মদনমহোৎসবের দৃষ্টান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিক কুঙ্কুম ও কুসুম্ভ প্রাচুর্য্যে অরুণ বর্ণা শত শত পিচকারী হইতে আবির মিশ্রিত সলিল উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। নগরের দীনতম প্রজাও ইহাতে যোগ দিয়াছে। সেই প্রাচীনকালেও এই উৎসবের যে মূর্ত্তি নাটকপাঠে ফুটিয়া উঠে, আজিও তাহার সদৃশ মূর্ত্তি উন্মাদনাময় হোলি-উৎসবে দেদীপ্যমান।

এখন উৎসব হইতেই যদি সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি ধরা যায় তাহা হইলে তাহার বিশেষত্ব কি? সিল্ ভিয়ান্ লেভি 'ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি' প্রবন্ধে [শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য। ভারতী] বলিয়াছেন বৈদিক সাহিত্যে নাট্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সূক্ত বিভিন্ন ঋষিগণ উচ্চারণ করিতেছেন। এই সূক্তগুলি কথোপকথনের আকারে গ্রথিত। হয়ত কোন যজ্ঞের সময় দুইজন ঋত্বিক্ এই সূক্ত আবৃত্তি করিতেন। ক্রমশঃ তাহা হইতে মিলিত গান ও বহু ব্যক্তির কথোপকথন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অল্প ব্যক্তির দ্বারা নাট্যাভিনয় যে অসম্ভব নহে গ্রীসীয় নাট্যে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। সাধারণতঃ তিনজন দ্বারাই অভিনয় চলিতে পারিত। সংস্কৃত নাটকের যে অংশ আমরা এখন দেখিতেছি তাহাতে অবশ্য বহু চরিত্র এক নাটকেই অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত আদিম নাটকাবলী আমরা পাই নাই। তাহাতে কয়টি চরিত্র প্রযুক্ত হইত তাহাও জানিবার উপায় নাই। যে

সময়কার সংস্কৃত নাটকাবলী আমরা পাইয়াছি তখন নাট্যকলা অনেক উন্নতি-লাভ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে কি ছিল জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল জাগ্রত হইয়া থাকে।

একণে সংস্কৃত নাটকের বিশেষত্ব পর্য্যালোচনা করা যাক্। প্রথমেই আমাদের চক্ষে "নান্দী" এক অভিনব বস্তু বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সর্ব্বত্র গ্রন্থ-প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিত হইয়াছে। বিঘ্নবিনাশের জন্য এই মঙ্গলাচরণ অবলম্বিত হইত। পরে কবিগণ মঙ্গলাচরণ না করিয়া একেবারেই কাব্য আরম্ভ করিতেন বটে, কিন্তু মঙ্গলের জন্য 'শ্রী', 'লক্ষ্মী' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে তাই আছে "আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তু নির্দ্দেশো বাপি তন্মুখম্" অর্থাৎ কাব্যের প্রারম্ভে আশীর্ব্বাদ, নমস্কার অথবা বর্ণিতব্য বিষয় আরম্ভ হইবে। নাটকের আদিতে কোথাও দর্শকগণের প্রতি দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা, কোথাও বা কোনও দেবতাকে নমস্কার। অভিজ্ঞান শকুন্তলে 'মহাদেব দর্শকগণকে রক্ষা করুন' এই বাণী প্রযুক্ত হইয়াছে। ভবভূতি মহাবীর-চরিতে জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যের স্তব করিয়াছেন। এই আশীর্ব্বাদ বা নমস্কার নাট্যসাহিত্যের প্রথমে প্রযোজ্য। একেবারে নাটক আরম্ভ হইয়াছে এরূপ কোনও উদাহরণ সংস্কৃত নাট্যে নাই। বাঙ্গালাদেশে যে নাটক রচিত হইতেছে তাহা ইংরাজী নাটকের আদর্শে গঠিত। তাহাতে একেবারেই পাত্র প্রবেশের দ্বারা অভিনয় আরম্ভ হইয়া থাকে। মধুসূদন ও দীনবন্ধু এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা নাটকেও সংস্কৃত নাটকের ন্যায় নান্দী থাকিত। রামনারায়ণের "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'' ইহার উদাহরণ।

সংস্কৃত নাট্যের এই নান্দী ক্রমে লিপিচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। নান্দীর আদিম উদ্দেশ্য বিঘ্নশান্তি বা মঙ্গলাচরণ।

"দেবদ্বিজনৃপাদীনামাশীর্ব্বাদপরায়ণা।
নন্দন্তি দেবতা যস্মাত্তস্মান্নান্দী প্রকীর্ত্তিতা॥

[ভরত-নাট্যশাস্ত্র।]

অর্থাৎ দেবতা, ব্রাহ্মণ, বা রাজগণের আশীর্ব্বাদযুক্ত নান্দী। ইহাতে দেবগণ প্রীত হন। কিন্তু নান্দীর এই মূল উদ্দেশ্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিলেও নান্দী-রচনায় কবি বহু কৌশল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নান্দীর শ্লোকে নাটকের আখ্যানবস্তুর আভাস প্রদত্ত হইতে লাগিল। মুদ্রারাক্ষস নাটকে চাণক্যের কুটিল নীতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার নান্দীশ্লোকে মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট পার্ব্বতীর কপট্যকে

শিরে রাখিয়া ছলে তাহা অস্বীকার করিতেছেন, এই কুটিল ভাবের ইঙ্গিত আছে। রত্নাবলীর নান্দীর চারিটি শ্লোক চারি অঙ্কের ইতিবৃত্ত সূচনা করিতেছে। [ভূদেব বাবুর "বিবিধ প্রবন্ধ" রত্নাবলী-সমালোচনা দ্রষ্টব্য] এইরূপ মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব প্রভৃতি নাটকের নান্দীতেও কবির কৌশলের পরিচয় বর্ত্তমান। নান্দী সংস্কৃত নাট্যের এক বিশেষত্ব।

আর এক নূতন ব্যাপার—সূত্রধার ও নট বা নটীর কথোপকথন। ইহা নাটকের প্রস্তাবনা নামে কথিত। ইহাতে নাটকলেখকের নাম, নাটকের নাম, কোন্ রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় নাটক অভিনীত হইতেছে, কোন্ উৎসবে অভিনীত হইতেছে প্রভৃতি বিষয় থাকিত। এই সূত্রধার যেন আধুনিক রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ। তাঁহার আদেশে নটগণ বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয়ে প্রবৃত্ত হয়। প্রস্তাবনার শেষে নাটকের প্রথমেই যে পাত্র প্রবেশ করিবেন তাঁহার নাম দেওয়া হইয়া থাকে। সেকালে ত আর মুদ্রিত প্রোগ্রাম বিতরিত হইত না যে তাহা দেখিয়া দর্শকগণ বুঝিতে পারিবেন অমুক আসিতেছেন। কাজেই নাটকের প্রথমে কে আসিতেছেন বলিয়া দেওয়া হইত। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে সূত্রধার বলিল "এই দুষ্যন্ত রাজা বেগবান্ মৃগ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছেন।" দর্শকগণ বুঝিলেন দুষ্যন্ত রাজা আসিতেছেন। সূত্রধার চলিয়া গেল। প্রস্তাবনা শেষ হইল। নাটকের আরম্ভেই রথারূঢ় দুষ্যন্ত মৃগের অনুসরণ করিতেছেন। বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে একেবারে ঘটনাটাই বুঝাইয়া বলা হইয়াছে—

"ঊরূদ্ভবা নরসখস্য মুনেঃ সুরস্ত্রী
কৈলাসনাথমনুসৃত্য নিবর্ত্তমানা।
বন্দীকৃতা বিবুধশত্রুভিরর্দ্ধমার্গে
ক্রন্দত্যসৌ করুণমপ্সরসাং গণোঽয়ম্।" [বিক্রমোর্ব্বশী

নারায়ণ মুনির উরুদেশ হইতে উৎপন্না উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরা কৈলাসনাথের সেবা করিয়া ফিরিবার সময় অর্দ্ধপথে অসুর কর্ত্তৃক বন্দিনী হইয়াছে। তাই অপ্সরাগণ করুণস্বরে কাঁদিতেছে।

এখানে নাটকের ঘটনার একটু পরিচয় পাওয়া গেল। এইরূপ প্রস্তাবনায় দর্শকেরা নাটকসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কিছু জানিতে পারিতেন। অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

নাটকের মধ্যেও যখন পাত্র প্রবেশ হয় তখনও প্রায় কেহ না কেহ জানাইয়া দেয় কে আসিতেছে। উত্তর-রাম-চরিতে অষ্টাবক্র চলিয়া যাইবার সময় বলি র

গেলেন "এই যে কুমার লক্ষণ আস্‌ছেন।" [অয়ে ! কুমারলক্ষণঃ প্রাপ্তঃ। উত্তরচরিত্ত প্রথম অঙ্ক] এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ পাত্রপ্রবেশই কঞ্চুকী, প্রতীহারী প্রভৃতির মুখে সূচিত হয়। আমরা আজকাল 'প্রোগ্রাম' দেখিয়াই ইহা বুঝিতে পারি।

যদি সংস্কৃত নাট্যে এই প্রস্তাবনাগুলি না থাকিত তাহা হইলে কোন্ নাটক কাহার রচিত,কোন্ রাজার সময়ে ইহা অভিনীত হয় প্রভৃতি বিষয় আমরা জানিতে পারিতাম কি না সন্দেহ! প্রস্তাবনা নাটকের অবয়ব হওয়াতে আজ পর্য্যন্ত এ সকল বিষয় বুকে ধরিয়া আছে ও নাট্যের লেখকও সময়ের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

সংস্কৃত নাটকের প্রথমে যেরূপ শেষেও সেইরূপ একটু বিশেষত্ব আছে। নাটকের সর্ব্বশেষ ভরতবাক্য। ইহা আশীর্ব্বাদ পূর্ণ। "পৃথিবী শস্যপূর্ণ হউক, সাধুগণ সুখে থাকুন," প্রভৃতি বাক্যে সংস্কৃত সকল নাট্যের শেষ।

নাটকের ঘটনাবলীর মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, সকল নাটকই মিলনান্ত হইবে। বিয়োগান্ত নাটক সংস্কৃত ভাষায় নাই। উত্তররামচরিতের শেষ দৃশ্যে ভবভূতি রামায়ণবর্ণিত সীতার পাতাল,প্রবেশ না দেখাইয়া রামসীতার মিলন দেখাইয়াছেন, এই প্রকার প্রচলিত সত্যের বিরুদ্ধ ঘটনা দেখাইতে কবি সঙ্কুচিত হন নাই, কারণ নাট্যে বিয়োগান্ত ঘটনা অবলম্বিত হইবে না। প্রাচীন গ্রীসে ট্রাজিডির আদর ছিল। প্রাচীন ভারতে নাট্যসাহিত্যে ট্রাজিডি নাই।

সংস্কৃত নাট্যের ভাষা গদ্য ও পদ্য উভয় মিশ্রিত কতক গদ্যে কতক বা শ্লোকে কথোপকথন রচিত। ছোটখাট কথাগুলি গদ্যে লেখা, কিন্তু যেখানে কোন গভীর ভাবের অবতারণা, কোনও মহান্ দৃশ্যের বর্ণনা, সেইখানেই শ্লোকের সহায়তা লওয়া হইয়াছে। ভাষাও পাত্রভেদে বিভিন্ন। রাজা, ব্রাহ্মণ (বিদূষক ভিন্ন), ঋষি প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন। রমণীগণ, হীন পাত্রগণ প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করে। ইংরাজী Dialect এর ন্যায় প্রাকৃত ভাষারও বিভিন্ন রূপ আছে। কে কোন্ প্রকার প্রাকৃত ব্যবহার করিবে আলঙ্কারিকেরা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু সংস্কৃত নাট্য যে সময়ে অভিনীত হইত তখন সাধারণ সকলেই ইহার আদর করিত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নাট্য যেরূপ জাতীয় জীবনের পরিচয় প্রদান করে, জাতির রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, আশা ভরসা বুঝাইয়া দেয়, সংস্কৃত নাট্যে সেরূপ স্থলে স্থলে বর্ত্তমান থাকিলেও ইহার প্রধান অভাব

সজীবতা। সকল নাটকগুলিই এক নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা। যদিও আলঙ্কারিক-গণ এই নিয়ম সৃষ্ট করিয়াছেন এ কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু এই নিয়মে পরবর্ত্তী নাটকগুলি বিকলাঙ্গ হইতে পারে কিন্তু পূর্ব্বের নাটকগুলি ত অক্ষুন্ন থাকির্বে। দুঃখের বিষয় সংস্কৃত নাট্যের সংখ্যা অধিক নহে। সমস্ত জাতির জীবনের স্পন্দন যদি নাট্যে ধ্বনিত হইত তাহা হইলে সংস্কৃত নাট্য উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিত, কিন্তু তাহা না হওয়াতে ক্রমে ক্রমে নাট্যে কৃত্রিমতার প্রাচুর্য্য ও অনুকরণস্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি আজ বিস্ময় উদ্রেক করিলেও পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ যথা (নল্লাকবি, প্রভৃতি) অবজ্ঞা ব্যতীত কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। ভাষার পরিবর্ত্তনে, সভ্যতার অবনতিতে নাট্যকলা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আশা আছে পুনরায় কোন মহাকবি ইহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

মঙ্গল কবচ।

(১)

নরদেহে বসন্ত রোগের বীজ সঞ্চার করিয়া দিলে যেমন বসন্ত রোগ নিবারণ করিতে পারা যায়, আমার জানা ছিল তেমনি বিবাহ রূপ টীকা দিলে প্রেম-ব্যাধি নামক সঙ্কটময় বায়ুরোগটা যুবক হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। প্রেমচিত্রাঙ্কিত সুবাসিত চিঠির কাগজে নব-পরিণীত যুবকবৃন্দ রবি বাবুর কবিতা উদ্ধৃত করিয়া নববধূকে প্রেমপত্র লিখিবার জন্য নিশীথ দীপের স্নিগ্ধ রশ্মির সদ্ব্যবহার করে তাহা আমি অস্বীকার করি না। নূতন পরিচয়ের পর কিশোরী ভার্য্যা অকস্মাৎ পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেও যুবকগণ বন্ধুবান্ধবদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে 'জীবনটা কিছুনা, কেবল একটা উ আর একটা আঁ'। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেরূপ পীড়ার মধ্যে কিছু বিষাক্ত পদার্থ থাকে না। তাহাতে মানুষ উন্মাদ হয় না, অপরের নিকটে হাস্যাস্পদ হয় না, পৃথিবীতে নিজের ও অপরের অনিষ্ট করে না।

আজ বহুদিন পরে বাল্যবন্ধু সহপাঠী ক্ষিতিশচন্দ্রকে পাইয়া "বিবাহ প্রেমের

টাকা" এই প্রবচনটার যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে মনস্থ করিলাম। ক্ষিতিশচন্দ্র কলেজে বড় প্রেমিক বলিয়া পরিচিত ছিল। গল্পের পথিক যেমন কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন নির্জ্জন নিশীথে প্রান্তর মধ্যে বিশ্রাম আশে আলেয়ার রশ্মির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শক্তির অপচয় করে, তৃষাতুর মৃগ যেমন কল্পনার চক্ষে মরুমাঝারে স্বচ্ছ-সলিল সরোবর দেখিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া মরে, ক্ষিতিশচন্দ্রও তেমনি একাদশ বর্ষীয়া শিশু বালিকার একটা নিরর্থক কথা শুনিয়া, কখনও বা গবাক্ষ-অন্তরালস্থিত দুইটা শঙ্কাচকিত নেত্রের জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া, কভু বা আর্দ্রবসনা কলসাকক্ষা গ্রাম্যবধূর অপাঙ্গের সলজ্জ কটাক্ষে প্রেমবিহ্বল হইয়া আপনাকে একটা উপ-ন্যাসের নায়ক মনে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, হা হুতাশ করিত, হাসিত, কাঁদিত আর এমন এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িত যে তাহার জোরে জ্বলন্ত ল্যাম্প নির্ব্বাপিত হইত।

অনেকে তাহাকে 'প্রেমিক ক্ষিতি' বলিয়া ডাকিত। তাহার হৃদয়টা ভাব-প্রবণ হইলেও বড় মধুর ছিল। আমরা তাহাকে 'মাই ডিয়ার ক্ষিতিদা' বলিয়া ঘনিষ্টতার পরিচয় দিতাম। আজ প্রায় চারি বৎসর পরে তাহাকে পাইয়া হৃদয়ের আর্ট গ্যালারীতে কলেজ-জীবনের অনেকগুলা সুখ-চিত্র দেখিতে পাইলাম।

আমি তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলাম—দাদা, তখন তোমায় ঠাট্টা করতাম। আহা! প্রেমটা যে কি মারাত্মক ব্যাপার এখন হাড়ে হাড়ে জেনেছি।

"'মাই ডিয়ার ক্ষিতিদা' একটু হাসিয়া বলিল—দূর পাগল! সংসারের জ্বালায় এখনও কি আর ওসব দুশ্চিন্তা আছে?

আমি বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলাম—সে কি দাদা! তোমার মুখে এরকম কথা তো কখন শুনিনি। দু একটা প্রেমের গল্প টল্প বল।

ক্ষিতিশ একটু হাসিল। আমি অন্যমনস্ক ভাবে পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া কেবল তাহার স্বাক্ষরটা দেখাইয়া বলিলাম—মনে কর যদি এই রকম স্বাক্ষরযুক্ত একখানা পত্র পাও।

ক্ষিতিদা পড়িল—'অনুগতা—শ্রীমতী মাধুরিকা দাসী'। পত্রের লিখিত অংশটী ঢাকিয়া আমি তাহাকে পত্রের উপরটি দেখাইলাম; তথায় লেখা ছিল—"কৃষ্ণনগর ৬ই আষাঢ়।" তাহার মুখভাব পরীক্ষা করিবার জন্য ক্ষিতিশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলাম। একটা বিস্ময়ের ভাব তাহার বদনে দেদীপ্যমান ছিল। তাহার

নিম্নোষ্ঠ ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছিল, তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটা যেন সেই অক্ষর কয়টাকে গিলিতেছিল। হঠাৎ স্মরণ হইল 'মাই ডিয়ার ক্ষিতিশ' কৃষ্ণনগরে ওকালতী করেন। আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—"কি দাদা লেখিকাকে চেন নাকি ?"

কথাগুলায় যেন তাহার চমক্ ভাঙ্গিল,সে একটু হাসিয়া বলিল—চিন্‌ব আর কোথা থেকে ? অবাক হচ্চি যে তোমার প্রাণে এখনও সখ আছে। আমার তো ভাই ওসব অভিনয়গুলা আজকাল মোটেই ভাল লাগে না।

আমি একটু বিজয়গর্ব্ব সহকারে সেই পত্র হইতে আবার একছত্র বাছিলাম। তাহাতে লেখা ছিল—"পত্রোত্তর কৃষ্ণনগরে দিবেন না। কলিকাতায় ৪নং——ষ্ট্রীটে দিবেন"। কেবল রাস্তার নামটা অঙ্গুলিদ্বারা চাপিলাম। সে পড়িয়াই আগ্রহ সহকারে পত্রখানা আমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল। আমি হাত সরাইয়া লইয়া একটু গুম্ফ পাকাইয়া বলিলাম—তা' হবে না।'

আমার দিকে একটা কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—কেন আর দাদা ও সব পুরাণো ঘুমান্ত ভাবগুলাকে জাগিয়ে দাও !

আমি বলিলাম—আচ্ছা, প্রেম পত্রখানা পকেটে পুরিলাম। বল দেখি তোমার স্ত্রীর প্রেমে—তোমার স্ত্রীর নামটা ভুলে গেছি—

ক্ষিতিশ একটু হাসিয়া বলিল—যামিনী।

আমি বলিলাম—আচ্ছা যামিনী বৌদিদির প্রেমে কি তুমি মজগুল হ'য়ে আছ ?

সে বলিল—দূর পাগল্। ওসব কথা ছাড়। আজ আসি। আবার দেখা হ'বে।

আমি তাহাকে অত শীঘ্র ছাড়িতাম না। কিন্তু তাহার গাম্ভীর্য্যটা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে খনি হইতে বিশেষ কিছু পদার্থ তুলিতে পারিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, হায় রে বিবাহ ! এমন লোকটাও সংসারী হ'য়ে গেছে !

(২)

উদয়গিরির ঠিক শৃঙ্গের উপরিভাগে নীলিমা সিন্দুরের বর্ণ মাখিয়া খণ্ডগিরির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। এক টুক্‌রা কালো মেঘ সেই সহাস্ত-আস্ত নীলিমার নিম্ন দিয়া পলাইতেছিল। কে যেন কতকটা সিন্দুরের গুঁড়া তাহার অঙ্গে ছড়াইয়া

দিয়া ছিল। সিন্দুরগুলা তাহার সে মসীঘন অন্তরের কৃষ্ণ ভাবটা মোটেই কাটা-ইতে পারে নাই। প্রভাত বায়ুর সেবা গ্রহণ করিতে করিতে আমরা ভুবনেশ্বর হইতে এ কয়েক মাইল পদব্রজেই আসিয়াছিলাম। পথের দুই পার্শ্বের ঈষৎ ঘন বিটপী শ্রেণীর আনন্দ কোলাহল বড় ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু তাহা অপেক্ষা প্রীতিকর হইয়াছিল উদয়গিরির পাদদেশের ডাক বাঙ্গালার চা পান করিবার ও সিদ্ধ আলু এবং ভি, এস ব্রাদার্সের নাইস বিস্কুটের সাহায্যে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার আশা।

আমি ভুবনেশ্বর হইতে বাহির হইবার সময় একটা গেরুয়া রঙের আলখালা এবং গেরুয়ার পাগড়ী বাঁধিয়া ছিলাম। সে কয়দিন আমরা সকলেই আমোদের বন্যায় গা ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। কেবল একটা নূতন রকমের 'মজা' করিবার জন্য এ বেশ ধারণ করিয়াছিলাম। খণ্ডগিরিতে উঠিয়া আমি একটা গিরি গুহার ভিতর বসিলাম। চা প্রস্তুত হইলে বন্ধুবর্গ আমাকে সংবাদ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। আমি সেই নিরালায় বসিয়া শুনিতেছিলাম—তাহারা নিম্নে বাঙ্গালার নিকট গিরি গুহাদির রক্ষক বৃদ্ধ উড়িয়া পাইকের সহিত গল্প করিতেছিল ও প্রাণ ভরিয়া হাসিতেছিল। দূরে পাহাড়ের দিকে একখানা গো-শকট আসিতেছিল।

মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্য প্রকৃতি দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ। সেই গুহার নির্জ্জনতা, খণ্ডগিরির ঐতিহাসিক স্মৃতি, তাহার উপর আমার স্বেচ্ছা-পরিহিত গৈরিক বাস সত্ত্বেও আমি কেবল আমোদপ্রয়াসী বন্ধু বান্ধবদের রঙ্গরসের নীরব দ্রষ্টা হইয়া তথায় বসিয়া ছিলাম এবং চা রসাস্বাদনের সুখ চিন্তায় উৎফুল্ল হইতে ছিলাম একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বেশ বুঝিতে ছিলাম অন্তর্জগতের একটা সুপ্ত ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত স্বরে আমাকে মনুষ্য জীবনের গুরুত্বটা উপলব্ধি করিবার পরামর্শ দিতেছিল। আমার সে যৌবনসুলভ লঘুতা সে ভাবের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ক্রমশঃ তরঙ্গ-তাড়িত-তরণীর মত হাবুডুবু খাইতেছিল। আমার অন্তরের ভিতর হইতে তারস্বরে কে চিৎকার করিয়া বলিল—'দেখ দেখি কি সুন্দর সৃষ্টি। শৈল-শিখরে কাহার আদেশে অকস্মাৎ ঐ মানস-মোহন বালারুণ লাফাইয়া উঠিল? যিনি এই সৌন্দর্য্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার নিজের কি রূপ!' আমার চক্ষু মুদিয়া আসিল। আমি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার চির আনন্দময় পরমাত্মার কথা স্মরণ করিলাম। অমনি শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

প্রতি লোমকূপের ভিতর দিয়া যেন আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিল। আমি সে আনন্দ-সলিলে ডুবিলাম।

(৩)

জগতে দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী। সুখ স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। আর সেদিন মধুর প্রভাতে যে অভিনব আনন্দে আমার প্রাণমন তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মুহূর্ত্ত স্থায়ী। মুহূর্ত্তের পর ঘোরটা কাটিয়া গেলে সে সুখের তরঙ্গ-টুকুর প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় ক্ষণকাল স্থির হইয়া চক্ষু মুদিয়া রহিলাম। কিন্তু কৃষকের গান, বন্ধু-বর্গের প্রীতিরোল এবং দোয়েলের স্বর ব্যতীত কিছুই শুনিলাম না। তবু চক্ষু চাহি নাই। যদি সে মুহূর্ত্ত আবার ফিরিয়া আসে।

হঠাৎ পদশব্দে চমক ভাঙ্গিল। দেখিলাম সম্মুখে অবগুণ্ঠণবতী দুইটি বাঙ্গালী যুবতী। দূরে দুইটি বর্ষীয়সী ও একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাহাড়ের অপর পার্শ্বের গুহার কারুকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। আমি চক্ষু চাহিবামাত্র রমণী দুইটী ভূমিষ্ঠা হইয়া আমায় প্রণাম করিলেন এবং একজন একটী টাকা লইয়া আমার সম্মুখে রাখিলেন।

আমি বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। বুঝিলাম ভগবদ্‌চিন্তার জ্যোতিতে নিশ্চয় আমার বাহ্যিক আকৃতি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া রমণীদ্বয় আমাকে সাধু ভাবিয়া সেস্থলে আসিয়া 'ধ্যানভঙ্গের' জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। কি রহস্য! আমি যে সন্ন্যাসী নহি তাহাদিগকে এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়া উঠিয়া পলাইতে পারিলাম না। অথচ তাঁহাদিগকে প্রতারণা করিয়া মুদ্রাটি আত্মসাৎ করিতেও পারি না। আমি কেবল দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা মুদ্রাটী তাঁহাদিগের দিকে সরাইয়া দিয়া যোড়হস্ত হইলাম। যুবতী দুইটি পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

আমি একটু সাহস পাইয়া বলিলাম—না মা, আমি সাধু নহি। আমি টাকা লই না।

রমণী দুইটির মধ্যে একটিকে শ্বেতবরণা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন বলিয়া বোধ হইল। অপর রমণীটি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট শ্যাম বরণা, কোমল মুখে বেশ সন্তোষের ভাব। কৃশ স্ত্রীলোকটি তাহার বড় বড় চক্ষে একবার আমার দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সঙ্গিনীকে বলিল—নিতে বল না।

অপর রমণীটি বলিল—বাবা, আমরা গরীব লো[illegible] শ্রদ্ধা ক'রে যা দি নাও।

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম—না মা আমি ভিখারী নই। ভগবান আমাকে আহার জুগিয়ে দেন।

কৃশ রমণীটির দিকে চাহিলাম। তাহার রোগক্লিষ্ট সুন্দর মুখে তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটী ভাসিতেছিল। মুখে অব্যক্ত বেদনার ভাব। তাহার হস্তে সধবার লক্ষণ দেখিলাম। আমি বলিলাম—আপনি কতদিন ভুগছেন? আপনার এ বয়সে এমন রোগ কি ক'রে হ'ল?

বলিষ্ঠ রমণীটি বলিল—ঠিক বলেছেন বাবা। সাধু দেখ্‌লেই চেনা যায়। তিন মাসের মধ্যে মাধুরী এমন হ'য়ে গেছে, আগে বেশ গোলগাল মোটা সোটা ছিল। পোড়া কেষ্টনগর দেশ।

আমি মাধুরীর দিকে বিস্ময়ে চাহিলাম। এই কি সেই পত্রের মাধুরিকা? তাহার সেই বেদনাক্লিষ্ট চক্ষে সে আমাকে দেখিতেছিল। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—আপনি কি বড় বেশী পড়াশুনা করেন?

আগ্রহে অপর রমণীটি বলিল—ঠিক্ বলেছেন। বাবা আপনি অন্তর্য্যামী। ইনি সমস্তদিন লেখাপড়া নিয়ে আছেন। মাধুরিকা আমার কাকার মেয়ে। আমার কাকা আর খুড়িমা ওকে ছ'মাসের মেয়ে রেখে মারা যান। আমার মা ওকে মানুষ করেন। —ষ্ট্রীটে ৪ নম্বর বাড়ি আমার বাপের বাড়ি। আমার ভগ্নীপতি—

মাধুরিকা প্রগলভা ভগ্নির উপর বিরক্ত হইতেছিলেন। শেষে তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—কি বাজে বক্‌ছিস? থাম্‌না সুর—

আমি বলিলাম—ওঁর ম্যালেরিয়া নাই? কি রোগে উনি রোগা হচ্চেন?

আবার অপর একটী দীর্ঘ বক্তৃতায় 'সুর' (পরে বুঝিলাম তাহার নাম সুরনলিনী) বুঝাইয়া দিল যে তাহার কোনও পীড়ার লক্ষণ ডাক্তার কবিরাজে ধরিতে পারে না। আমি বিস্ময়ে আবার তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম। সুন্দরীর বদনের প্রত্যেক স্থলে এক গভীর মর্ম্মবেদনার কাহিনী লুক্কায়িত ছিল। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—মা, আপনি কি এমন গভীর মনোকষ্টে আছেন? কোনও বিশেষ শোক পেয়েছেন কি?

মাধুরিকা অবনতমুখী হইল। তাহার সুন্দর দেহলতা ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছিল। সুরনলিনী একবার তাহার দিকে পরে আমার দিকে এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহাদের দুই জনকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আমি বলিলাম—ক্ষমা করবেন, মা। আপনি শোকের কথা বলিতে অনিচ্ছুক দেখছি। আমি

সাধু নহি; কিছু না, কেবল আপনাকে একটা পরামর্শ দিব। আপনি শিক্ষিতা হিন্দুরমণী। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে শোকের কারণটা ভুলতে চেষ্টা করুন। আপনি গীতা পড়েছেন?

মাধুরিকার চক্ষু হইতে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা পড়িতেছিল। আমি বড় বিচলিত হইলাম।

আবেগ ভরে বলিলাম—আমার বয়স অধিক না হইলেও আপনাকে যখন মাতৃ সম্বোধন করিয়াছি, আমার নিকট আপনি সকল কথা খুলিয়া বলুন। আপনাকে শান্তি দিবার চেষ্টা করিব।

আমি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া একটু নাম কিনিয়াছিলাম, বি, এ, পাশ করিয়াছিলাম। এত পড়িয়া, এত লিখিয়া কি আর নৈতিক উপদেশ দিয়া একজন স্ত্রীলোকের শোকাপনোদন করিতে পারিব না। তাহারা যখন আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, তখন আমার কথাগুলা সাধুবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ করিলাম না। রমণীদ্বয় আমার সম্মুখে সেই গিরি গহ্বরের উপর উপবেশন করিল। পূর্ব্বাকাশ হইতে ভগবান মরীচিমালী কতকটা কিরণ পাঠাইয়া দিয়া আমাদের সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক-স্মৃতি-বিজড়িত কক্ষটিকে উদ্ভাসিত করিলেন।

(৪)

আমার শিষ্যাদ্বয় উপবেশন করিলে বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম অদূরে সুরেশ ও কানাই দাঁড়াইয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিতেছে ও হাসিতেছে। মাধুরিকার দলের লোকেরা অপর দিকে চলিয়া গিয়াছে। বন্ধুদ্বয়ের অঙ্গভঙ্গি হইতে বুঝিলাম চা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে। অথচ সেস্থলে চা ও আলুসিদ্ধ খাইলে ভণ্ডামীর চূড়ান্ত করা হয়। আমি বহু কষ্টে প্রকৃত যোগীর মত আত্মসংযম করিয়া বন্ধুদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে বিরত হইলাম। কানাইলাল কিন্তু তাহার বৃহৎ উদরের প্রতি আমাকে এরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দেখিয়া বোধ হয় আমার ভণ্ডামী ধরাইয়া দিবার জন্য আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাধুরিকা স্বয়ং তাহার শোকের কারণ ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিতেছিল। কানাইকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমার হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ! হতভাগার অত বড় বিশাল বপুটার মধ্যে কি ভদ্রতার লেশ মাত্র নাই।

কানাই তাহার বিপুল আয়তন লইয়া হেলিতে দুলিতে গুহার সম্মুখীন হইল। আমার নাম ললিতমোহন হইলেও আত্মীয় স্বজন, অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব সকলে

আমাকে 'নেলো' বলিয়া ডাকিত। মেষের পালের নিকটে কখনও নেকড়ে বাঘের শুভাগমন দেখি নাই। তবে আহার-রত পায়রার ঝাঁকের নিকট কয়লার পিপার মধ্য হইতে অকস্মাৎ মেনী বিড়াল বাহির হইলে কিরূপ গণ্ডগোল উপস্থিত হয় তাহা পূর্ব্বে বহুবার দেখিয়াছিলাম। আমাদের সেই শান্ত 'আশ্রমে' কানাই আসিলে সেইরূপ হইল। সন্ন্যাসী ঠাকুরের হৃৎপিণ্ড তাহার পঞ্জরের বল পরীক্ষায় বদ্ধপরিকর হইল এবং ললনা দুইটী আভূমি ঘোমটা টানিতে ব্যাকুল হইল। আমার কানের কাছে কল্পনা-দেবী মেঘমন্দ্রে কানাইলালের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া বলিতে লাগিল—নেলো, ভণ্ডামী ছেড়ে এখন চা' খাবি আয়।

কানাই গুহার সম্মুখে আসিয়া হাসি চাপিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি রঙ্গমঞ্চের নারদ মুনির মত দক্ষিণ হস্তে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। সেও অভিনয়ের সুরে বলিল—স্বামীজি, কিছু ভোজন করিবেন কি? প্রভুর প্রসাদ না পেলে আমরা কিছু আহার করিতে পারছি না।

আমার ভরটা ভাঙ্গিয়া গেল, মোহ ঘোরটা কাটিল। আমি একটু মৃদুহাস্ত করিয়া বলিলাম—আমাদের আবার ভোজন! আর এই প্রভাতে। ভগবানকে নিবেদন ক'রে দিয়ে ভোজন করগে। জয়স্তু।

কানাইলাল অঙ্গভঙ্গি করিয়া চলিয়া গেল। রমণীদ্বয় তাহাদের কাহিনী বিবৃত করিল। সে কাহিনী বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী। অথচ উপন্যাসের মত। আদ্যোপান্ত শুনিয়া আমি বলিলাম—এরকম ভাব একটা ভুল থেকে হ'য়েছে। আপনি নিকটে থাকিলে তাহার হৃদয় থেকে এভাব অপসারিত হ'বে না। আপনাকে কিছু দিনের জন্য একেবারে স্বামীর নিকট থেকে পৃথক থাকতে হ'বে।

মাধুরিকা নীরবে আমার দিকে চাহিল, বুঝিলাম সে এ পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। আমি বলিলাম—এ অবস্থায় দু'জনে একত্র থাকিয়া কি লাভ? আপনাকে দেখিয়া তিনি শান্তি পাইবেন না এবং তাঁহার কঠোর ব্যবহারে আপনারও হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে।

মাধুরিকা বলিল—বাবা, তাঁহাকে এ অবস্থায় কিরূপে ছাড়ি। তাঁহার দৈনিক জীবনের প্রত্যেক আবশ্যক কাজটি আমি নিজের হাতে করি, তা'তেও তাঁহার অভাব যায় না। এই পনেরো দিন জ্যেঠাইমার সঙ্গে তীর্থ করতে এসেছি, এর মধ্যে তাঁর কত কষ্ট হ'চ্ছে।

ভাবিলাম যে হতভাগ্য এরূপ সাধ্বী স্ত্রীরত্নের উপর নির্ম্মম ভাবে অত্যাচার

করিতে পারে সে বড় ভীষণ। রমণীকে বুঝাইয়া দিলাম যে বাঙ্গালা প্রবচন আছে, 'লোকে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না'। নিত্যই আমরা এ কথাটার সত্য উপলব্ধি করিতে পারি। অভাব হইলেই তাহার স্বামী বুঝিবে যে সে কি রত্ন হারাইয়াছে। তাহাকে আদেশ করিলাম কলিকাতায় ফিরিবার পর তাহার স্বামী সাক্ষাৎ করিতে আসিলেও সহজে তাহাকে দেখা দিবে না। তাহা হইলেই তাহার স্বামীর পূর্ব্বের স্নেহ ফিরিয়া আসিবে। বুঝিলাম এরূপ আচরণ করিতে যুবতীর বুক ফাটিয়া যাইবে। কিন্তু সে আমার উপদেশ মত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

আমি বলিলাম—আপনার স্বামী কি কার্য্য করেন?

'ওকালতী'।

'তাঁহার নাম।' অন্যমনস্ক ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম—'তাঁহার নাম?'

সুরনলিনী বলিল—ক্ষিতিশচন্দ্র মিত্র।

(৫)

এক ভীষণ আত্মগ্লানি আসিয়া আমাকে তীব্র কশাঘাত করিতে লাগিল। রমণীদ্বয় সে দেশ ছাড়িয়া গো-শকটে চড়িয়া ভুবনেশ্বরের পথে চলিয়া যাইবার পরও আমি সেই গুহার ভিতর বসিয়া দগ্ধ হইতেছিলাম। সূর্য্যদেব ঠিক আমার সম্মুখে উঠিয়া আমাকে অগ্নি পরীক্ষা করিতেছিল। দেখিলাম অন্তরের অগ্নির সহিত তুলনায় সূর্য্যতাপ শীতল। বন্ধু বান্ধব পাহাড়ের প্রাচীন শিল্প পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একে একে স্নান করিয়া ডাক বাঙ্গালার সম্মুখে পাশার ছক্ পাতিয়া বসিয়াছিল এ সংবাদ পাইয়াও আমি সেস্থল পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। একটা গর্হিত ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্যের জন্য মানুষে এত কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে পারে পূর্ব্বে তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই। আমার এক মুহূর্ত্তের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে একটা প্রণয়ী দম্পতি এই দীর্ঘ তিন মাস ধরিয়া কি কষ্টই না পাইয়াছে। বাল্যবন্ধু সহপাঠী ক্ষিতিশচন্দ্র আমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া যে হলাহল উপহার পাইল তাহা স্মরণ করিয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মরিতে ইচ্ছা হইল।

আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যের অবসরে সাহিত্যচর্চ্চা করিবার জন্য মাসিক পত্রিকা চালাইতেছিলাম। নানা দিক হইতে অশেষ প্রকার ব্যক্তির নিকট হইতে বিবিধ রকমের প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতাদি আমাদিগের হস্তগত হইত। যে সময়

ক্ষিতিশের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে সময় শ্রীমতী মাধুরিকা দাসী সাক্ষরিত একটি কবিতা পাইয়াছিলাম। তাহার সহিত সেই পত্রখানি ছিল। লেখিকা বোধ হয় একেবারে 'মুদ্রিত সাক্ষর যুক্ত' কবিতা দেখাইয়া স্বামীকে বিস্মিত করিবার জন্য পত্রোত্তরাদি কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।' কলিকাতা হইতে নিঃসন্দেহ তাঁহার পত্র অপর লেফাফায় কৃষ্ণনগর পৌঁছিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

কুবুদ্ধির বশে পড়িয়া ক্ষিতিশচন্দ্রের সহিত কৌতুক করিবার জন্য ঐ পত্র খানির স্থল বিশেষ তাহাকে দেখাইয়াছিলাম। তখন কেমন করিয়া জানিব যে মাধুরিকা তাহার সহধর্ম্মিণী আর ক্ষিতিশচন্দ্র সেই সামান্য সাক্ষ্যে এরূপ ভাবে তাহার সাধ্বী স্ত্রীকে নির্য্যাতন করিবে। সে তাহার স্ত্রীকে স্পষ্ট করিয়া তাহার সন্দেহের কারণটা বলিলে সমস্ত পাপ মিটিয়া যাইত। সে কিন্তু তাহা করে নাই। সে নির্দ্দয় ভাবে মাধুরিকাকে অবহেলা করিয়া নিত্য প্রত্যেক কার্য্যে তাহাকে অবমানিত লাঞ্ছিত করিয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল। আহা সরলা হিন্দুললনা নীরবে স্বামীর সন্দিগ্ধ-হৃদয়-মথিত কালকুটের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছিল। আজ দৈবযোগে তাহার গল্প শুনিয়া আমি সে বিষের অংশ গ্রহণ করিলাম। তাহাকে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিলাম না। ভণ্ড সাধুর ন্যায় তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সামান্য পরামর্শ দিয়া বিদায় করিলাম। কিন্তু মনে মনে শপথ করিলাম, যে কোন প্রকারে হউক তাহাকে সুখী করিয়া আমার সেই ঘৃণিত ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিব। অপরিচিতা ভদ্র মহিলাকে মাতৃজ্ঞান করিয়া তাঁহার পত্রকে পবিত্র ভাবি নাই কেন তজ্জন্য বড় অনুতপ্ত হইলাম। কৌতুক করিবার প্রয়াসে আমরা যৌবনে অনেক সময় গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করিয়া বসি।

(৬)

আমাদের মাসিক পত্রিকার অফিসে একেলা বসিয়া একজন পণ্ডিত প্রেরিত 'সাংখ্য যোগ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলাম, এমন সময় গৃহে অকস্মাৎ ক্ষিতিশচন্দ্র প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলাম। এই কয় মাসের মধ্যে তাহার মুখে একটা ভয়ঙ্কর বিপ্লবের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল; সে অপেক্ষাকৃত কৃশ হইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখের লাবণ্যটুকু একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং তাহার চক্ষু হইতে একটা অহরহঃ যাতনার বিষাদময় চিহ্ন প্রকটিত হইতেছিল। আমি মনোভাব গোপন করিয়া তাহাকে বলিলাম—'কি দাদা, কেমন আছ? পূজার ছুটিতে কোথাও গিয়েছিলে না কি?'

সে বলিল—তোমরা তো বেনারস গিয়েছিলে শুনলাম। আমি মধ্যে একদিন এসেছিলাম।

বাস্তবিকই কৌতুক করিবার জন্য আমরা উড়িষ্যায় যাইবার সময় সকলকে বলিয়া গিয়াছিলাম যে বেনারস যাইতেছি। এখন দেখিলাম আমরা পুরীর দিকে গিয়াছিলাম একথাটা শুনিলে তাহার মনের অবস্থা আরও ভীষণ হইত। আমি বেনারসের স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধে দুই একটা কথা কহিয়া বলিলাম—কি দাদা যামিনীর খবর কি ?

সে বিস্মিত হইয়া বলিল—যামিনী ! যামিনী কে ?

আমি বলিলাম—কেন তুমি না বলেছিলে তোমার স্ত্রীর নাম যামিনী।

সে সময় সে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। মনোভাব গোপন করিয়া সে বলিল —ওঃ ! হ্যাঁ বেশ ভাল।

তাহার পর সে স্বীকার করিল তাহার সহধর্ম্মিণী আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতের সহিত পুরী প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিল। কথার ভাবে বুঝিলাম তাহার স্ত্রী কলিকাতায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। আমি টেবিলের ভিতর হইতে কতকগুলা প্রবন্ধ বাহির করিয়া বলিলাম—দাদা এসেছ ভালই হয়েছে। আমাদের মাসিক পত্রের জন্য প্রবন্ধ বাছছিলাম। বড় কঠিন কাজ, বাঁশ বনে ডোম কাণা হ'তে হয়। একটু সাহায্য কর দেখি।

আমি 'সিপ্পাস্ত্রীর অস্থি-পরীক্ষা' নামক একটা প্রেরিত প্রবন্ধ তাহার হস্তে দিলাম। সে বলিল—ননসেন্স, একি প্রবন্ধ !

আমি বলিলাম—আচ্ছা এ কবিতাটা দেখ দেখি। এটা দেখছি 'নায়িকার নূপুর' সম্বন্ধে। বেশ ছন্দ দেখ না আরম্ভ করেছে—রুণু রুণু ঝুমু ঝুমু,টুন টুন ঠুমু ঠুমু—

সে হাসিয়া বলিল—রক্ষে কর কাজ নাই।

আমি একেবারে তাহাকে 'বসন্ত-মল্লিকা' 'চীনের গোলাপ' 'দেখন হাসি' প্রভৃতি কতকগুলা কবিতার সঙ্গে মাধুরিকার পত্র সহ 'স্বামী' নামক কবিতাটী দিয়া অপর প্রবন্ধ লইয়া বসিলাম। দুই তিন মিনিটের মধ্যে তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে প্রকাশ্য ভাবে লক্ষ্য না করিয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহার হাত কাঁপিতেছিল। সে পুনঃ পুনঃ স্ত্রীর পত্র পাঠ করিতেছিল। শেষে সে বলিল—তুমি এই চিঠিখানাই না—

আমি বলিলাম—শুন শুন, এ এক বড় মজার রচনা। নাম—শর্ব্বরী-চিন্তা —লেখক—

"হ্যাঁ। বলছিলাম—এই চিঠিখানাই না সেবার আমার দেখিয়ে—

"লেখক বোধ হয় পণ্ডিত। দেখ না লিখেছে—'নীরেন্দ্র-মুক্ত-সুনীল-নীলিম-নভে রাকা-শশী-বাঁকা—

সে অধীর হইয়া বলিল—শুনছ? বলছিলাম কি?

আমি বলিলাম—হ্যাঁ কি বলছ! মাই ডিয়ার ক্ষিতি দাদা। প্রবন্ধটা—

'আরে চুলোয় যাক তোমার প্রবন্ধ—' এবার সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আমার হাত ধরিল। আমি নিদ্রোত্থিতের মত বলিলাম—হ্যাঁ।

সে বলিল—গত বারে যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন এই চিঠিখানা দেখিয়েছিলে না?

আমি চিঠিখানা হস্তে লইয়া বলিলাম—তা হ'বে। কত চিঠি আসে। এ যে কৃষ্ণনগরের চিঠি দেখছি। এ কবিতাটা তোমায় দেখিয়েছি না কি? তা' হবে।

সে অত্যন্ত অধীর ভাবে বলিল—আরে কবিতা নয় এই চিঠিখানা।

আমি বলিলাম—হ'বে।

সে আমাকে পূর্ব্বের ঘটনাটা সমস্ত বলিল, আমি হাসিয়া বলিলাম—তা' হ'বে মনে নাই। অনেক দিন বাদে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল হয়তো একটু রসিকতা করেছি।

ভাবপ্রবণ ক্ষিতিশচন্দ্রের মন হইতে বোঝাটা একেবারে নামিয়া গিয়াছিল তাহা বুঝিলাম। এখন তাহার মনে একটা আত্মগ্লানি ও আমার প্রতি ক্রোধের ভাব বিদ্যমান ছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ভদ্র মহিলার পত্র লইয়া ঐরূপ ভাবে পরিহাস করা কি অবিধেয় নয়?

আমি বলিলাম—ক্ষিতিশ, তুমি কি আমায় চেন না? তুমি বাল্যে কত পরিচিতা ভদ্রমহিলার সহিত সত্য সত্য প্রেমে পড়িয়া বিহ্বল হ'তে। আমি না হয় একজন অপরিচিতার একখানা পত্র নিয়ে তোমার সহিত রঙ্গ করিয়াছি। কাজটা অবিধেয় এবং পাপের—

সে ব্যাকুল ভাবে বলিল—মাধুরিকা কে তুমি জান?

আমি বলিলাম—শীঘ্রই যোগাভ্যাস করব, একবার 'যোগ' হ'লেই নখদর্পণে সমস্ত—

সে বলিল—তোমার মাথা—মাধুরী আমার স্ত্রী।

'হ্যাঁ বল কি? তবে আর কি অন্যায়'—

"কি অন্যায় হ'য়েছে ? জান কি হ'য়েছে ?" সে এই কয়মাস সন্দেহ করিয়া তাহার স্ত্রীর সহিত কুব্যবহার করিয়াছে, কতবার নিজে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এই কয়মাস সে এক দুর্ব্বিষহ যাতনায় দগ্ধ হইয়াছে, আমাকে কতবার গুলি করিয়া মারিবার শুভ সঙ্কল্প করিয়াছে—এ সকল কাহিনী সে বড় আবেগময়ী ভাষায় বলিল। শেষে বলিল—প্রথমে আমার স্ত্রী তোষামোদ করিত। এবার কি করেছে জান ?

আমি বলিলাম—ভাই তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি—আমার জন্যে—

"আরে চুলোয় যাক্ আমার পা।"

আমি ভয়বিহ্বল স্বরে বলিলাম—তা যাক্।

সে বলিল—আরে কি যাক্। স্ত্রী কি করেছে জান ? এবার পুরী থেকে এসে কৃষ্ণনগর যেতে অস্বীকার করেছে, আজ সকালে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেছে। তাই তোমাকে অব্‌সার্ভ করতে এলাম।

আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম—মাধুরিকার পক্ষে অভিমান করা আশ্চর্য্য নহে। এরূপ অবস্থায় আত্মহত্যা করা—

'অ্যাঁ আত্মহত্যা ! তাও তো বটে ! গুড্‌বাই। আমি ছুটে গিয়ে তা'র পায়ে ধরিগে। এতক্ষণে বোধ হয় আফিম, হাইড্রোসিনিক অ্যাসিড'—

বলিতে বলিতে প্রায় ক্ষিতিশচন্দ্র ছুটিয়া পলায়। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম সে যাহা এতদিন করে নাই অকস্মাৎ তাহা করিবে না। আর সে ছুটিয়া গেলেও শীঘ্র মাধুরী তাহাকে দেখা দিবে না।

"দেখা দিবে না ! তাও বটে।"

"তবে ! উপায় আছে।"

"হ্যাঁ উপায় আছে। নিশ্চয় আছে, অবশ্য আছে। আলবৎ আছে। একশো উপায় আছে। কি উপায় বল দেখি।"

আমি বলিলাম—দেখ এবার বেনারসে ঘুরতে ঘুরতে একটী সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমায় একখানি মঙ্গল কবচ দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন যে কোন ব্যক্তি তিনবার বিষ্ণু নাম উচ্চারণ ক'রে সেই কবচখানি কোন স্ত্রীলোকের হস্তে দিবে তখনি সেই স্ত্রীলোক তাহার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। সে প্রেম আর নষ্ট হবে না।

অধীর প্রেমিক কিছু বলিল—বল কি ! দাও কবচ দাও। এখনি দাও।

আমি বলিলাম—স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাবে কোথা ?

'জোর করে দেখা করব।'

তাহাকে দুই মিনিট বসিতে বলিয়া বাড়ীর মধ্যে ছুটিলাম। একখানা পুরাণো ঠিকুজি কোষ্ঠি হইতে একটু কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া তাহাতে লিখিলাম—

"মা!

আপনার স্বামী এবার তাহার দোষ বুঝিয়াছে। এখন তাঁহাকে গ্রহণ করুন। যদি সন্তানকে দেখিতে বাসনা হয় আপনার পাগল স্বামীকে বলিবেন—'কবচ-দাতাকে ডাকিয়া আন।' দেখিবেন কবচদাতা

খণ্ডগিরির (অ) সাধু।'

পুঃ—টাকাটী ফেরত দিলাম।"

বাহিরে আসিয়া ক্ষিতিশকে বলিলাম—এনেছি।

ভুলোট কাগজ দেখেই সে লাফিয়ে উঠে বলিল—দাও!

আমি বলিলাম—দাঁড়াও। কবচখানা এই লেফাফায় বন্ধ করিলাম। তুমি স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনবার বিষ্ণু বিষ্ণু বিষ্ণু বলে খামটা তা'র হাতে দিয়ে কবচের মন্ত্রটা চেঁচিয়ে পড়িতে বলিবে। তা'র পড়া শেষ হ'লে এই সিঁদুর মাখান টাকাটী তা'র কপালে ছুঁইয়ে তার হাতে দেবে।

কবচ লইয়া পাগল ছুটিল। আমার অন্তরের একটা বোঝা নামিল।

(৭)

পরদিন প্রাতে সহাস্য মুখে ক্ষিতিশ আসিয়া হাজির। আমি বলিলাম—কি বাবাজী!

সে বলিল—তুমি চোর জুয়োচোর বদমায়েস—

আমি বলিলাম—ইষ্টুপিড্, গাধা, ওরাঙ্ ওট্যাঙ্—

সে বলিল—পূজার সময় কোথা গিয়েছিলে?

'কেন উদয়গিরি প্রভৃতি—

'কি বেশে?'

'কেন সাধুবেশে। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। সব—'

'তাকে ঠকিয়েছ—'

'কেন? এক টাকা ঠকিয়েছিলাম। মঙ্গল কবচের সঙ্গে তো পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'মঙ্গল কবচ! তোমার মাথা! এখন চল। তোমার তলব হ'য়েছে।'

আমি চাদর লইয়া 'ভালো মাহুষে'র মত চলিলাম।

সমাপ্ত।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

ভারতে কয়লা।

ভূগোল-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে ভারতে নানা প্রকার খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কয়লা, স্বর্ণ, কেরোসিন তৈল, লবণ, হীরক, লৌহ, অভ্র, গন্ধক, রঙ্গ প্রভৃতি প্রধান। এক্ষণে কয়লার খাদ এবং কয়লার কার্য্য যেরূপ লাভজনক হইয়াছে তাহাতে কয়লার উৎপত্তি, আমদানী, রপ্তানী, মূল্য, ব্যবসায় প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হয়।

ভারতে যে সকল খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হয় কয়লা তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, অর্থাৎ ইহা পরিমাণে ও মূল্যে অন্যান্য খনিজ পদার্থ অপেক্ষা অধিক। বড় বড় বৃক্ষপূর্ণ বন প্রভৃতি ভূমিকম্পে অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক নিয়মে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পৃথিবীর উত্তাপে কালক্রমে কয়লারূপে পরিণত হয়। কয়লার গাত্রে এক একটী গাছের পত্রের ঠিক প্রতিরূপ থাকায় বিশেষজ্ঞেরা এই অনুমান করেন। অধুনা দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন খনিতে ১০।১৫ হাত গভীর কয়লা থাকার পর মৃত্তিকা, জল, পাথর প্রভৃতি বাহির হয়, পরে আরও ২০।৩০ হাত খনন করিলে আবার কয়লা বাহির হইতে থাকে (Lower Seam) ইহা হইতে বোধ হয় যে কোন বনভূমি ভূগর্ভে প্রোথিত হওয়াতে তাহার উপর পাথর, জল ও মাটি চাপা পড়ে; তদুপরে পুনরায় বৃক্ষ লতাদি উৎপন্ন হইয়া আবার ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া কয়লা রূপে পরিণত হইয়াছে।

পুরাতন ইতিহাস—ভারতে যে প্রচুর পরিমাণ কয়লা আছে তাহা এদেশীয় লোকদিগের অবিদিত ছিল না। ইন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ প্রভৃতি অত্যন্ত সহজলব্ধ থাকায়, লোকে খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিবার চেষ্টা করে নাই। এ দেশে ইংরাজদিগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খনি হইতে কয়লা তুলিবার চেষ্টা হয়। ১৭৭৪ খৃঃ তৎকালীন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ওয়ারেন হেস্‌টিঙ্‌স্ (Warren Hastings) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এস. জী. হিটলি (S. G. Heatly) ও জন সামার (John Sumner) নামক দুইজন ইংরাজকে ভারতের কয়লার খনি খনন করিবার জন্য ছাড়পত্র (License) প্রদান করেন। কিন্তু ১৮১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ভালরূপ কার্য্য হয় নাই—কারণ কয়লা উত্তোলন করাইবার সমস্ত ব্যয় উৎপন্ন কয়লা হইতে সঙ্কুলান হয় নাই এবং তৎকালে যে কয়লা

বাহির হইতেছিল তাহাও তাদৃশ ভাল নহে। ১৮১৫ খৃঃ বিলাত হইতে খনিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত R. Jones * ভারতে কয়লা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরিত হন। তিনি প্রকাশ করেন ভারতে যথেষ্ট পরিমাণ উৎকৃষ্ট কয়লা আছে। ১৮২০ খৃঃ কলিকাতার কতকগুলি ইংরাজ সওদাগর একত্রিত হইয়া একটি কোম্পানী গঠিত করেন এবং রাণীগঞ্জ নামক খনিতে তাঁহাদের সমবেত ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্যারম্ভ হয়; পরে উক্ত খনিতে উত্তম কয়লা উৎপন্ন হওয়াতে এবং সেই কোম্পানী লাভবান হওয়াতে নব নব কোম্পানী গঠিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য খনিও আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের যত্নে এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন কয়লার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। ১৮৮৫ খৃঃ ভারতে ৯৫টী খনিতে কার্য্য হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৯০টী বঙ্গদেশে, ১৯০০ খৃঃ ২৮৬টী, তন্মধ্যে ২৭১টী, বঙ্গদেশে ১৯০৬ খৃঃ ৩০৭টী, তন্মধ্যে ২৭৪টী বঙ্গদেশে অবস্থিত। ১৯১১ খৃঃ ৪৫৫টী খাদে কার্য্য হইয়াছিল, তন্মধ্যে বঙ্গদেশে ৪২২টী অবস্থিত এবং এই সংখ্যা গত বৎসর অপেক্ষা ৭টী বেশী হইয়াছে।

উৎপন্ন—নিম্নে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল, ইহাতে ভারতে উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ দৃষ্ট হইবে :—

খৃষ্টাব্দ	টন	খৃষ্টাব্দ	টন †
১৮৩৯	৩৬,০০০	১৮৯৫	৩৫,৪০,০১৯
১৮৫৭	২,৯৩,৪৪৩	১৯০০	৬১,১৮,৬৯২
১৮৬৮	৪,৫৯,৪০৮	১৯০১	৬৬,৩৫,৭২৭
১৮৭৮	১০,১৫,২১০	১৯০২	৭৪,২৪,৪০২
১৮৮০	১০,১৯,৭৯৩	১৯০৩	৭৪,৩৮,৩৮৬
১৮৮৫	১২,৯৪,২২১	১৯০৪	৮২,১৬,৭০৬
১৮৯০	২১,৬৮,৫২১	১৯০৫	৮৪,১৭,৭৩৯
১৮৯১	২৩,২৮,৫৭৭	১৯০৬	৯৭,৮৩,২৫০
১৮৯২	২৫,৩৭,৬৯৬	১৯১০	১,২০,৪৭,৪১৩
১৮৯৩	২৫,৬২,০০১	১৯১১	১,২৭,১৫,৫৩৪
১৮৯৪	২৮,২৩,৯০৭		

* Vide—Watt's Commercial Products.

† প্রতি টন ২৭ মণ ৮ সের ১০½ ছটাকের সহিত সমান।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা দৃষ্ট হইবে :—

প্রদেশ	১৮৯০ খৃঃ টন	১৯০০ খৃঃ টন	১৯০৭ খৃঃ টন	১৯০৮ খৃঃ টন	১৯০৯ খৃঃ টন	১৯১০ খৃঃ টন	১৯১১ খৃঃ টন
বঙ্গদেশ	...	৪৯,৭৮,৪৯২	৯৯,৯৩,৩৪৮	১,১৫,৫৯,৯১১	১,০৬,৬০,৮১১	১,০৭,৭৮,৫৩০	১,১৪,৬৮,৯০৪
ব্রহ্মদেশ	১৬,২৬,২৪৫	১০,২২৮	...	..	...	...	...
আসাম	১,৪৫,৭০৮	২,১৬,৭৩৬	২,৯৫,৭৯৫	২,৭৫,২২৪	৩,০৫,৫৫৩	২,৯৭,২৩৯	২,৯৪,৮৯৩
পঞ্জাব	৪০,৬৭৭	৭৪,০৮৩	৬০,৭৪৯	৫৪,৭৯৪	৩৭,২০৮	৪৯,১৮৯	৩০,৫৭৫
মধ্যপ্রদেশ	১,৩৭,০২২	১,৭২,৮৪২	১,৬৪,০৮৮	২,১৩,৭৮৯	২,৩৮,১০০	২,২০,৪৩৭	২,১১,৬১৩
বেলুচিস্থান	১৫,৫৪১	২৩,২৮১	৪২,৬৮৮	৪৫,২১২	৫২,৪৪৯	৫২,৩১৪	৪৫,৭০৭
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	...	...	...	৯০	৯৬	৯০	১৪০
হাইদ্রাবাদ	১,২৫,৪৮৬	৪,৬৯,২৯১	৪,১৪,২২১	৪,৪৪,২১১	৪,৪২,৮৯২	৫,০৬,১৭৩	৫,০৫,৩৮০
রাজপুতনা		৯,২৫০	২৮,০৪২	২১,২৯৭	১১,৪৪৯	১২,৭৪৪	১৪,৭৬১
মধ্য ভারতবর্ষ	৭৭,৮৪২	১,৬৪,৪৮৯	১,৭৮,৫৮৮	১,৫৫,১০৭	১,২১,৪৯৬	১,৩০,৪০০	১,৪৩,৫৫৮
মোট	২১,৬৮,৫২১	৬১,১৮,৬৯২	১,১১,৪৭,৩৩৯	১,২৭,৬৯,৬৩৫	১,১৮,৭০,০৬৪	১,২০,৪৭.৪১৩	১,২৭,১৫,৫৩৪

—১৮৭৮ খৃঃ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৮ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরেই কয়লার উৎপত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শেষোক্ত বৎসরে ১৮৭৮ অব্দের ১২॥০ গুণ কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ঐ বৎসরে উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৯১১ খৃঃ উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ ১,২৭,১৫,৫৩৪ টন অর্থাৎ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা কিছু কম। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের খনি সকল দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। মজুরেরা খনি হইতে দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া বাটী ফিরিবার সময় কতকগুলি কয়লা আপনাদিগের ব্যবহারের জন্য লইয়া যায়। এই সকল কয়লার কোন হিসাব রাখা হয় না, কিন্তু অনুমান ইহা মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা ২ভাগ অর্থাৎ (প্রায়) ২॥০ লক্ষ টন।

ভারতের খনিগুলি অন্যান্য দেশের খনির তুলনায় অত্যন্ত অগভীর; অধিকাংশ খনিই ১৫ হইতে ৩০০ হাত মৃত্তিকার নিম্নে অবস্থিত। আজকাল ২।১টী খনিতে ৭০০।৮০০ হাত নিম্ন হইতে কয়লা উত্তোলিত হইতেছে। খনি হইতে কয়লা তিন প্রকারে উত্তোলন করা হয়:—(১) খাদ অল্প গভীর হইলে উপরের মৃত্তিকা প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া ভিতরের কয়লা বাহির করিয়া লওয়া হয়; (২) সুরঙ্গ কাটিয়া (Incline) খনির ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক, কয়লা কাটিয়া লইয়া পুনরায় সুরঙ্গ পথে বাহির হইয়া জমীর উপরে রাখা হয়; (৩) খাদ মৃত্তিকার অনেক নিম্নে হইলে (Pit), কলের সাহায্যে বড় বালতি (Bucket) করিয়া লোকে খনির ভিতর প্রবেশ করে এবং ঐ বালতীর দ্বারা কয়লা উঠাইয়া উপরে আনয়ন করে। ১৯১১ খৃঃ যে সকল কয়লার খনি ছিল তাহার মধ্যে রাণীগঞ্জ ক্ষেত্রে—দেশরগড়, শিবপুর, সোদপুর, এবং বোরিয়া, আর ঝরিয়া ক্ষেত্রে—কুয়হুরবারি ও শ্রীরামপুর নামক খনিগুলি ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল ১লক্ষ টনের উপর প্রতি বৎসরে কয়লা উৎপাদন করিতেছে। ইহা ভিন্ন অধিকাংশ খনিতে ২০ বৎসরের কম কার্য্য হইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে ২১টী খনিতে প্রতি বৎসর ১লক্ষ টনের উপর উৎপন্ন হইতেছে।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ভারতের বিস্তৃত কয়লা-ক্ষেত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা:—

গণ্ডোয়ানা বিভাগ

(ক) বঙ্গদেশ:—
(১) রাণীগঞ্জ
(২) ঝড়িয়া
(৩) গিরিডি
(৪) ডেলটনগঞ্জ
(৫) রাজমহল
(৬) বকরো-রামগড়
(৭) নববলপুর

গণ্ডোয়ানা বিভাগ

(খ) মধ্যভারত :—উমারিয়া

(গ) মধ্য প্রদেশ :—

(১) মহাপানি

(২) পেঞ্চ উপত্যকা

(৩) বালারপুর

(ঘ) হাইদ্রাবাদ—সিঙ্গারিণী

টারসিয়ারি বিভাগ

(ঙ বেলুচিস্থান :—

(১) খোষ্ট,

(২) সুর পর্ব্বত প্রভৃতি

(চ) আসাম :—মাকুম

(ছ) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ :—

হাজাড়া

(জ) পঞ্জাব :—

(১) জেলাম

(২) মিয়ানওয়ালী

(৩) সাহাপুর

(ঝ) রাজপুতনা—বিকানীর

কয়লা-ক্ষেত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

বঙ্গদেশ :—(১) রাণীগঞ্জ ক্ষেত্র—ইহাই ভারতের সর্ব্বপ্রথম কয়লার ক্ষেত্র। ১৮২০ খৃঃ ইহা প্রথমে রীতিমত খনন করা হয়, এবং ১৯০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত কয়লা উৎপাদন শক্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ১৯০৬ খৃঃ হইতে ঝড়িয়া কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এই ক্ষেত্রের দেশরগড় এবং সাঁকতোরে খনির কয়লা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহা দামোদর নদের তীরে অবস্থিত এবং অধিকাংশ বর্দ্ধমান জেলাতেই বিস্তৃত, কিন্তু কতক অংশ বাঁকুড়া,বীরভূম,মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা জেলার ধারেও অবস্থিত। এই ক্ষেত্র ৫০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত। ১৮৫৮—৬০-খৃঃ Mr. W. T. Blanford দ্বারা এই ক্ষেত্র জরিপ করা হয় এবং তাঁহার কৃত মানচিত্র * কয়লার খনির অধিকারীদিগের বিশেষ সাহায্যে আইসে পরে Dr. W. Saise এবং Mr. G. A. Stonier এই ক্ষেত্রের মানচিত্রের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। ১৯০৮ খৃঃ, ৪২,২১,৭৮১ টন, ১৯০৯ খৃঃ ৪০,৩৪,৮১২ টন এবং ১৯১০ খৃঃ,৪২,১২,৬০৬ টন কয়লা এই ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯১১ খৃঃ ইহা ৪৩,১১,৯৫৬ টন অর্থাৎ ভারতের মোট উৎপন্নের শতকরা ৩৩·৯ ভাগ কয়লা উৎপন্ন করিয়াছিল।

* Mem : Geol. Surv. Ind. Vol III. Part I.

(২) ঝড়িয়া—১৮৯৩ খৃঃ ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার কতক অংশ দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত। এই ক্ষেত্রে ৫০ হইতে ৩০ ফিট গভীর কয়লা আছে এবং ইহার কয়লাও ভাল। ইহা মানভূম ও হাজারিবাগ জেলাতে বিস্তৃত। ১৯০৩ খৃঃ হইতে অন্যান্য কয়লার ক্ষেত্র অপেক্ষা ইহার উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ক্ষেত্রে ১৯০৮ খৃঃ ৬৪,০৮,৬৪৩ টন, ১৯০৯ খৃঃ ৫৮,৩২,৬৭২ টন, ১৯১০ খৃঃ ৫৭ ৯৪,৬১৬ টন উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯১১ খৃঃ ইহা ৬১,৭৩,৭২৮ টন অর্থাৎ মোট উৎপত্তির শতকরা ৫০.১ ভাগ উৎপাদন করিয়াছিল।

(৩) গিরিডি—এই ক্ষেত্র হাজারিবাগ জেলায় দামোদর নদীর উত্তরে অবস্থিত এবং ১৮৬৯ খৃঃ ইহা প্রথম খনন করা হয়। ইহাতে ১৯০৮ খৃঃ ৭,৮২,৭৬৩ টন, ১৯০৯ খৃঃ ৭,০২,৮১১ টন, ১৯১০ খৃঃ ৬,৭৯,৩০৪ টন এবং ১৯১১ খৃঃ ৭,০৪,৪৪৩ টন কয়লা অর্থাৎ সমগ্র উৎপত্তির পরিমাণের শতকরা ৫·৫ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছিল।

(৪) ডেলটন্‌গঞ্জ—ইহা পেলামৌ নামক স্থানের নিকট অবস্থিত। ১৯০১ খৃঃ ইহা প্রথম খোলা হয়। ইহাতে ১৯০৯ খৃঃ ৮৪,২৯০ টন, ১৯১০ খৃঃ ৮৪,৯৯৬ টন এবং ১৯১১ খৃঃ ৭০,৬৬২ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল।

(৫) রাজমহল—ইহা সাঁওতাল পরগণা জেলায় অবস্থিত এবং ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে ১৯০৯ খৃঃ ১,৯০০ টন, ১৯১০ খৃঃ ২,৭৮৮ টন এবং ১৯১১ খৃঃ ১,৯৭৮ টন অর্থাৎ ১৯১০ খৃঃ অপেক্ষা ৮১০ টন কম কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল।

(৬) রামগড়-বকরো—এই ক্ষেত্র ২৬০ বর্গ মাইল বিস্তৃত। ১৯০৮ খৃঃ ইহা প্রথম খোলা হয়। অনুমান ১৫০ কোটি টন কয়লা আছে, কিন্তু ইহার উপস্থিত উৎপাদিকা-শক্তি অতিশয় অল্প। ১৯১০ খৃঃ এই ক্ষেত্র হইতে ২,১৬৯ টন এবং ১৯১১ খৃঃ ৪৬৮ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল।

(৭) সম্বলপুর ক্ষেত্র ১৯০৯ খৃঃ প্রথম খোলা হয়। ইহা হইতে ১৯১০ খৃঃ ৮৩০ টন এবং ১৯১১ খৃঃ ৫,৬৬৯ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯১১ খৃঃ ভারতে মোট যে কয়লা উৎপন্ন হয়, বঙ্গদেশের এই সাতটী কয়লার ক্ষেত্র তাহার শতকরা ৯০·২ ভাগ উৎপন্ন করিয়াছিল।

(খ) মধ্যভারতের রেওয়া (Rewa) নামক করদ রাজ্যে উমারিয়া নামক একটি প্রসিদ্ধ খনি আছে। অনুমান ইহাতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টন কয়লা আছে। ১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহা হইতে কয়লা খনন করাইয়া-

ছিলেন, পরে রেওয়ার রাজা ইহা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ১৮৮৪ খৃঃ ইহার কার্য্য প্রথম আরম্ভ হয়। ইহা হইতে ১৯০৩ খৃঃ অত্যন্ত অধিক পরিমাণ অর্থাৎ ১,৯৩,২৭৭ টন, ১৯১০ খৃঃ ১,৩০,৪০০ টন এবং ১৯১১ খৃঃ ১,৪৩,৫৫৮ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল।

(গ) মধ্যপ্রদেশ—(১) মহাপানিক্ষেত্র সাতপুর পর্ব্বতের নিকট নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে, নরসিংহপুর জেলাতে অবস্থিত। ইহা ১৮৮০ খৃঃ প্রথম খনন করা হয়। ১৯০৪ খৃঃ হইতে নূতন মহাপানি খনিতে জি, আই, পি, রেলওয়ে (G. I. P. Railway) কোম্পানী কয়লা উত্তোলন করিতেছেন।

(২) পেঞ্চ উপত্যকা ক্ষেত্র ১৯০৫ খৃঃ প্রথম খোলা হয়। এই ক্ষেত্রে অনেক কয়লা উঠিবার সম্ভাবনা, কিন্তু কয়লা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য রেলওয়ের সুবিধা না থাকাতে, এই ক্ষেত্রের তাদৃশ উন্নতি হইতেছে না। G. I. P. Railway এই ক্ষেত্রের নিকট দিয়া নাগপুর এবং ইটারসিতে যোগ করিবার জন্য একটী রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত করিতেছেন—বর্ত্তমান বর্ষে ইহা প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা। পরে একটি শাখা রেল দ্বারা এই ক্ষেত্রের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইলে কয়লা পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে। বোম্বাই প্রদেশ এবং পশ্চিম ভারতের নিকট বলিয়া এই ক্ষেত্রের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, অধিকন্তু এই ক্ষেত্রের সেলামী ও রাজস্ব (Royalty) বঙ্গদেশের তুলনায় অনেক কম। এই ক্ষেত্রের রাজস্ব প্রতি টন উৎপন্ন কয়লার উপর /০ (এক আনার) হিসাবে; এবং ইহা হইতে বোম্বাই প্রদেশের সুতার এবং কাপড়ের কলে অনেক কয়লা গিয়া থাকে।

(৩) বালারপুর ক্ষেত্র, ওয়ারধা নদীর তীরে অবস্থিত। ১৯০৪ খৃঃ ইহা প্রথম খোলা হইয়াছিল। ইহাতে ৫০ ফিট গভীর কয়লা আছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই ক্ষেত্র হইতে কয়লা উত্তোলন করাইয়া থাকেন।

এই তিনটি ক্ষেত্রে গত তিন বৎসরে কত কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা নিয়ে দেওয়া গেল :—

ক্ষেত্র	১৯০৯ খৃঃ টন	১৯১০ খৃঃ টন	১৯১১ খৃঃ টন
মহাপানি	৬০,৬৬৭	৩৯,৪৮৩	৫১,৯৮৩
পেঞ্চ উপত্যকা	৯২,১৯৬	৮৭,৬৭৭	৬৬,০৩০
বালারপুর	৮৫,২৩৭	৯৩,২৭৭	৯৬,৬০৩

(ঘ) বঙ্গদেশ ভিন্ন হাইদ্রাবাদে সিঙ্গরিণী নামক একটি বিস্তীর্ণ কয়লার খনি আছে। ১৮৭২ খৃঃ ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিত W. King ইহা আবিষ্কার করেন এবং ১৮৮৭ খৃঃ ইহা হইতে কয়লা তুলিবার কার্য্য আরম্ভ হয়। গত দশ বৎসর গড়ে ইহা হইতে ৪,৪৭,০০০ টন এবং ১৯১১ খৃঃ ইহাতে ৫,০৫,৩৮০ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। হাইদ্রাবাদ ডেকেন কোম্পানী ইহার সত্বাধিকারী।

ক্রমশঃ

শ্রী—

এষা।*

এই করুণ মর্ম্মস্পর্শী কাব্যগ্রন্থে কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল

'বৈতরণী-তীরে বসি'

'মরণের তরে বসি—'

আপনার স্বর্গীয়া 'প্রেয়সী না কৃতদাসী'র জন্য বিলাপ করিয়াছেন। কৈশোরে সাহিত্যিক চন্দ্রশেখরের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেমে' তাঁহাকে "প্রভঞ্জন-বিধ্বস্ত অর্ণবপোতের ন্যায়, ভগ্নাবশেষ গৃহভিত্তির ন্যায়, ধ্বংসাবশেষ নগরের ন্যায়" থাকিয়া আপনার পরলোকগতা প্রিয়তমার 'সেই মুখখানি'র জন্য রোদন করিতে শুনিয়াছিলাম, পরে বিশাল ইংরাজি সাহিত্য-কাননে বিচরণ করিতে শিখিয়া মিত্র-শোকাতুর-বিলাপরত কবিকেশরী টেনিসনকে অমর গ্রন্থ In Memoriamএ বিনয়-সহকারে বলিতে শুনিয়াছিলাম,—

"For I am but an earthly muse
And owning but a little art
To lull with song an aching heart
And render human love his dues."

এমন কি অপহৃতা জানকীর শোকে রঘুকুলচূড়ামণি শ্রীরামচন্দ্রকে কাতরকণ্ঠে বলিতে শুনিয়াছি—

যৈঃ পরিক্রীড়সে সীতে বিশ্বস্তৈর্মৃগ-পোতকৈঃ
এতে হীনাস্ত্বয়া সৌম্যে ধ্যায়ন্ত্যস্রবিলোচনাঃ।

* কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল-প্রণীত। মূল্য ১৲। ২০১ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

এক্ষণে 'এষা' কাব্যে বড়াল কবি যে উন্মাদক সুরে বিলাপ করিয়াছেন, সে সুর শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠনিঃসৃত, বড়ই মর্ম্মভেদী। এত বড় গ্রন্থখানা করুণ বিলাপ-সঙ্গীতে পূর্ণ, কিন্তু ইহাতে পাঠক-ভুলানো সরস বাক্যের ছটা নাই, 'আহা' 'উহু মরি মরি' 'হায় হায়' প্রভৃতির সমাবেশ নাই, চোয়াল-ভাঙ্গা সংস্কৃত কথার প্রাচুর্য্য নাই। ইহাতে শোকবিহ্বল কবি—

'ঘরের ঘরণী,
সুখে দুঃখে জীবন-সঙ্গিনী,
শুদ্ধা, হৃদ্যা, শুভ-আকাঙ্ক্ষিণী
পুত্রের জননী।'

মৃতা স্ত্রীর জন্য শোক করিয়াছেন। যৌবনের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে তুমি আমি যেমন শোক করি, প্রিয়জনের জীবনস্মৃতি লইয়া পবিত্র প্রণয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করি, দীর্ঘনিশ্বাস দিয়া ব্যজন করি, আঁখি-মূল বিগলিত অশ্রুরূপ গঙ্গোদকে পূজা করি, তাহারই নিত্য কর্ত্তব্যের স্মৃতি-কানন হইতে প্রসূনরাশি চয়ন করিয়া তাহারই উদ্দেশে নিবেদন করি, 'এষা'তে কবি তাহাই করিয়াছেন ; তাঁহার জীবন-সঙ্গিনীর মৃত্যুকালে স্নেহের তনয়া কি বলিয়াছেন, শোক-বিহ্বল অজ্ঞমতি বালক পুত্র অময় বা অজয়কুমার কি বলিয়া কাঁদিয়াছে, কিরূপে শোকার্ত্ত কবির 'একে একে প্রতিদিন প্রতি কথা মনে পড়ে,' প্রাঙ্গণে ধূলায় পড়িয়া কবির জননী কিরূপে বিলাপ করিয়াছেন, এমন কি বিশৃঙ্খল ঘরে বিড়ালটী কিরূপে দীন ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছে—বিলাপ-কাতর কবি প্রহেলিকা-বর্জ্জিত সাদা কথায় আমাদিগকে সেই সকল শুনাইয়া কাঁদাইয়াছেন। হাঁ কাঁদাইয়াছেন —কারণ তাঁহার কবিতাগুলি পড়িবার সময় একবারও সন্দেহ হয় নাই যে তিনি পাঠকদের জন্য লিখিয়াছেন ; তিনি আপনি প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছেন বলিয়া পাঠকের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 'উদ্ভ্রান্ত-প্রেমে' প্রথমে শোক-সন্তপ্ত, পরিত্যক্ত স্বামীকে মনে পড়ে না। বাক্যের ছটায়, উপমার প্রাচুর্য্যে গ্রন্থকর্ত্তার অনুশীলন ও পাণ্ডিত্যে, চিত্রকরের চিত্র-অঙ্কন ক্ষমতার প্রশংসায় হৃদয় ভরিয়া উঠে। টেনিসনের In Memoriam পড়িলে লেখকের অসীম লিপিকুশলতা, তাঁহার জ্ঞানের বিশালতা, তাঁহার কাব্যকলার উৎকর্ষতাই আমাদিগকে মাতাইয়া তুলে। কিন্তু 'এষা' কাব্যে 'শোকবৃদ্ধ দীন হীন উদাসীন' প্রিয়াবিরহ দুঃখ-মলিন অক্ষয়কুমারকে, তাঁহার ভাগ্যহীন পুত্র কন্যাদিগকে, তাঁহার সেই ঘনান্ধকার-পূর্ণ নিরানন্দ গৃহকে, এমন কি প্রকৃত বাস্তব জগতের

প্রজ্বলিত চিতা অগ্নিকে আমাদের চক্ষের সম্মুখে আনিয়া দেয়। কাজেই এ গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে আমরা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি না।

আমি বলিতেছি না যে উদ্ভ্রান্ত-প্রেম বা In Memoriam মর্ম্মস্পর্শী করুণরস বঞ্চিত এবং এষা, লিপি-কুশলতা, পাণ্ডিত্য বা কলা-সৌন্দর্য্য রহিত। প্রথম দুইখানি গ্রন্থ ভাষার দ্যোতনায়, নানা রকম শব্দের নিক্কনে পাঠকের একাগ্রতা নষ্ট করে, তাই সে লেখকই দেখে শোকার্ত্তকে দেখে না। Tennyson এর কবিত্ব-যশ-সৌরভ বিশ্বব্যাপী। তাঁহার হস্তের তুলিকা অমোঘ। তিনি In Memoriamএ যখন বিলাপ করিয়াছেন তখন পাঠকের হৃদয়কে বিগলিত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তীব্র শোকে কবি লিখিয়াছেন—

Deep folly ! yet that this could be
That I could wing my will with might
Tc leap the grades of life and light
And flash at once my friend to thee.

কিন্তু এ কবিতাতেও একটা তেজের আভাষ পাওয়া যায়। তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী এত অধিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে যে, সেগুলির জাঁক জমকের মধ্যে পড়িয়া কেবল বিশুদ্ধ শোকের ছবি গুলা পাঠকের মানস-নেত্রে একাধিপত্য করিতে পারে না। বড়াল কবি চিরদিন আমাদিগকে সুষমাময়ী প্রকৃতির দৃশ্য পট হইতে চিত্র দেখাইয়া মোহিত করিয়াছেন। 'এষা'ও সে চিত্রের মাধুরিতে পূর্ণ।

"গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিম রাশি,
আদরে দুলায় শাখা প্রভাত-পবন আসি';
ঝরিতেছে হিম-ভার
সরিতেছে অন্ধকার;
পাণ্ডুর অধরে তার ফুটিছে রক্তিম হাসি।"

স্বভাবের এ সুন্দর ছবি 'এষা'তে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক ইহার পরেই যখন পড়ি

ওগো, তুমি এস—এস, খসিয়া সে প্রেমশ্বাস!
কত দিন আছি বেঁচে—ক্রমে হয় অবিশ্বাস!

তখন ঐ শেষের ভাবটাই হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হয়, মন হইতে স্বভাবের সৌন্দর্য্যগরিমাটুকু খসিয়া পড়ে। 'শোক' নামক অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকের স্বভাব বর্ণনা কয়জন কবি করিতে সক্ষম হইয়াছে? 'গুড়ি গুড়ি' বৃষ্টি ঝরিতেছে, গ্রাম সুষুপ্ত, 'অদূরে নধর বট, দূরে ত্রস্ত শিবা' গ্রামপথ কর্দ্দম-পিচ্ছিল হইয়াছে, বরষার জলে বনজ গলিয়া

বায়ুকে ওতপ্রোত করিয়াছে, অঙ্কুরিত ধান্যক্ষেত্রে 'কাণে কাণে' জল, বেণুবন মণ্ডূক কণ্ঠস্বরে মুখরিত। এ সময় কবির সেই পরিচিত গৃহে,

'ঘুমাইছে শিশুগুলি, মুখে স্বপ্নহাস।'

কবি কিন্তু অনিদ্রায় দুঃস্বপ্নে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন কবে প্রিয়া ফিরিয়া আসিবেন।

'কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—কত রোগে শোকে'
খুঁজিয়াছি—মিলে নাই তবু দেখা তার!'

এ কাতর প্রলাপ শুনিলে আমরা সে যাদুকর চিত্রিত বরষার ছবি ভুলিয়া গিয়া শোকোন্মাদের শোকের আত্যন্তিকতা উপলব্ধি করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারি না।

অক্ষয়কুমারের কবিতায় পাণ্ডিত্যের বিকাশও যথেষ্ট আছে। নানা দার্শনিক মুনির নানা মত বিচার করিয়া ইংরাজ কবীন্দ্র টেনিসন শোক-রহস্যের মীমাংসা করিয়া স্থির করিয়াছেন

That friend of mine who lives in God
That God, which ever lives and loves,
One God, one law one element
And one far off divine event
To which the whole creation moves.

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তিনি সরস কবিতায় অশেষবিধ দার্শনিক-তত্ত্বের আভাষ দিবার জন্য যেরূপ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সম্মিলিত ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহাতে আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যদিগকে স্মরণ হয়। বোধ হয় টেনিসনেরই প্রণালী লইয়া শোকার্ত্ত অক্ষয়কুমার তাঁহার 'এষা'য় হিন্দুর প্রাণ-স্পর্শী কতকগুলা মতের উল্লেখ করিয়াছেন। এ গবেষণায় আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনভিজ্ঞ শিক্ষিত বিকৃতমস্তিষ্ক বাঙ্গালী যুবকদের পরিচিত জড়বাদের সম্বন্ধে ক্ষিপ্তপ্রায় শোকাতুর কবি বলিয়াছেন

বীণে যথা সুর-আলাপন,
সংযোজনে তাড়িত-স্ফুরণ,
তেমনি কি প্রাণ—
সুধু—সুধু রসায়ণ ক্রিয়া?
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে গিয়া
লভিছে নির্ব্বাণ?

না তাহা হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রীতি, স্মৃতি, ভাবনা, কল্পনা সকলি কি

অলীক স্বপন। এ মতে শোকে শান্তি পাওয়া যায় না। শোক হইতে কবি-হৃদয়ে ক্রোধ উদ্ভূত হইল। রাগত স্বরে তিনি বলিলেন—

একদিন কেহ একবার
করিবে না তোমার বিচার,
হে অন্ধ শকতি।

বাঙ্গালীর কাব্য-সাহিত্য অপেক্ষাকৃত বিশাল হইলেও তাহা স্বভাব বর্ণনা ও প্রণয় কবিতা বহুল। সুললিত কবিতার ছন্দে এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক মতের বর্ণনায় ও বিচারে, পূর্ণ মাত্রায় টেনিসনের মত কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও, সে কবি যে বরণীয়, তাঁহার উচ্চতর পাণ্ডিত্য যে প্রশংসনীয়, তাঁহার শক্তি যে অত্যধিক তাহা কে অস্বীকার করিবে? অক্ষয়কুমার দার্শনিক নহেন, কবি—শোকবিহ্বল কবি। তিনি দর্শন বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন জগতের বিষম সমস্যারাশির পূরণের জন্য নহে। দর্শনে তাঁহার অভিরুচি হইয়াছে শোকে শান্তি পাইবার জন্য, তাঁহার প্রেমপূর্ণ কাতর হৃদয়ে প্রজ্বলিত বহ্নিরাশি উপশম করিবার শান্তিবারি আহরণের জন্য। তিনি বেলাভূমে উত্তাল তরঙ্গের খেলা দেখিবার জন্য সাগরতটে গমন করেন নাই, তিনি পিপাসাতুর, এক গণ্ডূষ পানীয় জলের জন্য মীমাংসা-সাগরের তীরে দণ্ডায়মান। জড়বাদের তরঙ্গ দেব-বাদের বেলায় আছাড়িয়া পড়ুক, চূর্ণ বিচূর্ণ হউক, গীতাবাদের তরঙ্গ বিজ্ঞান-বাদের তরঙ্গের ঘাড়ে পড়িয়া তাহাকে শতধা চূর্ণ করুক তাহাতে প্রেমবিহ্বল বিরহ বিধুর কবির কিছু লাভালাভ নাই। তিনি এক একবার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে এক এক গণ্ডূষ জল পরীক্ষা করিয়াছেন। যেমনি সে বারিতে লবণাস্বাদন পাইয়াছেন অমনি অপর তরঙ্গের বারিরাশি পরীক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং 'এষা'য় কোনও মতের বিস্তৃত পরিচয়, তর্কবাগীশের সুযুক্তি কুযুক্তি থাকিবার আবশ্যক নাই। ঐ সকল মতের সুন্দর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথায় সরস বর্ণনা আছে। যেমন কবিবর একটি মতে শান্তি পাইতে পারেন নাই অমনি সমস্যাভঞ্জন করিবার জন্য প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর মত অপর মতে শান্তি অন্বেষণ করিয়াছেন।

জড়বাদ অযোগ্য দেখিয়া কবি ভাবিলেন—বাস্তবিক কি লোকান্তর নাই "জীবনের অভিনব স্তর, পবিত্র বিকাশ" নাই?

কেন বুদ্ধ ত্যজিল আবাস,
কেন নিল নিমাই সন্ন্যাস—
মৃত্যু যদি শেষ?

নিশ্চয়ই লোকান্তর আছে, একটা দেবলোক আছে। কিন্তু দেবতা জ্যোতি-মণ্ডলে বসিয়া তাঁহার কি করিলেন—

কি দেখব !—তীব্র ভয়ঙ্কর।
ভাবিতে যে শিহরে অন্তর,
হয় না ধারণা—

কেমন করিয়াই বা দেবের দেবত্বে তাঁহার বিশ্বাস থাকিবে। প্রত্যহই তো শিথিল-অঞ্চলা, স্মিতাননা, কৌষেয়-বসনা কবি-ঘরণী ফুল, মালা, নৈবেদ্য লইয়া দেবার্চ্চনা করিতেন। সেই পাষাণ বিগ্রহের নিকট তো কবিবর কাতর বিলাপ সঙ্গীতে কত চিৎকার করিয়াছেন কিন্তু

'বুঝিবে না, বধির দেবতা'।
'কাংস্য-ঘণ্টা-শঙ্খ-রোলে তবু না শ্রবণ খোলে,
পশে না নরের ক্ষুদ্র কথা।

কবিবর প্রাণী হইয়াও শত্রুকে বুকে টানিয়া লয়েন—কাজেই যদি ক্ষোভে, শোকে অভিমানে হিন্দু কবি বলিয়া উঠেন—

দেব-দয়া নাহি চাই আর।
ইচ্ছা হয়,—দৈত্যসম ল'য়ে নিজ তপঃ শ্রম
মৃত্যুরে আক্রমি একবার—
গ্রহ-উপগ্রহ টানি' প্রিয়ারে ফিরায়ে আনি !
দেখি মৃত্যু কি করে আমার !

তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের কোন গোঁড়াই তাঁহাকে তিরস্কার করিতে পারেন না।

তাহার পর তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রভূত পরিচয় দিয়া গীতাবাদে তিনি দেখিয়াছেন

ছিনু, আছি, রব' চিরকাল,
সে-ও আছে, চোখের আড়াল—
এই মাত্র ভেদ।

গীতার এই সনাতন সত্যের উপর বিশ্বাসের সহিত কর্ম্মফলে বিশ্বাস জড়িত। কাজেই আবার কবি নিরাশাসাগরে ডুবিলেন। কারণ

সে পেয়েছে তার কর্ম্মফলে,
আমি পাব কোন্ পুণ্যবলে
সেই পরকাল ?
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, লক্ষ্যে, আচরণে
কি বিভিন্ন ছিলাম দু'জনে—
আকাশ পাতাল !

কবিত্ব ও দর্শনের কি সমন্বয়! কি সুন্দর সরল ভাষা! এ মীমাংসা পড়িয়া কে না বলিবে—অক্ষয়কুমার তোমার শোকেও তুমি ধন্য।

তিনি বিজ্ঞানবাদের আশ্রয় লইলেন। ঐরূপ সরল ভাষায় তিনি এক গভীর বিজ্ঞানানুশীলনের ফল অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ফেলিলেন—

সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ-দল,
সবে চলে তালে তালে; নীহারিকা বাঁধা জালে,
ধূমকেতু সময়ে উজ্জ্বল।
ঘুরে ধরা নিজ কক্ষে, বর্ষ ষড়-ঋতু-বক্ষে—
মরণ কি শুধু বিশৃঙ্খল?

কিন্তু গীতাবাদ যে হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করিল না, ছার বিজ্ঞানের কি সাধ্য সে হৃদয়ের শোক-বহ্নি নির্ব্বাপিত করে?

ছিল সত্য, ছিল স্থূল, হ'লো সূক্ষ্ম, হ'লো ভুল,—
মনেরে বুঝাব এই বলি'?
ব্যষ্টিতে সমষ্টি-ভাব? ক্ষুদ্রের মহত্ব-লাভ?
আবার সে রহস্য সকলি!

আবার কবি শোকবিহ্বল হইয়া উঠিলেন। বাস্তব জগতের ঘটনা রাশির উল্লেখ করিয়া বিলাপ সঙ্গীত উঠিল—সে শোকগাথায় বিপত্নীক পাঠক আবার নূতন করিয়া নিজের সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণ দেখিতে পাইবে—প্রত্যেক পাঠকের মৃত প্রিয় পরিজনের জীবনস্মৃতিতে তাহার নয়ন অশ্রু-অন্ধ হইবে।

অক্ষয়কুমার 'এষা'য় তাঁহার বিদ্যা, অনুশীলন, পাণ্ডিত্য ও শব্দ-সম্পদের পরিচয় দিয়াছেন বটে কিন্তু আপনার কাজ ভুলেন নাই। হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে সেই এষার অনুসন্ধিৎসা পুস্তকের সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। তিনি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন শোকে শান্তি পাইবার জন্য, বিদ্যা দেখাইয়া পাঠকের নিকট বাহাদুরী লইবার জন্য নহে। আর বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ না করিলে এ পুস্তকে যে পাণ্ডিত্য আছে তাহা সহজে পাঠক ধরিতে পারিবে না। শিল্প-চাতুরী গোপন করাই প্রকৃত শিল্পীর গুণপনা। এ বিষয়ে বঙ্গাল-কবি প্রকৃত শিল্পীর পরিচয় দিয়াছেন।

'এষা' চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ "মৃত্যু"। ধীরে ধীরে কিরূপে কবিবরের স্নেহময়ী প্রিয়তমার স্বল্পদিনব্যাপী জীবনের যবনিকা পতিত হইল কবিবর এ অধ্যায়ে সেই চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এ রকম মর্ম্মস্পর্শী করুণ বর্ণনা আমরা অতি অল্পই পড়িয়াছি। যাহা পড়িয়াছি তাহা কল্পিত চরিত্রের। কবিবরের সহধর্ম্মিণীকে দুরন্ত মৃত্যু আসিয়া স্বর্গধামে লইয়া যাইতেছে, মুমূর্ষু মাতার শয্যায় বসিয়া স্নেহের কন্যা ভীতা হইয়া বলিল—

'বড় ভয় করে, তুমি এস ঘরে,
একোমেলো কি বলে কেবল।'

মৃত্যুশয্যায় শায়িতা সাধ্বী প্রবাসী পুত্রের কুশল সংবাদে ম্লান মুখে হাসিলেন, শেষে

'শান্ত—তৃপ্ত, ধীরে পার্শ্ব ফিরে'
করিল শয়ন—
ফুরাল জীবন।'

কবির বর্ণনা-কৌশল এত সুন্দর যে পড়িবার সময় মনে হয় সত্য সত্যই এক সতীর আত্মা আমাদের সম্মুখ হইতে দিব্যধামে মহাপ্রস্থান করিল। মুগ্ধ পাঠকের এমন কি পাষাণ চক্ষু আছে যে তাহা অশ্রুরোধ করিতে পারে! ঠিক তাহার পরেই পরিত্যক্ত কাতর স্বামী শোক-মোহে পাগলের মত বলিয়া উঠিল—

'ম'রো না—ম'রো না প্রিয়ে, একমাত্র তোমা নিয়ে
আমার এ সাজান সংসার।
চেষ্টা করি', প্রাণেশ্বরি, নয়—তবে দয়া করি'
নিশ্বাস ফেল গো একবার।
না পারো, আমার প্রাণ আমি করিতেছি দান
শ্বাসে—শ্বাসে অধরে তোমার।'

এ আবেগময় বিলাপ শুনিলে কোন্ হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? বোধ হয় নির্জ্জনে বসিয়া পড়িলে, লক্ষ লক্ষ নরশোণিত-কলুষিত চঙ্গিজ খাঁরও চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে। ক্রমে শ্মশানের অন্তিম কার্য্য সমাধা হইল। সে করুণ বর্ণনার মধ্যে কিন্তু ভীষণতার চিহ্নটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি এত বিলাপ করিয়াছেন, এত কাঁদিয়াছেন কিন্তু একই ভাবের পুনরাবৃত্তি করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করেন নাই। তাঁহার ভাষায় কোনও কালে প্রহেলিকার তমসা নাই, শব্দের মন্দিরে ভাবের বলিদান নাই অথচ তাঁহার গাথার প্রতি ছত্র মাধুরী মাখানো। আমরা এই সমালোচনায় তাঁহার অনেক কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি। লোভ হয় আরও শ্লোক পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া নিজেদের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাই। এই অধ্যায় হইতে আর একটা শ্লোক না তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কোন্ অপরাধে এই কঠোর শাসন?
কোন্ পিতা পুত্র প্রতি
এমন নির্দ্দয় অতি?
আমিও ত করিতেছি সন্তান-পালন—
কত রাগি চোখে মুখে,
তখনি ত টানি বুকে,
মুছাতে নয়ন তার—মুছি ত আপন।

পাঠক দেখিবেন ইহার প্রত্যেক ছত্র কিরূপ শ্রুতিমধুর। ইহাতে কবি হৃদয়ের সুকোমল স্নেহের বৃত্তি জলন্ত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শোকের সময় অভিমানের সুরে অক্ষয়কুমার যেরূপ ভাবে বিধাতার সহিত কলহ করিতেছেন তাহাতে মনে হয় যে জগদীশ্বরের সহিত পিতা পুত্রের সম্বন্ধটা তাঁহার হৃদয়ে অতি গভীর ভাবে বদ্ধমূল ছিল। তিনি তাঁহার এই মর্ম্মবিদারক তীব্র বেদনার জন্য প্রতি হাতে পিতার সহিত আব্দুরে ছেলের মত ঠোঁট ফুলাইয়া ঝগড়া করিয়াছেন। যে কলহের শেষ ফল 'এষা'র শেষ অংশে স্বর্ণ অক্ষরে খোদিত হইয়াছে। ক্ষণিক নাস্তিকতার কৃত্রিম আবরণে তিনি আপনার ভক্তিপ্রাণতা ঢাকিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়—অশৌচ। মৃত্যু-কলুষিত ভীষণ রজনীর প্রভাতে কবিবরের নিকট পৃথিবী এক নূতন ভাব ধারণ করিল; তিনি নিরাশাপ্রসূত মলিন কণ্ঠে বলিলেন—'আমি শুষ্ক ছিন্ন সূত্র-দেব-মালিকার!' মনে মনে কতবার মৃত্যুকে ডাকিলেন। মৃত্যু আর তাঁহার কি করিবে! তিনি চাহিলেন

'একত্র স্বরগ-ভোগ
না হয় একত্র প্রেতলোক!'

তিনি কত রকম যুক্তি তর্কের দ্বারা আপনার মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। জগতে তো এ রকম বিপদ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। সে বর্ণনায় তিনি তাঁহার বহুদর্শিতা ও পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার শক্তি দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আর সুখ-নিদ্রা আসিল না। তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে তিনি

দুর্গদ্বারে একা সান্ত্রী মত
জীবনে জাগিয়া অবিরত।

তাহার পর তিনি একে একে দার্শনিক মতগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সে কথার আমরা পূর্ব্বে বিশদ ভাবে সমালোচনা করিয়াছি। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রাদ্ধাদি করিলেন। আদ্যকৃত্য হইয়া গেলে শান্তি জলে মঙ্গলময়ের নিকট মঙ্গল ভিক্ষা করিয়া কবিবর দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

'আনন্দ-বিদায়' ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার "কাব্যের উপভোগ" নামক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—'রবীন্দ্র বাবু তাঁর আত্ম-জীবনীতে Inspiration দাবী করে' যখন নিজের কবিতাগুলি সমালোচনা কর্ত্তে বসেছিলেন, তখন তাঁর দম্ভ ও অহমিকায় আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। তাঁরই উক্তি 'বঙ্গদর্শনে' প্রায় তাঁরই ভাষায় পুনরুক্ত দেখে বঙ্গ সাহিত্যের মঙ্গল হিসাবে তার প্রতিবাদ কর্ত্তে বসেছিলাম।"

রবীন্দ্রনাথের 'দর্পহরণ' মানসে তাঁহাকে ও তাঁহার লেখনীকে আক্রমণ করিয়া এই কয়বৎসর-কাল ক্রমাগত দ্বিজেন্দ্র বাবু অশ্রান্ত ভাবে কত যে ছড়া, পদ্য ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। অদ্যকার আলোচ্য এই 'আনন্দ-বিদায়' নাটিকাও প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যে রচিত। এই নাটিকা বা এই নাটিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা পরে বলিতেছি। "বঙ্গ সাহিত্যের মঙ্গল হিসাবে" সর্ব্বপ্রথমেই এই গ্রন্থের 'ভূমিকা' সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য বোধ করি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের যে দম্ভ-দোষ দর্শনে দ্বিজেন বাবু 'স্তম্ভিত ও বিস্মিত' হইয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা শত-সহস্র গুণ দম্ভ ও অহমিকা তাঁহার কৃত এই 'ভূমিকা'য় প্রকটিত। দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বিশদ করিয়া দিতেছি।

গ্রন্থকার 'ভূমিকা'য় এক স্থলে লিখিয়াছেন,—"কোন কোন সমালোচক এমন নিরেট যে ভূমিকারূপ হাতুড়ি দ্বারাও তাঁহাদের মাথায় পেরেক বসে না। উদাহরণতঃ "পরপারে"র ভূমিকায় আমি বলিয়া দিলাম যে, ইহা ইংরাজি শিক্ষায় আলোড়িত "বর্ত্তমান ভদ্র হিন্দু সমাজের" ভিত্তির উপর গঠিত। তথাপি এই ব্যক্তিগণ নাটকে সেকেলে আদর্শ খুঁজিতে বসিলেন।...... কিন্তু কি করিব আমি যুক্তি দিতে পারি, মস্তক দিতে পারি না। তাহা ভগবানের সৃষ্টি।"

'পরপারে'র চিত্র সামাজিক হইয়াছে কি অসামাজিক হইয়াছে, সে কথা 'পরপারে'র সমালোচনার সময় দেখাইব। উপস্থিত আমরা পাঠকবর্গকে উপরি-উদ্ধৃত দ্বিজেন বাবুর ভাষার প্রতি একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস, যাঁহার ঘটে বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে, তিনিই বুঝিবেন যে দ্বিজেন বাবুর ঐ গালাগালির লক্ষ্য—'বঙ্গবাসী' ও 'নব্যভারতে'র সমালোচক। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার একথা স্বীকার করিবেন না। তিনি হয়ত বলিবেন যে, "আমার অমন মৌলিক রসিকতাকে যে গালাগালি বুঝে, তাহার "মস্তকে ছোট-খাট চাটিকা।" কিন্তু দ্বিজেন বাবু যাহাই বলুন না কেন, তাঁহার ঐ ভদ্রলোকের অব্যবহার্য্য ভাষা পাঠে বোধ করি এমন কোনও ভদ্রসন্তান নাই, যিনি ঘৃণায় ও বিরক্তিতে মুখ না ফিরাইবেন। উহা পাঠে 'বঙ্গবাসী'র সমালোচক অনায়াসে বলিতে পারেন যে, "দ্বিজেন বাবুকে আহা আর কখনও কিছু বলিয়া কাজ নাই। যিনি নিজের লেখায় দুই একটা অপ্রশংসার কথা শুনিলেই ভদ্রলোককে গালাগালি করেন, তাঁহার উপর রাগ করিবার কিছু নাই; বরং তিনি কৃপাপাত্র।"

দ্বিজেন বাবুর তাঁহার অসংযম ও শিথিলতার পরিচয় যে আজ এই প্রথম পাইলাম, তাহা নহে। তিনি যখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে মগ্ন করিতেছিলেন, তখন একবার সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার দোষ ধরিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,—"এই সব কল্পনা উক্ত গ্রন্থকারের (বঙ্কিমের) শেষ বয়সে বিকৃত মস্তিষ্কের চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।" সুখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমের প্রতি এইরূপ অসংযত, উদ্ধত ভাষা প্রয়োগ করিয়া দ্বিজেন বাবু অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালার নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচক সমাজপতি মহাশয়ের ভাষার কশাঘাত তাঁহার ঐ অসংযত লেখনীকে সুসংযত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। জানি না কেন, সমাজপতি মহাশয় আজকাল দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই যথেচ্ছাচার নীরবে সহ্য করিতেছেন! নহিলে বুঝি দ্বিজেন্দ্রলাল এমন অযথা, এমন কিছু-না, এমন হেব্‌লামি পরিপূর্ণ পুস্তক লিখিতে সাহস করিতে পারিতেন না। দ্বিজেন্দ্র বাবু নিজেকে সুনীতির প্রতিপোষক ও দুর্নীতির শত্রু বলিয়া যখন-তখন ঘোষণা করিয়া থাকেন; সেইজন্য তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি যে, জগতের কোন্ নীতিশাস্ত্র ভদ্রলোকের প্রতি ঐরূপ ভাষা-ব্যবহার শিক্ষা দিয়া থাকে?

সমালোচকদিগের জন্য 'হাতুড়ি'র ব্যবস্থা দ্বিজেন বাবু যে 'আনন্দ-বিদায়ে' এই প্রথম করিলেন, তাহা নহে। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক 'নাটক' ও 'নাটিকা' নামাঙ্কিত পুস্তকের ভূমিকায় সমালোচকগণকে তিনি ধমক দিয়াছেন, চোখ রাঙাইয়াছেন। তাঁহার 'ভূমিকা'র ভাবখানা এই যে,—"যা" কিছু বিদ্যে, বুদ্ধি সে সমস্তই আমার মস্তকের ভিতর গজ্‌ গজ্‌ করিতেছে। আমি যাহা বলি, তাহা অকাট্য। আমি যাহা লিখি, তাহা নিখুঁৎ। যে লেখার যে দোষ ধরে' তাহার "পৃষ্ঠে ঝাঁটিকা।" আমরা একবার তাঁহার 'দুর্গাদাস' গ্রন্থের সমালোচন-কালে দেখাইয়াছিলাম যে 'তাঁহার অঙ্কিত আরঙ্গজেব চিত্র না হইয়াছে স্বাভাবিক, না হইয়াছে ইতিহাসানুযায়ী।' এতদুত্তরে তিনি তাঁহার 'সাজাহান' গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় লিখিলেন,—"যাঁহারা 'দুর্গাদাসে বর্ণিত ঔরংজীব ঐতিহাসিক ঔরংজীব নহে' বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহারা না জানেন ইতিহাস না জানেন মানব-চরিত্র।" অথচ—এই দ্বিজেন বাবু নিজেই ঐ 'ভূমিকা'র শেষাংশে লিখিলেন যে, "ইয়ুরোপীয় ইতিহাসকার ও পর্যটকগণ প্রায় একবাক্যে তাঁহাকে (আরেংজেবকে) কেন যে এমন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।"

শুধু 'হাঁ' এবং 'না' লইয়া তর্ক করা চলে না। পূর্বতন বড় বড় ঐতিহাসিকগণের অভিমতকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়ায় তাঁহার যুক্তির সারবত্তা খুবই প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু বলিতে কি—এ সমস্তকে লোকে 'প্রহসন' বলিয়াই মনে করে। অতএব দ্বিজেন বাবুর অমন পরম সারবান যুক্তি দেখিয়া যদি কেহ হাস্য সম্বরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়াও চলে না; বরং তাহার সে হাসি স্বাভাবিক বলিতে হইবে। তবে কথা হইতেছে, এই হাসির মৃদু আঘাত যে একজন 'পুরুষ লেখকে'র চিত্তকে এতটা বিকল ও এতটা বিচলিত করিয়া তুলিতে পারে, একথা আমরা দ্বিজেন বাবুর লেখা না পড়িলে ধারণা করিতে পারিতাম না। দ্বিজেন বাবু একজন সামান্য লেখক হইলে আমরা এত কথা বলিয়া 'অর্চ্চনা'র স্থান নষ্ট করিতে যাইতাম না। কিন্তু অনেকের লেখকের তিনি আদর্শ। পাছে তাঁহারা দ্বিজেন বাবুর এই বক্তির

দেখিয়া ভদ্র লেখকের অব্যবহার্য্য ভাষা এবং এই 'আনন্দ-বিদায়ে'র রসিকতার মত হীন রসিকতার উদ্গীরণ করেন, এই আশঙ্কায় আমরা এত কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

অনেক সময় অনেক বিষয়ে দেখা গিয়াছে যে, তর্ক-যুক্তি অপেক্ষা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অধিকতর কার্য্যকরী হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—ভল্‌টেয়ার। দৃষ্টান্ত—আমাদের দেশের অমৃতলাল। অমৃতলালের বিদারুণ অঙ্কুশ দেশের অনেক ভণ্ডের স্থূল চর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া তাহাদের চিত্ত বিকল ও বিচলিত করিয়াছে। তাঁহার 'বাবু' ও 'বিবাহ বিভ্রাট' যে শুধু চাটনীর মত আপাতঃ মুখরোচক, তাহা নহে। তাহাতে পুষ্টিকর খাদ্যেরও উপাদান আছে। তবে কথা হইতেছে এই যে, হাস্যরস বা ব্যঙ্গরস যদি সক্ষম লেখকের দ্বারা সুপ্রযুক্ত হয়, তবেই তাহা ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ কার্য্য করে; নতুবা নহে। রসিকতা সুপ্রযুক্ত না হইলে তাহা ছেব্‌লামিতে পরিণত হয়। কিন্তু ছেব্‌লামি—বিরক্তি-কর। ভদ্র-সাহিত্যে তাহার 'প্রবেশ নিষেধ'।

পাঠক ও সমালোচকের মুখবন্ধ করিবার আশায় দ্বিজেন বাবু সচরাচর যে কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন, 'আনন্দ-বিদায়ে'র 'ভূমিকা' এবং 'প্রস্তাবনা'তেও সে কৌশলের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। 'প্রস্তাবনা'র একস্থলে লিখিত আছে,—

"কে রসিক বেরসিক জানি না,
বিধের নিন্দাও মানি না,
বেরসিক যিনি, তাঁর আছে বেশ অধিকার—
বেশী ভাত খাইবার গিয়ে নিজ বাটিকায়।"

ছড়াটির ভাব এই যে, "আমার 'নাটিকা'কে যে মন্দ বলে, সে বেরসিক। সে যেন নিজের বাড়ীতে গিয়ে বেশী ক'রে ভাত খায়।"

'বেরসিক' নামের ভয়ে এক আধ জন পাঠক হয়ত এই 'কুইনাইনে'র বড়ী গলাধঃকরণ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু 'বাড়ীতে গিয়ে বেশী কোরে ভাত খেও',—মান্ধাতা আমলের এই অতি পুরাতন, অতি জীর্ণ ও পচা রসিকতা হইতে কেহ রস উপভোগ করিতে পারে, এমন পাঠক এখন বাঙ্গালা দেশে আছে বলিয়াত বিশ্বাস হয় না। দ্বিজেন বাবু যদি আমাদের সত্য-কথাকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান না করেন, তবে তাঁহাকে বলিয়া রাখি যে, এই বহি হইতে স্বয়ং রচয়িতা ব্যতীত আর কাহারও রসাস্বাদন করিবার সামর্থ্য নাই। গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমগ্র স্থানে হাসাইবার জন্য লেখকের একটা প্রাণপণ চেষ্টা লক্ষিত হয়; কিন্তু সে সমস্ত চেষ্টাই পণ্ডশ্রম হইয়াছে মাত্র। গ্রন্থখানা পড়িবার সময় মনে হয় লেখক যেন ব্যঙ্গ, গালি ও ছেব্‌লামি এই তিনের প্রভেদ ভুলিয়া গিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

অমৃত হইলেও একই সামগ্রী—বারংবার কচ্‌লাইলে তাহা তিক্ত হইয়া উঠে। এই 'আনন্দ-বিদায়' সেই তিক্ত রসের উৎস। গ্রন্থকারের মতানুযায়ী রবীন্দ্রনাথের যে সকল রচনা কুরুচি ও দুর্নীতিমূলক এই গ্রন্থখানিকে একপ্রকার সেই সকল রচনারই তালিকা বলা যাইতে পারে। কিন্তু একঘেয়ে একই কথায় বারংবার উদ্গীরণে লেখক নিজে রস পাইতে পারেন, তা' বলিয়া সকলেরই যে উহা ভাল লাগিতে হইবে, এমন আব্দার কে শুনিবে?

'প্যারডি' যদি সুরচিত হয়, তবে তাহা উপভোগ্য হইয়া থাকে স্বীকার করি। কিন্তু নন্দ বিদায়ের 'প্যারডি' হিসাবেও গ্রন্থখানি কিছু হয় নাই।

রসপরিচালনায় লেখক ইহাতে আদৌ দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। উদাহরণস্বরূপ, গ্রন্থের যদৃচ্ছাহ্বান হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ১৯ পৃষ্ঠা :—

"ডাকিয়াছি। যাও চট্টগ্রামে, ধ'রে আনো
দুরাত্মা নেপাল চন্দ্রে।
তাহারে করিব বধ।
পড়্ পড়্ পড়্—নেপালের হবে মুণ্ডপাত;
খড়্ খড়্ খড়্—পড়িবে নেপাল।
ছড়্ ছড়্ ছড়্—ছড়াইবে রক্ত তার;
হুড়্ হুড়্ হুড়্—খাইব তাহা উদর ভরিয়া।
কড়মড় চিবাইব মুণ্ডপরে—যেন পান।
(স্বগত) দেখিতেছি কত বল ধরে সে নেপাল!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ——"

মনুষ্য-আকারধারী জীবের মধ্যে বোধ করি, এমন কেহ অন্তঃসারশূন্য নাই যে, ঐ "প্যারডি" পড়িয়া যাহার মুখে একটুও হাসির রেখা ফুটিতে পারে। এক আধ স্থলে এরূপ হইলে আমরা কিছু বলিতাম না। গ্রন্থের আপাদমস্তক এই ধরণের 'প্যারডি'তে পরিপূর্ণ। কত দেখাইব? কম্বলের লোম—বাছিয়া দেখাইবার নহে।

এই গ্রন্থের আর এক পাত্র বলিতেছেন,—"এর moral আমি এইটুকু বুঝ্লাম যে—এঁ্যা এঁ্যা—ছেলে বয়সে যে লোকে বিয়ে করে সে নিজের জন্য, আর বুড়োবয়সে যে বিয়ে করে সে—এঁ্যা এঁ্যা—পরোপকারায়।" বটতলায় যে রসের তরঙ্গ আমরা কাটাইয়া উঠিতেছিলাম, আজ দেখিতেছি সেই রসের ভাঁড় হাতে করিয়া দ্বিজেন বাবু মাতৃমন্দিরে উপস্থিত। মার পবিত্র মন্দিরে তাড়ির হাঁড়ীর আমদানী কে সহ্য করিবে? দ্বিজেন বাবু অপরের রচনার মধ্যে বড় বেশী রকম 'দুর্নীতি'র অন্বেষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার ঐ 'রসিকতা'কে তিনি কোন্ 'নীতি'র অন্তর্গত করিতে চাহেন? এই দুঃখেই বঙ্কিমচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের দেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া দেয়। ভ্রান্ত অপর ভ্রান্তকে উপদেশ দিয়া থাকে।"

গ্রন্থকার 'ভূমিকা'য় লিখিয়াছেন বটে,—"এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই।" কিন্তু পাঠক সাধারণে এ কথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না। তাহারা বলে যে, 'আনন্দ বিদায়' নাটিকার ৩২ পৃষ্ঠায় রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি কটাক্ষ আছে। প্রমাণস্বরূপ তাহারা এই স্থলের উল্লেখ করে; যথা—

নেপাল। সাহিত্য-সম্রাট হব, কবি হব।
মালতি। সকলি সম্ভবে কলিকালে—
ভূমিশূন্য রাজা, বিদ্যাবিহীন হাকিম;

নিরক্ষর কাব্যবিশারদ,
বিধবী মহর্ষি।"

সাধারণের এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দ্বিজেন বাবুকে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কারণ, মৃত মহাত্মাদের প্রতি যিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে সঙ্কোচ অনুভব না করেন, তাঁহাকে কি বলিয়া যে লজ্জা দিব,ভাষায় তাহা ত খুঁজিয়া পাই না। 'হাস্যরসে'র এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াই বোধ করি, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"সাহিত্যসমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে; দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠী ঘুনে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠীর ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং।"

এই 'নাটিকা'র প্রথম অভিনয় রজনীতে দর্শকগণ বিরক্ত ও উত্তেজিত হওয়ায় দ্বিজেন বাবু দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালা দেশে 'প্যারডি' বুঝিবার এখনও সময় আসে নাই।" আমাদের কিন্তু এই মনে হয় যে, বাঙ্গালা দেশের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ, সেইজন্যই এই 'নাটিকা'র আর দ্বিতীয় অভিনয় রজনী হইল না। বাঙ্গালা দেশে এখনও মানুষ আছে বলিয়াই এ পুস্তককে অবজ্ঞার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছে।

তবে দ্বিজেন বাবুর বিপক্ষদল তাঁহার বিরুদ্ধে আর যে এক অভিযোগ আনিয়াছেন, সে অভিযোগের বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। তাঁহারা বলেন যে, দ্বিজেনবাবু নানা উপায়ে ইহাই বলিতে চাহিতেছেন যে তিনি বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী, আর নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস এই দ্বিজেন বাবু এত অপদার্থ নহেন যে তিনি স্বপ্নেও নিজেকে ঐ মহাকবিদ্বয়ের সহিত তুলনীয় মনে করিতে পারেন। কেননা, এই তুলনায় দ্বিজেন বাবুকে উপহাস করা হয় এবং গিরিশ ও রবীন্দ্রের যুগান্তরকারিণী প্রতিভার অবমাননা করা হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।